অচ্ছেদ্য

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

সাহিত্য সংস্থা

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

অষ্টম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮

প্রকাশক

রণধীর পাল

সাহিত্য সংস্থা

৯, নবীন পাল লেন, কলি-৯

মুদ্রক

সুধীর পাল

সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১৪।১এ, রাজা রামমোহন সরণী

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

গীতা দাস

প্রাপ্তিস্থান

সুহাস পাব্লিশিং হাউস

১৮-সি, টেমার লেন, কলি-৯

বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল অবিভক্ত ভারতের সমগ্র বাংলাদেশের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া, সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া যাহা দেখিয়াছি, লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি ও ইতিহাসের পাতায় যাহা পড়িয়াছি তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই 'অচ্ছেদ্য' উপন্যাস রচিত হইল। —লেখক।

লেখকের অন্যান্য বই

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

অগ্নিযুগের পথচারী

অগ্নিযুগের ফেরারী

উপনিষদ পরিচয়-শ্রুতি সংগ্রহ

বাঙলাভাষায় 'ভরাডুবি' বলে একটা কথা আছে। ভরা শব্দের এখানে অর্থ, 'বোঝাই নৌকা'। আর সাধারণত ভরাডুবি শব্দের অর্থ 'সর্বনাশ হওয়া'। এছাড়া এর একটা ঐতিহাসিক অর্থও আছে।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে বাঙলাদেশের হিন্দু জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনবানেরা জাতি ও পুরমহিলাদের ধর্মনাশের ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত থাকতেন। সেই বিপদে পুরমহিলাদের ধর্ম ও বংশ রক্ষার জন্য তাঁরা বাড়ী করতেন নদীর তীরে। বাড়ীর পিছনে নদীর ঘাটে সবসময়ের জন্য বাঁধা থাকত একখানা 'বজরা' নৌকা ও একখানা 'ছিপ' নৌকা। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাড়ীর মহিলারা ঐ বজরা বা ছিপ নৌকায় উঠে দেশান্তরে পালিয়ে যেতেন। যদি পালানোর সুযোগ না পাওয়া যেত, তবে সকলে বজরায় উঠে দরজা জানালা বন্ধ করে, বজরার তলায় কুড়ুল মেরে ফাঁসিয়ে, ডুবে যেতেন। মান-ইজ্জত-ধর্ম বাঁচানোর জন্য এই ভাবে মৃত্যু বরণ করাকেই 'ভরাডুবি' বলা হয়।

যে সব জমিদার বা ধনী নদীর তীরে বাড়ী করার সুযোগ পেতেন না, তাঁরা বাড়ীর পিছনে দীঘি বা বড়ো পুষ্করিণী কাটিয়ে সেখানে বজরা বেঁধে রাখতেন। কোনো ব্যক্তি যদি পুরমহিলাদের জাতি-ধর্ম রক্ষার এই চরম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শত্রুপক্ষের হাতে ধরিয়ে দিত, তবে সেই ব্যক্তিকে দেশের লোকে 'ভরাপারা' বলে অভিসম্পাত করত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বাঙলাদেশে অনেকগুলি ভরাডুবি ঘটেছিল। সেই সব স্মৃতি বহন করে এখনও দেশে বহু 'ভরাডুবির ঘাট', 'ভরাডুবির দীঘি', 'ভরাডুবির পুকুর' আছে। মধ্যবঙ্গের এই রকম একটা ভরাডুবির ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে এই গ্রন্থের গোড়াপত্তন করা হইল।

আদিপর্ব

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর বাদশাহ।

মধ্যবঙ্গে ভৈরব নদের তীরে সুলতানপুরের খানচৌধুরী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা এনায়েতুল্লা খাঁর জন্ম হয় ঢাকা সহরে। সে সময় সুবে বাংলার সুবেদার নবাবের রাজধানী ছিল ঢাকা।

এনায়েতুল্লা খাঁর পিতা সাহাবুদ্দিন খাঁ ভারতের বাইরে পারস্য বা ঐ রকম কোনো দেশ থেকে প্রথম যৌবনে একাকী এদেশে আসেন। তাঁর মৎলব ছিল 'সোনার ভারত' থেকে কিছু সোনা সংগ্রহ করা। বাদশাহী রাজধানী দিল্লী পৌছিয়ে সে সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। ইংরেজ আমলে যেমন বিলেত থেকে কোনো শ্বেতচর্ম—তা সে 'বাপে তাড়ানো মায় খেদানো' যাই হোক না কেন, এদেশে এলেই সদাশয় ইংরেজ সরকার তাঁর জন্য 'পুলি-পোলাও'-এর ব্যবস্থা না করতে পারলেও অন্তত দুধভাতের যোগাড় করে দিতেন; মুসলমান আমলেও তেমনি ভারতের পশ্চিম সীমান্তের ওপার থেকে যাঁরা কোনোক্রমে এদেশে এসে পৌছতে পারতেন,—তা সে হাড্ডিসার বুড়ো ঘোড়ায় পিঠে চড়েই হোক, অথবা লাগাম ধরে পায়দলে নেংচাতে নেংচাতেই হোক, তাঁদের সুখ-সুবিধা আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করার জন্য উপযুক্ত বাদশাহী বন্দোবস্ত ছিল।

সাহাবুদ্দিন খাঁ যুবক হলেও সাংসারিক বুদ্ধিতে ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান। তিনি কিছুদিন দিল্লী-আগ্রায় বাস করেই বুঝলেন দিল্লী ও আগ্রার সোনার মোহর আর পাকা ধানক্ষেতের বাবুই পাখি স্বভাবে এক। পাকা ধানের ক্ষেতে বাবুই বসে ঝাঁকে ঝাঁকে, কিন্তু চাষীর খট্‌খটির আওয়াজ হলেই ঝাঁকধরে উড়ে পালায়। দিল্লী-আগ্রায়ও মোহর আসে প্রচুর, কিন্তু ইরাণী-খোরসানী নাচওয়ালীদের পায়ের ঘুঙুরের শব্দে সব উড়ে যায়। যিনি সে সব জলসায় 'দিনার'-'আসরফি'-'মোহর' রীতিমত উড়োতে পারেন না, বা কার্পণ্য করেন, তিনি ভদ্রসমাজে পাত্তা পান না। আর ঐ সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে সোনা সংগ্রহও সহজ হয় না। দেখে শুনে সাহাবুদ্দিন খাঁ দিল্লী ছেড়ে এগিয়ে চললেন পূবে।

সাহাবুদ্দিন যতই এগিয়ে যান ততই দেখেন, সোনা সংগ্রহের সুযোগ পূবেই

বেশী। দেশের লোক 'ডাল-রোটি', 'ছাতু-লঙ্কা' বা 'শাক-ভাত' খেয়ে, খোলা-খাপড়া বা খড়ের কুঁড়ে ঘরে মুরগির পালের মত জড়াজড়ি করে থেকে, যেসব কৃষি ও শিল্প পণ্য উৎপন্ন করে, তা সুচতুর ব্যবসায়ীরা কয়েকগণ্ডা কড়ি বা তামার ঢেলার বিনিময়ে কিনে ভারতের বাইরে সোনার দরে বিক্রী করতে পারেন। সে ব্যবসাটাও ছিল তাঁরই মত বিদেশীদের হাতে। দেশের লোক এ নিয়ে মাথা ঘামাত্ত না। তারা নিরাপদে পেটভরে খেয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে ঘুমোতে পারলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত।

তারপর সাহাবুদ্দীন খাঁ এটাও লক্ষ্য করলেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলে যাঁরা সোনা কুড়োচ্ছেন, তাঁদের হাতের মোহরগুলো দিল্লী-আগ্রার মোহরের মত পাখ্‌নাওয়ালা নয়। কারণ, ইরাণী-খোরসানী নাচওয়ালীদের ঘুঙুরের শব্দ এত দূরে বড়ো একটা এসে পৌছায় না। এই সব দেখে শুনে নানা রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে তিনি ঢাকা সহরে এসে পৌছলেন।

ঢাকা সহরে এসে সাহাবুদ্দিন শুনলেন, এরপর আরও পূবে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ, ঐ সব দেশের মানুষ তখন পর্যন্ত বাদশাহী শাসনের আওতায় এসে বিদেশী বণিকের সোনা সংগ্রহে সহায়তা করার মত সভ্যতা অর্জন করে নি। তারপর ঐ দেশের পাহাড়পর্বতে যে সব মানুষ বাস করে, তাদের মধ্যে এমন সব মন্ত্র তন্ত্র জানা গুণিন্ আছে, যাদের কেরামতির কথা শুনে ইসলাম প্রচারক ফকির দেওয়ান সাহেবরাও ওদিকে যান না। কাজেই সাহাবুদ্দিন খাঁ ঢাকা সহরেই তাঁর অভিযান সমাপ্ত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় খুঁজতে লাগলেন।

দেশে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষ অশান্তি থাকলে সুচতুর ব্যবসায়ীদের হয় রাতারাতি ধনবৃদ্ধির মহা সুযোগ। একালে এই অশান্তি অর্থনৈতিক কুটকৌশলে সৃষ্টি করা হয়। সেকালে এর জন্য আর ধনী ব্যবসায়ীদের মাথা ঘামাতে হত না, বিভিন্ন ধর্মমত ও শাসন কর্তৃপক্ষের উপরতলার ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাতই দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখত। সাহাবুদ্দিন খাঁ ঢাকায় বসে বুদ্ধি খাটিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ গণ্যমান্য ধনী হয়ে উঠলেন।

ঢাকায় ব্যবসা আরম্ভ করে খাঁ সাহেবের হাতে প্রচুর সোনাদানা আসতে লাগল বটে, কিন্তু দিনের বেলাটা উপার্জনের নেশা মন চাঙ্গা করে রাখলেও রাতের বেলায় তো ও নেশা আমেজ দেয় না। রাতের বেলা একটু আমেজি হওয়ার যে সব উপায় আছে, সে সব উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি খাঁ সাহেবের আর হল না। কারণ, তিনি দিল্লী ও আগ্রায় দেখে এসেছেন, ও আমেজের আমেজিরা

আর সোনার ভারতের সোনা উটের পিঠে বোঝাই করে দেশে ফিরতে পারে না। যাঁরা আমেজের রসদ যোগান, তাঁরাই সেটা করেন। ভেবেচিন্তে খাঁ সাহেব একটা সাদী করাই স্থির করলেন।

সেকালে ভারতের বাইরে থেকে বহু 'ছুরতজামালি আওরত' ভারতের বড়ো বড়ো বাজারে বিক্রীর জন্য আমদানি হত। সুবাদার-নবাবের রাজধানী ঢাকার বাজারেও সে সব আওরত পাওয়া যেত। কিন্তু সাহাবুদ্দিন খাঁর হাতে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও ঐরকম কোনো ছুরতজামালি সাদী না করে একটি বাঙালী মেয়ে সাদী করলেন। বোধহয় তিনি বুঝেছিলেন, ঐ সব বিদেশী আওরত দামী হলেও ওদের সাদী করে নিশ্চিন্ত সুখ-শান্তিতে ঘর সংসার করা বড়ো একটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে তুলনায় এদেশী মেয়ে রঙে ময়লা হলেও একবার যদি সাদী কবুল করে, তবে আর হাতছাড়া হতে চায় না।

সাদীর দু'বছর পরে সাহাবুদ্দিন খাঁর বেগম সাহেবা স্বামীকে একটি সোনার চাঁদ পুত্র উপহার দিলেন। খাঁ সাহেব পুত্রের নাম রাখলেন এনায়েতুল্লা।

এরপর আরও তিন বছর কেটে গেল। সে তিন বছরে ধনদৌলত মান-সম্ভ্রমে খাঁ সাহেবের আরও উন্নতি হল। কিন্তু সে উন্নতি তো খাঁ সাহেবের বিদেশ ঢাকায় হল, মন যে তাঁর পড়ে আছে কোন সুদূরে স্বপ্নজড়ানো লাল-পাহাড়ের কোলে ছোট্টো মেটে ঘরের কোণে।

পৃথিবীর যে কোনো দেশের অধিবাসী—তা সে আফ্রিকার মরুভূমির হটেন্‌টট্‌ জাতিই হোক, আর চিরতুষারাবৃত ল্যাললণ্ডের এস্কিমো জাতিই হোক, তাকে তার জন্মভূমির কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে,

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥"

জন্মভূমির প্রতি এই যে আকর্ষণ ও মমত্ব, এটা একমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত জীবেই এ আকর্ষণ সমান। এমন যে হিংস্র বাঘ, সেও যদি কোনো কারণে জন্মভূমি থেকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়, তাহলে অন্তত বছরে একরাত লুকিয়ে এসে তার প্রিয় জন্মস্থানটা ঘুরে ফিরে দেখে যায়। এই জন্যই কোনো বন কেটে লোকালয় স্থাপন করলে সেখানে বেশ কয়েক বছর নানা রকম বন্য জীবজন্তুর আনাগোনা চলে থাকে।

ধনদৌলতে সাহাবুদ্দিন খাঁ যতই বড়ো হয়ে উঠতে লাগলেন, জন্মভূমির

মাকর্ষণও ততই প্রবল হতে লাগল। শেষে পুত্র এনায়েতুল্লার বয়স যখন তিন বছর, তখন একদিন খাঁ সাহেব স্ত্রীপুত্রের কাছে ছয় মাসের জন্য বিদায় নিয়ে গেলেন স্বদেশে। সঙ্গে গেল প্রচুর ধনরত্ন।

তারপর একযুগ বারো বছর কেটে গেল, সাহাবুদ্দিন খাঁ আর ফিরে এলেন না, বা কোনো সংবাদও দিলেন না। লোকমুখে যা কিছু শোনা গেল, তাও ঢাকার বাঙালী বেগমসাহেবার পক্ষে সুসংবাদ নয়। সে দেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের মুখে শোনা যায়, প্রচুর আস্‌রফির মালিক খাঁ সাহেব দেশে গিয়ে দু'জোড়া নীল নয়নের ফাঁদে আটক পড়েছেন।

মানুষের চোখে মানবদেহের সৌন্দর্যবোধ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেমন প্রতিটি মানুষ তার স্বদেশের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য খুঁজে পায়, তেমনি পায় বিশ্বসুন্দরী ও বিশ্বসুন্দর। এর জন্যই বোধহয় আধুনিক 'বিশ্বসুন্দরী' নির্বাচনের আন্তর্জাতিক নির্বাচকমণ্ডলী নিজেদের মন ও চোখের ওপরে নির্ভর না করে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। সাহাবুদ্দীন খাঁ সুদূর বিদেশে প্রয়োজনবোধে বিদেশী মেয়ে সাদী করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে দু'দুটো স্বদেশী বিবি পেয়ে যদি তিনি সেই বিদেশী বেগমের কথা মন থেকে সরিয়ে রাখেন, তবে মনস্তত্ত্ব বিচারে তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

ভালোবাসা ও প্রেম বলে যে দুটো ব্যাপার আছে তার মধ্যে, ভালোবাসা গতিশীল আর প্রেম অচলায়তনে স্থির। ভালবাসার এই গতিশীলতা অবস্থানুযায়ী ত্যাগ ও গ্রহণে সমর্থ, এদিক থেকে প্রেম একেবারেই স্থবির। এই জন্যই ভালোবাসার নিদর্শন সর্বত্রই দেখা যায় আর প্রেম যে কি, তা বুঝেছে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই ভার।

সাহাবুদ্দিন খাঁ অবস্থাগতিকে ঢাকায় সাদী করে বাঙালী বেগম সাহেবাকে ভালোবেসেছিলেন, স্বদেশে গিয়ে আবার অবস্থাগতিকে দুটি স্বদেশী বিবি সাদী করে তাঁদের ভালোবাসতে আরম্ভ করলেন। এর জন্য খাঁ সাহেব ও তার ভালোবাসাকে আদৌ দোষী করা যাবে না। কারণ, ভালোবাসার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকে স্বার্থে প্রয়োজন বোধ।

ধনী খাঁ সাহেবের অকৃত্রিম ভালোবাসা পেয়ে যেমন একদিকে তাঁর স্বদেশী দুই বিবির দুই জোড়া নীল নয়ন সর্বদা আনন্দোচ্ছল, অপর দিকে ঢাকায় তাঁর বিদেশী বেগমের কালো নয়নতারা কেঁদে কেঁদে সাদা হয়ে উঠল। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা পুত্র এনায়েতুল্লা।

এনায়েতুল্লা কিশোর বয়সেই বেশ শক্তিমান হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখে

ঢাকার ফৌজদার সাহেব সামরিক বিভাগে ভর্তি করে তিন বছর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠালেন দিল্লী। দিল্লী যাত্রার সময়ে এনায়েতুল্লার মা কেঁদে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ঐ একমাত্র পুত্র ছাড়া তাঁর কাছে দাঁড়ানোর আর কেউ তো ছিল না।

এনায়েতুল্লা দিল্লী গিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই সামরিক শিক্ষায় নাম করে ফেললেন। সে সময় বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর সাম্রাজ্যের বহুস্থানে নানা রকমের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। বলবান সাহসী শিক্ষিত যোদ্ধা তখন বাদশাহের বিশেষ প্রয়োজন। এনায়েত খাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হতেই তিনি বাদশাহী ফৌজে চাকরি পেয়ে, গেলেন দাক্ষিণাত্যে। তারপর তিন বছরের মধ্যে ঢাকা যাওয়ার মত ছুটি তিনি আর পেলেন না।

সাত বছর পরে ছুটি পেয়ে এনায়েত খাঁ ঢাকা গিয়ে শুনলেন, তাঁর দুঃখিনী মা স্বামী-পুত্র হারিয়ে রাতদিন কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মরে গেছেন। কয়েকদিন মায়ের কবরের ওপরে চোখের জল ফেলে, ঢাকার বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি-বন্দোবস্ত করে, এনায়েত খাঁ আবার ফিরলেন দিল্লী। দিল্লী এসেই তাঁকে যেতে হল বাদশার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে এক যুদ্ধে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও সাহস দেখানোর ফলে তিনি নিযুক্ত হলেন বাদশাহের 'খাস মনসবদার' পদে।

বাদশাহের দেহরক্ষী খাস মনসবদার পদাধিকারী তৎকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে একজন বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, মাইনেও ছিল প্রচুর। তারপর এনায়েত খাঁ সুশ্রী যুবক। পিতার গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আর বাঙালী মায়ের কমনীয় মুখশ্রী মিলে এমন একটা মাধুর্যমণ্ডিত সৌন্দর্যের অধিকারী তিনি ছিলেন, যে সৌন্দর্য দিল্লী আগ্রার বহু হারেমের ঝরকার আড়ালে বহু জোড়া-চোখ নিস্পলক করে দিত।

খাস মনসবদার পদ পাওয়ার পর বহু বড়োঘর থেকে এনায়েত খাঁর সাদীর প্রস্তাব আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বেছেগুছে তিনি সাদী করলেন এক নামকরা আমীরের মেয়ে। মেয়েটির মা ছিলেন প্রথম জীবনে নাচওয়ালী।

সাদীর কিছুদিন পরেই বাদশাহের সঙ্গে এনায়েত খাঁকে যেতে হল বিদেশে। আটমাস পরে ঘরে ফিরে দেখেন হারেম ফাঁক। খোঁজ করতে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে লাভ হল তিরস্কার। ভালোরকম সুরক্ষিত হারেমের ব্যবস্থা না করে 'ছুরতজামালি' বিবি সাদী করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে।

এরকম ব্যাপারে যে কেবল ঘরই ফাঁকা হয়, এমন নয়। অনেকের বুকের ভিতরটাও ফাঁকা হয়ে যায়। যুবক এনায়েতুল্লারও হল তাই। তারপর এই ব্যাপারে তাঁর এক দিলদরিয়া দোস্তের যে কেরামতি কানাঘুষায় শুনলেন, তাতে তাঁর ফাঁকা মনে নেমে এল বর্ষারাতের জমাট অন্ধকার।

সে অন্ধকারে সান্ত্বনার আলো দেখানোর বন্ধুবান্ধবের যে অভাব ছিল তা নয়, তবে সে সান্ত্বনা এনায়েতুল্লার কাছে আঁধার ঘরের ক্ষুদ্র প্রদীপ না হয়ে, হল বর্ষারাতের বজ্রবিদ্যুৎ। টাকার যখন অভাব নেই, তখন বাজার থেকে দেখে শুনে একটা ভালো বাঁদী কিনে এনে সাদী করলে আর পালানোর ভয় থাকে না। 'কেনা বাঁদী কেউ ফুসলিয়ে নিলে আইনত তার কঠোর শাস্তি হয়।' তারপর কোনো জিনিষের একঘেয়েমিও ভালো নয়, মাঝে মাঝে বদলানো ভালো। কোনো ঘরের মেয়ে সাদী করলে তাকে 'তালাক দিতে দেনমোহরের দাবি পূরণ করতে হয়'। বাজার থেকে বাঁদী কিনে আনলে তাকে আবার বেচাও যায়। এই রকম কত কি সান্ত্বনা ও পরামর্শ।

এনায়েতুল্লার অন্তর চেয়েছিল অপর সাধারণ দশজনের মত একটি শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র গৃহকোণ। যে গৃহকোণ থাকবে স্নেহ-মমতা ভরা দুটি চোখ তাঁরই পথ-পানে চেয়ে। বাইরের কর্ম-কোলাহলে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে সেই গৃহকোণে ফিরলেই সব জ্বালা দূর হয়ে আবার নতুন উদ্যম নতুন আশায় বুক ভরে উঠবে। কিন্তু সংসার-জ্ঞানহীন সরল যুবক এনায়েতুল্লা করেছিলেন দারুণ ভুল। উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী ধনীদের জাঁকজমকভরা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করার মত দুর্ভাগ্য যাদের হয়, তারা এনায়েতুল্লার আদর্শ বুঝতেই পারে না। সেই ভুলের মাশুল তাঁকে দিতে হল। তাঁর আশা আকাঙ্খা ক'দিনের জন্য আলেয়ার আলো দেখিয়ে হতাশার অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

দারুণ মানসিক অশান্তিতে এনায়েত খাঁর দিন কাটছে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও আর ভালো লাগে না। এমন সময় তলব এল বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে। তলব পেয়ে মনে মনে স্থির করলেন এই যাত্রাকেই তিনি শেষ যাত্রা করবেন। কিন্তু তাঁর এই সংকল্পই জীবনের গতিমোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল।

সেবার রাজস্থানের এক যুদ্ধে এনায়েত খাঁ মরণপণ যুদ্ধ করে দেখালেন অসামান্য বীরত্ব। যুদ্ধে জয়লাভ করে দিল্লী ফিরে এসে গুণগ্রাহী বাদশা তাঁকে দরবারে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। এনায়েতুল্লা বাদশার দরবারে আরজি পেশ করলেন, তাঁকে সুবে বাংলার মধ্যে একটা জমিদারী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বাদশার প্রয়োজন হলেই তিনি দিল্লী এসে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করবেন।

আরজি মঞ্জুর হল। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হুকুমনামা নিয়ে এনায়েতুল্লা খাঁ চললেন সুবে বাংলার নয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে।

সে সময় বাংলাদেশে চলছিল নানা রকম অশান্তি। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলপ্লাবন, ঝড়, এই সব দৈব দুর্বিপাক চিরকালই বাংলাদেশে বাঙালীর সঙ্গী। তারপর দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্বাঞ্চলে আসামের পার্বত্য জাতি আর দক্ষিণবঙ্গে মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের মিলিত দল 'হর্মাদ'দের আক্রমণে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ এই পার্বত্য জাতি ও হর্মাদ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পুরনো রাজধানী ঢাকা ত্যাগ করে নয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের পত্তন করেছেন।

সুবে বাংলার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নিজ নামে করেছেন নয়া রাজধানীর নামকরণ। সে নামের যাতে অমর্যাদা না হয়, তার জন্য রাজধানীর উপযুক্ত সহর গড়ে তুলতে হবে। ওদিকে দিল্লীর বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় অর্থাভাব লেগেই আছে, সে চাহিদাও মেটাতে হবে। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রবল চাপ গিয়ে পড়ল, যাঁরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করেন, সেই জমিদার শ্রেণীর ওপরে।

এই সময়ে বাংলাদেশের জমিদার অধিকাংশই ছিলেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের শায়েস্তা করে পথে আনার কৌশল যেমন জানতেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব, তেমনি জানতেন তাঁর সুযোগ্য সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ।

সুবাদারী চাহিদা পূরণে অস্বীকৃত বা অসমর্থ হিন্দু জমিদারদের শায়েস্তা করার জন্য নয়া রাজধানীর নয়া জেলখানায় সযত্নে প্রস্তুত করা হল 'নয়া বৈকুণ্ঠ'। সেই নয়া বৈকুণ্ঠে কতকগুলি ছোট অন্ধকার কাঁচা কুঠরির মধ্যে ইঁদুর, আরশোলা আর প্রচুর পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হল। আর একটা চৌবাচ্চায় জেলখানার নর্দমার নোংরা জল ভরতি করে তাতে ছেড়ে দেওয়া হল বিষাক্ত মাছ ও কীট। অপরাধীর হাতে পায় ডাণ্ডাবেড়ী লাগিয়ে দিনে গায়ে ঝোলাগুড় মাখিয়ে রাখা হত ঘরে, আর রাত্রে রাখা হত ঐ চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে।

এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কোনো কোনো জমিদার এক দিন-রাত নয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেই পরদিন বেহেস্তে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ইসলাম কবুল করে সসম্মানে নিজ জমিদারীতে ফিরে যেতেন। আর যাঁরা ইসলাম কবুল করতেন

না, তাঁরা দু'চার দিন নয়াবৈকুণ্ঠে বাস করে পুরণো বৈকুণ্ঠে চলে যেতেন। তাঁদের পরিবারের মহিলারা সময়মত সংবাদ পেলে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করতেন। নইলে ভরাডুবি করে পুরণো বৈকুণ্ঠে গিয়ে কর্তার সঙ্গে দেখা করতেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হুকুমনামা নিয়ে এনায়েতুল্লা খাঁ সে সময়ে মুর্শিদাবাদে সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে হাজির হলেন, তখন সুবে বাংলায় প্রায়ই ভরাডুবি ঘটছিল। সেজন্য জমিদারী পেতে খাঁ সাহেবের বেশী বিলম্ব হল না।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণবঙ্গে ভৈরবনদের তীরে তিনক্রোশ ব্যবধানে রাজনারায়ণপুর ও বাসুদেবপুর নামে পরিচিত দুইখানা গ্রাম ছিল। দুই গ্রামে ছিলেন দুইঘর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার। রাজনারায়ণপুরের জমিদার কালীনারায়ণ চৌধুরী ও বাসুদেবপুরের জমিদার হরিশঙ্কর রায় দু'জনে বাল্যবন্ধু।

সেবার দুই জমিদারের ওপরে নবাব সরকারের তলব এল, যত তঙ্কা সদর খাজনা তার দ্বিগুণ তঙ্কা 'আবওয়াব' তিন মাসের মধ্যে সদর খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতে হবে। তলব তামিল করতে না পারলে জমিদার স্বয়ং এসে সুবাদার নবাবের দরবারে হাজিরা দিন।

সে সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র চলছিল দুর্ভিক্ষ ও নানারকমের অশান্তি। তথাপি প্রজারা জমিদার দুইঘর বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যা দিল তাতে খাজনার তঙ্কা জুটলেও আবওয়াব সঙ্কুলান হল না। এই অবস্থায় দুই জমিদার বন্ধু পরামর্শ করে স্থির করলেন, বাসুদেবপুরের জমিদার হরিশঙ্কর রায়ের পক্ষে খাজনা ও আবওয়াব দাখিল করা হবে ; রাজনারায়ণপুরের জমিদার কালীনারায়ণ চৌধুরী নিজে মুর্শিদাবাদ গিয়ে খাজনা ও কিছু আবওয়াব জমা দিয়ে অবশিষ্ট আবওয়াব মকুবের জন্য দরবার করবেন। সে দরবার যদি নিষ্ফল হয়ে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়, তবে বাসুদেবপুরের জমিদারী দুই বন্ধু সমান ভাগ করে নেবেন।

দিনমত দুই জমিদারের খাজনা ও আবওয়াবের তঙ্কা নিয়ে কালীনারায়ণ চৌধুরী ও হরিশঙ্কর রায়ের 'বিশ্বাস' রামচাঁদ ঘোষ গেলেন মুর্শিদাবাদ। সেকালের নিয়মমত রামচাঁদের সঙ্গে গেল একটা শিক্ষিত সংবাদবাহী কবুতর।

মুর্শিদাবাদ পৌঁছে সুবাদারী খাজাঞ্চিখানায় 'তলবানা তঙ্কা' জমা দিয়ে

কালীনারায়ণ চৌধুরী দরবারে হাজির হয়ে আইন মাফিক আরজি পেশ করলেন। সেদিন কোনো রায় পাওয়া গেল না। পরদিন দরবারে হাজির হতেই তিনি বন্দী হয়ে গেলেন হাজতে।

বিশ্বাস রামচাঁদ ভিতরের সংবাদ জানার জন্য লাগালেন গুপ্তচর। পরদিন বেলা দেড়প্রহর গতে সংবাদ পেলেন, জমিদার কালীনারায়ণ চৌধুরী বৈকুণ্ঠবাসের ভয়ে বিষপান করে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর জমিদারী ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে পরিবারবর্গকে ধরে মুর্শিদাবাদে পাঠানোর জন্য বাদশাহী মনসবদার এনায়েতুল্লা খাঁকে পাঠানো হয়েছে। মনসবদারের সঙ্গে গিয়েছে দশজন ঘোড়সওয়ার ফৌজ। তাঁরা মেহেরপুরের ফৌজদার ও ফৌজদারী ফৌজ সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত আজ রাজনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ী দখল করবেন।

সংবাদ পেয়ে বিশ্বাস রামচাঁদ উড়িয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গের কবুতর। কবুতরের পায়ে বাঁধা থাকল পত্র।

দুপুরে কবুতর এসে বসল বাসুদেবপুর জমিদারবাড়ী। কবুতরের পায়ে বাঁধা পত্র পড়ে হরিশঙ্কর রায় একুশ মাল্লার ছিপ নৌকা পাঠালেন রাজ-নারায়ণপুর জমিদার-পরিবার আনতে। ছিপ ফিরে এসে জানাল, জমিদার-বাড়ীর ঘাটে পৌঁছানো গেল না। বাড়ী ঘিরে ফেলেছে ফৌজদারী ফৌজে।

কালবিলম্ব না করে হরিশঙ্কর রায় পরিবারের মহিলাদের বজরায় উঠতে আদেশ দিলেন। মাঝি গুরুচরণ হলদার বাইশজন মাল্লা নিয়ে বজরা ছেড়ে দিল। মহিলাদের অভিভাবক হয়ে সঙ্গে গেলেন পিতার নির্দেশে জ্যেষ্ঠপুত্র শিবশঙ্কর রায়।

বজরা ছেড়ে গেলে হরিশঙ্কর রায় ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুশঙ্কর যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে উঠলেন ঘোড়ায়। সঙ্গে চলল বাসুদেবপুর জমিদার-সরদার নিমাই মণ্ডল, আর চল্লিশজন লাঠি-সড়কিওয়ালা বাঙালী লস্কর।

বেলা দুপুরের পরেই দু'শ ফৌজদারী ফৌজে রাজনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। জমিদারের সরদার নইম খাঁ ও তাঁর পুত্র করিম খাঁ পঞ্চাশজন লস্কর নিয়ে সুরক্ষিত জমিদারবাড়ীর সিংহদরজার সম্মুখে নবাবী ফৌজ রুখে দাঁড়িয়েছেন। জমিদারের দুই পুত্রও তাঁদের সঙ্গে আছেন। জমিদার পক্ষে লড়াই চলছিল আত্মরক্ষা মূলক।

এনায়েতুল্লা খাঁ দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের খাস মনসবদার। বহু যুদ্ধ তিনি করেছেন ও দেখেছেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নির্দেশে রাজনারায়ণপুর জমিদারী দখলে তিনিই নেতা। মেহেরপুরের ফৌজদার লড়াই ব্যাপারে তাঁর অধীন। এনায়েত খাঁ বাঙালী লস্করের লড়াই পূর্বে কোনোদিন দেখেন নি, সেজন্য কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। বৃদ্ধ ফৌজদার সাহেবকে পাঁচটা বড়ো গাদা বন্দুক সঙ্গে আনতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন, জমিদারবাড়ীতেও বুঝি কামান-বন্দুক আছে। কিন্তু যখন দেখলেন, কামান-বন্দুক তো দূরের কথা বাঙালী লস্করদের হাতে কিরিচ-বর্শাও নেই, আছে বাঁশের লাঠি, লোহার ছোটো ফলাযুক্ত সড়কি, আর ছোটো ছোটো বেতের ঢাল, তখন তিনি নিজে তো যুদ্ধে নামলেনই না, তাঁর সঙ্গী দশজন ঘোড়সওয়ারকেও যুদ্ধে নামতে দিলেন না। তাঁরা ফৌজদারের সঙ্গে কিছুদূরে একটা বটগাছের তলায় থেকে লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতি দেখতে লাগলেন। কাছেই পাঁচটা খচ্চরের পিঠে বাঁধা থাকল পাঁচটা বন্দুক।

দুপুরে লড়াই আরম্ভ হয়ে তৃতীয় প্রহর গতেও যখন দেখা গেল, জমিদার-বাড়ী দখল তো দূরের কথা সিংহদ্বারের সম্মুখ থেকে বাঙালী লস্করদের একপাও হটানো গেল না, তখন অভিজ্ঞ ফৌজদার সাহেব বন্দুক চালানোর জন্য এনায়েত খাঁর অনুমতি চাইলেন। বাদশার খাস মনসবদার সে অনুমতি দিলেন না। হাতে লাঠি, পিঠে বেতের ঢাল, খালি গা খালি পা, মাথায় একটুকরো লাল কাপড় জড়ানো, পরণে পাঁচ হাত কাপড় বা গামছা, এই যাদের যুদ্ধসজ্জা, তাদের সঙ্গে বর্শা কিরিচধারী দু'শ নবাবী ফৌজের লড়াই কাপুরুষতা; এরপর বন্দুক চালানো অমানুষিক। এনায়েত খাঁ অমানুষ নন।

দিনের শেষে নবাবী ফৌজের দক্ষিণে একটা সরদারী 'ডাকভাঙ্গা' শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহদ্বার থেকেও একটা ডাকভাঙ্গা হল। তারপর দেখা গেল ফৌজদারী ফৌজ হটতে আরম্ভ করেছে। বিস্মিত এনায়েত খাঁ ফৌজদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

এটা কি হল?

হুজুর, বাসুদেবপুরের জমিদার শিবশঙ্কর রায় আমাদের আক্রমণ করেছেন।

বাসুদেবপুরের জমিদারের সঙ্গে আমাদের তো বিরোধ নেই!

তা না থাকলেও তিনি তাঁর দোস্তের পরিবার রক্ষার জন্য লড়াইতে নেমেছেন।

এই গোস্তাকির জন্য তো তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।

হাঁ হুজুর, এখন আমাদের কর্তব্য লড়াই ফতে করে শিবশঙ্কর রায় ও তাঁর পরিবারবর্গকেও ধরে মুর্শিদাবাদে চালান করা।

কিন্তু আমাদের ফৌজ যে হটতে আরম্ভ করেছে।

হাঁ হুজুর, এতক্ষণ জমিদারীলস্করেরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালাচ্ছিল। বাসুদেবপুরের লস্কর এসে সরদারী ডাকভাঙ্গলে কালীনারায়ণ চৌধুরীর সরদার ডাকভেঙ্গে আক্রমণের হুকুম দিয়েছে। এখন বন্দুক চালানো ছাড়া আর উপায় নেই।

বলেন কি! বাসুদেবপুর থেকে কত লস্কর এসেছে?

তিরিশ থেকে চল্লিশ জন হবে।

এই সত্তর আশীজন লস্কর হটাতে আপনার দু'শ ফৌজ পারবে না?

হুজুর নিজেই ব্যাপার দেখছেন। বাঙালী লস্করদের লাঠির সম্মুখে কিরিচ-বর্শা কোনো কাজে আসে না। এবার ওরা সড়কি চালাচ্ছে। এখন যদি আপনি বন্দুক চালাতে হুকুম না দেন তবে লড়াই ফতে করা তো যাবেই না, কতজন ফৌজ যে ফিরে যাবে তা বলা যায় না।

ফৌজদারের কথায় এনায়েত খাঁ মনে মনে বিরক্ত হয়ে কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর সঙ্গী দশজন ঘোড়সওয়ারকে লড়াইতে নামতে হুকুম দিলেন। নিজেও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

এনায়েত খাঁকে আর বেশীদূর এগিয়ে যেতে হল না, ফৌজীব্যূহের মাঝামাঝি যেতেই একটা লিকলিকে সড়কি বিদ্যুৎগতিতে এসে তাঁর ঘোড়ার গলা এফোড়-ওফোড় করে দিল। ঘোড়াটা দশবারো হাত লাফিয়ে উঠে ধপাস্‌করে পড়ে গেল। এনায়েত খাঁ ছিট্‌কে পড়লেন বিশহাত দূরে। মাথা তুলে দেখলেন তাঁর সঙ্গী তিন জন মাটি নিয়েছেন, তাঁদের আর ওঠার আশা নেই। অপর সাতজন নিরাপদ দূরত্বে হটে গেছেন।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম; পাঁচটা বন্দুক গর্জন করে উঠল! একটু পরেই আবার বন্দুকের আওয়াজ। এনায়েত খাঁ ছুটে গেলেন বন্দুকের কাছে, থামিয়ে দিলেন বন্দুক। ততক্ষণ চার ঝাঁক গুলি ছুটে গেছে।

এদিকে সিংহদ্বারে একটা ভয়ঙ্কর ডাকভাঙ্গা শোনা গেল। তার পরেই দেখা গেল সব জমিদারী লস্কর সিংহদ্বারে একত্রিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করে লড়াই করছে। কিছুক্ষণ পরে জমিদার বাড়ীর ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, তার পিঠে একটা পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে বাঁধা।

লোকটা আসতেই লস্করেরা তাকে ঘিরে বর্শাফলকের মত ব্যূহ রচনা করে ফৌজী ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলল। তাদের সে গতিরোধ করা ফৌজের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এনায়েত খাঁ তাঁর অবশিষ্ট সাতজন সওয়ার নিয়ে আবার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কোনো সুবিধা হল না, অধিকন্তু আরও দুইজন সওয়ার সড়কির মুখে মারা পড়ল।

আবার বন্দুক গর্জন করে উঠল। সেই গুলিতে ছেলে পিঠে বাঁধা লোকটা মাটিতে পড়ে আর উঠল না। পিঠে বাঁধা ছেলেটাও আর দেখা গেল না। লস্কর-ব্যূহ থেমে গেছে।

হঠাৎ লস্কর ব্যূহের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ডাকভাঙ্গা শোনা গেল। সে ডাকভাঙ্গার শব্দ এমন ভয়ঙ্কর যে, এনায়েত খাঁর ঘোড়া চঞ্চল হয়ে লাফিয়ে ওঠে আর রাশ মানতে চায় না।

সেই ডাকভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে লস্করেরা হাতের সড়কি ফেলে দিয়ে দু'হাতে ধরল লাঠি। লাঠি তুলল কালবৈশাখী ঝড়ের বোঁ বোঁ শব্দ। তারপর নিমিষের মধ্যে ফৌজী ব্যূহ ভেদ করে সব লস্কর উধাও হয়ে গেল। কেবল একজন সরদার দু'হাতে দু'খানা লাঠি নিয়ে ফৌজী ব্যূহের ওপরে আহত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এ ব্যাপারটা কি হল?—ফৌজদারকে জিজ্ঞাসা করলেন বিস্মিত এনায়েত খাঁ।

হুজুর, আমাদের লড়াই ফতে হয়ে গেল।

তা হলে জমিদারের লস্কর সব পালিয়ে গেল!

না হুজুর, একে ওরা পালানো বলে না। অকারণ লোকক্ষয় না করে সরদার ওদের চলে যেতে হুকুম দিয়েছেন। তাই ওরা 'লাঠিদৌড়' লাগিয়ে চলে গেল।

জমিদারবাড়ীর সকলকে ফেলে ওরা চলে গেল!

না হুজুর। জমিদার পরিবারে একটি বালবাচ্চা বেঁচে থাকলেও ওরা যেত না। জমিদার বাড়ীতে আর কেউ বেঁচে নেই।

জেনানা মহলে জেনানাদের কি হল?

তাঁরা সব ভরাডুবি করেছেন।

ভরাডুবি কি রকম ?

জমিদারবাড়ীর পিছনে নদীর ঘাটে একখানা বড়ো বজরা নৌকা বাঁধা ছিল। সেই বজরায় উঠে বজরার তলা ফাঁসিয়ে সকলে নদীর পানিতে ডুবে গেছেন। এইভাবে মরাকে এদেশে ভরাডুবি বলে।

আপনি কেন ফৌজ পাঠিয়ে ভরাডুবি ঠেকালেন না ?

সে জন্য আমি চাঁদপুরের থানাদারকে পরোয়ানা পাঠিয়েছিলাম। সে পরোয়ানায় হুকুম দেওয়া ছিল, কালীনারায়ণ চৌধুরীর পরিবার যেন নদীপথে পালাতে বা ভরাডুবি করতে না পারে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। থানাদারের পাইক বজরার কাছে যেতে পারে নি।

কেন পারে নি ?

বজরার মাঝিমাল্লা তীর চালিয়েছিল। আমাদের যদি আরও কয়েকটা বন্দুক আর দু'খানা বড়ো নৌকা থাকত তা হলে বোধহয় ভরাডুবি ঠেকানো যেত।

ভরাডুবি কখন হয়েছে ?

প্রথম দফা বন্দুক চালানোর পর হয়েছে।

এটা আপনি জানলেন কি-করে ? আপনি তো সেই থেকে গোলন্দাজদের সঙ্গে এখানেই আছেন।

হুজুর সব ঘটনা বোধহয় লক্ষ্য করেন নি। প্রথম দফা গুলিতে কালীনারায়ণ চৌধুরীর দুই ছেলে, সরদার নইম খাঁর ছেলে করিম, আর হরিশঙ্কর রায়ের ছেলে মারা পড়ে।

বাঃ, আপনার গোলন্দাজদের তো খুব নিশানা সই। একেবারে বেছে বেছে ছেলেগুলোই মেরে দিয়েছে।

হুজুরের যা মরজি ! কিন্তু এ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না।

বেশ, তারপর কি হল ?

হুজুর এসে বন্দুক থামিয়ে দিলে কালীনারায়ণ চৌধুরীর সরদার একটা ডাকভাঙ্গে। সে ডাকভাঙ্গার অর্থ, সকলে সিংহদ্বারে একত্রিত হয়ে শেষ চেষ্টা করা।

তা হলে সরদারী ডাকভাঙ্গার বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

হাঁ হুজুর। বাঙালী সরদার নানা রকমের ডাকভেঙ্গে অধীনস্থ লস্করদের কি করনীয় তা জানায়।

আচ্ছা তারপর কি হল ?

তারপর দেখলাম হরিশঙ্কর রায়ের লস্কর এসে সিংহদ্বারে জমায়েত হল

হরিশঙ্কর রায় হাতের বর্শা নইম খাঁর হাতে দিয়ে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তখনই বুঝলাম, এইবার ভরাডুবি হবে।

ভরাডুবি যে হয়ে গেছে, তা বুঝলেন কি করে?

হুজুর বোধহয় লক্ষ্য করেছেন, একটি লোক একটা ছেলেকে পিঠে বেঁধে নিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে এলেই লস্করেরা বর্শাব্যূহ রচনা করে সরে পড়তে চেষ্টা করে।

হাঁ, সেটা লক্ষ্য করেছি।

ঐ লোকটা কালীনারায়ণ চৌধুরীর 'বিশ্বাস'।

'বিশ্বাস' মানে কি?

বাংলাদেশের রাজা-জমিদার এমন একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী রাখেন, যে প্রাণ দিয়ে মনিবের কাজ করতে দ্বিধা করে না। এই বিপদে বাড়ীর ঝি-চাকর সব পালিয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস পালায় নি। বিশ্বাস মনিবের বংশ রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করে জীবন বিসর্জন দিল।

আপনি বলছেন, বাড়ীর ঝি, চাকর সব পালিয়েছে। যদি ঝি-চাকর পালাতে পারে, তবে আর সকলে পালায় নি কেন?

বাঙালী সম্ভ্রান্ত পরিবার ঐ ভাবে পালানো ঘৃণা করে।

ধরুন, কেউ যদি ঐ ভাবে পালিয়েই থাকে?

তাহলে সে পথে থানাদারের হাতে ধরা পড়বে।

থানাদার তাকে চিনবে কি করে?

ওদের চেহারা, কথাবার্তার ধরণ আর হাবভাবই চিনিয়ে দেয়।

আপনি তো দেখছি বাঙালী হিন্দুদের চাল চলন-সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ। এখন আমাকে একটা ব্যাপার বুঝিয়ে দিন তো। বাঙালী লস্কর লাঠিদৌড় লাগিয়ে চলে গেলে একটা বুড়ো কেন ফৌজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল? বুড়োটা তো বোধহয় মুসলমান!

হাঁ হুজুর, ঐ বুড়োই কালীনারায়ণ চৌধুরীর বিখ্যাত সরদার নইম খাঁ। বাঙালী সরদারদের একটা সরদারী নিয়ম আছে। মনিববাড়ীর জেনানামহল রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে বেঁচে থাকার চাইতে লড়াই করে মরাই সম্মান জনক মনে করেন। সরদার নইম খাঁ মনিবের একটি বংশধর রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টায় যদি তিনি সফল হতেন, তা হলেও দেখা যেত, ছেলেটিকে লড়াইয়ের বাইরে পাঠিয়ে নিজে একা ফিরে এসে এইভাবে লড়াই করে মরতেন। এ না করলে সরদারী সম্মান তিনি পেতেন না।

সরদারী সম্মান কি রকম ?

এইভাবে যাঁরা সরদারীর মর্যাদা রক্ষা করে জীবন দেন, তাঁদের কবরের পাশের পথে কোন সময় কোনো সরদার পথ চলতে, থেমে একটা সরদারী সেলামীডাকভেজে তিন প্যাঁচ লাঠি ঘুরিয়ে সেলাম জানিয়ে যান।

সরদার যদি হিন্দু হয় ?

তবে আর শ্মশানে ঐ রকম সম্মান দেখানো হয়।

হিন্দু, মুসলমান, সরদারদের মধ্যেই কি এই প্রথা আছে ?

বাঙালী সরদারদের সরদারী ব্যাপারে জাতি বা ধর্মভেদ নেই। এরা যার নিমক খায় জীবন দিয়ে তার নিমকের মর্যাদা রক্ষা করে। নইম সরদারের শেষ ডাকভাঙ্গার অর্থ, 'তোমারা লাঠিদৌড় লাগিয়ে চলে যাও। এবার আমি একাই মনিবের নিমকের দাম শোধ করব।'

বাসুদেবপুর জমিদারের সুবৃহৎ বজরা চলেছে ভৈরব নদ বেয়ে দক্ষিণে। সজোরে চলেছে বাইশ খানা দাঁড়। হালের মাঝি বুড়ো গুরুচরণ হলদার মাল্লাদের হুকুম দিয়েছেন, চাঁদপুর থানার এলাকা না ছাড়িয়ে কেউ বিশ্রাম পাবে না। মনিবপরিবার বাঁচাতেই হবে।

বজরায় আছেন জমিদার গৃহিণী হরসুন্দরী, দুই পুত্রবধূ বিশ্বেশ্বরী ও কল্যাণী; বিশ্বেশ্বরীর তিন মেয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শচী; কল্যাণীর এক ছেলে দেড় বছরের রামশঙ্কর। অভিভাবক হয়ে চলেছেন শিবশঙ্কর রায়।

দু'বছর হল জমিদার বাড়ীর গৃহিণী হরসুন্দরী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ বিশ্বেশ্বরীর হাতে তুলে দিয়ে নিজের সাধন-ভজনের মধ্যে ডুবে গেছেন। এতবড়ো বিপদে তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে, বজরায় উঠে একটা ছোটো কামরা বেছে নিয়ে, নির্বিকার চিত্তে তাঁর সাধনভজনে মনোনিবেশ করেছেন।

বড়বউ বিশ্বেশ্বরী জমিদারের মেয়ে। সেকালে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে বার-ব্রত, কথা-কাহিনী, ছড়া-পাঁচালী, গল্প-উপন্যাস, প্রভৃতি অবলম্বনে মেয়েদের এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা হত যাতে, এরকম বিপদের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা অবিচলিত থাকতে পারতেন। জমিদার ঘরের মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর সে মানসিক প্রস্তুতি ছিল। তারপর তিনি ছিলেন বিদুষী। পিতা তাঁকে পণ্ডিত রেখে পড়িয়েছিলেন। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী এলে শ্বশুর পুত্রবধূর

বিদ্যানুরাগ দেখে আরও পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ নিয়ে জমিদার হরিশঙ্কর রায় বেশ গর্বকরে বলতেন, 'আমার বড়ো বউমা মস্তবড়ো পণ্ডিত। সে বহুশাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছে।'

ছোটো বউ কল্যাণী সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে। এতবড়ো জমিদার ঘরে বিয়ে সম্ভব হয়েছে তার অসাধারণ রূপ ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য।

জমিদার হরিশঙ্কর রায় গিয়েছিলেন মফস্বল কাছারি দেখতে। অপরাহ্নে ফেরার পথে ওঠে কালবৈশাখী ঝড়। পাল্কি নামিয়ে জমিদার অতিথি হয়েছিলেন কল্যাণীর বাপের বাড়ী। বাপ বাড়ী ছিলেন না, মা রোগে শয্যাশায়ী, বাড়ীর বড়ো মেয়ে চোদ্দ বছরের কল্যাণী জমিদার অতিথির সাধ্যমত অভ্যর্থনা করল। ঝড় থামলে অতিথি বিদায় চাইলে বিদায় পেলেন না। কারণ, তখনও বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি সন্ধ্যায়ও ছাড়ল না। সে রাত্ত অতিথি সেই ব্রাহ্মণ বাড়ীতেই থাকলেন। রাত্রে কল্যাণী ইঁচরের ডালনা, কইমাছের ঝোল রান্নাকরে দশজন অতিথিকে খাওয়াল। প্রভাতে বিদায়কালে কল্যাণী এসে হরিশঙ্কর রায়কে প্রণাম করে কাছে দাঁড়াতেই তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'মা, তুমি রাজরাণী হবে'।

পথে এসে হরিশঙ্কর রায় বিশ্বাস রামচাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মেয়েটি কেমন দেখলে?

আর দেখাদেখি কি। আপনি তো কথা দিয়েই এলেন।

হাঁ, তা দিয়েই এলাম। মেয়েটি রূপে গুণে অতুলনীয়।

বয়সটা বড়ো কাছাকাছি হয়ে গেল। বিষ্ণুশঙ্করের এই আঠারো চলছে। মেয়ের বয়স পনরোর কম হবে না।

তা হোক। এরকম বয়সে বিয়ে হয়ে তারা যদি আমাদের শাস্ত্রীয় ও পারিবারিক বিধিনিয়ম মেনে চলে তবে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু হয়। তাদের সন্তানগুলিও সবদিক থেকে ভালো হয়ে থাকে।

তা যদি মনে করেন, তবে এ মেয়ে সবদিক থেকেই কাম্য। আমাদের বাড়ীর পারিবারিক আদবকায়দা শিক্ষার যে অভাব আছে সেটা বড় বউরাণীর হাতে পড়লে ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর একমাসের মধ্যেই কল্যাণী বাসুদেবপুর জমিদার বাড়ীর ছোটো বউরাণী হয়ে ঘরে আসে। বিশ্বেশ্বরী তাকে আপন বোনের মত পরম স্নেহে গ্রহণ করেছেন। কল্যাণীর যত কিছু আবদার সব বড়দি'র কাছে। বিশ্বেশ্বরী রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। কল্যাণী হাসিখুশীতে চঞ্চল।

বাসুদেবপুর জমিদারীর কুমারবাহাদুর শিবশঙ্কর রায় চেহারা-চালচলন, কথাবার্তা-বিদ্যাবুদ্ধি সবদিক থেকেই ছিলেন উপযুক্ত জমিদার। পিতা হরিশঙ্কর রায় জমিদারীর বিলিব্যবস্থা, বিচার-আচার, সবকিছুর দায়িত্ব উপযুক্ত পুত্র শিবশঙ্করের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রজারাও কুমার বাহাদুরের বিচার ব্যবস্থা ন্যায্য বলে মেনে খুশী হত।

ছোটো কুমারবাহাদুর বিষ্ণুশঙ্কর ছিলেন বিদ্যানুরাগী স্ফূর্তিবাজ। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে তিনি পড়তেন বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী, সেকালে প্রচলিত চারটি ভাষা ; আর ভালো ভালো ওস্তাদের কাছে শিখতেন গান-বাজনা ও যুদ্ধবিদ্যা। বিষ্ণুশঙ্করের সঙ্গে কল্যাণী সুন্দর মানিয়েছিল।

বিয়ে হওয়ার কয়েকমাস পরে একদিন বিশ্বেশ্বরী বিষ্ণুশঙ্কর ও কল্যাণীকে একত্রে দেখে পরিহাস করে বলেছিলেন,—

যাক্, এতদিন পরে বাসুদেবপুর সত্যিকারের বৈকুণ্ঠ হল।

এ কথা কেন বলছেন, বউদি ? হেসে প্রশ্ন করলেন বিষ্ণুশঙ্কর।

কল্যাণী লক্ষ্মী এসে পুরী আলো করে বিষ্ণুর পাশে দাঁড়িয়েছে।—উত্তর দিলেন বিশ্বেশ্বরী।

তাহলে এইবার শিবঠাকুর তাঁর বিশ্বেশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসে গিয়ে বেলতলায় বাঘছালে বসে ডুগ্ডুগি বাজিয়ে হরিকীর্তন আরম্ভ করুন।

তাই যাব ভাই। কল্যাণীর কোলে একটা সোনার চাঁদ এলে আমিও মা'র মত সব দায়িত্ব তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে সাধন-ভজনে মন দেব।

ইস্, আমি ঐ দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি আর কি। আমি কখনও অতবড়ো ঝামেলায় যাব না ; তা দেখে নেবেন।—বলল কল্যাণী।

আচ্ছা তা দেখা যাবে। আগে তোর কোলে সোনার চাঁদ আসুক তো।

তা এলেই বা কি। যিনি সোনার চাঁদ চাচ্ছেন, তিনিই তাঁর সোনার চাঁদ কোলেপিঠে করে মানুষ করবেন।

আচ্ছা তা করব। মা ষষ্ঠীর দয়ায় বংশের প্রদীপ সোনার চাঁদ তোর কোলে আসুক তো।

বিশ্বেশ্বরীর তিন মেয়ে, ছেলে ছিল না।

ভৈরবের বুকে ভেসে চলেছে বাইশ দাঁড়ের বজরা। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত একপ্রহর হয়ে গেল দাঁড়ের বিশ্রাম নেই। জমিদার হরিশঙ্কর রায় তাঁর

পরিবারের মান-ইজ্জৎ-ধর্মরক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন বৃদ্ধ মাঝি গুরচরণ হলদারের হাতে। মাঝিমাল্লা প্রাণ দিয়ে সে দায়িত্ব পালন করবে।

গুরুচরণ মাঝি রাণীমা ও বউরাণীদের ভরসা দিয়ে বলেছেন,—আমরা ঘাট থেকে যখন বজরা ছেড়ে আসতে পেরেছি, তখন আর ভয় নেই। এই দক্ষিণ অঞ্চলের সব নদীনালা আমার চেনা। যদি তেমন বিপদ বুঝি তবে বজরার পিছনে বাঁধা ছিপ-নৌকায় রাণীমাদের তুলে নিয়ে বাইশখানা বৈঠায় এমন বাইচ দেব যে, কেউ ঘোড়া ছুটিয়েও আমাদের ধরতে পারবে না। বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও বাইচের নৌকার হাল ধরলে নৌকা ভেল্কি খেলবে।

তা তো জানি মাঝিকাকা, কিন্তু এই নদীপথে হর্মাদ-বোম্বেটের ভয়ও আছে যে।—বললেন শিবশঙ্কর।

বাপু তুমি ওর জন্য ভয় ক'রো না। এসময়ে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের কামান-বন্দুকওয়ালা জাহাজ এদিকে আসে না। মঘ বোম্বেটেদের নৌকা দু'পাঁচখানা দেখা যায়, তবে তার জন্য আমরাও প্রস্তুত আছি। বাইশখানা ধনুকে তীর চললে মঘ বোম্বেটে কাছে ঘেঁষবে না। ওরা আসে লুটপাট করে লাভ করতে, জান খোয়াতে আসে না।

কাকা, সেই বেলা থেকে এরা সমানে দাঁড় টানছে। রাত এক প্রহর পার হয়ে গেল। এখন কোনো বাজারের ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে এদের কিছু খাইয়ে নিলে হয় না?

না। এখনও আমরা মেহেরপুরের ফৌজদারের এলাকা ছাড়াতে পারি নি। আরও দুই বাঁক গেলে এ এলাকা ছাড়িয়ে 'ভূষণার এলাকায়' পড়ব। তখন যা হয় করা যাবে।

শিবশঙ্কর আর কিছু বললেন না, নীরবে তামাক সেজে নিয়ে গেলেন মাল্লাদের কাছে। তামাকখোর মাল্লারা একে একে দাঁড়ের টান রেখে আর এক হাতে হুকা ধরে দু'চার টান টেনে নিল। বজরা সমানে চলছে ভৈরবের বুকে।

গভীর রাত্রি বজরার বুকে মেয়ে তিনটি ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ্বেশ্বরীর চোখে ঘুম নেই, কল্যাণীর অবস্থা তাঁকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। বজরায় উঠে কল্যাণী কারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নি, জানলার ধারে স্থির হয়ে বসে উত্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে অবশিষ্ট দিন ও রাতের প্রথম প্রহর কাটিয়েছে, এমন কি কোলের ছেলে রামশঙ্করকেও একবার কোলে নেয় নি, চোখমুখ অসম্ভব বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রথম দিকে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীকে কিছু বলতে সাহস করেন নি। রাত গভীর হলে তার হাত ধরে এনে নিজের কাছে বিছানায় শুইয়ে ছেলে কোলে দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন নি। এই পরিস্থিতিতে কথায় যে, কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় না, তা বিশ্বেশ্বরী বোঝেন।

বজরার ভিতরে আলো জ্বালা হয় নি। অন্ধকারেই বিশ্বেশ্বরী বুঝলেন কল্যাণীর কাছে রামশঙ্কর না ঘুমিয়ে ছটোপুটি করছে। কল্যাণী তাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে না।

হঠাৎ রামশঙ্কর কেঁদে উঠল। বিশ্বেশ্বরী জিজ্ঞাসা করতে কল্যাণী বলল—দিদি আপনি ওকে নিন, ও বড় জ্বালাচ্ছে।

একটু বুকের দুধ দিয়ে ঘুম পাড়া।—বললেন বিশ্বেশ্বরী।

দুধ শুকিয়ে গেছে।

বলিস কি, এরই মধ্যে এত দুধ শুকিয়ে গেল!—চমকে উঠলেন বিশ্বেশ্বরী।

হ্যাঁ দিদি। আপনি ওকে নিন। আপনার কাছে ও শান্ত থাকে।

চিন্তিত বিশ্বেশ্বরী রামশঙ্করকে টেনে কাছে নিয়ে পিঠ থাবরিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কল্যাণীকে বললেন—

তোর মতলবটা কি বল তো?

মতলব আর কি হবে। আপনি কথা দিয়েছিলেন, আমার কোলে সোনার চাঁদ এলে আপনি তাকে মানুষ করবেন। এখন সে কথা রাখুন।

দেখ কল্যাণী, কোনো পাগলামি করিস নে। যুদ্ধের কোনো সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। আর, আমার কাছে শুয়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর।

এই বলে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীর হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখের জল কয়েক ফোঁটা কল্যাণীর হাতে পড়ল।

বিশ্বেশ্বরীর পিঠের কাছে কল্যাণী নীরবে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ধীরে ধীরে মিনতির স্বরে বলল,—

দিদি, আপনি তো বহু শাস্ত্র পড়েছেন। আমার একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন?

কি প্রশ্ন?

দুজনের একজন যদি আগে স্বর্গে যায়, তবে সেই স্বর্গে থেকে সে কি তার ফেলে আসা আর একজনের কথা ভাবে।

এবার আর বিশ্বেশ্বরী অন্তরের কান্না বাইরে প্রকাশ রোধ করতে পারলেন না। পাশ ফিরে কল্যাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কেঁদে মনটাকে কিছু

শান্ত করে নিয়ে উত্তর দিলেন।—

আমাদের বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন, বিশ্বসৃষ্টির প্রথমে যে আত্মা সৃষ্টি হয়েছিল, সে আত্মার কোনো লিঙ্গভেদ ছিল না। সে স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, কিছুই নয়। এই অবস্থায় আত্মা সুখী বা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মটর-কলাই যেমন মাটিতে পড়ে মাটির রসে ভিজে ফুলে উঠে ফেটে দুভাগ হয়ে অঙ্কুরকে পরিণাম দেয়, সেইরকম আদি আত্মাও বিশ্বক্ষেত্রে পড়ে কামনা-রসে ভিজে দুভাগ হয়েছেন। তার একভাগ স্ত্রী, আর একভাগ পুরুষ। এই দুই ভাগের মিলনেই একটি আত্মার পূর্ণতা। এই কারণেই স্মৃতিশাস্ত্র স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলেছেন। আত্মার এই অবস্থায় তাঁর আধখানা এখানে, আর আধখানা সেখানে, এ রকম ব্যাপার বেশীদিন চলতে পারে না। পরস্পরের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের আকর্ষণে অল্পকালের মধ্যে দু'জনে একত্রিত হয়।

ওঃ, এই জন্যই শাস্ত্র সহমরণের ব্যবস্থা দিয়েছেন।—সিদ্ধান্ত করল কল্যাণী।

শুনে ধমক্ দিয়ে বিশ্বেশ্বরী বললেন,—দেখ্ তুই আজে-বাজে বকিস নে তো। এরকম কথা ফের মুখে আনবি তো মার খাবি। জীবাত্মা অমর, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য। আত্মার অনন্তজীবনের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, কোনো একজন্মে দুজনের মধ্যে মৃত্যু এসে যদি বিচ্ছেদ ঘটায় তবে সে বিচ্ছেদ একজনকে বাড়ীতে রেখে আর একজনের পাড়া বেড়াতে যাওয়ার মত তুচ্ছ।

রাজনারায়ণপুর জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সেদিন সন্ধ্যায় পড়ে আছে অনেকগুলি রক্তাক্ত মৃতদেহ। ফৌজদারী ফৌজদের মৃতদেহগুলি লড়াই শেষ হতেই সরানো হয়েছে। জমিদার পক্ষের মৃতদেহগুলি সরানো হয় নি, আর সরাবেই বা কে?

বসন্তকাল, চৈত্র মাসের প্রথম। সেদিনও সন্ধ্যায় চৈতী হাওয়া বসন্তের আমেজ গায় মেখে রাজনারায়ণপুর জমিদার বাড়ীর সম্মুখের মাঠে দোলন দিয়ে যাচ্ছিল। সে দোলনে নির্জন মাঠে উঠেছে সন্‌সন্ শব্দ, ভৈরবের বুকে উঠেছে ঢেউ। শুক্ল পক্ষের সপ্তমীর চাঁদ সেদিনও সন্ধ্যায় সেই মাঠে বিছিয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার শুভ্র মসলিন, ভৈরবের বুকে ঢেউয়ের মালায় ছড়িয়ে দিয়েছে লক্ষহীরার ফুল। প্রকৃতিদেবী বড়ো নির্মম, বড়ো নিষ্ঠুর; জীবজগতের কোনো ঘটনাই তাঁকে বিচলিত করে না। প্রকৃতি অন্ধ বধির।

সত্যই কি তাই? না না, তা হতে পারেনা। প্রকৃতিদেবী কখনো নির্মম নিষ্ঠুর হতে পারেন না। রাজনারায়ণপুরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঐ যে, ক'টি বাঙালীবীর রক্তাক্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছে, তারা আর জেগে প্রকৃতিদেবীর কোলে হাসবে না, কাঁদবে না, কর্মচঞ্চল ছুটাছুটি করবে না। তাই শোকার্তা প্রকৃতিদেবী শেষবারের মত আদর করে তাঁর জ্যোৎস্না-শাড়ীর আঁচল ঢাকা দিয়ে চৈতীপাখায় হাওয়া করছেন। মাঠে যে শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যায় ও তাঁর শোকাচ্ছন্ন অন্তরের দীর্ঘশ্বাস-শব্দ।

ঐ যে ভৈরবের অথৈ তলে সুসজ্জিত বজরার মধ্যে শিশুসন্তানগুলি বুকে জড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে আছে কটি সুকুমারী নারী, ওরা বারোমাসের তের পার্বণে সেজেগুজে সেই পরমসুন্দরের পূজানন্দের সৌন্দর্য ছড়িয়ে প্রকৃতি-সুন্দরীর সুষমা বাড়াতে আর তো ছুটে আসবে না। তাই শোকাকুলা প্রকৃতিদেবী তাদের ভৈরবসমাধির ওপরে তরঙ্গের মালা পরিয়ে সে মালায় গেঁথে দিয়েছেন চন্দ্রকান্ত মণির ফুল।

প্রকৃতিদেবী নির্মম নিষ্ঠুর নন, তিনি মমতাময়ী স্নেহশীলা নারী।

সূর্যদেব পাটে বসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছিল রাজনারায়ণপুরের লড়াই। লড়াই ফতে করে এনায়েতুল্লা খাঁ ও ফৌজদার সাহেব আহত ও নিহত ফৌজদের যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্ত চাঁদপুরের থানাদারকে নির্দেশ দিয়ে, গেলেন তাঁবুতে। তারপর বিশ্রাম করে খানা খেয়ে দু'জনে যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রটা দেখতে এলেন, তখন রাত একপ্রহর হয়েছে।

জমিদার পক্ষের মৃতদেহগুলি বেশ লক্ষ্য করে দেখে এনায়েত খাঁ ফৌজদারকে বললেন,—

কি আশ্চর্য! এরা একটাও বর্শা বা কিরিচের আঘাতে মরেনি। সব মরেছে গোলার আঘাতে!

হাঁ হুজুর। আজ বন্দুক না চালালে লড়াই ফতে হত না। কিরিচ বর্শা বাঙালী লস্করের লাঠি সড়কির সম্মুখে কোনো কাজে আসে না।

আমি এই ব্যাপার দেখে ভাবছি, বাদশাহী ফৌজে কেন বাঙালী লস্কর নেই।

হুজুর বাঙালী জাতটা বড়ো বদ্‌খত্, কথায় কথায় বেয়াড়া হয়ে ওঠে, না বুঝে কোনো হুকুম তামিল করতে চায় না। আমার মনে হয় এইজন্তই বাদশাহী ফৌজে বাঙালী লস্কর নেওয়া হয় না।

আপনি কি ?

আমি! হুজুর আমার কথা জিজ্ঞাসা করছেন ?

হাঁ, আপনার কথাই জানতে চাচ্ছি। আপনি কি মোগল, পাঠান, আরবী, পার্শি, আফগান, বা ঐ রকম কিছু ?

জী হুজুর, আমরা কয়েক পুরুষ এই দেশেই বাস করছি।

আপনার পূর্বপুরুষ কোন দেশ থেকে এদেশে এসেছিলেন ?

তা সঠিক জানিনে হুজুর। ফৌজদারের কণ্ঠস্বরে সঙ্কোচ ও কাতরতা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আপনি তা হলে বাঙালী। বেশ, এখন থেকে আপনি আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবেন। আমিও বাঙালী, ঢাকা আমার জন্মস্থান।

ফৌজদার সাহেব এবার খুব খুশী হয়ে সেলাম জানিয়ে বললেন,—

হুজুর কি এই রাত্রেই জমিদার বাড়ীটা ঘুরে দেখবেন ?

হাঁ দেখব। তার আগে এই লাশগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। এঁদের রাখার মত ভালো জায়গা জমিদার বাড়ীতে আছে কি ?

হাঁ হুজুর, আছে। সদর কাছারি মহলে দু'টো দরবারী ফরাস আছে। ছোটো ফরাসে বসতেন জমিদার, বড়োটায় বসত প্রজারা।

আপনি তাহলে এ বাড়ীতে আগেও এসেছেন।

হাঁ হুজুর। সরকারী কাজে আমাকে সব জমিদার বাড়ীতেই যেতে হয়।

তাহলে জমিদার গোষ্ঠীর লাশ জমিদারী ফরাসে, আর লস্করদের লাশ বড়ো ফরাসে রাখার ব্যবস্থা করুন। আপনার থানাদারকে তলব দিন।

হুজুর, থানাদার তো এখানে নেই। লড়াই শেষ হতেই তাকে দুটো বন্দুক দিয়ে পাঠিয়েছি বাসুদেবপুর জমিদারের বজরা আটক করতে।

এরকম পরোয়ানা তো আপনি মুর্শিদাবাদ থেকে পান নি।

না পেলেও এসব ব্যাপারে এই ভাবে কাজ হাসিল না করলে চাকরি থাকে না, আরও শাস্তি পেতে হয়। আমি এই ফৌজদারী চাকরি করেই বুড়ো হলাম, আমার কাজ আমি ভালোই জানি।

বজরা আটক করতে পাঠালেন কেন ? সেখানেও কি ভরাডুবি হবে ?

ভরাডুবি হবে কিনা তা এখনও বলা যায় না। বাসুদেবপুরের জমিদার হরিশঙ্কর রায় বাড়ীর জেনানাদের বজরায় তুলে দক্ষিণে চালান করে এখানে লড়াই করতে এসেছিলেন।

বেশ, তাতে আপনি বজরা আটক করতে চেষ্টা করছেন কেন ?

মুর্শিদাবাদ থেকে আমি যে পরোয়ানা পেয়েছি, তাতে হুকুম ছিল, রাজনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ীর জেনানা সমেত সবলকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে চালান দিতে। হুজুর দেখতে পাচ্ছেন, এবাড়ীর কাউকে ধরা গেল না। এ অবস্থায় বিদ্রোহী জমিদার হরিশঙ্কর রায়ের পরিবার ধরে চালান করতে পারলে আশা করি কসুর মাফ পাব। বিশেষ করে হরিশঙ্কর রায়ের ছোটো বেটার বউয়ের ছুরতের কথা এদেশে বিখ্যাত।

আপনি এখুনই 'হরকরা' পাঠিয়ে থানাদারকে ফিরিয়ে আনুন।

হুজুর জমিদার হতে চলেছেন। আমি সুবে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর ফৌজদার।

আর আমি দিল্লীর শাহানশাহ আওরঙ্গজেব বাদশার খাস মনসবদার এনায়েতুল্লা খাঁ। এই দেখুন আমার 'পরচা'।

এই বলে এনায়েত খাঁ তাঁর জামার ভিতর থেকে সোনার পাতে খোদাইকরা 'বাদশাহী পাঞ্জাযুক্ত পরচা' বের করতেই ভীত সন্ত্রস্ত ফৌজদার সাহেব আইন-কানুন মাফিক দশ কদম পিছিয়ে গেলেন। তারপর তিন কদম এগিয়ে এসে হাঁটুগেড়ে বসে সাতবার কুনিশ করলেন। আবার উঠে তিন কদম পিছু হটে পূর্বের মত বসে তিনবার কুনিশ করে দুই হাত হাঁটুর ওপরে রেখে কাতর কণ্ঠে বললেন,—

হুজুর মালিক মেহেরবান্। নফরকো বেয়াদপি কসুর মাফ্ কিজিয়ে।

আরে না, না; আপনার কোনো কসুর হয়নি। আপনি তো আমার পরিচয় জানতেন না। খাস মনসবদারের হুকুম রদ করা বা তাঁর কোনো কাজের কৈফিয়ত তলব করার অধিকার একমাত্র বাদশাহ ছাড়া আর কারও নেই। আমি যখন এখানে উপস্থিত আছি, তখন কৈফিয়তের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তাহলে নফর এখন হুজুরের কোন হুকুম তামিল করবে।

আপনি এখুনি সওয়ার পাঠিয়ে থানাদারকে ফিরিয়ে আনুন।

হুজুর মেহেরবান। কোনো সওয়ার তো এখানে হাজির নেই।

তারা কোথায় গেছে?

লড়াই থামতেই তারা বাসুদেবপুর গেছে।

আপনি পাঠিয়েছেন?

না, আমি কোনো হুকুম করি নি। আমি কেবল থানাদারকে পাঠিয়েছি বজরা আটক করতে।

তবে সওয়ার বাসুদেবপুর গেল কেন ?

কেবল সওয়ার ক'জনই যায় নি, সব ফৌজও গিয়েছে।

কেন গেল ?

জমিদার বাড়ী লুট করতে।

লুট! লুট করতে ফৌজ গেছে !!

হাঁ হুজুর। এই জমিদারবাড়ী এখন আপনার হল বলে ওরা এবাড়ী লুট করতে সাহস করে নি। নইলে এসব ব্যাপারে এই রকমই হয়।

হাঁ দিল্লীতেও আমি এই রকমই শুনেছি, দেখেছিও। লড়াই ফতে হওয়ার পর ফৌজ আর সামলানো যায় না। তবে এমন ছোটো ব্যাপারেও এ রকম হতে পারে, এ আমি ভাবতে পারি নি। এখন বলুন কি করা যায় ?

থানাদারকে ফেরানোর আর কোনো উপায় নেই। কারণ, সে বাইরের নৌকা নিয়ে এতক্ষণ বহুদূর চলে গেছে।

তা হলে লাশগুলির কি ব্যবস্থা করবেন ?

এই মহলের দফাদার ও চৌকিদার আছে। তাদের দিয়ে লাশ এনে রাথার ব্যবস্থা করছি।

বেশ সেই সঙ্গে আর একটা কাজ করুন, রাজনারায়ণপুর ও বাসুদেবপুরের আশেপাশে সবগ্রামে আজ রাত্রেই ঢোল সহরত জানিয়ে দিন, লড়াইতে যারা মরেছে তাদের আত্মীয়স্বজন নির্ভয়ে এসে লাশগুলির শেষ কাজ করতে পারে। থানাদার যদি বাসুদেবপুরের বজরা ধরতে পারে, তবে দু'দিনের মধ্যেই বজরা ঘাটে আসবে।

বজরা ধরা যাবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

যদি ভরাডুবি না করে, তবে বোধহয় ধরা যাবে। কারণ, বাসুদেবপুরের বজরা খুব বড়ো, সে জন্য চলে কম।

বজরা যদি ধরা পড়ে, তবে জমিদার পরিবারের কাউকে আমি মুর্শিদাবাদে চালান দিতে দেব না। তাঁরা বাসুদেবপুরে ফিরে গিয়ে যাতে নিরাপদে জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব।

হুজুর দিল্‌দরিয়া মেহেরবান আমীর।

আমি বাঙালী। আমার মা বাংলা দেশের বাঙালীঘরের মেয়ে।

রাত দুপুরে এনায়েত খাঁ প্রবেশ করলেন রাজনারায়ণপুরের জমিদার

কালীনারায়ণ চৌধুরীর অন্দরমহলে। সঙ্গে আছেন ফৌজদার সাহেব আর তিনজন মশালচি।

অভিজ্ঞ ফৌজদার এনায়েত খাঁকে নিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করে প্রথমেই গেলেন রান্নাবাড়ীর দিকে। রান্নাবাড়ীর পিছনে খিড়কি দরজা দেখলেন খোলা। সে দরজা পেরিয়ে একটা নানারকম ফলের বাগান। বাগানটা উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। বাগানের ভিতরের পথ চলে গিয়েছে ভৈরবনদের তীরে প্রাচীরের দিকে। সেই পথে গিয়ে দেখা গেল প্রাচীরের ছোটো লোহার কপাটওয়ালা দরজাও খোলা।

সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এনায়েত খাঁ এসে দাঁড়ালেন ভৈরবের তীরে। সম্মুখে ভৈরবের বুকে একখানা বড়ো বজরার মাস্তুল জেগে রয়েছে। মাস্তুলের মাথায় সগৌরবে উড়ছে রাজনারায়ণপুর চৌধুরী জমিদার বংশের মর্যাদা জ্ঞাপক চিহ্নযুক্ত রক্ত-হরিৎবর্ণের সুবৃহৎ পতাকা।

সেই পতাকার নীচে শুক্লা সপ্তমীর অর্ধচন্দ্র ম্লানমুখে অস্তামিত হচ্ছেন। দেখে এনায়েত খাঁ শিউরে উঠলেন।

ঘাটে বসেছিল দুটো কুকুর। তার একটা এসে এনায়েত খাঁর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে লাগল। আর একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতার কেটে গিয়ে মাস্তুলের চারপাশে ঘুরতে লাগল। মনসবদার খাঁ সাহেব আর চোখের জল সামলাতে পারলেন না।

ঘাট থেকে ফিরে সকলে গেলেন অন্দরমহলের উপরতলায়। সব ঘরের দরজা খোলা। ফৌজদার সাহেবের সঙ্গে এনায়েত খাঁ সব ঘর ঘুরে দেখতে লাগলেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের আচার ব্যবহার সম্পর্কে ফৌজদার সাহেবের কিছু জানাশোনা ছিল। যা খাঁ সাহেব বুঝতে পারছিলেন না, ফৌজদার সাহেব সাধ্যমত বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

খাটে বিছানা পাতা আছে, শোবার লোক নেই। আলনায় ধুতি, শাড়ী, জামা-চাদর সাজানো আছে, পরার লোক নেই। টাঙ্গানো দোলনার পাশে দুধভরা বাটি ঢাকা আছে, শিশুটি নেই। বড়ো ত্রিপদীর ওপরে আয়না চিরুণী, সিন্দুরকৌটা, আলতাবাটি, আতরদান সব সাজানো আছে, বধূটি নেই। ডালাভরা পুতুল, ঘরে ছড়ানো নানারকমের খেলনা পড়ে আছে, যে ছেলে-মেয়েগুলি সে সব নিয়ে খেলত, তারা নেই। পূজার ঘরে ফুল বেলপাতা ধূপ দীপ চন্দন নৈবেদ্যের দ্রব্য পূজার সাজ-সরঞ্জাম সব পড়ে আছে, পূজারিণী নেই। লক্ষ্মীর ঘরে সোনার সিংহাসনে লক্ষ্মীর ঝাঁপি-কৌটা বসানো আছে,

বাস্তুদেবীর কাছে রূপার সুবৃহৎ দীপাধারে তখনও ঘিয়ের বাস্তুপ্রদীপ জ্বলছে, সে প্রদীপে ঘি ফুরলে ঘি দেবার মত আর কেউ নেই। বাড়ীর পোষা বিড়াল কাতর কণ্ঠে মিউ মিউ করে ডাকতে ডাকতে এঘর ওঘর করছে, সে তার একটি প্রিয়জনকেও খুঁজে পাচ্ছে না। বাড়ীর গোহালে বাঁধা গাইগুলির করুণ হাম্বারবের সঙ্গে থেকে থেকে বাড়ীটা যেন হাহাকার করে কেঁদে উঠছে!

ওপরতলা সব দেখে নীচতলায় নেমে বিষাদখিন্ন কণ্ঠে এনায়েত খাঁ ফৌজদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন।

এদের কেউই কি বেঁচে নেই?

না হুজুর। বোধহয় এই পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। তবে এই সব জমিদার বাড়ীতে চোরকুঠরি থাকে। এ বাড়ীতেও সেরকম কুঠরি থাকতে পারে। সেই চোরাকুঠরিতে যদি দু'একজন লুকিয়ে থাকে, তবে এ রাত্রে খুঁজে বের করা যাবে না, কাল দিনের বেলা দেখতে হবে।

সে দেখায় আর দরকার নেই। আপনি বাড়ীর পিছনের দরজা ভিতর থেকে খিল দিয়ে বন্ধ করে জেনানামহলের সম্মুখের দরজায় বাইরে তালা লাগিয়ে দিন। সাতদিনের মধ্যে কেউ আর জেনানামহলে ঢুকবে না। এখন বলুন তো, অবশিষ্ট রাতটুকু কাটানো যায় কোথায়?

হুজুরের যদি মরজি হয়, তবে কাছারি বাড়ীতে জমিদারের খাস কামরায় রাত কাটানো যায়। হুকুম হলে বান্দা পাহারায় থাকবে।

বেশ তাই চলুন। আপনি আমার কাছেই শোবেন।

জমিদারের সুসজ্জিত খাসকামরা। এনায়েত খাঁ এসে একখানা সোফায় একেবারে এলিয়ে পড়লেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে কাছেই আর একখানা সোফায় বসলেন ফৌজদার সাহেব।

কিছুক্ষণ নীরবে চোখবুজে থেকে এনায়েত খাঁ আবার ফৌজদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এবাড়ীর কেউই কি বেঁচে নেই?

না হুজুর। ভরাডুবি করা মানে পরিবারের সকলে একসঙ্গে মরা।

বাসুদেবপুর জমিদারের যদি ভরাডুবি হয়, তবে সে পরিবারও কি নিঃশেষ হয়ে যাবে?

হাঁ হুজুর।

আমি বাদশাহের সঙ্গে গিয়ে বহু যুদ্ধ করেছি। সে সব যুদ্ধের একটাতে হিন্দুমহিলাদের জহরব্রত পালন করতে দেখেছি। সে ব্রতে এগার বারো বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মহিলারাই আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অথবা জহর-বিষ খেয়ে মরেন; ছোটো ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধারা মরেন না। এঁরা এমন করে কাচ্চাবাচ্চা সমেত মরেন কেন?

হুজুর, বাংলাদেশের ডোরাকাটা বাঘ নাকি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই জাতের বাঘিনী যদি শত্রুর হাতে মারাত্মক জখম হয়, তবে সে তার কোলের বাচ্চা ক'টা আগে খুন করে, তারপর শত্রুকে আক্রমণ করে মরে। শত্রুর হাতে বাচ্চা ধরা পড়বে, এ এই বাঙালী বাঘিনীর অসহ্য। সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের মেয়েরাও এই বাঘিনীর মত। তাঁদের ছেলেমেয়ে ধরাপড়ে দুশ্‌মনের নফর-বাঁদি হবে, বা বাজারে বিক্রী হবে, এ চিন্তা তাঁদের অসহ্য।

আপনি ঠিক বুঝেছেন। এইজন্যই বাংলার নবাব শাহজাদা সুজার একটি বাঙালী বেগমও বাদশাহ আওরঙ্গজেব ধরতে পারেন নি। তাঁরা সব ভরাডুবি করে মরেছেন।

শেষরাতে কাছারিবাড়ীতে উঠল করুণ ক্রন্দন রোল। যুদ্ধে মৃত লস্করদের আত্মীয়-স্বজন এসে পড়েছে। দুই জমিদার বংশের মৃতদেহ সৎকারের জন্য এসেছেন তাঁদের পুরোহিত ও কর্মচারীরা।

প্রভাতে আরম্ভ হল 'ভেওয়া ফকিরের' দরগার পাশে সারি সারি কবর খোড়া আর ভৈরবের তীরে সারি সারি চিতা সাজানো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরের পাশে আরম্ভ হল 'জানাজার নামাজ', ভৈরবের তীরে জ্বলে উঠল চিতা। বেলা একপ্রহর হতেই সব শেষ হয়ে ভৈরবের স্রোতে ভেসে চলল চিতাভস্ম অনন্ত সাগরে। সেই সঙ্গে কালসমুদ্রে ডুবে গেল রাজনারায়ণপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার চৌধুরী বংশের জমিদারী।

শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ডুবে গেছে। ভৈরবের বুকে বজরা চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে।

বাবা, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, রামশঙ্করের বড়ো খিদে পেয়েছে। সে কান্নাকাটি করছে।—বজরার ছাদে এসে বলিল বড়ো মেয়ে লক্ষ্মী।

শিবশঙ্কর রায় কথা বলার আগেই মাঝি গুরুচরণ উত্তর দিলেন,—কি করব

দিদিমণি, এখনও আমরা মেহেরপুরের এলাকা ছাড়াতে পারি নি। এই আর এক বাঁক যেতে পারলেই হরিশপুরের বাজার, সেখানে যাহোক কিছু খাবার পাওয়া যাবে।

দুধ পাওয়া যাবে না?—প্রশ্ন করলেন শিবশঙ্কর।

না বাবা। এই রাতে দুধ পাওয়া যাবে না।—উত্তর দিলেন গুরুচরণ।

তবে খোকা কি খাবে?

চিড়ে পাওয়া যাবে। চিড়ের মাড় করে রাজাবাহাদুরকে এখন খাওয়াতে হবে।—রামশঙ্করকে বৃদ্ধ মাঝি রাজাবাহাদুর বলে ডাকেন।

মাঝি কাকা, আমরা এখন আর রাজাবাহাদুর নই।

আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার রাজা তোমরাই। খোকা আমার রাজাবাহাদুর।

শিবশঙ্কর আর কথা বলতে পারলেন না। সারা বছরে মাত্র এক আনা জলকর। তাও অনেকে দিতে না পেরে কাছারিতে এসে কর মকুবের জন্ম কান্নাকাটি করে। এক সন্ধ্যা জালে না গেলে অনেকের ভাত জোটে না। তা সত্ত্বেও জমিদারের বিপদে এরা নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে। এদের এই মনোভাব ও বীরত্ব উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কাজে লাগাতে পারেন নি বলেই দেশের এই দুর্গতি। কথাটা সেদিন বেশ ভালো করে বুঝলেন শিবশঙ্কর রায়, তবে বড়ো দেরীতে বুঝলেন।

হালের মাঝি গুরুচরণের কাছে বসে শিবশঙ্কর নীরবে নানা কথা ভাবছেন। এমন সময় মাঝি বলে উঠলেন,—

যাক, বাঁচা গেল। ঐ যে সামনে বটগাছটা দেখা যাচ্ছে, ঐ পর্যন্ত মেহেরপুরের সীমানা। তারপর 'ভূষণা'।

ভূষণাও তো মুর্শিদাবাদের সুবাদারের অধীন।—বললেন শিবশঙ্কর।

নামকা ওয়াস্তে সুবাদারের অধীন, আসলে তা নয়।

কেন নয়?

আমরা ওদেশে ইলিশ মাছ ধরতে যাই, কিন্তু কোথাও কাজী, থানাদার, তউশীলদার, দেখি নে।

তোমাদের খাজনা দিতে হয় না?

হয়। সে খাজনা নেয় গ্রামের মাতব্বর।

কি রকম খাজনা দেও?

এক পণ মাছ ধরে বেচলে এক পণ কড়ি দিতে হয়।

জোর জুলুম করে কেউ কিছু নেয় না ?

থানাদার, তউশীলদার, কোনো কিছু নেই ; জোরজুলুম করবে কে।

বজরা বটগাছ অতিক্রম করতেই মাঝি দশখানা দাঁড় থামিয়ে দিলেন। বড়ো বজরা, বেগে চলছে। এত বেগ থাকলে নিকটে হরিশপুর ঘাটে ভিড়ানো যাবে না। একটু পরে আরও ছ'খানা দাঁড় থামিয়ে মাল্লারা লগি হাতে নিয়ে বাজারের ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে সিঁড়ি ফেলল। দুজন মাল্লা সঙ্গে নিয়ে শিবশঙ্কর গেলেন বাজারে খাবার কিনতে। বাজারে চিড়ে, মুড়ি, গুড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

ফিরে এসে শিবশঙ্কর কিছু চিড়ে পাঠিয়ে দিলেন বজরার ভিতরে। রামশঙ্কর ততক্ষণ কেঁদেকেটে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাল্লারা তাদের গামছায় চিড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে লাগল। মাঝি শিবশঙ্করকে বললেন,—বাবা, তুমি দুটো খাও। তুমি না খেলে আমি খাই কি করে।

শিবশঙ্কর কোনো কথা না বলে মাঝিকাকার গামছা থেকে কিছু চিড়ে মুড়ি খেয়ে জল খেলেন। সকলের খাওয়া হলে বজরা আবার ছাড়ল। এবার মাল্লারা দুই দলে ভাগ হয়ে দশজনে দশখানা দাঁড় ধরল আর বারোজন গামছা পেতে শুয়ে পড়ল।

শিবশঙ্কর মাঝিকে বললেন,—কাকা, অন্য কারও হাতে হাল দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও না।

না বাবা, এই নিশি রাতে আর কারও হাতে হাল দিতে পারি নে। রাণীমাদের ভরসা দিয়েছি, কোনো ভয় নেই। কিন্তু দূরে কোনো শব্দ হলেই বুক কেঁপে উঠছে। বাবা, তুমি ভিতরে গিয়ে একটু ঘুমাও। আহা, সোনার চাঁদ আমার আজ গেরণে ঘিরেছে।

বলতে বলতে বুড়োমাঝির বুক থেকে বেড়িয়ে এল একটা স্নেহমাখা দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। সে স্নেহের স্পর্শে শিবশঙ্করের চোখের পাতাও ভিজে উঠল। তিনি মাঝিকাকার চটের বিছানাটা টেনে নিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লেন।

মাঝি কাকা, আমরা কোথায় যাব, বাবা কি কিছু বলে দিয়েছেন ?

রাজাবাহাদুরকে আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে তিনি বললেন, 'আগে তুমি এদের বাঁচাও, তারপর সে চিন্তা ক'রো। এতক্ষণ এ বিষয়ে ভাবি নি, এখন ভাবছি।

ভেবে কিছু স্থির করলে ?

এখন আমরা মধুমতীর ওপারে 'ভাটিয়াপাড়া' বন্দরে গিয়ে বিপিন মুদীর সঙ্গে দেখা করব। বিপিন মুদী বড়ো ধনী ব্যবসাদার, সাধুভক্ত মানুষ। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করব।

এখান থেকে ভাটিয়াপাড়া আর কতদূর ?

আর একবাঁক গিয়ে মধুমতীতে পড়ব। ভোরেই বজরা ভাটিয়াপাড়া ভিড়বে।

বঙ্গজননীর বুকের রক্ত মধুমতী। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মধুমতী বাঙালীর বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের সাক্ষী। প্রাচীন বাংলার গৌরব বাঙালী বণিক সদাগরদের বেশীরভাগ সমুদ্রগামী বাণিজ্য বহর 'সপ্তডিঙা মধুকর' এই মধুমতী দিয়েই চলাচল করত। বাংলার রাজশক্তির দুর্বলতার জন্য মঘ-জলদস্যুর অত্যাচারে বাঙালীর সে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। একবার মাত্র রাজা দক্ষিণ রায় এই মধুমতীর বুকে যুদ্ধ করে দক্ষিণবঙ্গ থেকে মঘদের তাড়িয়েছিলেন। তারপর পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে মঘজলদস্যু মিলিত হয়ে 'হর্মাদ বোম্বেটে' দল গঠন করে প্রায় তিনশ' বছর দক্ষিণবঙ্গে যে ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছিল তার প্রধান সাক্ষী এই মধুমতী। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে যে সব রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু দেখা যায়, তাঁদের পূর্বপুরুষ সেকালে জাতি ধর্মনাশ ও পুরমহিলাদের লাঞ্ছনার ভয়ে বিষয় সম্পত্তি সব ফেলে পরিবারের হাত ধরে রাঢ়দেশ ছেড়ে একটু মাথাগোঁজার নিরাপদ স্থান অন্বেষণে এই মধুমতী পার হয়েই জলজঙ্গল ভরা পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিনও ভোরে মধুমতী পার হতে চলেছে ভাগ্যবিড়ম্বিত বাসুদেবপুর জমিদার পরিবার নিয়ে বজরা।

ভোররাতে মধুমতীতে পড়েছে বজরা। ভৈরবের মোহনা থেকে কিছুদূর উজিয়ে গিয়ে নদী পাড়ি দিলে ভাটিয়াপাড়া বন্দর। বজরার মাস্তুলে পাল তুলে দুইজন মাল্লা পালের 'ছিট্'ধরে বসে আছে, আর সকলে বজরার ছাদে গামছা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বজরা মধুমতীতে পড়তেই শিবশঙ্কর উঠে বসেছেন।

মধুমতীর পূর্বপারে আকাশে নতুন দিনের সূর্যোদয়ের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। বজরার ছাদে বসে শিবশঙ্কর ভাবছেন, নতুন দিবসে দিবাকর সূর্য তাঁর ভাগ্যের কোন নতুন দৃশ্য খুলে দেবেন ? ভোরে মধুমতীর বুকে কুয়াশার আবরণের মতই তাঁর ভবিষ্যৎ আবৃত।

ক্রমে অন্ধকার দূর হয়ে অরুণালোকে সবদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শিবশঙ্কর রায়ের মনে জাগল, ঘোর বিপদের আঁধার রাত কেটে গেছে। এখন অন্তত মেয়েদের মান-ইজ্জত ধর্ম রক্ষা করে বাঁচার মত আশার আলো দেখা যাবে।

বজরার মধ্যে রামশঙ্কর জেগে দামাল হয়ে উঠেছে। শিবশঙ্কর গিয়ে তাকে ছাদে নিয়ে এলেন। গুরুচরণ মাঝি রামশঙ্করের খুব পরিচিত, বিশেষ করে মাঝির পাকা লম্বা দাড়ি তার অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু। বুড়োকে দেখেই রামশঙ্কর জ্যেঠার কোল থেকে নেমে গিয়ে বসল মাঝির দুই হাঁটুর মধ্যে। তারপর হাঁটুধরে উঠে দাঁড়িয়ে দাড়ি নেড়ে-চেড়ে দেখে হালের জোয়াল ধরে ঝাঁকাতে চেষ্টা করল। সে চেষ্টায় যখন বুঝল, বুড়ো ওটা নড়িয়ে ঘুরিয়ে ক্যাঁচ্‌কোঁচ শব্দ করতে পারলেও তার সামর্থ্যে কুলায় না, তখন তার নজর পড়ল বুড়োর থেলো হুঁকোটার ওপরে।

রাজাবাহাদুর, হুঁকোটা ভাঙ্গলে আমি একেবারে মারা যাব।—বলে গুরুচরণ তাঁর হুঁকো রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু হুঁকোটা রামশঙ্করের কাছে একেবারে নতুন জিনিস্‌ তারপর সেটা গড়িয়ে দিলে জল পড়ে, এমন খেলা সে ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। এমন সময় লক্ষ্মী এল একবাটি চিড়ের মাড় নিয়ে রামশঙ্করকে খাওয়াতে। সারা রাতের অভুক্ত ক্ষুধার্ত শিশু খাবার এসেছে দেখে খেলা ফেলে গেল খেতে। কিন্তু একটু খেয়েই সে বুঝে ফেলল, এটা তার খাদ্য নয়, আরম্ভ করল কাঁদতে।

ব্যাপারটা দেখে শিবশঙ্কর চোখের জল সামলাতে পারলেন না। একদিন মাত্র তফাত, কি অবস্থার থেকে কি অবস্থায়।

ভাটিয়াপাড়া বন্দরে বজরা ভিড়লে গুরুচরণ মাঝি একজন মাল্লা সঙ্গে নিয়ে, গেলেন বিপিন মুদীর গদীতে। অল্প পরেই একঘটি টাট্‌কা দোহানো গরুর দুধ নিয়ে মাল্লা ফিরে এসে শিবশঙ্কর রায়কে জানালো, মুদী নিজেই বজরায় আসছেন। মাঝি বলে দিয়েছেন, কুমার বাহাদুর যেন বজরার খাস কামরায় গিয়ে বসেন।

কিছু পরেই বিপিন মুদী এলেন। সেকালের বাঙালীর প্রথামত সঙ্গে এনেছেন রাজদর্শনের ভেট ঘি, মধু, চিনি, দৈ, মাছ। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য শাক তরকারি চাল ডাল।

শিবশঙ্কর রায়কে প্রণাম করে বিপিন মুদী করজোড়ে বিনীতভাবে বললেন,

আপনি রাজা। আজ আপনি বিপন্ন হলেও আমাদের দেবতা। আদেশ করুন, অধম দাস এখন আপনার কি সেবা করতে পারে।

আপনি গুরুচরণ কাকার মুখে বোধহয় সবই শুনেছেন। এখন আমরা কোথায় গিয়ে মাথাগুঁজে মান সম্মান জাত ধর্ম বাঁচাতে পারব, সেই সন্ধান ও পরামর্শ আপনার কাছে আমি চাই।

এ বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি। যদিও এ অঞ্চলে মুশিদাবাদের নবাবের সে রকম কোনো প্রভাব নেই, তথাপি মাঝে মাঝে নবাবী ফৌজ কামান বন্দুক নিয়ে, এসে টহল দিয়ে যায়। পূবে বিক্রমপুর অঞ্চলেও এই অবস্থা। এইসব অঞ্চলে আপনাদের মত রাজপরিবার আত্মগোপন করে বেশীদিন থাকতে পারবে না। এ অঞ্চলে নবাবের বহু গুপ্তচর আছে। আমার মনে হয় দক্ষিণে বাদা অঞ্চলে গেলে নবাবী জুলুমের ভয় আর থাকবে না।

আপনি যে পরামর্শ দেবেন আমি তাই নেব।

এখানে বেশীক্ষণ বজরা রাখা আমি সঙ্গত মনে করিনে। নিকটেই ভূষণা। আগামী দশদিনের জন্য কি লাগবে তার একটা ফর্দ রাণীমা দিলেই আমি সব জিনিস বজরায় তুলে আমার বড়ো ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে দুপুরের আগেই বজরা খোলার ব্যবস্থা করব।

শিবশঙ্কর উঠে ভিতরের কামরায় গিয়ে বিশ্বেশ্বরীকে সব জানালেন। বিশ্বেশ্বরী শুনে বললেন, তুমি গিয়ে মুদীকে বল, কিছু জামা কাপড়, বিছানাপত্র আর থালা-ঘটি-বাটি ছাড়া আর কিছুই আমরা সঙ্গে আনতে পারিনি। মুদী তাঁর বিবেচনামত যা লাগতে পারে সব যোগাড় করে দিন।

শিবশঙ্কর রায় বিপিন মুদীকে সেই কথাই বললেন। মুদী আর বিলম্ব না করে গদীতে গিয়ে নিজেই ফর্দ করে সব জিনিস বেলা দুপুরের আগেই বজরায় তুলে দিলেন। খোকা রাজাবাহাদুরের দুধের জন্য দুটো ছাগী বাচ্চাসমেত এনে বজরার ছাদে বাঁধা হল।

সব যোগাড় শেষ হলে বিপিন মুদী তাঁর বড়ো ছেলে কেষ্ট দত্তকে সঙ্গে নিয়ে এলেন বজরায়। শিবশঙ্কর রায়কে প্রণাম করে মুদী বললেন,—আমার এই বড়ো ছেলে কেষ্ট বজরায় সঙ্গে যাবে। দক্ষিণে মঘ-বোম্বেটেদের ভয় আছে। কেষ্ট সঙ্গে থাকলে মঘ-বোম্বেটেরা কিছু বলবে না। কারণ, ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে, কেষ্টকে চেনে। আমি এদিকে লোক পাঠিয়ে বাসুদেবপুর ও রাজনারায়ণপুরে কি ঘটেছে তার সংবাদ নিচ্ছি।

আমরা এখন যাব কোথায়?

এখান থেকে প্রায় দশ ভাটা দক্ষিণে সুন্দরবনে ষাটগাছা বাদা আমার পরিচিত। ঐ বাদার 'বাওয়ালী' আদু ফকির আমার বন্ধু লোক। সেখানে রাজাবাহাদুর নিরাপদে থাকতে পারবেন।

আপনার জিনিসপত্রের দাম কত হল?

আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, আজ বিপদে পড়েছেন। এ বিপদ আমারও বিপদ, এ বিপদে আমার কর্তব্য আমি করেছি। আপনার আশীর্বাদে মা'লক্ষ্মী এটুকু কর্তব্য পালনের যোগ্যতা আমাকে দিয়েছেন।

মধুমতীর বুকে নেমেছে চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীর সন্ধ্যা। ভাটার টানে ভেসে চলেছে বজরা। বজরার ছাদে বসে গল্প করছেন শিবশঙ্কর রায় আর কেষ্ট দত্ত। নিকটে রামশঙ্কর ছাগল ছানাদের সঙ্গে পরমানন্দে খেলা করছে। চারটে ছাগল ছানা পেয়ে রামশঙ্কর সব, এমন কি গুরুচরণ মাঝির পাকা দাড়ি ও থেলো হুকোর কথাও ভুলে গেছে। জ্যান্ত খেলনা পেলে কে আর নিষ্প্রাণ খেলনার কথা মনে করে।

কেষ্ট দত্তর বয়স পঞ্চাশের ওপরে, ব্যবসা উপলক্ষে দক্ষিণ অঞ্চল ঘুরে অনেক-কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন। বহুস্থান তাঁর সুপরিচিত। তাঁর মুখে শিবশঙ্কর শুনছেন ঐদেশের সরকারী ও বেসরকারী চালচলনের কথা। কেষ্ট দত্ত বললেন,—

এই ভাটিয়াপাড়ার দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে খুলনা পর্যন্ত সুবে বাংলার অধীন হলেও এ অঞ্চলে সুবাদারের শাসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহুকাল নেই।

কেন নেই?—প্রশ্ন করলেন শিবশঙ্কর।

এ অঞ্চলে আছে অসংখ্য নদী, নালা, বিল, হাওড় আর বন। সে সব নদী-নালায় আছে হর্মাদ আর 'কালোমানিক', বনে আছেন ঠাকুর দক্ষিণ রায়।

কালোমাণিক আর দক্ষিণ রায় কারা? আমি তো জানি বহুকাল আগে এদেশের রাজা ছিলেন দক্ষিণ রায়। তিনি দেশ থেকে মঘ-বোম্বেটে তাড়িয়েছিলেন।

হাঁ, সেই মঘঠ্যাঙ্গানো রাজা দক্ষিণ রায়ের নামানুসারে এদেশের লোকে বাদাবনের ডোরাকাটা বড়ো বাঘের নামকরণ করেছে ঠাকুর দক্ষিণ রায়।

দক্ষিণ রায় ঠাকুর হলেন কি করে?

মঘ-বোম্বেটেদের অত্যাচার থেকে দেশের প্রজাদের রক্ষা করার জন্য

বৈকুণ্ঠের নারায়ণ রাজা দক্ষিণ রায় রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর আবার যখন মঘ ও ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের অত্যাচার আরম্ভ হল, তখন দক্ষিণ রায় নারায়ণ আবির্ভূত হলেন, বনে বাঘ হয়ে, আর জলে কেঁদো কুমীর হয়ে।

তারপর কি হল ?

হর্মাদ অত্যাচারে দক্ষিণ অঞ্চল উজাড় হয়ে গেলে হর্মাদদের ডাকাতি ও ছেলে-মেয়ে-বউ চুরির ব্যবসা বছরে শুকনোর আট মাস বন্ধ হয়ে গেল। বর্ষার চার মাসের ব্যবসায় পেট চলত না। তখন তারা ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন ক'রে বনের কাঠ, বেত, মধু ও জলের মাছ ধরে শুকিয়ে শুঁটকি মাছের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। সেই সঙ্গে তাদের জাতব্যবসা ডাকাতি ও ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে বিক্রী করত। ঠাকুর দক্ষিণ রায় ও ঠাকুর কালোমাণিক আবির্ভূত হয়ে তাদের ডাঙ্গায় ও জলে নামা বন্ধ করে দিলেন।

এখনও তো এ অঞ্চলে হর্মাদ অত্যাচার আছে।

হাঁ, আছে। এখন ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের জাহাজ আসে বর্ষার তিন মাস, অন্য সময় আসে না। অন্য সময় মঘ বোম্বেটেদের নৌকা দু'চারখানা বড়ো নদীতে দেখা যায়। এখন আর ওরা আগের মত সুবিধা করতে পারে না। দেশের লোকে প্রবল বাধা দেয়।

কি করে বাধা দেয় ?

আগা সরু লোহা বড়ো কাঠের খুঁটির আগায় বসিয়ে জলের ভিতর পুঁতে রাখে, একে বলে 'তুরপিন'। তুরপিনে ঘায়েল হয়ে বোম্বেটে জাহাজ ডুবে যায়। নদীনালার ঘাটে বুরুজ বেঁধে তার ওপরে বসায় 'জাঠা' মারার 'রামধনুক'। এক একখানা জাঠা এক একখানা বড়ো বর্শার মত। জাঠার আঘাতে নৌকা তো ডোবেই, চার পাঁচটা জাঠার ঘা খেয়ে বোম্বেটেদের ছোটো কাঠের জাহাজও ডুবে যায়। এরপর আমাদের ঢাল, সড়কি, লাঠি, বাগবাঁশ তো আছেই।

বাগবাঁশ কি রকম ?

একটা আস্ত বড়ো বাঁশের গোড়ার দিক তিনটে খুঁটোয় বেঁধে আগাটা বেত দিয়ে টেনে বেঁকিয়ে ছেড়ে দিলে অন্ধকার রাতে একসঙ্গে অনেকগুলো সাবাড় হয়।

তাহলে এখন বাদা অঞ্চলে আবার বাঙালীর বসতি হয়েছে ?

হাঁ, তা হয়েছে।

বাঘে কুমীরে এদের অনিষ্ট করে না ?

এরা যে ঠাকুর দক্ষিণ রায় আর ঠাকুর কালোমাণিকের ভক্ত! ভক্তবাঞ্ছা-

কল্পতরু সর্ববিঘ্ন বিনাশন ঠাকুর 'রায়রায়ান্' পূজা পেলে ভক্তের অনিষ্ট করেন না।

ঠাকুর 'রায়রায়ান্' কি কালোমাণিক আর দক্ষিণরায়ের মিলিত নাম?

হাঁ, তাই। এই দক্ষিণ অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তিতে সকলেই রায়রায়ান পূজা করে। এঁদের পূজার বিধান দুই রকম। হিন্দুদের পূজা হয় হিন্দুশাস্ত্র বিধান মতে বনদেবীর মূর্তি গড়িয়ে। সেই সঙ্গে থাকে বাঘ, বাঘিনী ও একজোড়া কুমীরের মূর্তি! মুসলমান 'বাওয়ালী ফকির' তাঁর দরগার বেদীতেই 'বনবিবির' পূজা করেন।

বনদেবী দেখতে কেমন?

আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবীর মত। তবে মুসলমান ভক্তের সম্মুখে তিনি কালো বোরখা পরে 'হালুমবাঘা'র পিঠে চড়ে দেখা দেন। এ পূজার পাঁচালীতে হিন্দু ও মুসলমান ভেদে কিছু তফাত আছে।

শুনেছি বাওয়ালীরা নাকি অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে।

হাঁ, আগে ওরা ছিল হিন্দু ওঝা। এখন প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ওদের পুরুষানুক্রমে মন্ত্রতন্ত্র ওষুধপত্রগুলো ঠিক আছে। যারা বাদায় ব্যবসা করতে যায়, তারা প্রথমে সেই বাদার দরগায় গিয়ে সিন্নি দিয়ে বাওয়ালী ফকিরের মন্ত্রপড়া তেল সিঁদূর নিয়ে, তবে বাদার বনে ঢোকে। যে বাদায় বাওয়ালীর দরগা নেই, সে বাদার বনে কেউ যায় না, খালে মাছও ধরে না।

তাহলে এই দক্ষিণ অঞ্চলে বাদশাহী শাসন নেই।

না, এ অঞ্চলে বাইরের শাসন অচল। খুলনা পর্যন্ত নামে বাদশার অধীন। খুলনার দক্ষিণে কোনোকালেই বাদশা বা নবাবের শাসন চলে নি। তাঁরাও সে চেষ্টা কোনোকালে করেছেন বলে শুনি নি।

কেন করেন নি?

এ অঞ্চল শাসনে রাখতে হলে নবাব সরকারের যে ব্যয় হবে, তা এ অঞ্চলের খাজনায় উঠবে না। এই জন্যই বোধহয় মুসলমান নবাবী আমলে সে চেষ্টা হয় নি।

আগে কি এদেশে রাজা জমিদার ছিল?

হাঁ ছিল। হিন্দু আমলে এই দক্ষিণ অঞ্চলে বহু শক্তিশালী রাজা জমিদার ছিলেন। তাঁদের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বহু জায়গায় দেখা যায়।

তাঁরা লোপ পেলেন কেন?

জমিদারের ওপরে জোর জুলুম করে খাজনা আবওয়ার আদায় করা যত সহজ, সাধারণ প্রজার নিকট থেকে আদায় করা তত সহজ নয়। মুসলমান

আমলের প্রথমে নবাবী দাবি আর বোম্বেটেদের অত্যাচারে বাংলাদেশের এই দক্ষিণ অঞ্চলে জমিদার ও ধনী ব্যবসাদার লোপ পেয়েছে।

বাসুদেবপুরের বজরা ভাটিয়াপাড়া ঘাট ছেড়ে পাঁচ দিন পরে পৌঁছল ঘাটগাছা। ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে কেষ্ট দত্তের সঙ্গে শিবশঙ্কর রায় গেলেন দরগায়। সব ঘটনা শুনে আতুফকির বললেন,—

আপনি বিপদে পড়ে আশ্রয়ের জন্য এসেছেন আমার মুর্শীদের দরগায়। দয়াল মুর্শীদ আপনাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন। আমি দরগায় গরীব খিদ্‌মৎগার, আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব। এখন আমি এ অঞ্চলের মাতব্বর-প্রধানদের খবর পাঠাচ্ছি। আজ সন্ধ্যার পর সকলে দরগায় বসে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে।

সন্ধ্যার পর দরগায় পরামর্শ-সভা বসল। মাতব্বর-প্রধানরা পরামর্শ করে স্থির করলেন, রাজাবাহাদুর এখন সপরিবারে বজরায়ই থাকুন। গ্রাম থেকে বজরা পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। আঠারোজন মাল্লা নিয়ে ছিপনৌকায় কেষ্ট দত্ত বাসুদেবপুর গিয়ে সেখানে কি ঘটেছে দেখে আসুক। যদি রাজাবাহাদুরের পক্ষে এখন দেশে ফেরা সম্ভব না হয়, তবে গ্রামের মাঝখানে দোতলা কাঠের ঘর তুলতে হবে। একতলা বাড়ীতে বর্ষাকালে রাজাবাহাদুর থাকতে পারবেন না। ঘরের ছাউনির জন্য এখনই খড় সংগ্রহ করতে হবে, নইলে এমাসের শেষে বনের খড় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।

পরামর্শমত পরের দিন কেষ্ট দত্ত ভাটার মুখে ছিপ খুলে চলে গেলেন। বজরায় থাকলেন গুরুচরণ মাঝি আর পাঁচজন মাল্লা।

বড়ো জমিদারের 'পিনেস বজরা', তাকে ছোটো জাহাজও বলা চলে। ভিতরে অনেকগুলি কামরা পুরুষ মহল ও অন্দর মহলে ভাগ করা। বৈঠকখানা, রান্নাঘর, স্নানের ঘর, সব রকম ব্যবস্থা আছে।

অপরাহ্নে গ্রামের বউ-ঝি-বৃদ্ধারা দল বেঁধে আসে বড়োলোক জমিদারের বউ-ঝি দেখতে। বিশ্বেশ্বরী তাদের আদর করে বজরার অন্দর মহলের বৈঠকখানায় বসিয়ে আলাপ করেন। তাঁর সরল আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহারে পল্লীর হিন্দুমুসলমান চাষী বউঝি-গিন্নীরা মুগ্ধ হয়ে যান। কল্যাণী কিন্তু একদিনও এই আসরে আসে না।

কল্যাণী ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কোনো বিষয়ে নিজের কোনো চেষ্টা নেই। এমন কি রামশঙ্কর কাছে এলে তাকেও দেখে না। প্রভাতে উঠে, গিয়ে বসে জানলার ধারে। সারাদিন আর রাতের এক প্রহর সেখানে বসে তাকিয়ে থাকে উত্তর আকাশের দিগন্তে।

কল্যাণী দেখে, আকাশে ছোটো ছোটো মেঘ ভেসে চলে। চলতে চলতে কয়েকটা ছোটো মেঘ এক হয়ে একটা বড়ো মেঘ হয়। এমনি করেই বুঝি জমাট বেঁধে কালবৈশাখীর ঝড়ো মেঘে কত ঘরবাড়ী গাছ ভেঙ্গে নৌকা ডুবিয়ে সব ওলট পালট করে দেয়। এমনি করেই বুঝি মানুষের ছোটো ছোটো পাপ জমাট বেঁধে তার জীবনে আনে দূর্ভাগ্যের কালবৈশাখী।

কল্যাণী ভেবে পায় না, ঐ ছোটো ছোটো মেঘের মত এমন কি পাপ সে করেছে, যা আজ জমাট বেঁধে তার জীবনে এতবড়ো সর্বনাশা ঝড় তুলেছে? পনরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সে এসেছে শ্বশুরবাড়ী। শাশুড়ী অদ্ভুত মানুষ, কারও সঙ্গে তিনি মেশেন না, কাউকে কিছু বলেন না, এমন কি কেউ তাঁর কোনো সেবা করার সুযোগও পায় না। শাশুড়ীর কাছে তো কল্যাণীর কোনো অপরাধ ঘটা সম্ভব নয়। শ্বশুরবাড়ী এসেই কল্যাণী পেয়েছে স্নেহময়ী দিদি বিশ্বেশ্বরীকে। এই ছয় বছরের মধ্যে কোনো একটা সামান্য ব্যাপারেও সে দিদির অবাধ্য হয় নি। সেদিক থেকেও তো কোনো অপরাধ খুঁজে পাওয়া যায়না। যে পনরো বছর তার বাপের বাড়ী কেটেছে, তার প্রথম দিকে ছেলেবেলায় সে অনেক সময় দুষ্টুমি করে মায়ের হাতে মার খেয়েছে। সে সব তো ছেলেবেলার ঘটনা। ওরকম দুষ্টুমি ঐ বয়সে সবাই করে মার খায়। বড়ো হয়ে সে তো কখনো মা-বাবার অবাধ্য হয় নি!

তবে হ্যাঁ, কল্যাণী বিয়ে হয়ে এসে মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে বিষ্ণুশঙ্করকে খেপাতো বটে। কিন্তু সে তো একটু মজা করার জন্য। সে খেপানোয় তিনি রাগ করলে কল্যাণী আদরকরে তাঁর গলাজড়িয়ে ধরে অকপটে নিজের দুষ্টুমির কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। সে সব ঘটনায় শেষে তো তিনি আনন্দই পেতেন, অসুখী তো হন নি!

কল্যাণী দিনের পর দিন বজরার জানলার কাছে বসে তার একুশ বছরের জীবনস্মৃতির পাতা উল্টায়। সে স্মৃতির কোনো পাতায়ই এমন একটা কালো দাগ খুঁজে পায় না, যাকে সে তার এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করতে পারে। তবে কি এ তার পূর্বজন্মের কর্মফল? হ্যাঁ, তাই হবে। তা না হলে অমন দিনে অমন কথা বিষ্ণুশঙ্করের মুখ থেকে বেরোবে কেন?—ভাবে কল্যাণী।

বিয়ের পরের বছর আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর দুপুরে বিষ্ণুশঙ্কর যোদ্ধার সাজসজ্জা পরে কল্যাণীকে দেখানোর জন্য আসেন অন্দরমহলের পিছনের বাগানে। কল্যাণী তাঁকে দেখে খুব উল্লসিত হয়ে বলেছিল, 'তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন মহাভারতের অভিমন্যু'।

কল্যাণীর কথা শুনে বিষ্ণুশঙ্কর হেসে বলেছিলেন, 'আমিও হয়তো একদিন অভিমন্যুর মত তোমার কাছে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে যাব, আর ফিরে আসব না।'

কথাটা শুনে কল্যাণী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। বিষ্ণুশঙ্কর চেষ্টা করে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাতে না পেরে বিশ্বেশ্বরীকে জানান। বিশ্বেশ্বরী এরজন্য বিষ্ণুশঙ্করকে যথেষ্ট তিরস্কার করে কল্যাণীকে তুলে ঘরে নিয়ে বহুযত্নে মূর্চ্ছা ভাঙ্গান। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর কল্যাণীর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সে কারও সঙ্গে কথা বলত না, থেকে থেকে চিৎকার করে উঠত। রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নে বিভীষিকা দেখে কেঁদে উঠত। বিশ্বেশ্বরী ভালো কবিরাজ লাগিয়ে চিকিৎসা ও নানারকম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে তাকে সুস্থ করেছিলেন। যে দুইমাস কল্যাণী অসুস্থ ছিল সে দু'মাস বিশ্বেশ্বরী তাকে চোখের আড়াল করেন নি, রাত্রে নিজের বিছানায় রেখেছেন।

এতদিন পরে দিদির সব শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ব্যর্থ করে সেই অলক্ষুণে কথাটাই ফলে গেল!—ভাবে কল্যাণী।

সে দিনও অপরাহ্নে জানালার পাশে বসে আছে কল্যাণী। হঠাৎ তার কানে এল, এক চাষীবউ বিশ্বেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করছে,—

এটি বুঝি আপনার কোলের ছেলে?

না, এটি আমার ছোটো জায়ের খোকা। আমার তিন মেয়ে, ছেলে নেই।

আপনার জা কি সঙ্গে আসেন নি?

এসেছে, এই পাশের কামরায়ই আছে।

তবে আমরা একদিনও তাঁকে দেখতে পাইনে কেন! তিনি কি আমাদের দর্শন দেবেন না?

রাজনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ীর মেয়ে বউদের রক্ষা করতে আমার শ্বশুর আর দেওর লস্কর নিয়ে যুদ্ধে গেছেন। সেখানে কি ঘটেছে তার সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। আমার জা সেই থেকে কারও সঙ্গে কথা বলে না, নিজের ইচ্ছায় খায় না, স্নান করে না, এমন কি এই কোলের ছেলেটাকেও একটু তাকিয়ে দেখে না; সারাদিন জানলার কাছে বসে উত্তর আকাশে তাকিয়ে থাকে।

আহাঃ মা, আপনারা বড়ো ঘরের বউ ঝি, আপনাদের তো সব সময়ই বড়ো বিপদ মাথায় নিয়ে ঘর করতে হয়। আমরা চাষী ঘরের বউ ঝি, আমাদেরও এ রকম বিপদ হয়ে থাকে। ঐ যে দেখছেন বিধবা মেয়েটা বসে আছে, ওর স্বামী এই তিন বছর হল হর্মাদদের সঙ্গে লড়াই করে মারা গেছে। আহা, বিয়ে হয়ে পুরো দুটো বছরও শাঁখা-সিঁদুর পরতে পারে নি। এই বেশে কতকাল যে এই দুঃখের বোঝা ওকে বইতে হবে, তা কে জানে।

চাষীবউয়ের কথা শুনে কল্যাণী উঠে পাশের ঝরকার ফাঁক দিয়ে সেই বিধবাটিকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তার বিবর্ণ মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—না না, ও কখনও নয়। ও বেঁচে নেই, ওটা শ্মশানের মড়া। ওর মধ্যে আত্মা নেই, থাকতে পারে না, না না না, পারে না।

কল্যাণীর গলার আওয়াজ পেয়ে বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠে এসে দেখেন কল্যাণী দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে, মুখ হয়ে গেছে অস্বাভাবিক সাদা, চোখ বড়ো বড়ো ও পলকহীন।

ব্যাপার গুরুতর বুঝে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই সে মূর্চ্ছিতা হয়ে এলিয়ে পড়ল। পাশের কামরায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বুঝে এগিয়ে এল কয়েকজন চাষী বউ। তারা ব্যাপার দেখে কেউ ছুটল জল আনতে, কেউ পাখা আনতে।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কল্যাণী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,—দিদি, আমার ভালো শাড়ী জামা আর গয়না বের করে দিন, আমি স্নান করে পরব।

কল্যাণীর কথায় বিশ্বেশ্বরী মনে ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলেন না, কথামত সব বের করে দিলেন। কল্যাণী বেশ সুস্থ মেয়ের মত গেল স্নান করতে।

সব দেখে একজন বয়স্কা চাষী বউ প্রস্তাব করল, এ অবস্থায় তারা বড়ো রাণীমাকে একা রেখে সাহস পাচ্ছে না, তারা দু'একজন কাছে থাকতে চায়। বিশ্বেশ্বরী তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

স্নানকরে এসে কল্যাণী বলল,—'দিদি, আমার চুল বেঁধে সিঁদুর পরিয়ে দিন'। বিশ্বেশ্বরী নীরবে চুল বাঁধতে বসলেন। চুল বাঁধতে বসে কল্যাণী আবার বলল,—'দিদি, আমি আলতা পরব'। আলতা সঙ্গে ছিল না, একজন চাষীবউ গ্রামে গিয়ে আলতা নিয়ে এল।

কল্যাণীর চুল বাঁধা শেষ হতেই সে দিদির চুল বাঁধতে বসল। কল্যাণীর কোনো আবদারেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিলেন না। চুল বেঁধে দিদির পায়ে আলতা

পরিয়ে নিজে পরে, বেশ সেজেগুজে বিছানার ওপরে ভালো হয়ে বসে, বলল, —দিদি, রামশঙ্কর কোথায়? তাকে আমুন, একটু কোলে করে দুধ দেব।

রামশঙ্কর তার জ্যেঠার কাছে ছিল, বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে তাকে এনে কল্যাণীর কোলে দিলেন। কল্যাণী রামশঙ্করকে কোলে নিয়ে আবার আবদার ধরল,—দিদি, আজ থেকে রাতে রান্না আমি করব।

এবার বিশ্বেশ্বরী সাহস করে বললেন,—তোর মতলবটা কি, খুলে বল তো। হঠাৎ এ পরিবর্তনের হেতু কি হল?

মতলব আবার কি হবে। বড়োঠাকুর আমার রান্না খেতে খুব ভালোবাসেন, তাই রাঁধব। আচ্ছা দিদি, এটা তো চোত্‌মাস; ইঁচর আর কইমাছ পাওয়া যাবে না?

না, এটা নোনা দেশ। এদেশে কাঁঠাল গাছ নেই।—উত্তর দিল চাষীবউ।

কইমাছ পাওয়া যাবে?

না, এ সময়ে কইমাছও পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে কল্যাণী মুখ একটু ভার করে বলল,—তবে তোমাদের দেশে কি পাওয়া যায়?

এদেশে যথেষ্ট নারকেল পাওয়া যায়। মাছের মধ্যে ইলিশ, তপসে, চিংড়ি, ভাঙ্গন, ভেটকি, রামট্যাংরা, এই সব মাছ ভালো।

এখন কি মাছ পাওয়া যাবে?

সন্ধ্যায় জেলেরা ঘাটে ফিরলে সব মাছই পাওয়া যাবে।

তাহলে দিদি গিয়ে বড়োঠাকুরকে বলুন, আজ রাতে আমি মুগের ডাল, তপসে মাছ ভাজা আর ইলিশমাছের পাতুরি রান্না করব।

বিশ্বেশ্বরী গিয়ে সব ঘটনা জানালেন। শুনে শিবশঙ্কর বললেন,—বউমা যখন বলেছে, এখন থেকে রাতের রান্না সেই করবে। তুমি তাঁর কোনো আবদারে বাঁধা দিও না।

সেইদিন থেকে কল্যাণী সময় মত স্নান ক'রে ভালো জামাকাপড় পরে সেজেগুজে দিনের বেলা সব কাজে দিদিকে সাহায্য করে। রাতে রান্না ক'রে কাছে বসে শিবশঙ্করকে খাওয়ায়। রামশঙ্করের স্নান, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সব নিজে করে। প্রভাতে বিছানাছেড়ে উঠে স্নান ক'রে প্রথমে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে শিবশঙ্করকে ও দিদিকে প্রণাম করে। কোনো সময়ে কোনো কাজে আর তাকে উদাসীন দেখা গেল না।

শিবশঙ্কর ভরসা দিলেও বিশ্বেশ্বরী কিন্তু কল্যাণীর ভাবভঙ্গী দেখে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অপরাহ্ণে কল্যাণীর চুল বেঁধে যখন সিঁথায় সিঁদুর পরাতে নেন, তখন বুকের কান্না চেপে রাখতে পারেন না। তাঁর চোখে জল দেখেও কল্যাণী অটল।

রাতে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীকে কাছে শুইয়ে নানারকম পৌরাণিক কাহিনী শুনান। এক রাতে শুনালেন পরীক্ষিতের কাহিনী। বলা শেষ হলে বিশ্বেশ্বরী মন্তব্য করলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হলে উত্তরাদেবী বহুকাল বেঁচে থেকে তাঁর কর্তব্য কোলের ছেলে পরীক্ষিৎকে মানুষ করেছিলেন।

শুনে কল্যাণী উত্তর দিল,—তাঁর যে আপনার মতো কোনো দিদি ছিল না।

আর একদিন পাড়ার বউঝিদের সঙ্গে সেই বিধবা মেয়েটি এসেছে বেড়াতে। কল্যাণী তাকে দেখেই চমকে উঠে, ছুটে পালালো। তার ভাব দেখে বিস্মিত বিশ্বেশ্বরী একটু পরে পাশের কামরায় এসে দেখেন, কল্যাণী আবার সেদিনের মত বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তাঁকে দেখে ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলল—

ও-ওকে যেতে বলুন। এ-এখুনি চলে যেতে বলুন।

কাকে চলে যেতে বলব ?—জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বেশ্বরী।

ও-ও-ঐ যে মেয়েটা।

এবার বিশ্বেশ্বরী ব্যাপারটা বুঝলেন। কল্যাণী নিজের বৈধব্য শঙ্কা সম্মুখে রেখে তার সমবয়সী ঐ মেয়েটার থান কাপড় পরা, রুক্ষ এলোচুল, হাতখালি, বিষাদের প্রতিমূর্তি সহ্য করতে পারছে না।

নিজভাবে বিভোর মানুষ তার ভাববিপরীত ব্যাপার কাছে থাকলেও দেখে না, দেখলেও বোঝে না। সেইজন্যই দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের ঘরে রুটি নেই শুনে রাণী তাদের 'কেক' খেতে বলেছিলেন। দেশে চালগমের অভাব পূরণের জন্য খাদ্যমন্ত্রী মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল এইসব খাদ্যে অভ্যস্ত হতে জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় যদি কেউ হঠাৎ তার নিজভাবের বিপরীত চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে সেটা ভালোর দিকে হলে তার ব্যবহার হয় বোকা বেকুবের মত। আর মন্দের দিকে হলে সে দেখে বিভীষিকা।

কল্যাণী এর পূর্বে বহু বিধবা দেখেছে, কিন্তু সে তাদের বৈধব্যের স্বরূপ

বুঝতে পারে নি, বুঝতে চেষ্টাও করে নি। এখন এই অবস্থায় তার সম্মুখে ঐ বিধবা মেয়েটি হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।

এরপর আরও দু'দিন গেলে কল্যাণী বিশ্বেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করল—

দিদি, আপনি কি সেই মেয়েটাকে আসতে নিষেধ করেছেন?

হ্যাঁ। তোর কথামত নিষেধ করেছি।

দিদি, আমি খুব অন্যায় করেছি। আহা, ও বড়ো দুঃখী। আমি ভুল করে ওর মনে আরও দুঃখ দিয়েছি। আজ ওকে আসতে বলে পাঠান, আমি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করব।

মেয়েটিকে আসতে নিষেধ করে বিশ্বেশ্বরীও মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কল্যাণীর মত পেয়ে সেইদিনই তাকে ডেকে পাঠালেন। অপরাহ্নে আর কয়েকটি চাষীমেয়ের সঙ্গে সেই মেয়েটি এলে কল্যাণী নিজে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল,—বোন, আমি খুব অন্যায় করে তোমার অন্তরে ব্যাথা দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

কল্যাণীর কথা শুনে মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

বিদায়ের সময় কল্যাণী আবার তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল,—

বোন, তোমার নামটি কি?

সৌদামিনী।—উত্তর দিল মেয়েটি।

আঠারোজন মাল্লা নিয়ে বাইচের ছিপ নৌকায় গেছেন কেষ্ট দত্ত। আট-দশ দিনে ছিপ ফিরে আসার কথা, ষোলোদিন হয়ে গেল কোন সংবাদ নেই। শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাসুদেবপুর ও রাজনারায়ণপুরের জমিদারবাড়ী ও জমিদারী যে বেদখল হয়ে গেছে, তাতে তাঁদের আর কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা জানতে চান, কেউ ধরা পড়ে মুর্শিদাবাদে চালান হয়েছে কিনা।

শেষে সতেরোদিন পরে দুপুরে জোয়ারের মুখে দেখা গেল ছিপ আসছে। গুরুচরণ মাঝির ডাকে শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বজরার ছাদে এসে দাঁড়ালেন। ছিপ আরও এগিয়ে এলে দেখে চেনা গেল, ছিপে বসে আছেন বাসুদেবপুর জমিদারের কুলপুরোহিত স্মৃতিরত্ন মশাই, বিশ্বাস রামচাঁদ ঘোষ আর কেষ্ট দত্ত।

ছিপ কাছে আসতেই রামচাঁদ হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন—'রাজা-

বাহাদুর কুমার বাহাদুর আর এ জগতে নেই'। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরীর পায়ের কাছে পড়ে গেল মূর্চ্ছিতা কল্যাণী। কল্যাণী যে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল তা বিশ্বেশ্বরী আগে লক্ষ্য করেন নি।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কল্যাণী কাঁদল না, কোনো ব্যাকুলতাও প্রকাশ করল না, নীরবে উঠে গিয়ে সেই জানলার কাছে বসে তাকিয়ে রইল উত্তর আকাশে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পেলেন না বিশ্বেশ্বরী। রামশঙ্করকে যে তার কোলে গুঁজে দেবেন, সে সাহসও তাঁর হল না।

সন্ধ্যার পূর্বে হরসুন্দরী নির্বিকার চিত্তে ঘাটে নেমে শাঁখা ভেঙ্গে, সিঁদুর মুছে, স্নান করে, থানকাপড় পরলেন। কল্যাণীকে স্নানকরার কথা বলতেই সে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করল; মাথার এলোচুল ফুলে উঠল ক্রুদ্ধ সিংহের কেশরের মত, মুখের বর্ণ অস্বাভাবিক কালো, চোখে যেন আগুন ঝলকাতে লাগল। ভয় পেয়ে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীর সম্মুখ থেকে সরে গেলেন।

কল্যাণীর অবস্থা শুনে শিবশঙ্কর চিন্তিত হয়ে পুরোহিত স্মৃতিরত্নের কাছে ব্যবস্থা চাইলেন। পুরোহিত এ অবস্থায় কল্যাণীর স্নানের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা দিতে পারলেন না। তিনি শিবশঙ্করকে রাণীমা হরসুন্দরীর কাছে ব্যবস্থা নিতে বললেন।

সব শুনে হরসুন্দরী বললেন,—থাক, ওকে এখন তোমরা কিছু ব'লো না। এখনই ওর স্নানের প্রয়োজন নেই।

রাত একপ্রহর অতীত হয়ে গেল, কল্যাণী একইভাবে জানলার কাছে বসে আছে। বিশ্বেশ্বরী সাহসে ভর করে রামশঙ্করকে কোলে দিতে গেলেন, কল্যাণী ছেলে ধরল না। বিশ্বেশ্বরী কাঁদতে কাঁদতে হাত ধরে বললেন,—আয়, আমার কাছে শুবি, আয়।

কল্যাণী এবার উঠে দিদির সঙ্গে গিয়ে বিছানায় শুলো। বিশ্বেশ্বরী তাঁর একপাশে শোয়ালেন রামশঙ্করকে আর একপাশে কল্যাণী। রামশঙ্কর ঘুমোলে বিশ্বেশ্বরী কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকে ধীরে ধীরে নিজের পরণের শাড়ীর আঁচল দিয়ে জড়ালেন।

ক'দিন ধরে নানা দুশ্চিন্তায় বিশ্বেশ্বরীর চোখে ঘুম ছিল না। সেরাতেও প্রথম দিকে তাঁর চোখে ঘুম আসে নি, শেষের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ বাইরের গোলমালে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের গোলমাল? 'জল আন, জল আন, পুড়ে ম'ল, পুড়ে ম'ল'।

কে পুড়ে মরল ? লাফিয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বরী। কামরায় আলো নেই, প্রদীপ নেভানো। বিছানা হাতড়িয়ে দেখলেন কল্যাণী নেই, রামশঙ্কর ঘুমিয়ে আছে। এক ঝাঁকিতে রামশঙ্করকে কোলে তুলে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী ছুটে বজরার বাইরে গেলেন।

তাঁদেরই ঘর ছাইবার জন্য খড় কেটে এনে ঘাটে গাদা দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই খড়ের গাদায় লেগেছে বেড়া আগুন। সেই আগুনের মাঝখানে জ্বলন্ত খড়ের গাদার মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। তার পরণের শাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দেখে বিশ্বেশ্বরী চিৎকার করে উঠলেন—ও কল্যাণী, তুই একি করলি।

কল্যাণী ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল—দিদি, এ জীবনে এই একবার মাত্র আপনার অবাধ্য হলাম। অবাধ্য বোনকে ক্ষমা করুন।—বলেই জ্বলন্ত খড়ের গাদার মধ্যে বসে পড়ল, আর দেখা গেল না।

কল্যাণী যে, কোন সময় বজরা থেকে নেমে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়েছে তা কেউ দেখে নি। বজরার ছাদে মাঝি-মাল্লা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। খড়ের গাদাটা ছিল বজরার খুব কাছে। আগুনের তাপে মাঝিমাল্লাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সাধারণ আগুন মনে করে সকলে লগি নিয়ে আগুন নেভাতে গেলে আগুনের ভিতর থেকে কল্যাণী ধমক দিয়ে বলেছে—খবরদার, আগুনে কেউ হাত দেবে না। বড়ো বউরাণীকে ডেকে দাও।—তখন সকলে বজরার দরজার কাছে এসে শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরীকে ডেকেছে।

বজরার বাইরে শিবশঙ্কর প্রথম আসেন। তাঁকে দেখে কল্যাণী সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েই হাতজোড় করে প্রণাম করে। শিবশঙ্কর এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মুখে কোনো কথা যোগালো না। তারপরে এসেছেন বিশ্বেশ্বরী।

নিকটবর্তী পাড়ার লোক সব জলের কলসী নিয়ে ছুটে এল আগুন নেভাতে। তখন আগুনের মধ্যে কল্যাণী অদৃশ্য হয়ে গেছে। শিবশঙ্কর তাদের বললেন,—সতী স্বর্গে স্বামীর কাছে যাচ্ছেন। আপনারা কাঠ এনে চিতায় দিন।

পল্লীর হিন্দু মুসলমান নারী, পুরুষ সব এসে ঘাট ভরে গেল। ভারে ভারে কাঠ এসে চিতায় পড়ল। প্রভাতে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল।

আগুন থেমে গেলে কুলপুরোহিত নিয়ে শিবশঙ্কর গেলেন চিতা ধুতে। গ্রামের হিন্দু মুসলমান মাতব্বররা তাঁকে জানালেন সতীমার চিতা ধোয়ার জন্য দুধের যোগাড় করতে তারা লোক পাঠিয়েছেন, এখনি দুধ এসে যাবে।

কলসী কলসী দুধ এসে গেল। কল্যাণীর চিতা দুধে ধুয়ে চিতাভস্ম ঝাটগাছা খাঁড়ির ভাটিয়াল স্রোতে ভেসে চলে গেল অনন্ত সাগরাভিমুখে।

অপরাহ্নে গ্রামবাসীরা চিতার ওপরে বেদী বেঁধে বেড়া দিয়ে চিতা ঘিরে দিল। দরগার আতুফকির একটা কদমের চারা এনে চিতা-বেদীর পাশে বুনে ঘাটের নাম রাখলেন সতীমায়ের ঘাট। সন্ধ্যাবেলা গ্রামের বউ-ঝি রাশিরাশি ফুল, ফুলের মালা এনে চিতা সাজিয়ে জ্বেলে দিল প্রদীপের মালা।

সংসার পথে চলতে মানুষ অনেক কিছু পায়, অনেক কিছু হারায়। প্রিয়কে পাওয়ায় যেমন আনন্দ, হারানোয় তেমনি দুঃখ। এই হারানোর দুঃখ সম্ভাবনা নিয়েই কিন্তু প্রাপ্তির আনন্দ।

দুঃখবাদী জ্ঞানীরা বলেন, যারা প্রিয়ের অন্বেষণ করে তারা মূর্খ অজ্ঞান। তাঁদের কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু খুব কম মানুষেই তাঁদের কথা শোনে। কারণ, এই প্রিয়কে খুঁজে পাওয়াই মানুষের স্বভাব-কৃতিত্ব ও মনুষ্যত্ব। প্রিয়ের আশা ত্যাগ করলে মানুষ অস্তিত্বহীন, সে অবস্থা সাধারণত কেউ চায় না।

সরোবরে ফোটে পদ্ম। কোনো পদ্ম তার পূর্ণ পরমায়ু কাল পর্যন্ত হেসে খেলে সৌন্দর্য-সুষমা বিলিয়ে ঝরে যায়। কোনোটা বা প্রভাতে মুখ খুলে দু'তিন প্রহর হেসে খেলে অপরাহ্নের দৈব দুর্যোগে অকালে হারিয়ে যায়। যে ফুলটি তার সবটুকু সম্পদ প্রকাশ করে বিলিয়ে যেতে পারল না, তার সেই স্বল্পকাল স্থিতিও মহাকালের যাত্রাপথে তুচ্ছ নয়। সেই জন্যই ও রকম দুর্যোগের সম্ভাবনা নিয়েই নতুন ফুল ফোটানোর জন্য মহাকাল ব্যগ্র।

প্রতিটি মানুষই সংসার যাত্রাপথে কল্যাণ-কল্যাণীর সঙ্গ পায়। সে সঙ্গ না পেলে কেউ প্রিয়ের অন্বেষণে পথ চলতে পারেনা। কল্যাণ-কল্যাণীকে হারানো সব চাইতে বড়ো দুঃখ। সে দুঃখে প'ড়ে কেউ তার স্মৃতি সম্বল করে অবশিষ্ট পথ চলে, কেউ তা পারে না। যে তা পারে না, সে তার যাত্রাপথে সেবারের মত যাত্রা স্থগিত করে দেয়।

এ জগতে মানব সৃষ্ট সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, কলা, যা কিছু আনন্দ-রসপ্রদ বস্তু আছে, তার স্রষ্টার পিছনে রয়েছে কল্যাণ বা কল্যাণীর অবদান ও প্রেরণা।

রাজনারায়ণপুরের লড়াইয়ের পরদিন এনায়েতুল্লা খাঁ ফৌজদার সাহেবকে

কয়েকজন খানসামা, বাবুর্চি ও পাহারাওয়ালা সংগ্রহ করতে বললেন। ফৌজদার সাহেব উত্তর দিলেন—

হুজুর, আমি সে চেষ্টা করেছি, এ পর্যন্ত সে রকম কাউকে পাই নি।

কেন পেলেন না, এ অঞ্চলের অধিবাসী কি সব পালিয়ে গিয়েছে?

না হুজুর, পালায় নি। কেউ কাজ করতে রাজি হয় না।

এ অঞ্চলের সকলেই কি ধনী?

এটা ধনী দরিদ্রের প্রশ্ন নয়। প্রজারা এই জমিদার পরিবর্তনে দুঃখিত।

এ দেশে কি মুসলমান প্রজা নেই?

যথেষ্ট আছে। হুজুর এখন বড়ো জমিদার হতে চলেছেন। মেহেরবানি করে এই বুড়ো ফৌজদারকে যখন দোস্তের মর্যাদা দিয়েছেন, তখন সেই হিসাবে একটা কথা বলি। এই বাঙালী জাতটাকে ধর্মের দিক থেকে পৃথক দেখলেও আর কোনো দিক থেকে পৃথক করা যায় না, করলে মস্তবড়ো ভুল হয়।

তাহলে মুসলমান প্রজারাও আমাকে মানবে না?

মানবে, হিন্দু মুসলমান সব প্রজাই আপনাকে মানবে। তবে তাতে সময় লাগবে।

কেন সময় লাগবে?

তারা বুঝে নিতে চাইবে, নয়া জমিদার কেমন হল।

কি করে বুঝবে?

জমিদারের বিচার-আচারে বুঝবে।

বিচারের দায়িত্ব তো পরগণার কাজীর ওপরে।

এদেশের প্রজারা নিজ ইচ্ছায় কাজীর দরবারে বিচারের জন্য যায় না, যায় জমিদারের কাছারিতে।

তা যায় কেন?

যেখানে নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার পায়, সেখানেই যায়।

তাহলে এখন আমার খানসামা-বাবুর্চি কি করে যোগাড় হবে?

দেখি, থানাদার ফিরলে কি করা যায়।

বাসুদেবপুরের বজরা সম্পর্কে কোনো খবর পেয়েছেন?

বজরার কোনো খবর পাইনি, তবে থানাদার যে বজরা ধরতে পারবে না, সেটা বুঝেছি।

কিসে বুঝলেন?

গত রাত্রে সকলে বাসুদেবপুর জমিদার বাড়ী লুট করতেই ব্যস্ত ছিল, বজরা গ্রেফতার করতে কেউ যায় নি। আজ ভোরে গিয়েছে।

আপনার হুকুম অমান্য করার জন্য এদের শাস্তি দেবেন না?

এ রকম ব্যাপারে সুবাদারই শাস্তি দিতে সাহস করেন না, আমি কি করে দেব।

রাজনারায়ণপুরের লড়াইতে এনায়েতুল্লা খাঁর সঙ্গী দশজন সওয়ারের সাতজন মারা পড়েছিলেন। যে তিনজন বেঁচে ছিলেন, তাঁদের দুজনকে ফেরত পাঠানো হল মুর্শিদাবাদে। তাঁদের সঙ্গে এনায়েত খাঁ পাঠালেন নবাবী দরবারে 'কয়ছালার এতেলা'।

এতেলায় লেখা থাকল, রাজনাবায়ণপুরের যুদ্ধের বিবরণ। কালীনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীর জেনানা সব ভরাডুবি করে মরেছে, বাসুদেবপুরের জমিদার বাড়ীর জেনানারা পালিয়ে সুন্দরবন এলাকায় চলে গেছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টায় ফৌজদারের কোনো গাফিলতি হয় নি।

কিছুদিন পরে এনায়েত খাঁ মুর্শিদাবাদের সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর ফরমান পেলেন, বাসুদেবপুরের জমিদারীও তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

যে একজন সওয়ারকে এনায়েতুল্লা খাঁ রেখেছিলেন, তাঁর নাম আলি হোসেন। হোসেন সাহেবকে এনায়েত খাঁ করলেন তাঁর জমিদারীর দেওয়ান। বৃদ্ধ ফৌজদার সাহেব ও থানাদারের চেষ্টায় পুরনো জমিদারের কর্মচারীরা এসে আবার জমিদারের কাছারিতে বসলেন। এনায়েতুল্লা খাঁর জমিদারী চালু হল।

মাসখানেক পরে কতকগুলি জেলে মাতব্বর এসে জমিদার এনায়েতুল্লা খাঁ সাহেবকে জানালেন, রাজনারাণপুর যুদ্ধের দু'দিন পরে রাত্রে ভৈরবে মাছ ধরতে গিয়ে, তাঁরা একটি জলে ডোবা যুবতী মেয়ে পেয়েছেন। মেয়েটি কালীনারায়ণ চৌধুরীর অবিবাহিতা কন্যা। অনেক চেষ্টা করে তাকে বাঁচানো হয়েছে বটে, কিন্তু তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না, নিজের ইচ্ছায় কিছু করে না, মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে ছুটে যায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। হুজুরের হুকুম ছাড়া মেয়েটিকে কোথাও পাঠাতে তাঁরা সাহস পাচ্ছেন না।

জমিদার বাড়ীর পালকি নিয়ে এনায়েত খাঁ নিজেই গেলেন মেয়েটিকে দেখতে। মেয়েটিকে দেখে যুবক এনায়েত খাঁ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দিল্লী আগ্রার বিদেশিনী দামী নাচওয়ালীদের মত গায়ের রঙ্ ফরসা নয়, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবে এ

মেয়ের কাছে তারা দাঁড়াতেই পারে না। মাতব্বরদের কাছে জমিদার প্রস্তাব করলেন, মেয়েটিকে তিনি জমিদারবাড়ীতে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। চিকিৎসায় সুস্থ হলে জমিদারের কন্যা যাতে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

ব্যবস্থা যে অবিবাহিত মুসলমান জমিদার কি করবেন তা বুঝতে আর কারও বাকি থাকল না, কিন্তু কোনো উপায় আর নেই। নির্বোধের মতো যখন বাঘের মুখে হরিণ শিশু তুলে দেওয়া হল, তখন আর কি করা যাবে। জেলে মাতব্বররা সম্মত হলেন।

পরদিন জমিদার আট বেহারার পালকি পাঠিয়ে কালীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যাকে সসম্মানে নিয়ে এসে অন্দর মহলে স্থান দিলেন। সেবা শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করলেন উপযুক্ত বাঁদি। দেশের কবিরাজ ডেকে আরম্ভ করলেন চিকিৎসা। দুই মাস চিকিৎসা করেও যখন কোনো ফল হল না, তখন এনায়েত খাঁ আরও ভালো চিকিৎসার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন ঢাকা।

ষাটগাছায় শিবশঙ্কর রায় তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের দু'দিন পরে অতঃপর কি করা হবে সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য গ্রামের সব মাতব্বরদের আহ্বান করলেন। পরামর্শে স্থির হল, সম্মুখে বর্ষাকাল, একমাসের মধ্যেই গ্রামের ভিতরে রাজা বাহাদুরের বাসোপযোগী বাড়ী তৈরী শেষ করতে হবে। এবার বর্ষাকালে হর্মাদ-আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। বজরার মাল্লারা এদেশে মাছের ব্যবসা করবে। তারা মাছ ধরে শুকিয়ে ও নোনা করে ছিপনৌকায় ভাটিয়াপাড়া গিয়ে তাদের মাছ বেচবে। কেষ্টদত্ত ওদিকের সব সংবাদ জেলে মাল্লাদের মারফত জানাবেন। বিশ্বাস রামচাঁদ ঘোষ যখন যা ঘটে কেষ্টদত্তকে জানাবেন। যদি নবাবী ফৌজ এদিকে আসে তবে পূর্বেই সংবাদ পাওয়া যাবে।

পরামর্শ স্থির করে পরদিন ছিপনৌকায় কেষ্টদত্ত, রামচাঁদ ঘোষ ও পুরোহিত ঠাকুর দেশে ফিরে গেলেন। ষাটগাছায় আরম্ভ হল রাজাবাহাদুরের বাড়ী তৈরী ও হর্মাদ আক্রমণ প্রতিরোধের তোড়জোড়।

ষাটগাছার অধিবাসীদের অধিকাংশই হিন্দু কৃষক ও জেলে। তাদের উপাধি মণ্ডল, দাস, সর্দার, ঢালী, জাঠাদার। সর্দার, ঢালী, জাঠাদার,— এই তিনটি সেকেলে সামরিক উপাধি। যাঁরা লাঠি ও সড়কি নিয়ে যুদ্ধে

বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতেন, দেশের রাজা বা জনসাধারণ তাঁকে উপাধি দিতেন 'সর্দার বা সদ্দার'। এই রকম ঢাল, সড়কি ও রামদা নিয়ে যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য উপাধি হত 'ঢালী'। জাঠা চালানোর ওস্তাদীর জন্য উপাধি হত 'জাঠাদার'। বংশে কেউ এইরকম উপাধি পেলে তাঁর পরবর্তী বংশধরেরাও সে উপাধির মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

সেকালে বাংলার এই সামরিক জাতিগুলির সামরিক শক্তি এমন দুর্ধর্ষ ছিল যে, বৃটিশ আমলের পূর্বে কোনো রাজশক্তি সমগ্র বাংলা অধিকার করে শাসন করতে সক্ষম হন নি। মুসলমান আমলের কোনো কোনো মানচিত্রে দেখা যায়, সমগ্র বাংলা দিল্লীর অধীন হয়েছিল; কিন্তু ঐ তথ্য কাগজে লেখা ভূগোল ও ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ। বাস্তব ইতিহাসে ওরকম ব্যাপার কোনোকালেই ঘটেনি। বাংলা দেশের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর অঞ্চল বাইরের কোনো শক্তি অধিকার করে সেকালে বেশীদিন শাসন করতে পারেন নি।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, কোনো অজানা কাল থেকে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বহু স্থানে ছোটো-বড়ো বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাংলার সামরিক জাতিগুলিই ছিলেন সেই সব গণতন্ত্রের রক্ষক। প্রবল রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজতন্ত্রের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হলেও সুযোগ পেলেই বাঙালী আবার তাঁদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেন। মুসলমান আমলে বাংলার হিন্দু জমিদারগণ বাঙালী প্রজাসাধারণের এই গণতন্ত্রীমনোভাব মেনে নিয়ে সেই ভাবেই জমিদারী পরিচালনা করতেন। হিন্দু জমিদারের জমিদারীর মধ্যে সুবাদার-নিযুক্ত বিচারক কাজী বড়ো একটা ছিল না। জমিদার কাছারির নায়েব প্রজা মাতব্বরদের সহযোগিতায় বিচার-আচার চালাতেন। শেষের দিকে মুসলমান জমিদারগণও হিন্দুজমিদারদের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

বাঙালী কোনোকালেই একনায়কত্ব বা স্বৈর শাসকের শাসন নির্বিবাদে মেনে নেয় নি। বাংলা ও বাঙালী সুপ্রাচীনকাল থেকেই স্বৈর শাসকবর্গের চক্ষে একটা দারুণ বিভীষিকা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও প্রজাসাধারণের শাসন সংরক্ষণ নিয়ে বাংলার সুবাদারী শাসন-কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামান নি। সুবাদারী সরকার জমিদারদের নিকট থেকে যতটা পেরেছেন খাজনা-আবওয়াব আদায় করেই সরকারী কর্তব্য শেষ করেছেন। বাঙালী জনসাধারণ জমিদারদের অথবা গ্রাম্য মাতব্বরদের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে

দক্ষিণে রুখেছে হর্মাদ আক্রমণ, পূর্বে আসামের পার্বত্যজাতির আক্রমণ ও উত্তরে ভুটানী আক্রমণ। বাংলার পল্লীগীতিকা ও কাহিনীগুলিই বাংলার প্রকৃত ইতিহাস।

শিবশঙ্কর রায় যখন ঘাটগাছা এসে আশ্রয় নিলেন, তার তিন বছর পূর্বে ঘাটগাছায় হর্মাদ আক্রমণ হয়েছিল। সেবার তারা সারারাত লড়াই করে শেষে বেগতিক দেখে ফিরে যায়। এবার একঘর উচ্চবংশ জমিদার এসে বাসা বেঁধেছেন, এবং সেই পরিবারে সুন্দরী মেয়ে আছে শুনে হর্মাদ-বোম্বেটের দল বিশেষ তোড়জোড় করে আক্রমণ করতে পারে ভেবে, ঘাটগাছার হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

বড়ো রকমের হর্মাদ আক্রমণ হয় বর্ষাকালে। সে সময় বাদার নদী ও বড়ো খাঁড়িতে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কামানওয়ালা 'স্লুপ' জাহাজ ঢুকতে পারে। সেজন্য ঘাটগাছা খাঁড়ির জলে পাতা হল বহু তুরপিন, আর তীরে যেখানে জাহাজ ভেড়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে মাটির বুরুজ বেঁধে রামধনুক পাতা হল। খাঁড়ির ঘাটে ও গ্রামের পথে পাতা হল বাগবাঁশ। গ্রামের তিনদিকে চাষের মাঠ, মাঠের পরেই বাদাবন। আগে থেকেই বাদাবনের সীমানা হিংস্রজন্তুর ভয়ে 'ডাকাতে কাঁটা' গাছের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা ছিল। মধ্যে স্থানে স্থানে বাদাবনে যেতে যে পথ ছিল, সে পথ নানা জাতীয় কাঁটা দিয়ে বন্ধ করা হল। পূর্বাহ্নেই যাতে হর্মাদদের গতিবিধির সংবাদ পাওয়া যায় তার জন্য খাঁড়ির ভাটিতে পাঁচ মাইলের মধ্যে অনেকগুলি পাহারা ঘাঁটি স্থাপন করে বাঁশের 'খট্‌খটি'র সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হল। এক ঘাঁটি থেকে খট্‌খটির দড়ি টানলে আর এক ঘাঁটির খট্‌খটি বেজে ওঠে।

ঘাটগাছা গ্রামের মধ্যে কাঠের দোতলা বাড়ী তৈরী হয়ে গেলে জ্যৈষ্ঠমাসে শিবশঙ্কর রায় সেই বাড়ীতে উঠে গেলেন। বজরায় থাকলেন গুরুচরণ মাঝি ও জেলে মাল্লারা।

আষাঢ় শ্রাবণ দুইমাস হর্মাদদের দেখা গেল না। ভাদ্র মাসে একদিন জেলেরা মধুমতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দেখল, কয়েকখানা মঘ-বোম্বেটের নৌকা ঘাটগাছা খাঁড়ির ভাটি মোহনায় জলের গভীরতা মাপছে। সংবাদ পেয়ে

সকলে বুঝলেন, হর্মাদ আক্রমণ আসন্ন, এবং তারা সম্মুখে অমাবস্যার বড়ো জোয়ারে কামান-বন্দুকওয়ালা স্লুপ জাহাজ নিয়ে আক্রমণ করবে।

গ্রামের মাতব্বর প্রধানেরা পরামর্শ করে আক্রমণ প্রতিরোধের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললেন। কামানের গোলায় ঘরবাড়ী ভেঙ্গে জিনিসপত্রের ক্ষতি ও গরুবাছুর মারা যেতে পারে। তারজন্য বাদাবনের ভিতরে নিরাপদ স্থানে সেগুলি সরানোর ব্যবস্থা করা হল। শিবশঙ্কর রায়ের বজরা পাঠানো হল খাঁড়ির উজানে একটা খালের মধ্যে।

অমাবস্যার দিন জেলেরা এসে সংবাদ দিল দুইখানা বোম্বেটে স্লুপ ও অনেকগুলি নৌকা এসে জমা হয়েছে মধুমতীর পূর্বপারে। সংবাদ পেয়ে সকলেই বুঝলেন রাত্রে বড়ো জোয়ারের মুখে আক্রমণ হবে।

সন্ধ্যা হতেই গ্রামের মাতব্বর ও যুদ্ধে সক্ষম পুরুষ ছাড়া আর সকলকে পাঠানো হল বনে নিরাপদ স্থানে। তাদের সঙ্গে গেলেন আতুফকির ষাটগাছার বাওয়ালী। বাওয়ালী সঙ্গে থাকলে বাঘ, সাপ ও বিছার ভয় থাকে না। মাতব্বররা শিবশঙ্কর রায়কেও সপরিবারে বাওয়ালীর সঙ্গে যেতে বললেন, কিন্তু তিনি তা গেলেন না। সন্ধ্যা হতেই শিবশঙ্কর রায় তাঁর কৌলিক সামরিক পোশাক প'রে কোষে তলোয়ার হাতে বর্শা নিয়ে উপস্থিত হলেন আতুফকিরের দরগায় মাতব্বর-প্রধানদের ঘাঁটিতে। তাঁকে পেয়ে সকলেই খুব উৎসাহিত হলেন।

হরসুন্দরী বাওয়ালীর সঙ্গে গেলেন না। তিনি বাড়ীতেই থাকলেন দেখে বিশ্বেশ্বরীও থেকে গেলেন। তিন মেয়ে ও রামশঙ্কর গেল বাওয়ালীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা ঘোর হতেই মাতব্বরদের ঘাঁটিতে খট্‌খটি বেজে সঙ্কেত করল, বোম্বেটে জাহাজ মধুমতী পার হয়ে খাঁড়ির মোহনার দিকে এগিয়ে আসছে। রাত একপ্রহরে জোয়ার আরম্ভ হতেই খট্‌খটি বেজে সংবাদ দিল, বোম্বেটেদের তিনখানা স্লুপ জাহাজ ও বহুনৌকা খাঁড়িতে প্রবেশ করেছে। তারপর একের পর এক সংবাদ আসতে লাগল, তিনখানা স্লুপের দুইখানা ছোটো, একখানা বড়ো। ছোটো স্লুপে কামান দেখা যায় না, বড়ো স্লুপে কামান আছে। মঘ-বোম্বেটে নৌকা বাইশখানা। বাইশখানা নৌকার চারখানা ছিপ, আর সব 'কোশা'। বড়ো স্লুপ আগে চলেছে। ছিপ চারখানা জলে দড়ি ফেলে তুরপিন খুঁজছে। এই সব সংবাদ খট্‌খটির নানা ধরনের আওয়াজে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হবার জন্য মাতব্বর-প্রধানরা যোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন।

সন্ধ্যা হতেই গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেছে, কেবলমাত্র শিবশঙ্কর রায়ের বাড়ীতে

আছেন হরসুন্দরী আর বিশ্বেশ্বরী। হরসুন্দরী তাঁর পূজাঘরে বসে জপ করছেন। ঘরের বাইরে দরজার কাছে বসে আছেন নীরব বিশ্বেশ্বরী।

রাত তখন একপ্রহর অতীত হয়ে গেছে। হঠাৎ বিশ্বেশ্বরী শব্দ পেলেন, কে যেন সিঁড়ির ওপরে উঠে আসছে। বিস্মিত হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাতেই অন্ধকারে দেখলেন একটি মেয়ে আসছে। কাছে এলে চিনলেন মেয়েটি সৌদামিনী।

এ কি! তুমি বাওয়ালীর সঙ্গে যাও নি?—প্রশ্ন করলেন বিশ্বেশ্বরী।

সৌদামিনী গড় হয়ে প্রণাম করে কাছে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—না মা, আমি যাই নি।

কেন গেলে না! শুনছি বোম্বেটেদের সঙ্গে কামান বন্দুক আছে।

যাদের জীবনের দাম আছে, বেঁচে থাকা যাদের প্রয়োজন, তারা বাওয়ালীর সঙ্গে গেছে। আমার তো সে সব কিছু নেই মা।

তবুও অপঘাতে কেন জীবন দেবে?

না মা, এ আমার কাছে অপঘাত নয়। তিনবছর আগে এমনি এক রাতে ঐ বোম্বেটেদের কামানের গোলায় আমার বুকের মানিক হারিয়ে গেছে। আজ আমি ওদের গোলা বুক পেতে নেব।

সৌদামিনীর কথায় বিশ্বেশ্বরী আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠল।

মা, আমার মনে আজ দুঃখ এই যে, আমি লড়াই করতে জানি নে। লড়াই করে ওদের একটাকেও যদি ঘায়েল করে মরতে পারতাম, তবে আজ এটা আমার শুভদিন হত। মা, আপনি আশীর্বাদ করুন আজ যেন আমি স্বামীর কাছে যেতে পারি।—বলে আবার প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে সৌদামিনী চলে গেল।

অশ্রুভারাক্রান্ত বিশ্বেশ্বরীর মনে পড়ল কল্যাণীর কথা। সেবার বিজয়া-দশমীতে বিষ্ণুশঙ্করের মুখে সেই মর্মান্তিক কথা শুনে কল্যাণী বায়না ধরেছিল, সে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে। তার আগ্রহ দেখে সকলেই মত দিয়েছিলেন, কেবল বিশ্বেশ্বরীর অমতের জন্য সে যুদ্ধ শিখতে পারে নি। যদি শিখতো তবে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেই মরতো, এমন করে আগুনে পুড়ে মরতো না।

রাত দুপুরে পুরো জোয়ারে এসে গেল বোম্বেটেদের জাহাজ ও নৌকা। জাহাজ থেকে চলতে থাকল কামান-বন্দুকের গোলা-গুলি। ছিপ ও কোশায় মগ-বোম্বেটেরা চালাতে লাগল ধনুকে তীর। এদিক থেকেও কায়দামতো

চলতে থাকল জাঠা, তীর ও বাগবাঁশ। দরগার কাছে বুরুজের আড়ালে থেকে মাতব্বর-প্রধানেরা খট্‌খটির সাহায্যে কোথায় কি হচ্ছে শুনে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

ইয়া আল্লা, বড়ো স্লুপ বোধহয় ঘায়েল হয়েছে।

ওখানে জলের নীচে পাঁচটা তুরপিন আছে।

দোহাই ঠাকুর কালোমানিক, তিনটে তুরপিন লেগে যাস।

তিনটে বোধহয় লাগে নি, একটা লেগেছে।

তাই হবে, স্লুপ খাঁড়ির ওপারে যাচ্ছে।

ওপারে কি তুরপিন নেই?

আছে বৈকি। কায়দামতো লাগা চাইতো।

দোহাই ঠাকুর দক্ষিণ রায়, ওপারে যদি ওরা ডাঙ্গায় নামে, তবে তোমরা ওদের ঘাড় মটকাবে।

রাত তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল, হর্মাদরা ষাটগাছার ঘাটে নামতে পারল না। তাদের বড়ো স্লুপ তুরপিনে ঘায়েল হয়ে খাঁড়ির ওপারে গিয়ে মেরামত হচ্ছে। আর দু'দণ্ড পরেই ভাটায় জোর হলে তখন বাধ্য হয়ে বোম্বেটেদের পালাতে হবে।

খট্‌খটি বেজে উঠল, সতীমায়ের ঘাটে স্লুপ ভিড়তে চেষ্টা করছে। কুড়িখানা জাঠা পাঠাও।

মাতব্বর-প্রধানেরা সকলেই বৃদ্ধ। দুই বুড়ো দুই বোঝা জাঠা কাঁধে তুলতেই শিবশঙ্কর রায় এগিয়ে এসে তাঁদের হাত থেকে জাঠার বোঝা নিলেন নিজের কাঁধে। হঠাৎ কোথা থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে জাঠার বোঝা নিয়ে ছুটল সতীমায়ের ঘাটে বুরুজের দিকে।

কে লোকটা?

চিনতে পারলাম না।

লোকটা তো এখানকার কেউ নয়!

লোকটা বুরুজ থেকে এসেছে।

পরণে তো দেখলাম সাদা লুঙ্গি। ও বুরুজে তো মুসলমান কেউ নেই!

ঐ দেখ, বোঝা নিয়ে ছুটছে।

ইয়া আল্লা, বন্দুকের গুলি লেগে যে, পড়ে গেল।

ঐ যে আবার উঠে বোঝা নিয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছে, কিন্তু জোরে যেতে পারছে না, জখম হয়েছে।

হে হরিঠাকুর, হে মা দুর্গা, লোকটা যেন জাঠা নিয়ে পৌছতে পারে।

হায় হায় আবার গুলি লেগেছে।

উঠতে চেষ্টা করছে। নাঃ, উঠতে পারল না, পড়ে গেল।

ঐ যে একটা লোক বুরুজ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, জাঠা বুরুজে পৌছে গেল।

খোদা, তোমারই কুদ্রত।

জাঠা বুরুজে পৌছে গেল। সতীমায়ের ঘাট দরগা থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে। দরগার বুরুজ থেকে ঘাটের সব দেখা যায়। মাতব্বর-প্রধানরা দেখলেন, যে স্লুপখানা ঘাটে ভিড়তে চেষ্টা করছিল, সেখানা খাঁড়ির ওপারে যেতে চেষ্টা করছে। একটু পরেই বুঝা গেল স্লুপখানা ডুবে যাচ্ছে।

পুব আকাশ লাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাঁড়ির জলে জোর ভাটা ধরল। এদিকে ঘায়েল ছোটো স্লুপের বোম্বেটেরা বিপদ বুঝে সেখানা ছেড়ে উঠল নৌকায়। তারপর বড়ো স্লুপ ও আর একখানা ছোটো স্লুপের সঙ্গে মঘ-বোম্বেটেরাও ভাটার টানে খাঁড়ি বেয়ে দক্ষিণে চলে গেল।

পাহারা ঘাঁটি থেকে খট্‌খটিতে সংবাদ আসতে লাগল, পনরোখানা নৌকা আর দু'খানা জাহাজ ফিরে যাচ্ছে। সাতখানা নৌকা, তার মধ্যে তিনখানা ছিপ ও চারখানা কোশা দেখা যাচ্ছে না। সংবাদ পেয়ে মাতব্বররা সব বুরুজ ও ঘাঁটিতে নির্দেশ দিলেন আরও দু'দণ্ড থেকে দেখতে হবে, কোনো বোম্বেটের নৌকা লুকিয়ে আছে কিনা।

দু'দণ্ড পরে মাতব্বর-প্রধানেরা বুরুজ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই দেখতে গেলেন সেই লোকটিকে, নিজের জীবন দিয়ে ষাটগাছা রক্ষা করেছে। মৃতের কাছে গিয়ে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন, সে ষাটগাছার গোপাল ঢালীর বিধবা মেয়ে সৌদামিনী। একটা গুলি লেগেছে উরুতে, আর একটা লেগেছে পেটে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন বিশ্বেশ্বরী।

শরতের নির্মল প্রভাত। সতীমায়ের ঘাটে বসে আছেন বিশ্বেশ্বরী। বিশ্বেশ্বরীর কোলে মৃত সৌদামিনী। সৌদামিনীর মুখে অপূর্ব প্রশান্তি, যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই চিরনিদ্রিত শান্ত মুখমণ্ডলে পড়ছে প্রভাতী ফুলের ওপরে পাতাঝরা শিশিরবিন্দুর মতো বিশ্বেশ্বরীর চোখের জল। শ্রদ্ধানত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন শিবশঙ্কর রায়, হিন্দু মুসলমান মাতব্বর-প্রধানগণ, আর সব বীর যোদ্ধা।

আশ্বিনমাসে শিবশঙ্কর রায় ষাটগাছার হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের উৎসাহে নিজের কৌলিক দুর্গাপূজার আয়োজন করলেন। ভাটিয়াপাড়ার বিপিনমুদী ফর্দমতো পূজার দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন। মহালয়ার দুদিন পূর্বে পুরোহিত এসে অমাবস্যা তিথিতে শিবশঙ্কর রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ অপকর্ষে সমাপ্ত করে তাঁকে পূজক করেই পূজা করালেন।

বিশ্বেশ্বরী তাঁর বড়ো দুই মেয়ে নিয়ে পূজার তিনদিন ভোগ রেঁধে সন্ধ্যাবেলা ষাটগাছার সকলের হাতে প্রসাদ দিলেন। শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরীর ব্যবহারে ষাটগাছার সকলে বলাবলি করতে লাগল, সাক্ষাৎ শিব-দুর্গা কৈলাস ছেড়ে ষাটগাছায় এসে বাস করছেন।

বিজয়া দশমীর পরদিন হরসুন্দরী পুরোহিত ও শিবশঙ্করকে ডেকে এনে বললেন, আগামী দীপান্বিতা অমাবস্যায় তিনি কল্যাণীর চিতার পাশে কালীপূজা করাবেন। এখন থেকে সেই আয়োজন করতে হবে।

হরসুন্দরীর প্রস্তাব শুনে পুরোহিত থেকে গেলেন। রামচরণ ঘোষ ছিপ নৌকায় গেলেন ভাটিয়াপাড়া। হরসুন্দরী দেবীর নির্দেশে সতীমায়ের চিতার পাশে দীপান্বিতায় কালীপূজা হবে শুনে ভক্ত বৈষ্ণব বিপিন মুদী নিজে সব দ্রব্যাদি নিয়ে, এলেন ষাটগাছা।

পূজার দিন অপরাহ্নে হরসুন্দরী ডেকে পাঠালেন, পুত্র শিবশঙ্কর, পুরোহিত, রামচরণ ঘোষ, বিপিনমুদী, আতুফকির ও গুরুচরণ মাঝিকে। সকলে উপস্থিত হলে হরসুন্দরী বললেন,—

আমার মনে হয় বাসুদেবপুরের রায়বংশ ভবিষ্যতে আর জমিদার হবে না। তাদের অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। আমার ইচ্ছা সেই উপায়টি যেন সম্মানজনক ও পরোপকারী হয়। সে রকম কোনো প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ করতে আপনারা শিবু ও বউমাকে উৎসাহ দেবেন। মনে রাখবেন, দশজনের উপকার করতে পারলেই প্রকৃত সম্মান পাওয়া যায়।—

আর একটা আমার নিজের কথা বলি। বিষ্ণু ও কল্যাণী বড়ো কামনা বাসনা নিয়ে এ সংসার ছে—'। হরসুন্দরী আর বলতে পারলেন না, কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

এত বড়ো বিপদে এতগুলি শোকাবহ ঘটনায় কেউ তাঁকে বিচলিত হতে বা চোখের জল ফেলতে দেখেননি। সকলে ভেবেছিলেন, হরসুন্দরী সাধনবলে শোকদুঃখের অতীত হয়ে গেছেন। এখন বুঝলেন. মা মা-ই। মাতৃস্নেহের কাছে সাধনলব্ধ জ্ঞান চিরপরাজিত।

হরসুন্দরী নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—

আজ রাত্রে পূজা শেষে আমি কল্যাণীর চিতার পাশে বসে জপ আরম্ভ করব। সেই সময়ে আপনারা আমার জপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিনাম কীর্তন করবেন।

কালীপূজা শেষ হতে ভোর হয়ে গেল। পূজা শেষে হরসুন্দরী বসলেন জপে বাইরে বিপিন মুদীর নেতৃত্বে গ্রামের মাতব্বররা আরম্ভ করলেন কীর্তন।

অপরাহ্নে হরসুন্দরীর কথা ও ভাবভঙ্গী দেখে বিশ্বেশ্বরী খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পূজা শেষে আর প্রসাদ বিতরণ করতে গেলেন না। প্রসাদ বিতরণের ভার শিবশঙ্কর ও বড়ো মেয়ে লক্ষ্মীর ওপরে দিয়ে বিশ্বেশ্বরী গিয়ে বসলেন জপমগ্ন হরসুন্দরীর কাছে।

বেলা একপ্রহর হয়ে গেল, হরসুন্দরীর জপসমাধি ভাঙ্গল না। বিশ্বেশ্বরী উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তিনি লক্ষ্য রাখলেন শাশুড়ীর বুকের দিকে। বেলা দ্বি-প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল, হরসুন্দরীর বুকের স্পন্দন যেন আর বোঝা যাচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে বিশ্বেশ্বরী পেঁজা তুলা ধরলেন নাকের কাছে; নাঃ, তুলা নড়ে না। এবার সাহস করে গায়ে হাত দিয়ে বিশ্বেশ্বরী কেঁদে উঠলেন, মা আমাদের ছেড়ে গেছেন।

পরম বিস্ময়ে থেমে গেল কীর্তন। শিবশঙ্কর মায়ের চরণে লুটিয়ে বালকের মতো কেঁদে উঠলেন; মা, তুমিও আমাকে ছেড়ে গেলে!

সংবাদ পেয়ে দরগা থেকে ছুটে এলেন আহ্ফকির। ব্যাপার দেখে ফকির বললেন,—আপনারা কীর্তন থামাবেন না, কীর্তন চলুক। এই ঘাটে আমরা দেখেছি, ষাটগাছা রক্ষার জন্য আমাদেরই মেয়ে সৌদামিনীর জীবন দান। আজ এই ঘাটেই আমরা দেখলাম, মহাযোগিনীর দেহত্যাগ। এই ঘাট মহা-পুণ্য-তীর্থ। আপনারা আবার কীর্তন আরম্ভ করুন। মহাযোগিনী মায়ের শেষ কাজ পর্যন্ত দরগায় অখণ্ড নামাজের জন্য আমি মোমিন ভাইদের ডাকছি।

আবার কীর্তন আরম্ভ হল, দরগায় চলল নামাজ। সন্ধ্যায় বিসর্জনের জন্য প্রতিমা উঠলেন নৌকায়; ওদিকে ষাটগাছা খাঁড়ির তীরে জ্বলে উঠল, বাসুদেবপুরের শেষ ব্রাহ্মণ জমিদারগৃহিণী হরসুন্দরীদেবীর চিতা।

তখনও সতীমায়ের ঘাটে চলছে মহা নামকীর্তন, দরগায় চলছে অখণ্ড নামাজ।

এনায়েতুল্লা খাঁ ঢাকা গিয়ে নিজের বাড়ীতে উঠলেন। ঢাকার শ্রেষ্ঠ

কবিরাজ ডেকে রোগিণী দেখিয়ে আরম্ভ করলেন চিকিৎসা। উপযুক্ত চিকিৎসায় ছ'মাসের মধ্যে রোগ দূর হলে এনায়েত খাঁ মেয়েটিকে সাদী করলেন। তারপর আরও ছ'মাস ঢাকায় থেকে বেগমসাহেবাকে নিয়ে 'ভাওয়ালী পিনেস'-এ নদী পথে যাত্রা করলেন দেশে।

ভাটিয়াপাড়া ছাড়িয়ে মধুমতী পার হয়ে পিনেস ভৈরব নদে প্রবেশ করল। এনায়েত খাঁ দেখলেন, ভৈরবের মোহানায় বহু জেলে মাছ ধরছে। তাদের মধ্যে দু'একজন চেনা মুখও দেখা যায়। দেখে জমিদার পিনেস থামাতে হুকুম দিলেন।

পিনেস থেমে নোঙর করলে এনায়েত খাঁর হুকুমে পিনেসের পিছনে বাঁধা ছোটো নৌকা খুলে দুজন বরকন্দাজ গেল সেই চেনা জেলে ক'জনকে ডাকতে। জেলেরা জমিদারের তলব শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে সেলাম জানিয়ে কয়েক হালি ইলিস মাছ ভেট দিল। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে বিস্মিত এনায়েত খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এ রকম করছেন কেন? আপনারা তো আমার পরিচিত।

হুজুর, আমরা জেলে মানুষ; হুজুরের সম্মান কেমন করে রাখতে হয় তা জানতাম না বলে সেবার বেয়াদবি হয়ে গেছে।—উত্তর দিলেন একজন জেলে মাতব্বর।

আপনারা এত দূরে মাছ ধরতে এসেছেন কেন, ওদেশে কি মাছ নেই?

হুজুর আমরা এখানেই বাড়ী করেছি।

এখানেই বাড়ী করেছেন! তাহলে কি আপনারা দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন?

হাঁ, হুজুর।

কেন দেশ ছাড়লেন?

দেওয়ান সাহেব হাতি দিয়ে আমাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন।

হাতি দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন! আপনারা কি অন্যায় করেছিলেন?

হুজুরের বরাদ্দ খাজনা-আবওয়াব আমরা দিতে পারি নি।

বরাদ্দ খাজনা-আবওয়াব কত?

মাথা পিছু পাঁচপণ খাজনা আর আটপণ আবওয়াব।

আগে দিতেন কত?

আমাদের কাছে কোনো আবওয়াব আগের জমিদার তলব করতেন না। আমরা মাথাপিছু একপণ কড়ি খাজনা দিয়ে সারাবছর দুই জমিদারের জলায় জাল বাইতাম।

রাজনারায়ণপুরের আর সব প্রজা কেমন আছেন ?

হিন্দুপ্রজা সব গ্রাম ছেড়ে গেছে।

জমিদার বাড়ীর পাশে শিবমন্দিরের পুরোহিত আছেন কি ?

ঠাকুর নিয়ে পুরোহিত অন্যগ্রামে গেছেন। শিবমন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

আচ্ছা, আমি সব বুঝেছি। এখন আমি আপনাদের মনের কথা শুনতে চাই। এরপর যদি আমার জমিদারীতে আর কোনো অত্যাচার না হয়, আপনাদের ঘরবাড়ী যদি আমি বেঁধে দি, তবে আপনারা দেশে ফিরে যাবেন কিনা ?

হুজুর, বাপঠাকুরদার ভিটের মায়া কেউ ত্যাগ করতে পারে না।

বেশ, তাহলে আপনারা সকলে একমাস পরে রাজনারায়ণপুর গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

হুজুর, ও গ্রামের নাম এখন হয়েছে সুলতানপুর।

বাসুদেবপুর ঠিক আছে তো ?

আজ্ঞে, না হুজুর। বাসুদেবপুরের নাম হয়েছে হোসেনপুর।

আচ্ছা, তা হোক। মানুষেই গ্রামের নাম দেয়, মানুষেই সে নাম পাল্টাতে পারে। কিন্তু তার মাটি আর প্রাচীন ইতিহাস কেউ লোপ করতে পারে না। আপনারা বসুন, আমি ভিতর থেকে আসি।—বলে এনায়েত খাঁ পিনেসের ভিতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে এনায়েত খাঁ একজন খানসামা সঙ্গে করে ফিরে এলেন। খানসামার হাতে রুপোর বাটায় সুগন্ধী পান আর পাঁচটি রূপার তঙ্কা। খানসামা বাটাখানা জেলে মাতব্বরদের সম্মুখে রাখলে এনায়েত খাঁ বললেন,—

আপনারা আমার জমিদারীর মাতব্বর প্রজা। আপনারা আপনাদের সাধ্যমত আমাকে ইলিসমাছ ভেট দিয়েছেন। আমার দিক থেকেও আপনাদের সম্মান রক্ষাকরা কর্তব্য। বাটার পান আপনাদের সম্মান। আপনাদের মুখে যেসব কথা শুনলাম, তাতে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। সেই উপকারের পারিতোষিক তঙ্কা পাঁচটি আপনারা গ্রহণ করুন।

এনায়েতুল্লা খাঁর পিনেস বেলা দুপুরে এসে পৌছল রাজনারায়ণপুরের নয়া নাম সুলতানপুর গ্রামের উপকণ্ঠে। দেওয়ান হোসেন সাহেব জমিদারের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে ঘাট তৈরী করে হাতি ও তাঞ্জাম সাজিয়ে বহু লোক-

লস্কর-কর্মচারী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। লাল পরদা দিয়ে ঘেরা ঘাটে পিনেস ভিড়লে দেওয়ান সাহেব নবাবী কায়দায় জমিদারের অভ্যর্থনা করলেন।

জমিদারের অভ্যর্থনার জন্য দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে অনেকগুলি কর্মচারী এসেছেন। এনায়েত খাঁ লক্ষ্য করলেন কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র সদর নায়েব বৃদ্ধ হরিদাস চক্রবর্তী ছাড়া আর সব তাঁর অপরিচিত মুসলমান।

দেওয়ান সাহেব জমিদারকে হাতিতে উঠতে অনুরোধ করলেন। তিনি না উঠে সকলের সঙ্গে হেঁটেই চললেন। বেগম সাহেবা গেলেন পরদা ঢাকা তাঞ্জামে।

বাড়ীর সম্মুখে এসে এনায়েত খাঁ দেখলেন, সিংহদ্বারের সিংহ দুটি নেই। সেখানে গম্বুজ করা হয়েছে। কাছারি বাড়ী অতিক্রম করে পূজাবাড়ীতে দেখলেন, চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙ্গে করা হয়েছে মসজিদ, নাটমন্দির ভেঙ্গে সেখানে হয়েছে পাতাবাহার ও ফুলের বাগান। অন্দর মহলে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখলেন, আগের সেই বড়ো দরজার সোজাপথ বন্ধ করে ছোটো একটা দরজা দিয়ে ঢুকে তিনখানা ছোটো অন্ধকার ঘর ঘুরে ওপরতলার সিঁড়ি পেতে হল। ওপরতলায় উঠে দেখা গেল, ভিতর দিকের বারান্দা কাঠের ঝরকা ও বাঁশের চিক্ দিয়ে ঢাকা। ঘরগুলির বাইরের জানলা ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দু'হাত ওপরে দেওয়ালের গায় কাটা হয়েছে ছোটো ছোটো ঘুলঘুলি।

অপরাহ্নে জমিদার এনায়েতুল্লা খাঁ গিয়ে বসলেন কাছারি বাড়ীর খাস কামরায়। জমিদার খাস কামরায় এসেছেন শুনে দেওয়ান সাহেব এলেন দেখা করতে। জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন—

জমিদারী চলছে কেমন?

চলছে ভালোই, তবে কোনো কোনো মহলে হিন্দু মাতব্বরদের কারসাজিতে কিছু কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে।

হিন্দুরা এরকম করছে কেন?

তারা মুসলমান জমিদার হুজুরকে মানতে চায় না।

খাজনা আদায়-ওয়াশীল হচ্ছে কি রকম?

খাজনা আদায় একরকম হয়, কিন্তু বরাদ্দ আবওয়াব নিয়েই যত গোলমাল।

পুরনো কর্মচারী-আমলারা আছে কি?

এই সদর নায়েব আর কিছু পাইক বরকন্দাজ ছাড়া আর কোনো হিন্দু আমলা নেই।

তাঁরা চাকরি ছেড়ে গেলেন কেন ?

ওরা সব বেইমান। ওরা গোপনে গোপনে হুজুরের বিরুদ্ধে মাতব্বরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রজা খেপাচ্ছিল।

সদর নায়েব চক্রবর্তীকে রেখেছেন কেন ?

লোকটা জমিদারী সেরেস্তার কাজে পাকা। ওর কাছে আর সব আমলারা কাজ শিখছে। ওর ওপরে আমি কড়া নজর রেখেছি, কাজ শেখা হলেই তাড়াব।

আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন।

দেওয়ান সাহেব চলে গেলে এনায়েত খাঁ ডেকে পাঠালেন সদর নায়েব হরিদাস চক্রবর্তীকে। নায়েব এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালে এনায়েত খাঁ নিজের কাছে একখানা আসন দেখিয়ে বললেন—এইখানে আমার কাছে বসুন, অনেক কথা আছে।

নায়েব বসলে জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন—সব পুরনো কর্মচারী বরখাস্ত করা হয়েছে, আপনি আছেন কেন ?

জমিদারের প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ নায়েব হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি উত্তর দিতে ইতস্তত করছেন দেখে জমিদার বললেন—

আপনি ভয় করবেন না। আপনার কাছে আমি সঠিক খবর পেতে চাই।

সকলেই যে বরখাস্ত হয়েছে, তা নয়। অনেকে নিজের ইচ্ছায় কাজ ছেড়েছেন।—উত্তর দিলেন নায়েব।

নিজের ইচ্ছায় কাজ ছাড়লেন কেন ?

দেওয়ান সাহেবের হুকুম মতো কাজ করা তাঁদের পোষায় নি।

আপনি আছেন কেন ?

হুজুর নিজে ডেকে এনে আমাকে কাছারিতে বসিয়েছিলেন, সেই জন্য এ পর্যন্ত আছি। এখন হুজুর এসেছেন। আমার দায়িত্ব ফুরিয়েছে। আগামীকাল আমার চাকরির ইস্তাফা হুজুর মঞ্জুর করবেন।

যতদিন আমি আপনাকে বিদায় না দেব ততদিন আপনি চাকরিতে ইস্তাফা দিতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আজ এখন আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব। কাল সকালে এসে খাস কামরায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

হুজুর, আমি তো সকালের দিকে কাছারিতে আসি নে।

কেন আসেন না ?

সকালের দিকে কয়েদীদের চাবুক মারা হয়। এই বুড়ো বয়সে ওদের কান্না আর সহ্য হয় না।

চাবুক মারা হয়! কেন, কি অপরাধে চাবুক মারা হয়?

সে সব আমি কিছুই জানিনে, জানতে চেষ্টাও করিনে।

আপনি গিয়ে দেওয়ান সাহেবকে ডেকে দিন তো।

দেওয়ান সাহেব বাড়ী চলে গিয়েছেন।

তাঁর বাড়ী আবার কোথায়?

হোসেনপুরের জমিদার বাড়ীতে দেওয়ান সাহেব থাকেন।

তাঁর বিবিরা এসেছেন নাকি?

না, তাঁরা আসেন নি। শুনছি দেওয়ান সাহেব সে সব বিবি তালাক দিয়ে এইদেশী মেয়ে সাদী করবেন।

আচ্ছা, আপনি গিয়ে কাছারি থেকে কয়েদখানার আসামীদের নথি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

এসব আসামীদের কোনো নথি নেই। এদের 'হাজিরা বিচার' হয়।

তা হলে আপনি কাছারিতে গিয়ে হুকুম দিন, আগামীকাল সকালে আমি কাছারিতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যেন কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়া না হয়।

হুজুর, এ হুকুম জারি করার অধিকার আমার নেই। সদর নায়েব তমিজুদ্দিন সাহেবকে তলব দিলে কাজ হবে।

সদর নায়েব তাহলে আপনি নন!

না হুজুর। আমি কাছারিতে বসে নতুন আমলাদের সেরেস্তার কাজ বুঝাই।

আচ্ছা আপনি যান। কাল সকালে আমি আপনাকে এই খাসকামরায় উপস্থিত চাই।

চক্রবর্তী চলে গেলে জমিদার তলব করলেন তমিজুদ্দিন সাহেবকে। 'চাপরাসি-নকিব' ঘুরে এসে জানাল, তমিজুদ্দিন সাহেবও বাড়ী গেছেন।

রাজনারায়ণপুরের জমিদারী যেভাবে এনায়েত খাঁর হাতে এসেছে তাতে তিনি খুশী হতে পারেন নি, বরং মনে আঘাতই পেয়েছিলেন। তারপর কালীনারায়ণ চৌধুরীর মেয়েকে হঠাৎ হাতে পেয়ে তাঁর মনের অশান্তি অনেকখানি দূর হয়। মেয়েটি সুস্থ হয়ে সাদী কবুল করলে এনায়েত খাঁর মনের গ্লানি দূর হল। বেগম সাহেবার ব্যবহারেও তিনি সুখী হয়েছিলেন।

প্রায় চোদ্দমাস পরে বেশ খুশীমনে এনায়েত খাঁ ফিরছিলেন তাঁর জমিদারীতে। পথে ভৈরবের মোহানায় জেলেদের মুখে যা শুনলেন, তাতে তাঁর মনের আনন্দ সরে গিয়ে সেখানে এল দুশ্চিন্তা। তারপর জমিদারবাড়ীর অবস্থা দেখে মনে মনে বুঝে নিলেন, এ পরিবর্তন না করে উপায় নেই। হিন্দুবাড়ীর ঘরদুয়ার ও মহল, আর সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাড়ীর ঘরদুয়ার মহল একরকম হতে পারে না। খাস কামরায় বসে দেওয়ান সাহেবের মুখে জমিদারীর অবস্থা যা শুনলেন, ব্যাপার যদি ঐ রকমই হয়ে থাকে তবে দেওয়ানের কাজ ও ব্যবস্থা সঙ্গতই হচ্ছে। কিন্তু এনায়েতুল্লার মনের ফ্যাসাদ জমাট বেঁধে দিয়ে গেলেন হরিদাস চক্রবর্তী। তাঁর বেড়াতে যাওয়া আর হল না, ভাবতে ভাবতে গেলেন জেনানা মহলে।

ভাবনা চিন্তায় রাত্রে এনায়েত খাঁর ঘুম হল না। প্রভাতে উঠে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নামাজ পড়ে কিছু নাস্তা খেয়ে গেলেন খাস কামরায়। গিয়ে দেখলেন চক্রবর্তী হাজির নেই। জমিদার ভাবলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এত সকালে আসতে পারেন নি, একটু বেলা হলে আসবেন। ততক্ষণ সদর নায়েব তমিজুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করবেন ভেবে তাঁকে সংবাদ দেওয়ার জন্য নকিব-চাপরাসি ডাকলেন। নকিব এসে কুর্নিশ করলে, জিজ্ঞাসা করলেন—

সদর নায়েব কাছারিতে হাজির হয়েছেন?

জি হুজুর।

তিনি এখন কি করছেন?

জি হুজুর, তিনি কয়েদী বাঁধাচ্ছেন।

কয়েদী বাঁধাচ্ছেন কি রকম?—চমকে উঠলেন জমিদার।

জি হুজুর, আজ যাদের চাবুক মারা হবে তাদের বাঁধা হচ্ছে।

জমিদার এনায়েত খাঁ উঠে গেলেন সদর কাছারি মহলে। গিয়ে দেখলেন, কাছারির সম্মুখে উঠানে দশটা মোটা কাঠের খুঁটি পোঁতা আছে। দুটো খুঁটিতে দুজনকে বাঁধা হয়ে গেছে, আর একটা খুঁটিতে আর একজনকে বাঁধা হচ্ছে। তিনজনের মধ্যে একজন চোদ্দ-পনরো বছরের বালক। কারও পরণে কোনো কিছু নেই।

এনায়েত খাঁ গিয়েই হুকুম দিলেন, 'খোলো এদের।' আসামী খোলা হলে বললেন, 'তোমরা এস আমার সঙ্গে'। জমিদার গিয়ে বসলেন সদর নায়েবের গদীতে।

দেওয়ান সাহেব খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। কাছারির আর সব আমলা,

গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ, সব জমিদারের সম্মুখে হাজির। সদর নায়েবকে জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন—

এই ছোক্‌রা কি করেছে?

হুজুর, ও কাল বিকালে হুজুরের জেনানা মহলের পিছনের বাগিচায় কাঁঠালগাছে উঠেছিল। বাগিচার গাছে উঠলে হুজুরের জেনানা মহলের ভিতরটা দেখা যায়।

এনায়েত খাঁ ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

তোমার নাম কি?

লতিফ।

গাছে উঠেছিলে কেন?

আমার বাপজান খুব গরীব। আমাদের কাঁঠাল গাছ নেই। হুজুরের বাগানের গাছে একটা বড়ো পাকা কাঁঠাল কাকে খাচ্ছিল। তাই আমি পাড়তে গাছে উঠেছিলাম। গাছটা বাগানের বাইরে।

তোমাদের বাড়ী কোথায়?

এই গ্রামেই।

তুমি যা করতে গিয়েছিলে, তাকে চুরিকরা বলে। পরের জিনিস না বলে নেওয়াই চুরি করা।

কাকে খাচ্ছিল যে?

তুমি তো আর কাক নও, তুমি মানুষ। আর কখনও এমন কাজ ক'রো না, কেমন?

নাঃ, আর আমি এমন কাজ করব না।

আজ বিকালে আমি ভৈরবের তীরে বেড়াতে যাব। তখন তুমি এস। তোমাকে দিয়ে ঐ গাছের কাঁঠাল পাড়ব। তুমি যে ক'টা কাঁঠাল নিতে পার নিয়ে যাবে।

বড়ো কাঁঠাল দু'টোর বেশী নিতে পারব না।

আচ্ছা তাই নিও। তোমার যখন কাঁঠাল বা অন্য ফল খেতে ইচ্ছা করে, আমার সঙ্গে দেখা করবে। খবরদার চুরি করবে না।

না হুজুর, আমি আর চুরি করব না।

আচ্ছা, এখন বাড়ী যাও।

ছেলেটি খুশীমনে সেলাম করে চলে গেল।

এ লোকটি কি করেছে?—তমিজুদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

এ লোকটি হুজুরের বাড়ীর সীমানার মধ্যে নৌকায় পাল উড়িয়ে যাচ্ছিল, থামতে হুকুম করলেও থামে নি। ধরতে গেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন পালিয়েছে, এই লোকটা ধরা পড়েছে।

তোমার নাম কি?—লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

গদু হলদার।—উত্তর দিল লোকটি।

বাড়ী কোথায়?

উত্তরে পদ্মার ধারে জলঙ্গী।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

মধুমতীতে ইলিস মাছ ধরতে।

থামতে বললে পালাতে চেষ্টা করেছিলে কেন?

হুজুর, আমরা প্রতিবছর এই পথে নৌকায় যাতায়াত করি। এখন যে এখানে পাল উড়িয়ে যাওয়া নিষেধ, তা শুনেছিলাম। কিন্তু তখন মনে ছিল না।

তোমার নৌকা কোথায় আছে?

হুজুর, তা জানি নে।

এর নৌকা কোথায় আছে?—তমিজুদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন এনায়েত খাঁ।

কাছারির ঘাটে বাঁধা আছে হুজুর।—উত্তর দিলেন তমিজ সাহেব।

নৌকার মালপত্র সব ঠিক আছে তো?

তা বোধহয় নেই।—উত্তর দিলেন নায়েব তমিজ সাহেব।

আপনারা এর নৌকা গ্রেফ্‌তার করলেন, আর নৌকার মালামাল ঠিক রাখলেন না!

হুজুর, এসব ব্যাপারে 'হুমুনে'র লুঠতরাজ ঠেকানো যায় না।

সে হুমুনের পাল বাইরের থেকে আসে নি, তারা এখানেই আছে। আজ দিনের মধ্যে সমস্ত মাল উদ্ধার করে একে দেবেন। যা পাওয়া যাবে না তার দাম ধরে হুমুনের পালের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে এর ক্ষতিপূরণ করবেন। এখন ওর খাওয়া পরার জন্য যা প্রয়োজন তা সব দিয়ে দেবেন।—এই হুকুম দিয়ে জমিদার গদুহলদারকে বললেন—তুমি এখন তোমার নৌকায় যাও। কাল সকালে এই সময় কাছারিতে এসে তুমি সব পেয়েছ কিনা আমাকে জানিয়ে যাবে।

গদুহলদার সেলাম করে চলে গেল।

এ লোকটি কি করেছে ?—জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

এ জমিদার সরকারে সেলামীর তঙ্কা না দিয়ে বিনা হুকুমে সওয়ারী ঘোড়া কিনেছে। জমিদার তরফ থেকে তলব দিলে হাজির হয় নি।—উত্তর দিলেন তমিজ সাহেব।

এর জন্য একে ধরে এনে কি শাস্তির হুকুম করেছেন ?

ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করে দশ তঙ্কা জরিমানা করা হয়েছে। যতদিন জরিমানার তঙ্কা জমা না দেবে, ততদিন কয়েদখানায় রেখে রোজ দু'ঘা চাবুক লাগানো হবে।

তোমার নাম কি ?—লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

হানিফ। আমার বাপজান মেহের সরদার।

বাড়ী কোথায় ?

বাসুদেবপুর।

দেখুন হুজুর, এই ছোকরা কি রকম বেয়াদব।—বললেন সদর নায়েব তমিজ সাহেব।

এর কথায় বেয়াদবি দেখলেন ?—প্রশ্ন করলেন জমিদার।

হুজুর জানতে চাইলেন ওর নাম। বাপজানের নাম বলে হুজুরকে জানাল যে, ও মস্তবড়ো সরদারের বেটা। হোসেনপুর নামটা ওর মুখেই আসে না।

হুঁ, এ একটা সত্যিকারের আসামীই বটে। তা দেখ হানিফ, তুমি এত বেয়াড়া হয়েছ কেন ?

আমরা ছিলাম রায় জমিদারের প্রজা। তাঁদের আমলে কোনো অত্যাচার অবিচার ছিল না। এখন নিত্যিনতুন আইন জারি করে দেশের মানুষ ধরে এনে, জরিমানা, জুতোমারা, চাবুকমারা, এইসব অত্যাচার চলছে।

দেখ হানিফ, 'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা' ঠিক নয়। জমিদারীতে বাসকরে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।

তা যদি হয় তবে আমরাও হিঁদুদের মত দেশ ছেড়ে চলে যাব।

বুঝতে পেরেছি তুমি সরদারের বেটা। আচ্ছা, আজ তুমি বাড়ী যাও, তিনদিন পরে তোমার বাপজানকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করবে।—তারপর নায়েবকে বললেন, হানিফের ঘোড়াটা দিয়ে দিন গিয়ে।

অপরাহ্নে জমিদার এনায়েতুল্লা খাঁ বেড়াতে বেরুলেন। জেনানা মহল

থেকে বেরিয়ে কাছারি বাড়ীতে এসে নায়েবের নিকটে খোঁজ নিয়ে শুনলেন সেদিন হরিদাস চক্রবর্তী কাছারিতে আসেন নি, কোনো সংবাদও দেননি।

জমিদার কাছারি থেকে বেরুতেই দুইজন বরকন্দাজ সঙ্গে চলল। তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

হুজুরের খিদমতে সঙ্গে যাচ্ছি। দেশে বহু দুশমন লোক আছে। তারা দুশমনি করতে পারে।

কে তোমাদের বলেছে আমার সঙ্গে যেতে ?

দেওয়ান সাহেব বলেছেন।

আচ্ছা তোমরা ফিরে যাও, আমার সঙ্গে আসতে হবে না।

বরকন্দাজ দু'জন ফিরে গেলে এনায়েত খাঁ সদর দরজায় এসে দেখেন বাইরে লতিফ আর গদু হলদার দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে দু'জন সেলাম দিল।

তোমার সব ফিরে পেয়েছে ?—গদুকে জিজ্ঞাসা করলেন এনায়েত খাঁ।

আজ্ঞে হুজুর, পেয়েছি।

হিসাব মত সব পেয়েছ তো ?

আজ্ঞে হুজুর দশহালি ইলিস কুটে নুন দিয়ে রেখেছিলাম, সেইটে পায়নি। তা কর্তাসাহেবরা খেয়ে ফেলেছেন, তা খান। আমাদের মাছ অনেকেই খায়।

দশ হালি মাছের দাম তোমাদের দেশে কত হবে ?

আজ্ঞে হুজুর চার-পাঁচপণ কড়ি হতে পারে, এর বেশী আর কত হবে !

জমিদার তাঁর জামার ভিতর থেকে একটা রূপার তঙ্কা বের করে গদুর হাতে দিয়ে তাকে দেশে যেতে বললেন। গদু গড় হয়ে প্রণাম করে জুতার ধুলো নিয়ে চলে গেল।

এবার এনায়েত খাঁ লতিফকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি হরিদাস চক্রবর্তীর বাড়ী চেন ?

যে চক্কত্তি ঠাকুর কাছারিতে কাজ করে ?

হাঁ, সেই চক্রবর্তী ঠাকুরের বাড়ী চেন ?

আমি তো সেই বাড়ীর গরু রাখি।

তিনি আজ কাছারিতে আসেন নি কেন ?

তিনি কাল অনেক অনেক দূর চলে গেছেন।

কোথায় গেছেন ?

আমি বাচ্চা মানুষ, তা বলব কি করে।

লতিফের মুখের ভাব ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে এনায়েত খাঁ বুঝলেন, আজ হরিদাস চক্রবর্তীর না আসার মূলে রহস্য আছে। এবং লতিফ মিথ্যাকথা বলছে। তিনি ওবিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললেন—আচ্ছা চল এখন আমরা কাঁঠাল পাড়তে যাই। লতিফ, তোমরা কয় ভাইবোন?

আমার বড়োভাই চৌধুরী বাড়ীর লড়াইতে গত বছর মারা গেছে। এখন আমরা চার ভাইবোন।

তোমার বাপজান কি করেন?

আগে চাষ-আবাদ করতেন। এখন জমি নেই তাই কামলা খাটেন।

জমি নেই কেন?

ভাই চৌধুরী বাড়ীর লস্কর ছিল, তখন জমি ছিল। ভাই মরে গেছে, জমি খাস হয়ে গেছে।

চক্রবর্তী বাড়ীতে তুমি মাইনে কত পাও?

মাইনেদেয়না আমরা চার ভাইবোন খাই, আর আমাদের জামা কাপড় দেয়।

তোমার বাপজানের কামলার কাজে চলে?

যখন কাজ-কাম থাকে তখন চলে।

যখন থাকে না তখন?

দিনে কচু, কুমড়ো, লাউ, এই সব সিদ্ধ করে খায়। রাতে চক্রবত্তি বাড়ী আমরা যা পাই তাই বাড়ী এনে সকলে খাই।

আচ্ছা লতিফ, তোমাকে যদি আমি চাকরি দিই, তুমি নেবে? তোমাকে মাসে দুই তঙ্কা মাইনে দেব আর তোমার বাপজানের জমি ফিরিয়ে দেব। আমার বাড়ীতেই তুমি খাবে।

ঠাকুরবাড়ীর গরু রাখবে কে? আমি ছাড়া আর কেউ ওদের গরুর কাছে যেতে পারে না।

সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

কবে চাকরি দেবেন?

আজ থেকেই।

তবে আমি এক দৌড়ে চক্রবত্তি ঠাকুরকে বলে আসি।

তুমি যে বললে চক্রবত্তি ঠাকুর বাড়ী নেই?

লতিফ একেবারে ভ্যাব্যাচাকা খেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—না হুজুর, সত্যিই তিনি বাড়ী নেই। তিনি অনেকদূর চলে গেছেন। এখন আমার চাকরির দরকার নেই। চলুন আমরা কাঁঠল পাড়ি।

এনায়েত খাঁ সকালবেলা দেখেছেন হানিফের মেজাজ, এখন দেখলেন এই লতিফের ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন, কাছারিতে এমন কিছু চক্রবর্তীকে বলা হয়েছে, যার ফলে তিনি ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। ব্যাপারটা আর যাতে বেশীদূর না গড়ায় তার জন্য লতিফকে বললেন—ওগাছের সব কাঁঠাল আমি তোমাকে দিলাম। যখন তোমার খুশি পেড়ে নিয়ে যেও। এখন চল তোমার মনিব-বাড়ী যাই।

এখন যে আমার অনেক কাজ আছে, কাল আপনাকে নিয়ে যাব। লতিফের মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

তোমার কোনো ভয় নেই। চক্রবর্তীঠাকুরকে বাঁচানোর জন্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দেখলে না, আজ সকালে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম।

আচ্ছা, তবে চলুন।

হরিদাস চক্রবর্তীর বাড়ীর কাছে এসে লতিফ বলল, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি গিয়ে দেখে আসি, কর্তা আছেন কিনা।

বলে লতিফ এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

একটু পরেই হরিদাস চক্রবর্তী ব্যস্ত হয়ে এসে সেলাম করে বৈঠকখানায় নিয়ে বসিয়ে বাটায় করে পান ও পাঁচতঙ্কা জমিদারের 'নজরানা' এনে সম্মুখে রাখলেন। এনায়েত খাঁ বললেন—

দেখুন চক্রবর্তীমশাই, আমি আপনার গ্রামবাসী। আমাকে আপনি সেই ভাবেই গ্রহণ করুন। এ নজরানা আমি নেব না।

চক্রবর্তী হাতজোড় করে উত্তর দিলেন,—হুজুর আজ প্রথম আমার বাড়ীতে এসেছেন। প্রজার যা কর্তব্য তাই করেছি। এর পর হুজুরের মর্জি মাফিক চলব।

আপনি আজ কেন কাছারিতে যান নি, তার কারণ আমি বুঝেছি। এখন বলুন তো হিন্দুরা দেশছেড়ে যাচ্ছে কেন?

জমিদারীতে 'নজরমরেচা' আইন জারি করা হয়েছে। সেই ভয়ে যাদের ঘরে অবিবাহিতা সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে তারা পালাচ্ছে।

নজর মরেচা আইন কি?

বিয়ের পূর্বে মেয়েটিকে সরকারের কোনো পদস্থ কর্মচারীকে দেখাতে হয়। তিনি দেখে নজর সেলামীর তঙ্কা বরাদ্দ করেন। সেই বরাদ্দের তঙ্কা সরকারে জমা দিয়ে তবে মেয়ে বিয়ে দিতে হয়। অন্যদেশের মেয়ে বিয়ে করে আনলে বউ দেখিয়ে নজর মরেচা দিয়ে হুকুম নিতে হয়।

কত তঙ্কা নজর মরেচা দিতে হয়?

তা নির্দিষ্ট নেই।

যদি নজর মরেচা না দিতে পারে?

তবে মেয়ে বা বউ সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

এই আইন এদেশের অন্য কোথাও আছে?

যে সব পরগনা বা মহল সুবাদারের খাস দেওয়ানের অধীন, সে সব দেশে এই আইন চালু আছে।

সে সব দেশে হিন্দু বাসকরে কি করে?

সে সব দেশে মেয়ের বয়স পাঁচ-সাত বছর হতেই বিয়ে দিয়ে ফেলে। প্রাচীনকালে আমাদের হিন্দু সমাজে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত না। এই নজরমরেচা আইনের জন্য এখন দুই তিন-বছরের মেয়েকেও বিয়েদেওয়া হয়।

এ জমিদারীতে আগে এ আইন ছিল না?

কোনো হিন্দু জমিদারীতে এ আইন নেই। বহু মুসলমান জমিদারও এ আইন পছন্দ করেন না।

এ আইন কি কেবল হিন্দুদের জন্য?

হাঁ হুজুর।

এ আইন কতদিন থেকে চলে আসছে?

এ আইন প্রথম জারি করেন দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজি। মাঝখানে আকবর বাদশা এ সব আইন রদ করেছিলেন। এখন আবার শাহসুলতান বাদশাহ আওরঙ্গজেব চালু করেছেন।

জমিদারীর মুসলমান প্রজারা খেপেছে কেন?

প্রজাদের কায়েমী স্বত্ব রদকরে 'কোর্ফা স্বত্ব' আইন জারি করায় তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে।

কোর্ফা স্বত্ব কি?

প্রজা নিজের খুশিমত জমিতে পুকুর, ইঁদারা, রাস্তা কাটতে পারবে না। বাড়ীতে নতুন করে ইঁটের গাঁথনি দিতে পারবেনা। জমির ওপরের গাছ কেটে নিতে পারবে না। জমিদারের প্রয়োজন হলে যে কোনো জমি-বাড়ী বিনা কৈফিয়তে বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।

এ আইন কি অন্যদেশেও আছে?

এই সুবে বাংলার কয়েকটা হিন্দু জমিদারের জমিদারী ছাড়া দিল্লীর বাদশাহর অধীন আর সব দেশেই আছে। বাংলার বাইরে এ আইন আরও কঠোর।

কি রকম কঠোর ?

ওসব দেশের সাধারণ প্রজা হাতি, ঘোড়া, তাঞ্জাম, পালকি ব্যবহার তো দূরের কথা খাট, চৌকি, কাপড়ের ছাতা, ভালো জুতো, কোনো কিছু দামী জিনিস ব্যবহার করতে পারে না। ব্যবহার করতে হলে বাদশাহী সরকারের নির্দিষ্ট সেলামী জমা দিয়ে 'ফরমান' নিতে হয়। সেলামীর পরিমাণ এতই বেশী যে, প্রায় কেউই তা দিতে পারে না।

আমার জমিদারীতেও কি এই সব আইন চালু হয়েছে ?

আস্তে আস্তে চালু করা হচ্ছে।

এ সব বুদ্ধি তো হোসেন সাহেবের মাথায় খেলে নি !

সেই জন্য তাঁর দেশ থেকে তমিজুদ্দিন সাহেবকে এনেছেন।

এঁদের দেশ কোথায় ?

পশ্চিমে জৌনপুর।

আচ্ছা, আজকের মত আমি যাই। আগামীকাল কিন্তু আপনি কামাই দেবেন না।

হুজুর, আমি এখন বুড়ো হয়েছি। আমাকে—।

সে আমি বুঝেছি। আপনি কাল থেকে নিয়মিত কাছারিতে যাবেন। আর একটা কথা, আপনার রাখাল লতিফকে আপনি যদি আমাকে দেন, তবে খুব উপকৃত হব।

হুজুর, এ রকম কথা বলে আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না। লতিফকে আপনি নেবেন, এতো আমার আনন্দের কথা। ওরা বড়ো গরিব, দুবেলা ভাত জোটে না।

সে সব আমি শুনেছি। কেন ওরা এত গরিব হয়েছে, তাও শুনেছি। ওকে আমার খাস খানসামা করব।

চক্রবর্তীবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে এনায়েত খাঁ দেখলেন পথে লতিফ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে এনায়েত খাঁ বললেন—

তোমার মনিব রাজি হয়েছেন। কাল সকালে মনিবের সঙ্গে কাছারিতে গিয়ে কাজে ভর্তি হবে। তোমার বাপজানকে সঙ্গে নিয়ে যেও, এখন বাড়ী যাও।

এখন আঁধার হয়ে গেছে। আমি সঙ্গে গিয়ে কাছারি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

দরকার হবে না, আমি একাই যেতে পারব।

পথে কবরখানার কাছে ভূতের ভয় আছে।

তুমি ও জায়গা দিয়ে একা ফিরবে কি করে?

আমি আল্লা-রছুলের নাম করে চোখ বুঁজে এক্কে দৌড়ে ও জায়গা পার হয়ে বাড়ী যাব।

এনায়েত খাঁ বুঝলেন, খাস খানসামা নির্বাচনে ভুল হয় নি।

পরদিন সকালে জমিদার এনায়েত খাঁ কাছারি মহলের খাস কামরায় এসে প্রথমেই দেওয়ান হোসেন সাহেব ও সদর নায়েব তমিজুদ্দিন সাহেবকে তলব দিলেন। তাঁরা এলে জমিদার দেওয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শুনতে পাচ্ছি আপনারা অনেকগুলো নতুন আইন জারি করেছেন। এ সব করতে গেলেন কেন?

হুজুর, আমি এ সব কিছু বুঝি নে। সেজন্য তমিজুদ্দিন সাহেবকে আনিয়েছি। ইনি এসব কাজে পাকা লোক।

আচ্ছা, তমিজুদ্দিন সাহেবই আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

হুজুর, এসব সুলতানি আইন তো নতুন নয়। শাহন্‌শাহ বাদশাহ সুলতানরা এই সব আইনের জোরেই হিন্দুস্থানে বাদশাহী করছেন। আকবর বাদশা এই আইনের কতকগুলি রদ করেছিলেন। তার ফলে প্রজারা ধনেসম্পদে প্রবল হয়ে এখন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় বিদ্রোহ করছে। প্রজার ঘরে যাতে ধন সঞ্চিত হতে না পারে, সেদিকে বাদশাহ, সুবাদার দেওয়ান, জমিদার, সকলেরই লক্ষ্য রাখতে হয়।

নজর মরেচা আইন জারি করলেন কেন?

তা না করলে প্রয়োজন মত খুবছুরত বাঁদি যোগাড় হবে কি করে? কে, কয়টা বাঁদি বাজার থেকে কিনতে পারে?

যে যে আইন আপনারা জারি করেছেন, তার লিখিত বিবরণ আমার কাছে এখনই পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখব। হরিদাস চক্রবর্তীকে আমার জমিদারিতে আমি প্রধান বিচারপতি 'কাজীদেওয়ান' নিযুক্ত করছি। আপনি সেই মর্মে ফরমান লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি ফরমানে 'সই পাঞ্জা' দিয়ে দেব। সাতদিনের মধ্যে জমিদারীর সব 'মহলকাছারি'তে ফরমান জারি করে দেবেন।

হুজুর, চক্রবর্তী বড়ো নরম ধাতের মানুষ।—বললেন তমিজা সাহেব।

যারা নরম ধাতের মানুষ, তারাই দরকার হলে কড়াও হতে পারে। শুধু কড়া ধাতের মানুষ দিয়ে জমিদারী চালানো যায় না। আপনি এখন কাছারিতে গিয়ে সেরেস্তাদারকে বলুন, জমিদার পক্ষের লস্করদের যে সব জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সে সব ফিরিয়ে দেবার দলিল তৈরী করতে। দেওয়ান সাহেব গিয়ে নতুন জারি আইনের কাগজপত্র পাঠিয়ে দিন।

এনায়েতুল্লা খাঁ জমিদারীতে ফিরে আসার পাঁচদিন পরে সকালবেলা খাসকামরায় বসে জমিদারীর কাগজ পত্র দেখছেন। লতিফ এসে জানাল, দরগার ভেওয়া ফকির হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছেন।

জমিদারী হাতে নেওয়ার পর সে পর্যন্ত কোনো বাইরের লোক জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। ভেওয়া ফকির এসেছেন শুনে এনায়েত খাঁ হাজির হতে অনুমতি দিলেন। কাছারির পেশকার যথারীতি ফকিরসাহেবকে হাজির করে পরিচয় জানিয়ে চলে গেলেন।

পাকা চুলদাড়ি বৃদ্ধ ফকির আসতেই জমিদার তাঁকে সসম্মানে নিজের ফরাসে বসালেন। পেশকারের মুখে পরিচয় শুনে ফকির সাহেবকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—

আপনার নাম ভেওয়া ফকির হল কেন?

হুজুর, ফকিরদের কোনো নামও নেই, পরিচয়ও নেই। সাধারণ মানুষে ফকিরসাহেবদের ব্যবহারে কোনো কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে একটা নাম পাড়ায়। আমার বড়ো মুর্শিদ প্রায় ষাট বছর আগে কলাগাছের ভেলায় চড়ে এইখানে চৌধুরী জমিদারের ঘাটে এসেছিলেন। তারজন্য দেশের লোকে তাঁকে ভেওয়া ফকির বলত। এদেশে ভেলাকে ভেওয়া বলে। সেই নাম থেকে আমাকেও সকলে ভেওয়াফকির বলে।

তিনি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন?

তা আমরা কেউ জানি নে।

চৌধুরীবাড়ীর ঘাটে এসে ফকির দেওয়ান কি করলেন?

ভেওয়া যে কখন এসেছিল, তা কেউ দেখতে পায় নি। প্রভাতে দেখে অনেকে ভেওয়া থেকে নেমে খানা পিনা করতে বললেন, তা তিনি নামলেন না, কারো সঙ্গে কথাও বললেন না। সংবাদ পেয়ে জমিদার বাড়ীর বড়ো কুমারবাহাদুর এসে অনুরোধ করলেন, তাতেও তিনি নামেন নি। শেষে অতিবৃদ্ধ জমিদার সূর্যনারায়ণ চৌধুরী লাঠিভর করে এসে ঘাটে নেমে যখন হাত

বাড়ালেন, তখন সেই বুড়ো রাজাবাহাদুরের হাত ধরে বুড়ো ফকির ভেওয়া থেকে নেমে দু'জনে গিয়ে বসলেন শিববাড়ীর পঞ্চবটী তলায়। সেখানে বসে দুজনের মধ্যে তখন যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা নাকি কেউ বুঝতে পারে নি

তারপর কি হল?

ফকির সাহেব রাজাবাহাদুরের দেওয়া খানাপিনা করে প্রায় একমাস পঞ্চবটী তলায় ছিলেন। এরমধ্যে জমিদার তরফথেকে দরগা তৈরী হয়ে গেল। দরগার খিদ্‌মত চলার জন্য রাজাবাহাদুর তিরিশ বিঘা জমি লাখেরাজ পীরোত্তর করে দিলেন।

সে লাখেরাজ এখন আপনার আছে তো?

হাঁ হুজুর আছে। সেই বিষয়েই একটা আর্‌জি নিয়ে আমি হুজুরের দরবারে হাজির হয়েছি।

সে বিষয়ে কি আরজি আপনার?

হুজুর, এদেশে আর আমি থাকতে চাইনে। পীরোত্তরের জমি ক'বিঘে হুজুর সরকারে জমা নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় দরগায় একটু ঝাঁট আর সন্ধ্যায় একটা প্রদীপের ব্যবস্থা হলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি। এই আমার আরজি।

আপনি দেশ ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন কেন?

হুজুর, চৌধুরী ও রায় জমিদারদের আমলে দেশে ধর্ম নিয়ে কোনো মনোমালিন্য ছিল না, সকলেই ছিল ভাই ভাই। এই এক বছরের মধ্যে দেশ থেকে সেভাব চলে যেতে বসেছে। আগে বহু হিন্দু দরগায় এসে মানত দিত, এখন কেউ আসে না।

এর কারণ?

এর কারণ বোধহয় চৌধুরীদের শিবমন্দির ভেঙে পঞ্চবটীর গাছগুলো কেটে ফেলা। সত্যকথা বলতে কি, গাছগুলো যখন কাটা হয় তখন আমার মনে হচ্ছিল, প্রতিটি কুড়ুলের ঘা যেন আমার বুকে এসে পড়ছে। ঐ পঞ্চবটী তলায়ই আমার বড়ো মুর্শিদ প্রথম আস্তানা করেছিলেন। ঐ বটগাছটার বাঁধানো গোড়ায় বসে বড়ো মুর্শিদ ছোটো মুর্শিদ কতলোকের সঙ্গে কত আলাপ করেছেন। গরমের দুপুরে ঐ পঞ্চবটী তলায় ছিল তাঁদের আস্তানা। এখন ঐ পথ দিয়ে চলতে যখন কাটাগাছের গুঁড়িগুলো চোখে পড়ে, তখন চোখের জল সামলাতে পারি নে। সন্ধ্যায় যখন ভাঙা শিবমন্দিরে শিয়াল ডেকে ওঠে, তখন আমার নামাজ ভুল হয়ে যায়।—বলতে বলতে ফকির সাহেবের চোখের জল সাদা দাড়ি বেয়ে নেমে এল।

জমিদার কিছুক্ষণ নীরব থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—

এ সব কাণ্ডের জন্য আপনারা কাকে দায়ী করেছেন ?

আমরা তো শুনেছি, হুজুরের মরজি মাফিক এসব কাজ হয়েছে।

হুঁ। আপনার আর কিছু জানাবার আছে ?

হুজুরের দরবারে আর একটি বিধবার এক আরজ আছে। সে নিজে আসতে পারে না বলে আমাকে পাঠিয়েছে।

বিধবাটি কে, বাড়ী কোথায় ?

এই পাশের গ্রাম গোপালপুরের নইম সরদারের বেটার বউ।

কি আরজ তাঁর ?

নইম সরদার ছিলেন কালীনারায়ণ চৌধুরীর প্রধান সরদার।

সে সব আমি জানি। তাঁর লড়াই আমি দেখেছি।

তাঁর বিধবা বেটার বউ খুব সুন্দরী। বউটির একটি ছেলে আছে। সে আর নিকে কবুল করবে না, স্বামী শ্বশুরের ভিটায় থেকে বুড়ী শাশুড়ীর সেবা আর ছেলেটাকে মানুষ করতে চায়। আপনার দেওয়ান একদিন তাকে ভৈরবের ঘাটে দেখে নিকের প্রস্তাব পাঠান। বউটি সে প্রস্তাব অস্বীকার করে। তারপর নইম সরদারের বাড়ীতে হামলা হয়েছে।

সে হামলায় কে বউটিকে বাঁচিয়েছে ?

গ্রামে নইম সরদারের সাকরেদ কয়েকজন নমঃশূদ্র ও মুসলমান লেঠেল আছে, তারা বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখন তারা বলছে, এ ভাবে জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে বউটিকে বেশীদিন রক্ষা করা যাবে না। এরই মধ্যে তাদের 'গোচর' জমিগুলো জমিদার সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বউটি হুজুরের কাছে অভয় চায়।

ফকিরের এই আরজি শুনতে শুনতে এনায়েত খাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। ফকিরের বক্তব্য শেষ হলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে জমিদার বললেন—আপনি আজই গোপালপুর যান। গিয়ে গ্রামের লেঠেলদের আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, নইম সরদারের বেটার বউয়ের ওপরে যারা হামলা করতে যাবে, তাদের মাথা কেটে এনে আমাকে দেখালে এক একটা মাথার জন্য এক একটা 'সুলতানী মোহর' বকশিস্ মিলবে। গোচর জমিতে গরু চরাতে যদি কেউ বাধা দিতে যায়, তবে তাকে যেন তাঁরা ঠেঙিয়ে তাড়ান। এরপর আর যেসব ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি সাতদিন পরে এসে জেনে যাবেন।

সেদিন অপরাহ্নে এনায়েত খাঁ খাসকামরায় এসেই ডেকে পাঠালেন দেওয়ান হোসেন সাহেব ও সদর নায়েব তমিজুদ্দিন সাহেবকে। তাঁরা এসে বসলে জমিদার বললেন—

একবছর পরে দেশে এসে চারদিক থেকে যে সব খবর পাচ্ছি তাতে জমিদারী ও আপনাদের দুজনের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এই বাঙালী জাতটা ঠিক ভেড়ার মত, দেখতে খুব নিরীহ ; কিন্তু যদি একবার শিঙ্‌ বাগিয়ে রুখে দাঁড়ায়, তখন আর এদের সামলানো যায় না। এদের হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করেও কোনো সুবিধা হবে না। দেখলেন তো, সেদিন ঐ হানিফ ছোকরার বেয়াদবি। ছোকরার এতবড়ো আস্পর্ধা যে, সদর কাছারিতে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় তেরা করে বলল, দরকার হলে হিন্দুদের মতো ওরাও দেশছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু ও কথার ঐখানেই শেষ নয়, ও কথার আরও অর্থ আছে। সে অর্থ, যাবার সময় একটা 'মরণ কামড়' দিয়ে যাবে।

তবে ওকে বেকসুর খালাস দিলেন কেন ?—প্রশ্ন করলেন তমিজুদ্দিন সাহেব।

খালাস দিলাম ভয়ে। ওরা জোট বেঁধে যদি কলার ডেগো হাতে নিয়েও তাড়া করে, তবে আমাদের পায়ের জুতো খুলে ফেলে দৌড়তে হবে।. তাতেও জান বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ।

তাহলে হুজুরের এখন কি মরজি ?—প্রশ্ন করলেন তমিজ সাহেব।

দিল্লীর বাদশাহের ফরমানে আমি পেয়েছি এই জমিদারী। তারপর আমি বাদশাহের খাস মনসবদার। আমাকে এই জমিদারী নিয়ে থাকতেই হবে। আমি ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য। একবছর আমি বিদেশে থাকায় প্রজাদের সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছে আপনাদের দুজনের ওপরে।

হুজুর এখন আমাদের কি করতে হুকুম করছেন ? জিজ্ঞাসা করলেন তমিজ সাহেব।

আপনারা দুজন আমার দোস্ত। আমার জন্য আপনাদের কোনো অনিষ্ট হয়, এ আমি চাইনে। আপনাদের তিনবছরের মাইনে আমি এককালে দিয়ে দিচ্ছি। সাতদিনের মধ্যে আপনাদের সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ হিসাব-নিকাশ আমাকে ও হরিদাস চক্রবর্তীকে বুঝিয়ে দিয়ে দেশে চলে যান। এ সাতদিন আপনাদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

জমিদারের কথার তাৎপর্য হোসেন সাহেব না বুঝলেও চতুর তমিজ সাহেব বুঝলেন, কিন্তু কিছু বলার নেই। দুজনে উঠে গেলেন।

এরপর জমিদার ডেকে আনলেন হরিদাস চক্রবর্তীকে। চক্রবর্তী এসে সেলাম দিলে তাঁকে বসিয়ে বললেন—

দেওয়ান আর সদর নায়েব চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সাতদিন পরে দেশে যাচ্ছেন।

হুজুর বোধহয় তাঁদের বরখাস্ত করলেন।—বললেন বিস্মিত চক্রবর্তী।

আপনি যদি সেই রকম বুঝে থাকেন তবে তাই।

কিন্তু হোসেন সাহেবের তো কোনো দোষ দেখি নি! লোকটি সাদাসিধে মানুষ।

আর নির্বোধ লম্পট পরধর্মবিদ্বেষী। আমারই ভুল হয়েছিল, সুবাদারের 'রিসালদারী'র যোগ্যতা, আর বাংলাদেশে বড়ো জমিদারের দেওয়ানীর যোগ্যতা যে এক নয়, তা আগে বুঝতে পারি নি। সেই জন্যই এত বিভ্রাট ঘটেছে।

কিন্তু এখন কাজ চলবে কি করে?

আপনি আবার সদর নায়েবের কাজ চালাবেন, আমি দেওয়ানের কাজ চালিয়ে নেবো।

হুজুর, আমি বুড়ো হয়ে গেছি—।

ও কৈফিয়ত আপনার মুখে আরও দু'বার শুনেছি। আমি জানি, আপনাদের বুড়ো হাড়েই ভেলকি খেলে। এখন গিয়ে তমিজ সাহেবের কাছে সেরেস্তা বুঝে নিন, সময় মাত্র সাতদিন। এরপরে দেখতে হবে, এই এক বছরে কত গলতি জমেছে।

বিদায়ের দিনে তমিজুদ্দিন সাহেব কাছারিতে বসে মন্তব্য করলেন, দেওয়ান হোসেন সাহেব কোনো অন্যায় কাজ করেন নি। মন্দির ভাঙা, পঞ্চবটী কাটা? সে তো সুলতান মামুদের সময় থেকে হয়েই আসছে। মধ্যে আকবর বাদশা হিঁদু বেগম আর হিঁদু উজিরদের পাল্লায় পড়ে ও সব বন্ধ করেছিলেন। এখন খাটি মুসলমান বাদশা আওরঙ্গজেব আবার হুকুম দিয়েছেন। করিম মিঞার বেওয়াকে নিকা করতে চেয়ে তিনি ভালো প্রস্তাবই করেছিলেন। এই রকম বেওয়ারিশ খুবছুরত আওরত মরদেই দখল ক'রে থাকে। সওয়ারের হাতে পড়লে যেমন ঘোড়া জাত থাকে, মরদের হাতে তেমনি আওরত জাত থাকে। জমিদার খাঁ সাহেব হিঁদু বেগম সাদীকরে চোখে একটু ঘোলা দেখছেন। এ ঘোলা বেশীদিন থাকবে না। এত বড়ো জমিদারীর জমিদারের এত বড়ো

হারেমে অন্তত চোদ্দটা বেগম আর কুড়ি দুই বাঁদী না হলে মানাবেই না। আপনারা দেখতে পাবেন, হয় তো একদিন করিম খাঁর ছুরতজামালি বেওয়াই তাঞ্জামে পরদা ঢাকা দিয়ে জমিদারের হারেমে ঢুকে পড়বে।

তমিজসাহেবের এই মন্তব্য কয়েকদিন পরে জমিদার এনায়েত খাঁর কানে উঠল। শুনে তিনি বললেন, তমিজসাহেব আমার দোস্ত। সেই জন্য বিদায়ের সময় আমাকে সতর্ক করে গেলেন।

ষাটগাছায় শিবশঙ্কর রায়ের মাতৃদেবী হরসুন্দরী দেহত্যাগের পর একবছর গেল। সে বছরে বর্ষায় আর হর্মাদদের দেখা গেল না। সেবার দুর্গাপূজায় কেষ্টদত্ত এসে বললেন হর্মাদরা ষাটগাছা আক্রমণ করে দু'বারই ভালো আক্কেল পেয়েছে। শেষবারে দুখানা স্লুপ জাহাজ নষ্ট হওয়ায় ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা দায়ী করেছে মঘ-বোম্বেটেদের। এ নিয়ে তাদের মধ্যে নাকি বিবাদ বেধেছে। পূর্বাঞ্চলে লৌহভঙ্গ, কার্তিকপাশ, চাঁদপুর প্রভৃতি জায়গায়ও এ কয়বছর হর্মাদরা আর সুবিধা করতে পারছে না। দেশের মানুষ এখন হর্মাদ-আক্রমণ প্রতিহত করতে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। ব্যাপার বুঝে মঘদের মধ্যে অনেকে ভালোমানুষ সেজে মনোহারী জিনিসের দোকান ও ভোজবাজি খেলা দেখানোর ব্যবসা আরম্ভ করেছে।

ষাটগাছা বাদায় এসে শিবশঙ্কর রায় মুর্শিদাবাদের সুবাদারের ভয় থেকে নিরাপদ হয়েছেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই নানারকমের সমস্যা চিন্তা করে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হাতে যে সোনাদানা আছে তা খাটিয়ে ব্যবসা করলে সংসার একরকম চলে যেতে পারে, কিন্তু তাঁরা যে সমাজের মানুষ, সে সমাজ তো এদিকে নেই। লক্ষ্মী বড়ো হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে। বংশের একমাত্র দুলাল রামশঙ্কর, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। ছোটো দুটি মেয়েও বড়ো হয়ে উঠছে। ষাটগাছায় থেকে এ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যেখানে গেলে সম্ভব হয় সেখানে যাওয়া তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক। সাধারণ বিদ্রোহী প্রজার কথা দু'চার মাসেই নবাব সরকারে চাপা পড়ে যায়, বিদ্রোহী জমিদার সম্পর্কে সেরকম হয় না।

এই সব সমস্যা নিয়ে শিবশঙ্কর বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করেন, কোনো সমাধান খুঁজে পান না। এই ভাবে আরও কয়েকমাস গিয়ে চৈত্র মাসে একটা দুর্ঘটনায় শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

বাসুদেবপুর থেকে যে সব মাঝিমাল্লা বজরায় এসেছিল তারা সকলেই দরিদ্র জেলে। বাদার নদীনালার প্রচুর মাছ দেখে তারা মাছের ব্যবসা করার জন্ত আশ্বিনমাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ঘাটগাছায় থাকত। শিবশঙ্কর রায় জেলেদের মাছ ধরার নৌকা তৈরী করে দিয়েছেন। চৈত্রমাসে একদিন ভোরে জেলেরা নৌকা নিয়ে গিয়েছে মাছ ধরতে। গুরুচরণ মাঝির বড়োছেলে হরিচরণ কোনো প্রয়োজনে তীরে নৌকা লাগিয়ে বনের মধ্যে ঢুকতেই তাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল।

সংবাদ পেয়ে শিবশঙ্কর রায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সতীমায়ের ঘাটে এসে দেখেন বাওয়ালী আছু ফকির ঘাটগাছার চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে নৌকায় উঠেছেন। শিবশঙ্করকে দেখে ফকির বললেন—রাজাবাহাদুর, আপনি ফিরে যান। আমি এ বাদার বাওয়ালী। আমি যাচ্ছি।

তা হয় না ফকির সাহেব। আমার লোক বাঘে নিয়েছে, আর আমি ঘরে বসে থাকব!—উত্তর দিলেন শিবশঙ্কর।

তাহলে আপনি ওসব পোষাক ছেড়ে আমাদের মতো ছোটো একখানা কাপড় মালকোচা করে পরে খালিগায়ে একখানা কাটারি দা অথবা ছোরা নিয়ে আসুন। দেরী করবেন না। আমার মনে হয়, তাড়াতাড়ি যেতে পারলে লোকটাকে বাঁচানো যাবে।

ফকিরের কথামত শিবশঙ্কর রায় নৌকায় উঠলে নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকায় বসে শিবশঙ্কর ফকিরকে প্রশ্ন করলেন—

আমাদের হাতে তো এই ছোট্টো একটুখানি দা। এ নিয়ে আমরা কি করে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব?

আমরা তো বাঘের সঙ্গে লড়াই করব না। এই বাদাবনের বড়ো বাঘের সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লড়াই করে কেউ জিততে পারে না। আমরা করব ওর সঙ্গে এক ধরনের গালাগালি খেলা। সেই খেলায় ওকে হারিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করব।

লোকটা যে বেঁচে আছে তা বুঝলেন কিসে?

দেখুন রাজাবাহাদুর, আমি ছেলেবেলা হতেই এই বাদাবনেই আছি। আমার বাপজানও এই বাদায় বাওয়ালী ছিলেন। পুরুষানুক্রমে আমরা এই বাঘ, কুমীর, সাপ, বিছা নিয়ে বাওয়ালীর কাজ করি। সেজন্ত ওদের স্বভাব-চরিত্র চালচলন জানি। এটা বাঘের খাওয়ার সময় নয়। ওরা খায় সূর্যাস্তের পর রাত দুপুরের মধ্যে। তবে যদি সময়মত খাওয়া না জোটে, তবে যে কোনো

সময় শিকার ধরেই খায়। সেক্ষেত্রে শিকার ধরেই ঘাড় ভেঙে ফেলে, চিৎকার করার অবকাশ দেয় না। এ লোকটা তো বাঘের মুখে পড়ে চিৎকার করতে করতে গেছে।

তা না হয় গেল, কিন্তু এখনও যে হরিচরণ বেঁচে আছে, সেটা বুঝলেন কি করে?

এই সুন্দরবনের ডোরা কাটা বাঘ তাজা গরমরক্ত সমেত মাংস খেতে ভালোবাসে। সেজন্য পেট ভরা থাকলে শিকারটাকে এমনভাবে ধরে, যাতে না মরে। সাধারণত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে থাবা দিয়ে শিকারটাকে মাটিতে ফেলে পায়ের দিক ধরে পিঠে করে নিয়ে যায়।

তাহলে এখন আমরা গিয়ে বাঘের সঙ্গে কি রকম খেলা খেলব, সেটা একটু আগে থেকেই বুঝিয়ে দিন।

হ্যাঁ, সেই কথাই এখন বলছি। যেখান থেকে লোকটাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে প্রথম বুঝে নিতে হবে, শিকার নিয়ে বাঘটা দূরে গেছে না নিকটেই আছে, আর এটা বাঘ না বাঘিনী।

তা বুঝবেন কি করে?

দূরে যদি গিয়ে থাকে, তবে দেখা যাবে অনেকটা পথ সোজা গিয়েছে। আর নিকটে হলে আঁকাবাকা পথে ঝোপঝাড় এড়িয়ে গেছে। বাঘ বা বাঘিনী বুঝা যাবে পায়ের ছাপ দেখে। তবে আমার মনে হয় এটা বাঘ। বাঘিনী এর সঙ্গে আছে।

এ অনুমানের হেতু?

এই সময়ে বাঘিনীর কোলে ছোটো বাচ্চা থাকে। বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য বাঘ-বাঘিনী একসঙ্গে বেড়ায়।

তা হলে হরিচরণকে তো বাঘিনীতেও ধরতে পারে!

হাঁ, তা ধরতে পারে। তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে বাঘিনী একাই আছে, বাঘ নেই। ওদের চালচলন ও স্বভাবানুযায়ী দেখাযায় বাঘ বেঁচে থাকলে বাচ্চাকোলে বাঘিনী কখনো শিকার ধরতে যায় না।

তা হলে তো দেখছি বাঘিনীর সাংসার অনেকটা মানুষের মত।

হাঁ, মানুষের মত এদের আরও কতকগুলি আচরণ আছে। যতদিন বাঘ-বাঘিনী দু'জনই বেঁচে থাকে, ততদিন ওরা একজন আর একজনকে ফেলে কিছু খায় না।

যদি ওদের একটা মারা যায় তখন অপরটা কি করে?

সে আরও আশ্চর্য ব্যাপার। এই ডোরাকাটা বাঘের জোড়ার একটা মারাগেলে অপরটা সারাজীবন একাই থাকে, অন্য একটার সঙ্গে জোড়বাঁধে না। এই রকম জোড়-ভাঙ্গা বাঘ বা বাঘিনী একজায়গায় থাকেনা, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, আর অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে পড়ে। গভীর রাতে জোড়াভাঙ্গা বাঘ বা বাঘিনীর ডাক একটা করুণ হাহাকারের মত শোনায়।

তা হলে আপনারা বাঘের ডাক শুনে তাদের অবস্থার অনেক কিছুই বুঝতে পারেন।

এই সুন্দরবনের বাদায় কয়েকবছর বাসকরে চোখ-কান খুলে রাখলে বাদার বাসিন্দা জীবজন্তুর অনেককিছু আপনিও জানতে ও বুঝতে পারবেন।

এখন আজ আমাদের কি করতে হবে তাই বলুন। আপনি কি মন্ত্র দিয়ে বাঘ বশীভূত করবেন?

হাঁ,মন্ত্র তো আছেই। এখন যা করতে হবে তাই বলি শুনুন। বাঘ যে পথে শিকার নিয়ে গেছে সেই পথ ধরে আমরা হৈ হল্লা করতে করতে যাব, যাতে ওরা আগেথেকেই আমাদের উপস্থিতির সংবাদ পায়।

আগে থেকেই জানতে হবে কেন?

হঠাৎ দেখলে ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে বসবে। সে আক্রমণের মুখে কোনো মন্তর-তন্তর খাটেনা সেইজন্য হৈ হল্লা করতে করতে গিয়ে ওদের দেখা পেলে আমরা এমন ভাবে দাঁড়াব, যাতে বাঘটা আমাদের সকলকে দেখতে পায়। দাঁড়িয়ে বাঘটার দিকে তাকিয়ে হাতের দা নাচিয়ে খুব গালাগালি দেব। দা নাচানোয় সাবধান হতে হবে, যেন ছুঁড়েমারার ভাব না হয়। ছুঁড়ে মারার ভাব হলেই সঙ্গে সঙ্গে অক্রমণ করবে। এই সময় আর একটা বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের চোখের দৃষ্টি যেন বাঘিনী ও তার বাচ্চার দিকে না হয়। সবসময় বাঘের দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে।—

'আমাদের দেখে প্রথমে বাচ্চা দুটো তাদের মায়ের আড়ালে গিয়ে লুকোতে চেষ্টা করবে, বাঘিনীটা ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আর বাঘটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রেগে গর্‌-র্‌-র্‌ গর্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করতে করতে মাঝে মাঝে বিড়ালের মতো মুখ ফিরিয়ে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করবে। একটু পরেই বাঘিনীটা একলাফে নিকটের ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকোবে। বাচ্চা দুটোও মায়ের সঙ্গে যাবে।—

'বাঘিনী পালালে বাঘটা আমাদের ওপরে খুব রেগে ঘন ঘন ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করবে, আর আড়চোখে দেখবে, যেদিকে বাঘিনী গিয়েছে সেই দিকের

ঝোপজঙ্গল। এই সময় আমরা গলাকাটিয়ে গালাগালি দেব আর দা নাচিয়ে লাফাতে থাকব, কিন্তু এগিয়ে যাবনা। বাঘটা যদি শুয়ে থাকে, তবে আমাদের লম্ফঝম্ফ দেখে উঠে এমন ভাবে বসবে, একদিকে থাকব আমরা আর একদিকে থাকবে বাঘিনী-লুকনো ঝোপ। এইভাবে বাঘ বসলে আমরা লাফাতে লাফাতে একটু একটু করে এগোব। এইরকম করে এগিয়ে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে থাকতেই বাঘটা মাথা নীচুকরে একটা ডাকছেড়ে একলাফে বাঘিনী যে দিকে গেছে সেই দিকে পালাবে।—

তখন আমরা হৈ-হল্লা করে গিয়ে একজন হরিচরণকে কাঁধে তুলে নেব। আর সকলে তাকে ঘিরে এমন ভাবে আসবো, যেন সবদিকে আমাদের একজনের সমুখ থাকে। বাঘ তার শিকার সহজে হাতছাড়া করতে চায়না। ও আমাদের পিছন নিয়ে ঘাট পর্যন্ত আসবে।—

'আপনি সুন্দরবনে নূতন এসেছেন, এ অঞ্চলের হালচাল অনেক কিছুই জানেন না। যারা সুন্দরবনের বাদায় বাস করে, তারা এসব জানে। এটাকে একটা খেলা বলেই মনে করবেন। এ খেলা আমি বহুবার খেলেছি, আর প্রতিবারই জিতেছি। এ খেলায় চাই দুর্জয় সাহস, ভয় পেলেই সর্বনাশ।'

আতুফকির যেরকম বললেন ব্যাপারটাও সেই রকমই ঘটল। আহত হরিচরণকে নিয়ে সকলে নিরাপদে ফিরে এলেন। হরিচরণের জখমটা তত মারাত্মক ছিল না, উরুতে চারটে দাঁত বসেছিল মাত্র। কিন্তু দেখা গেল, তার কোন বাহ্যজ্ঞান নেই ; তাকিয়ে থাকে, চোখের পলকও পড়ে, অথচ কথা বলে না। ফকির বললেন, বাঘে ধরা শিকারের এইরকম অবস্থা হয়। একেই বলে 'বাঘাভুলি'।

আতু ফকির তাঁর বাওয়ালী মতে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সারাদিন গিয়ে সন্ধ্যার পর হরিচরণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঘটনা সম্পর্কে সে বলল, বাঘে ধরে পিঠে করে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ চিৎকার করেছিল, তারপর আর পারে নি ; এমন কি নড়বার ক্ষমতাও তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল ; অথচ সব ঘটনাই সে দেখেছে ও শুনেছে। বাঘটা তাকে ধরে পিঠে করে নিয়ে বাঘিনীর সম্মুখে নামিয়ে রেখে একটু দূরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুলো। বাঘিনীটা শুয়েছিল। সে ধীরেসুস্থে উঠে এসে শিকারের মুখটা একটু শুঁকে দেখে আবার যথাস্থানে গিয়ে পূর্বের মতো শুয়ে পড়ল। বাচ্চা দুটো লাফাতে লাফতে এসে শিকারের গায়ের ওপরে হুটোপুটি আরম্ভ করলে বাঘটা একটু ঘেঁও

করে তাড়া দিতেই সরে গেল। তারপর যখন দূরে বাওয়ালীদলের হৈ-হল্লা শোনা গেল, তখন থেকে বাঘ ও বাঘিনী মাথা তুলে কান খাড়া করে যেন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এরপর যা ঘটেছে তা বাওয়ালীর দল দেখেছেন।

বাওয়ালী আহ্ ফকির শিবশঙ্কর রায়ের প্রশ্নে বললেন, বাঘের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা মানুষের বাঘাভুলি দূর হলেও বিভীষিকাটা মন থেকে যেতে অনেক দিন সময় লাগে। প্রথম কিছুদিন সে ঘুমোতেই পারে না, ঘুমোলেই বিভীষিকা দেখে। জ্বরও হতে পারে। সেজন্য সাতদিন না গেলে কিছু বলা যায় না।

বাওয়ালী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হল। রাত্রেই হরিচরণের জ্বর হল, দু'দিন পরেই দেখা গেল ঘোর বিকার। পাঁচদিন পরে হরিচরণ মারা গেল।

এই ঘটনায় শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী মনে খুবই আঘাত পেলেন। বুড়ো গুরুচরণ হলদার বাসুদেবপুর জমিদার বাড়ীর মাঝি। জমিদারের এই বিপদকে সে নিজের বিপদ বলে মেনে জমিদার পরিবারকে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে বাদাবনে ফেলে রেখে দেশে যায় নি। এই থাকার জন্য তারা শিবশঙ্কর রায়ের কাছে মাহিনাও নিতো না, বরং কুমার বাহাদুরকে প্রতিদিন বিনামূল্যে ভালো মাছ দিত।

পুত্রশোকে গুরুচরণ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। একরাত্রেই তাঁর বয়সটা ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে আশীর কোঠায় পৌছে গেল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছাড়া পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মতো আর কিছু শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরীর ছিল না।

জমিদার এনায়েতুল্লা খাঁ দেওয়ান হোসেন সাহেব ও নায়েব তমিজ সাহেবকে বিদায় করে জমিদারী নিজ হাতে নিয়ে প্রথমেই জারিকরা বাদশাহী আইন বাতিল করে দিলেন। সেই সঙ্গে সব মহল কাছারিতে জানিয়ে দিলেন, এখন থেকে তাঁর নাম লিখতে হবে মহম্মদ এনায়েতুল্লা খান চৌধুরী।

ভেওয়া ফকিরকে পাঠিয়ে জমিদার ডেকে আনলেন শিববাড়ীর পূজারী ঠাকুরমশাইকে। পূজারী এলে তাঁকে সমাদর করে বসিয়ে বললেন,—আমার অনুপস্থিতিতে যা হবার তা হয়েছে। এখন আমি জায়গাটার ভাঙ্গা ইট সরিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আপাতত আপনি আপনার পছন্দমত কয়েকখানা খড়ের ঘর তুলে ঠাকুর এনে নিয়মিত পূজাপার্বণ আরম্ভ করুন। আমার হাতে এখন সেরকম টাকা নেই, টাকা হাতে এলেই পাকা মন্দির তৈরী আরম্ভ করা

যাবে। পঞ্চবটীর চারা যোগাড় করে লাগিয়ে দিন। এসব করতে যা খরচ হবে সব আমার।

জমিদারের ব্যবহারে ও কথায় পূজারী ঠাকুরমশাই খুশী হলেন। ছ'মাসের মধ্যেই পুরনো শিববাড়ীতে নতুন খড়ের ঘরে পূজার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল।

সুলতানপুরের নয়া জমিদার এনায়েতুল্লা খান চৌধুরী তাঁর জমিদারী থেকে নতুন জারিকরা বাদশাহী আইন রদ করেছেন, নজর-মরেচার ভয় আর নেই। দু'বছর দেশে ভালো ফসল হয়েছে। যেসব হিন্দু প্রজা ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা অনেকে ফিরে আসছে। কিন্তু জমিদারীর মহলে মহলে প্রজাবিদ্রোহ দিনের পর দিন বেড়েই চলল। শেষে এমন অবস্থা হল যে, সদর লাট খাজনাই যোগাড় হতে চায় না।

নয়া জমিদার তাঁর অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সদর নায়েব হরিদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে সব মহল কাছারির নায়েবদের সদরে তলব করলেন। তাঁরা সকলে সদরে হাজির হলে জমিদার তাঁদের পরামর্শ চাইলেন।

নায়েবরা পরামর্শ দিলেন,—জমিদার পক্ষ থেকে নরম হওয়াটাই ভুল হয়েছে। ওরা 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। হুজুর যদি কারও কথা কানে না তুলে শক্ত হয়ে থাকেন, আর কয়েক শ' পশ্চিমা পাইক-বরকন্দাজ এনে দিতে পারেন, তবে এই সব বেয়াড়া প্রজার বদমাশী ঠাণ্ডা করতে খুব বেশীদিন লাগবে না।

নায়েবদের এই পরামর্শ জমিদারের পছন্দ হল না। তিনি তাঁদের বিদায় দিয়ে আবার সদর নায়েবের পরামর্শ চাইলেন।

সদর নায়েব বললেন,—এরকম কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে আগের জমিদারেরা সব মহলের প্রজা-মাতব্বর-প্রধানদের তলব পাঠিয়ে সদরে এনে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। আমরা আলোচনার সময় জমিদারের কাছে থেকে দলিল-দস্তাবেজ সরবরাহ করতাম। এতে খুব ভালো ফল হত। প্রজারাও জমিদারের সমস্যা বুঝে নিতেন, জমিদারও প্রজাদের অবস্থা বুঝতে পারতেন। হুজুরের যদি মরজি হয় তবে এই উপায়টা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

এ তো খুব ভালো পরামর্শ। এতদিন এ কথা আমাকে বলেন নি কেন?

হুজুরের জমিদারীর অধিকাংশ প্রজাই হিন্দু।

জমিদারের দৃষ্টিতে প্রজা আবার হিন্দু মুসলমান কি?

হুজুরের এই মনোভাব বুঝতে আমার একটু সময় লেগেছে।

তা হলে দু'এক দিনের মধ্যেই মহলের নায়েবদের মারফত মাতব্বর-প্রধানদের তলব পাঠান।

আমার মনে হয় এ তলব হুজুরের খাস সেরেস্তা থেকে সরাসরি হরকরা মারফত মাতব্বরদের হাতে পাঠানোই ভালো।

এ পরামর্শ কেন দিচ্ছেন ?

আমি বেসরকারীভাবে যতদূর খবর পেয়েছি তাতে এই গোলমাল বেধেছে মহল কাছারির আমলাদের সঙ্গে প্রজাদের। এ অবস্থায় নায়েবদের মারফত তলব পাঠালে কোনো প্রজা প্রতিনিধি মাতব্বর নাও আসতে পারে।

আপনার যুক্তি আমি বুঝেছি। মহলের নায়েবদের ওপরে তলবের ভার দিলে তারা তাদের পেটোয়া মাতব্বরদেরই পাঠাবে।

হাঁ হুজুর, এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

বেশ তাহলে মাতব্বরদের একটা তালিকা করে আমাকে দিন। কতজন মাতব্বর হতে পারে ?

এক শ'র মধ্যেই তালিকা করব।

হিন্দু হবে কি পরিমাণ ?

পঞ্চাশ-ষাট হতে পারে।

তাঁরা এসে থাকবেন কোথায় ?

শিববাড়ীতে খড়ের চালা করতে হবে।

এইজন্যই বুঝি চৌধুরী জমিদারের আমলে দরগায় অত ঘর করা হয়েছিল ?

হাঁ হুজুর। আগের জমিদারের আমলে পুণ্যাহের সময় দরগার ঐ ক'খানা ঘরে কুলাত না, আরও খড়ের চালা করতে হত।

পুণ্যাহ কি ব্যাপার ?

নতুন বছরের প্রথমে বৈশাখ মাসে একটা শুভদিনে বছরের প্রথম খাজনা আদায় করে জমা করা হত। সেই উপলক্ষে সব মহলের বড়ো জোত্দার-তালুকদার-মাতব্বর-প্রধানদের সদরে নিমন্ত্রণ করা হত। তাঁরা কিছু খাজনা ও নানারকম ভেট নিয়ে সদরে হাজির হতেন। তিনদিন ধরে নানারকম গান বাজনা উৎসব হত।

এতে খরচ হত কিরকম ?

খরচ যা হত তা যাঁরা আসতেন তাঁরাই দিতেন। লাভের মধ্যে জমিদার মাতব্বরদের সঙ্গে মেলামেশা করে মহলের প্রজাদের হালচাল বুঝে নিতে পারতেন।

এইরকম পুণ্যাহ কি এখন করা যায় না ?

যাবে না কেন ? অনেক মুসলমান জমিদার ও ব্যবসাদার হিন্দুদের দেখা-দেখি হালখাতা-মহরত করেন।

তাহলে এবার থেকে আমরাও হালখাতা মহরত করব। সামনেই বৈশাখ মাস, আপনি এখন থেকেই চেষ্টায় থাকুন।

তা যদি করেন, তবে এখন মাতব্বরদের তলব না করে নতুন বছরে পয়লা বৈশাখ হালখাতা মহরতের নিমন্ত্রণ করাই ভালো হবে।

কেন ভালো হবে ?

এতে মহল কাছারির আমলারা আগে থেকেই কোনো সন্দেহ করতে পারবে না।

আমি বুঝতে পারছি, আপনি মহল কাছারির আমলা-গোমস্তাদের সন্দেহের চোখে দেখছেন।

হুজুর নিরপেক্ষভাবে প্রজা মাতব্বরদের সঙ্গে আলোচনা করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

নতুন বৎসরের পয়লা বৈশাখ সুলতানপুরের নয়া জমিদারের প্রথম পুণ্যাহ বা হাল-খাতা-মহরত। জমিদারীর সব মহল হতেই এসেছেন তালুকদার, জোতদার, মাতব্বর, প্রধান ও বড়ো ব্যবসায়ী। তাঁদের সংখ্যা পাঁচ-সাত শ'। এত লোক যে আসবেন, তা নয়া জমিদার তো দূরের কথা পুরনো কর্মচারী সদর নায়েব হরিদাস চক্রবর্তীও ধারণা করতে পারেন নি। চতুর নায়েব গোপনে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, এঁরা সব এসেছেন নয়া জমিদারের সঙ্গে একটা চরম বুঝাপড়া করতে। সেই মর্মে আগে থেকেই নায়েব জমিদারকে সতর্ক করে দিলেন।

হালখাতা মহরতে যা পাওয়া গেল তাতে সুবাদারী লাট খাজনার প্রায় অর্ধেক তঙ্কা যোগাড় হয়ে গেল। জমিদার নিজে যে নজরানা পেলেন তার পরিমাণ হল হালখাতার জমা তঙ্কায় প্রায় পাঁচ গুণ। এছাড়া যেসব উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভেট পাওয়া গেল তা দিয়ে গ্রামশুদ্ধ লোককে একমাস খাওয়ানো যেতে পারে। ব্যাপার দেখে এনায়েতুল্লা খানচৌধুরী বিস্মিতও হলেন, আশস্তও হলেন।

দিনে হালখাতা মহরত শেষ হয়ে সন্ধ্যার পর বসল দরবার। দরবারের প্রথমেই জমিদার জানালেন, সেদিন যা কিছু নজরানা পেয়েছেন তা দিয়ে শিক্ষ-

বাড়ীর শিবমন্দির নতুন করে গড়ে তুলবেন। তারপর তিনি জমিদারীর অবস্থা জানিয়ে চাইলেন প্রজা মাতব্বরদের পরামর্শ।

এর জন্য প্রজা মাতব্বরেরা পূর্বের থেকেই প্রস্তুত ছিলেন, তবে তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে, জমিদার নিজেই এই প্রসঙ্গ তুলবেন। তাঁরা ভেবেছিলেন জমিদারী ব্যাপারে নয়া জমিদার খুবই কাঁচা। এখন বুঝলেন জমিদার নয়া হলেও বুদ্ধিতে কাঁচা নন, অতএব সাবধানে কথা বলতে হবে।

উপস্থিত মাতব্বর-প্রধানদের মুখপাত্র এক বৃদ্ধ তালুকদার উঠে বললেন,—হুজুর, আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি অতি সৎলোক ও ধার্মিক। কিন্তু জমিদারী চালাতে হলে যে শিক্ষা ও বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন তা আপনার নেই। যে ব্যক্তি নিজে ক্ষেতে গিয়ে কোনোদিন চাষ-আবাদ দেখে নি, ক্ষেতে উৎপন্ন ফসল ঘরে তুলে মাপে নি, তাকে যদি আপনি আমিন নিযুক্ত করে চাষীর ক্ষেতের ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হুকুম দেন, তবে সে তার বুদ্ধি ও সুবিধা মতো এমন হিসাব দেবে, যাতে আপনার ক্ষতি অথবা প্রজার সর্বনাশ হতে পারে। আগে যাঁরা জমিদার ছিলেন তাঁরা বাল্যকাল থেকে 'হাতে কলমে' জমিদারীর কাজ শিখতেন, সেজন্য তাঁদের জমিদারী ভালোভাবে চলত। হুজুর তো সে শিক্ষা পান নি।

তাঁরাও তো কর্মচারী রেখেই জমিদারী চালাতেন।—বললেন এনায়েত খানচৌধুরী।

হাঁ, তাঁরাও নায়েব-গোমস্তা রেখেই জমিদারী চালাতেন। তাঁরা যাঁদের কর্মচারী নিযুক্ত করতেন, তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মানী ব্যক্তি। অর্থের চাইতে সম্মান ও সুনামই ছিল তাঁদের কাছে বড়ো। এখন জমিদারীতে নায়েব-গোমস্তা হয়েছেন, তাঁরা সম্মানী প্রজার সম্মান রেখে কেমন করে কথা বলতে হয় তা জানা তো দূরের কথা, কাছারির ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেমন করে বসতে হয় তাও জানেন না। তাঁরা জানেন কেবল দুর্বল প্রজাদের বিপদে ফেলে পাকে চক্রে যা কিছু আদায় করে আপন আপন ঝুলি ভরতে।

যেসব কর্মচারী সাবেক জমিদারের আমলে ছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে আনা যায় না?—জিজ্ঞাসা করলেন জমিদার।

বর্তমান অবস্থায় তাঁরা আবার কাজে আসতে রাজি হবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এ সন্দেহের হেতু?

সব কর্মচারীর ওপরে যিনি থাকেন তিনি যদি ন্যায়পরায়ণ ও অভিজ্ঞ না হন,

তবে তাঁর অধীনে কোনো সম্মানী সৎলোক কাজ করতে পারেন না, চাকরি নিতে রাজিও হন না।

তা হলে এখন কি করা যায় সেই পরামর্শ আমি আপনাদের কাছে চাই।—বললেন জমিদার।

আমাদের বিবেচনায় হুজুর যদি একজন ভালো দেওয়ান নিযুক্ত করেন, তবে বোধহয় এ সমস্যার মীমাংসা হবে।

আমি এদেশে নূতন ও অপরিচিত। দেওয়ানের উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারাই আপনাদের পছন্দমত দেওয়ান খুঁজে বের করুন। আপনারা যাঁকে পছন্দ করবেন আমি তাঁকেই দেওয়ান নিযুক্ত করব।

জমিদারের এই প্রস্তাবে মাতব্বর প্রধানেরা বেশ অসুবিধায় পড়ে গেলেন। দায়িত্বটা যে জমিদার শেষ পর্যন্ত তাঁদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেবেন, তা তাঁরা আগে বুঝে উঠতে পারেন নি। এখন জমিদারের এই প্রস্তাবে সকলে নির্বাক হয়ে গেলেন।

মাতব্বর প্রধানদের কেউ আর কিছু বলছেন না দেখে ভেওয়া ফকির উঠে বললেন,—শিবশঙ্কর রায়কে ফিরিয়ে এনে যদি দেওয়ান করা যায়, তবে আমার মনে হয় সবদিক থেকে ভালো হবে।

শিবশঙ্কর রায়! বাসুদেবপুরের কুমারবাহাদুর শিবশঙ্কর রায়?—প্রশ্ন করলেন জমিদার এনায়েতুল্লা খানচৌধুরী। দরবারে সকলেই এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বিস্মিত জমিদারের প্রশ্নের উত্তরে ভেওয়া ফকির বললেন—হাঁ, আমি কুমার বাহাদুরের কথাই বলছি। আমি শুনেছি কুমারবাহাদুরের মা যোগবলে দেহত্যাগ করার পূর্বে সকলকে ডেকে কাছে বসিয়ে কুমার বাহাদুরকে বলে গিয়েছেন, যদি কোনো সম্মানজনক চাকুরীর প্রস্তাব আসে তবে তা গ্রহণ করতে।

কিন্তু এখানে যে সেই সম্মানেরই প্রশ্ন। যিনি দু'বছর আগে এই জমিদারীর জমিদার ছিলেন, তিনি কি আজ দেওয়ান হতে পারেন?—বললেন জমিদার।

তা পারেন। হুজুর, প্রয়োজন হলে এই বামুন জাতটা সব পারে। চণ্ডীপাঠ করতে করতে দরকার হলে জুতো সেলাই করতেও তাদের বাধে না।—বললেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

শিবশঙ্কর রায়ের মাতৃ-আদেশের কথা আমিও শুনেছি। শিবশঙ্কর রায় খুব মাতৃভক্ত।—বললেন শিববাড়ীর পুরোহিত।

আমরা দশজনে গিয়ে যদি তাঁকে ধরি, তবে তিনি না বলতে পারবেন না। আমরা তাঁকে চিনি।—বললেন এক মাতব্বর।

এখন হুজুর তাঁকে হজম করতে পারবেন কিনা সেইটে চিন্তার বিষয়।—বললেন এক তালুকদার সাহেব।

কুমার শিবশঙ্কর রায় যদি আমার জমিদারীর দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন, তবে সেটা খোদার দোয়া ও আমার নসীব বলে আমি মনে করব।—বললেন জমিদার।

এর জন্ত কুমার বাহাদুর কি পাবেন ?—জিজ্ঞাসা করলেন এক বৃদ্ধ প্রধান।

আমি তাঁকে মাইনে দিয়ে অপমান করব না। জমিদারীর আয়ের সিকি ভাগ এখন তিনি পাবেন। পরে সুবিধামত আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্ত ব্যবস্থা করব।

এ ব্যবস্থা যদি করেন, তবে আপনার যথেষ্ট লাভ হবে। তিনি জমিদারীর কাজে পাকা।

কুমারবাহাদুর দেওয়ান হয়ে আসছেন, এই কথাটা মাত্র প্রচার হলে সব বিদ্রোহ থেমে যাবে।

আর কাছারিতে বসে যারা লুটেপুটে খাচ্ছে ওরা সব পালাতে পথ পাবে না।

হুজুর, আজ যারা বিদ্রোহী হয়ে খাজনা বন্ধ করেছে, দু'বছর আগে দেশে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ওরাই দু'ঘর জমিদার বাঁচানোর জন্ত লোটা-বদনা বিক্রী করে আবওয়াব দিয়েছিল। যদি প্রজারা সময় থাকতে জানতে পারত, ফৌজদারী ফৌজ জমিদার বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে, তবে ফৌজদারী ফৌজ তো দূরের কথা, নবাবী ফৌজও সহজে কিছু করতে পারত না। বিশ-তিরিশ হাজার প্রজা মরণপণ করে এগিয়ে আসত জমিদার পরিবারের মান ইজ্জত রক্ষা করতে। তাতে অন্তত চৌধুরী জমিদারের ভরাডুবি হত না। জমিদারী দখল করা এক কথা, আর প্রজাসাধারণের জমিদার হওয়া ভিন্ন কথা।

ঘাটগাছা বাসায় এসে শিবশঙ্কর রায়ের একে একে দু'বছর কেটে গেল। লক্ষীর বয়েস সতেরো, সরস্বতীর বয়স চোদ্দ। শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী ভেবে পান না কি করে মেয়েদের বিয়ে হবে। বিশ্বাস রামচাঁদ ঘোষ ও বিপিন মুদী ব্রাহ্মণের কন্তা দায় উদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করছেন, ভালো পাত্রের সন্ধানও পাওয়া

যায়, কিন্তু কেউ বাঘ-কুমীর-হর্মাদের দেশ সুন্দরবনে ছেলের বিয়ে দিতে চায় না।

নানারকম দুশ্চিন্তায় শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরীর দিন কাটছে। বৈশাখের শেষে হঠাৎ একদিন এলেন বিশ্বাস রামচাঁদ, পুরোহিত স্মৃতিরত্ন, ভেওয়া ফকির ও পাঁচজন মাতব্বর-প্রধান।

আগন্তুকদের মুখে শিবশঙ্কর ও বিশ্বেশ্বরী নয়া জমিদার ও প্রজাসাধারণের প্রস্তাব শুনলেন। সেই সঙ্গে সংবাদ পেলেন মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পরলোক গমন করায় সুবাদার হয়েছেন সরফরাজ খাঁ। সরফরাজ খাঁ একটা নিতান্ত অপদার্থ। সুবাদারের অজ্ঞতা ও চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নবাব সরকারের উচ্চস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে চলছে ক্ষমতা দখলের গোপন ষড়যন্ত্র। নীচের কর্মচারীরা যে যা পাচ্ছে লুটেপুটে খাচ্ছে। দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই বৃদ্ধ বয়সে সাম্রাজ্যের চারিদিকে এত বেশী বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছেন যে, সাধারণ প্রজা শাসন সংরক্ষণ ব্যাপারে সুদূর বাংলা তো দূরের কথা দিল্লী-আগ্রায় যা ঘটছে তারই প্রতিকার করার মতো সময় তাঁর নেই।

সব শুনে শিবশঙ্কর রায় বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে পরামর্শ করে মাতব্বর প্রধানদের বললেন—আপনারা জানেন আগের জমিদারীতে আইন ছিল বাকি খাজনার দায়ে বিধবা ও নাবালকের খোরাক-পোষাক চলার মতো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত না। আর কোনো কারণেই কাউকে পূর্বপুরুষের বাস্তু ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হত না। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তির ওপরে কোনো খাজনা বা আবওয়াব ধার্য করাও নিষিদ্ধ ছিল। আপনারা দেশে গিয়ে জমিদারের সঙ্গে দেখা করে জেনে আসুন, তিনি এই সাবেক আইন মানবেন কি না।

পরদিন শিবশঙ্কর রায়ের সর্ত নিয়ে মাতব্বর-প্রধানেরা দেশে গেলেন। একমাস পরে ফিরে এসে তাঁরা জানালেন, কুমারবাহাদুরের সর্ত শুনে জমিদার এনায়েতুল্লা খান চৌধুরী খুশী হয়েছেন। জমিদার বলেছেন, কুমারবাহাদুর এসে জমিদারীর দেওয়ানী পদ গ্রহণ ক'রে তাঁর ঐ সব সর্তানুযায়ী একখানা দলিল করলে তিনি তাতে সহি দিয়ে বাদশাহী পাঞ্জা লাগিয়ে পাকা করে দেবেন, যাতে কেউ ভবিষ্যতে ঐ সব আইন কানুনের কোনো প্রকার রদ বদল করতে না পারে।

শিবশঙ্কর রায়ের দেশে ফিরে যাওয়া স্থির হয়ে গেল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দক্ষিণবঙ্গের নদীনালায় জল বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীনালায় জল বাড়লে

জলপথে হর্মাদ দেখা যায়। শিবশঙ্কর রায়ের বজরা খুবই বড়ো, চলে কম। যদিও জমিদার এনায়েত চৌধুরী বজরা রক্ষার জন্য লস্কর পাঠাতে চেয়েছেন, তথাপি বিপিনমুদী আদুফকির ও স্থানীয় মাতব্বর প্রধানেরা এই বর্ষার জলবৃদ্ধির সময় রাজাবাহাদুরের দেশে ফেরার মত দিলেন না। ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের কামান-বন্দুক ওয়ালা জাহাজ এই সময় মধুমতী নদীর ভাটি অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। বর্ষাশেষে কার্তিক মাসে দেশে ফেরাই নিরাপদ।

রাজাবাহাদুর দেশে ফিরে যাবেন শুনে ঘাটগাছায় সকলেই অন্তরে ব্যথা পেল। স্বর্গের দেবতা অভিসপ্ত হয়ে বনবাসে এসেছিলেন, এখন তাঁরা আবার তাঁদের জায়গায় যাবেন, এতে কারও কিছু বলার নেই। যে ক'দিন তাঁদের সঙ্গ পাওয়া গেল সেইটাই লাভ।

সেবার আশ্বিন মাসে শিবশঙ্কর দুর্গোৎসবের তিনদিন ঘাটগাছার সমস্ত অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।

লক্ষ্মী পুজার সাত দিন পরে শিবশঙ্কর রায়ের যাত্রার দিন স্থির করা ছিল। একদিন আগে দশখানা ছিপ নৌকায় এল তিন শ' হিন্দু-মুসলমান প্রজা। কুমারবাহাদুরের বজরা তারা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে জমিদার এনায়েতুল্লা খান চৌধুরীর পক্ষ থেকে দশজন বরকন্দাজ নিয়ে সদর নায়েব হরিদাস চক্রবর্তী এসেছেন। তাঁদের পথ দেখিয়ে এনেছেন বিশ্বাস রামচাঁদ ঘোষ আর কেষ্টদত্ত।

রাজাবাহাদুরকে নিতে এসেছে শুনে ঘাটগাছার অধিবাসীদের মুখেচোখে প্রিয়জন বিচ্ছেদের দুঃখছায়া নেমে এল। তারা দলে দলে এসে রাজাবাহাদুর ও রানীমার সঙ্গে দেখা করে যেতে লাগল। সকলেই কিছুনা কিছু শাক শব্জি ফলমূল হাতে করে এনে বলে—'দশদিনের পথ বজরায় যেতে পথে ব'ড়া কষ্ট হবে কোথায় কি পাওয়া যায় কি না যায়, আমার এই আনাজ ক'টা সঙ্গে নেবেন, সময়ে কাজে লাগবে।'

বিশ্বেশ্বরী আগ্রহকরে তাদের হাতের জিনিস নিয়ে সেগুলো যে তাঁর খুবই কাজে লাগবে এমনিভাবে বজরায় পাঠিয়ে দেন।

যাত্রার দিন দুপুরের পর শেষ ভাটার টানে বজরা ছাড়তে হবে, যাতে মধুমতীতে পড়েই জোয়ার পাওয়া যায়। সেইভাবেই সব আয়োজন করা হল।

যাত্রার সময় বিশ্বেশ্বরী রামশঙ্করকে কোলে নিয়ে মেয়ে তিনটির সঙ্গে পথে বেরোতেই বহু বউ-ঝি নীরবে চলল তাঁর পিছে পিছে। সতীমায়ের ঘাটে এসে বিশ্বেশ্বরী গেলেন কল্যাণীর চিতাবেদীর ঘরে। ঘরে গিয়ে দুধ-আলতায়

বেদী ধুয়ে তার ওপরে রাখলেন কল্যাণীর সবচাইতে ভালো শাড়ীখানা আর একজোড়া শাঁখা, একপাত সিঁদুর। তারপর বেদীটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে, পাশে একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে বেদীর সম্মুখে গড়াগড়ি দেওয়ালেন রামশঙ্করকে। রামশঙ্কর গড়াগড়ি দিয়ে উঠলে তার কপালে চিতাবেদীর মাটির ফোঁটা দিয়ে তাকে কোলে করে চোখ মুছতে মুছতে বিশ্বেশ্বরী গিয়ে উঠলেন বজরায়।

বজরা ছেড়ে দিয়েছে। বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন নীরব নিস্তব্ধ শিবশঙ্কর রায় আর রামশঙ্করকে কোলে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র ঘাটগাছার স্ত্রীপুরুষ। কারও মুখে কোনো কথা নেই শুধু চোখে জল।

বজরা ঘাটগাছার বাঁকে ঘুরে গেল, আর দেখা গেল না।

বিশ্বেশ্বরীর অন্তরের অন্তস্তল থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে বেরিয়ে এল একটি কথা—

কি নিয়ে এসেছিলাম, আজ কি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

মধ্যপর্ব

অনাদি-অনন্ত মহাকাল চলেছেন তাঁর খেয়াল খুশিমত। কালস্রোতে ভেঙ্গেচুরে ডুবে যায়, কতকিছু নূতন ভেসে ওঠে। যা ডুবে যায়, তার সবকিছুই ভালো নয়। যা ভেসে ওঠে, তার সবকিছুই মন্দ নয়। তথাপি একশ্রেণীর বয়স্করা বলেন,—গত দিনগুলোই ভালো গেছে, এখন বড়ো দুর্দিন। কিন্তু এজগতে যা কিছু ঘটে চলেছে, তার সবকিছুই যে ভালো-মন্দে মিশানো, এই পরম সত্যটিকে অনেকেই বুঝতে চান না। তাঁরা কেবল ভালোই আশা করেন।

মানুষও ভালোমন্দে মিশানো। যার মধ্যে ভালোর ভাগ বেশী, সে ভালমন্দে মিশানো ব্যাপারগুলির মন্দটুকু সরিয়ে ভালোটুকু ব্যবহারোপযোগী স্থায়ী করার জন্ত আইন প্রণয়ন সমর্থন করে, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে। যাদের মধ্যে মন্দের ভাগ বেশী, তারা বুদ্ধি খাটিয়ে আইনকে ফাঁকি দেয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গে। ভালো মানুষে সংপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে, মন্দ মানুষে ভাঙ্গে।

এই ভালো ও মন্দ মানুষের মধ্যে যাদের বড়ো রকমের ভালো বা মন্দ হবার সুযোগ ঘটে, তাঁরা কিছুকালের জন্ত জনচিত্তে ও ইতিহাসের পাতায় স্থান পান। একখানা উপন্যাসের বই যখন প্রথম বাজারে আসে, তখন জমকালো প্রচ্ছদপট গায় জড়িয়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে আসে। তারপর মানুষের হাতে পড়ে কিছুদিনের মধ্যেই তার জম্‌কালো প্রচ্ছদপট জমক হারিয়ে খসে যায়। আরও কিছুদিন গেলে পাতা ছিঁড়ে ছাপা ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। শেষে একদিন ছেঁড়া বই আবর্জনার ঝুড়িতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ব্যক্তির ভাগ্যও এই বইয়ের মতো। প্রথম দিকে তাঁকে ও তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে জনসাধারণ খুব হৈ চৈ করে। কিছুদিন পরে হৈ চৈ তো থেমে যায়ই, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কোথাও তাঁর কথা বড়ো একটা আলোচনা হয় না। এর মধ্যে আবার ভালো ঐতিহাসিক ব্যক্তি অপেক্ষা মন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা মানুষের মনেও ইতিহাসের পাতায় বেশীদিন স্থায়ী হয়। বাংলাদেশে হর্মাদ'দের কথা এখনও অনেকে আলোচনা করেন। কিন্তু বাঙালী জমিদার রাজা দক্ষিণরায় ও রাজা মাণিক রায়—যাঁরা এককালে বাঙালী নৌবাহিনী গঠন করে দুর্ধর্ষ হর্মাদ বোম্বেটেদের তাড়িয়ে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ রক্ষা করেছিলেন,

তাঁদের কথা ক'জন বাঙালী জানেন? আরও আশ্চর্যের বিষয় অশোক আকবরের জাতি বলে গর্ব করার মতো মানুষ বড়ো একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমরা নাদির শাহ সুলতান মামুদের জাতি, বলে গর্বকরার মতো মানুষের অভাব নেই। তথাপি মহাকালের গতিপথে এই ভালো ও মন্দের প্রয়োজন আছে। ভালোর কাজ মন্দরা যদি না ভাঙে, তবে নূতনের আবির্ভাব হবে কি করে?

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যবঙ্গে ভৈরব নদের তীরে রাজনারায়ণপুর ও বাসুদেবপুর দু'খানা গ্রামের দু'ঘর হিন্দু-জমিদারের সঙ্গে গ্রাম দু'খানার নামও কালস্রোতে ডুবে গেল। সেখানে ভেসে উঠল সুলতানপুর ও মুসলমান জমিদার খান চৌধুরীর বংশ, আর হোসেনপুরে রায়বংশের নূতন পরিচয় দেওয়ান বংশ।

তারপর মহাকালের গতিপথে দু'শ বছর পার হয়ে দেখা দিল বিংশ শতাব্দী। এই দু'শ বছরের মধ্যে সুলতানপুরের মুসলমান জমিদারের জমিদারীতে কোনো ভাঙন ধরানো সম্ভব হয় নি। কারণ, জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা এনায়েতুল্লা খাঁ ও তাঁর দেওয়ান শিবশঙ্কর রায় ছিলেন বুদ্ধিমান ভালোমানুষ। ওঁরা দু'জনে পরামর্শ করে জমিদারী ও জমিদার বংশের স্থায়িত্বের জন্য করেছিলেন একখানা পারিবারিক দলিল। দলিলখানা দিল্লীর 'বাদশাহী পাঞ্জা' লাগিয়ে পাকা করা হয়েছিল। সেজন্য সেই বাদশাহী আমল থেকে এই ইংরেজ আমলের আইন-আদালতও সে দলিলের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মন্দ মানুষের কারসাজি রোধ করে জমিদারীতে ভাঙন ধরতে দেয় নি।

এনায়েতুল্লা খাঁর সেই দলিল অনুসারে জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন ষোল-আনা জমিদারী, বাড়ীঘর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক; আর সকলে পেলেন আজীবন একটা নির্দিষ্ট ভাতা। জমিদারের পক্ষে বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বাঁদীরাখা, তালাক, প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। ফলে দু'তিন পুরুষের মধ্যে এমন অবস্থা দেখা গেল, সুলতানপুরের খানচৌধুরী বংশের মহিলারা পর্যন্ত তালাক ও নিকা প্রথা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। বংশের মেয়েদের বিয়ের সময় পাত্রপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে নেওয়া হত, কোনো কারণেই তালাক দিতে পারবে না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের জননেতৃত্ব ছিল দেশের রাজা-জমিদার শ্রেণীর হাতে। ভারতের কোনো প্রদেশে 'সুবর্ণযুগ' বলে কোনো কিছু যদি

কোনো কালে ঘটে থাকে, তবে তা সম্ভব হয়েছিল ঐ রাজা-জমিদার শ্রেণীর প্রচেষ্টায়। মুস্‌লীম রাজত্বকালে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে দেশের সার্বভৌম শাসনকর্তা যে প্রকারই হন না কেন, রাজধানীর বাইরে হিন্দু-মুসলমান জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী ন্যায়পরায়ণ জননেতা। অবশ্য ভুল-ত্রুটি যে তাঁদের ছিল না, এমন কথা কেউই বলবে না; সে ভুল-ত্রুটির ফলে উৎপীড়িতের সংখ্যা অপেক্ষাগুণে উপকৃতের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, দেশে রাজা-জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্ব দূর হয়ে ধনীবণিক অথবা ধনীবণিক পৃষ্ঠপোষিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে উপকৃত অপেক্ষা অপকৃতের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সুচতুর ইংরেজ সরকার জননেতার আসন হতে রাজা-জমিদার শ্রেণীকে সরিয়ে তাঁদের স্বগোত্র ধনীবণিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রবল বাধায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা ধর্মভিত্তিক পৃথক স্বার্থবাদ আমদানী করে ...শের জনসাধারণের ঐক্য বিনাশে কৃতকার্য হলেন। তারপরেও যে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান রাজা-জমিদার ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদের বিকট হুঙ্কার গ্রাহ্য না কোরে, ইংরেজের শেষ কামড়ের বিষ ধর্মীয় ভেদ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বলতার জন্য সবদিক থেকেই পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাঁদেরই একঘর এই সুলতানপুরের মুসলমান জমিদার খান্‌চৌধুরী বংশ।

যদিও একটা হিন্দু-জমিদার বংশের বিলোপ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুলতানপুরের মুসলমান জমিদার খানচৌধুরী বংশ, তথাপি প্রতিষ্ঠাতা এনায়েতুল্লা খাঁ প্রথম দিনেই বুঝেছিলেন, বাংলার বাঙালীকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক করা যায় না। দূরদর্শী এনায়েত খাঁ শিবশঙ্কর রায়কে সুন্দরবন থেকে ফিরিয়ে এনে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই মনোভাব তাঁর বংশে সব জমিদারেরই ছিল।

শুধু সুলতানপুরের জমিদার বংশেই নয়, সেকালে সব মুসলমান জমিদার বংশেরই ধারণা ছিল, জমিদারীর কাজকর্ম হিন্দুরাই ভালো বোঝেন। তারপর প্রয়োজন হলে বাড়ীর জেনানারাও নির্ভয়ে হিন্দুকর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে

পারেন, তাতে কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই। হিন্দুকর্মচারীরা মুসলমান মনিবের বাড়ীর মহিলাদের আপন মা-বোনের মতো দেখতেন।

জমিদারেরা কর্মচারীদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য অকুণ্ঠ চেষ্টা করতেন। এদিক থেকে বাঙালী জমিদারেরা ছিলেন ইংরেজ শাসনকর্তাদের স্বগোত্র।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জমিদার হিদায়েতুল্লা খানচৌধুরীর আমলে একবার মধুমতী নদীর চরে অনেকগুলো পূবে মুসলমান জমি জবরদখল করে ঘর বেঁধে চাষ-আবাদ আরম্ভ করে। তারা জমিদারের খাজনা তো দেবেই না, নিকটবর্তী নমঃশূদ্র প্রজাদের ক্ষেতের ফসল জোর করে তুলে নিয়ে যায়, গরু ছেড়ে দিয়ে খাওয়ায়।

প্রজারা বিপন্ন হয়ে এসে নালিশ করল জমিদার-কাছারিতে। নায়েব মশাই তলব করলেন পূবেদের। তারা তলব অমান্য করল। তখন নায়েব মশাই নিজে গেলেন সরেজমিন তদন্তে। পূবেরা জোট বেঁধে তাঁকে করল অপমান।

অপমানিত নায়েবমশাই সদরে এসে ঘটনা জানালেন দেওয়ানকে। দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় নায়েব মশাইকে উপস্থিত করলেন জমিদার হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরীর খাস কামরায়। নায়েবের মুখে সব শুনে জমিদার দেওয়ানজীকে হুকুম দিলেন—আজ হতে পনেরো দিন পরে আমি মৌজা চরগোপালপুর গিয়ে জবর দখলকারী পূবেদের ভিটায় সর্ষের চারা দেখতে চাই।

হুকুম তামিল হল। চরগোপালপুরের পূবে মুসলমানদের ঘর পোড়া ছাই মধুমতীর স্রোতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পনরোদিন পরে জমিদার হিদায়েতুল্লা খাঁ ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে, পূবেদের নিশ্চিহ্ন বসতিস্থলে সর্ষের চারা দেখে নমঃশূদ্র প্রজাদের নজর সেলামী ও কুড়িখানেক ভেড়া-খাসি ভেট নিয়ে ফিরে এসে ঘর জ্বালানী মামলায় তিরিশ হাজার টাকা খরচ করলেন। দু'বছর মামলা চলে সাক্ষ্য-প্রমাণ অভাবে ডিসমিস হয়ে গেল।

আর একবার এক মফস্বল কাছারির নায়েব মশাই দু'হাজার টাকা তবিল ভাঙলেন। দেওয়ানজী অপরাধী নায়েবকে তলব করে সদরে এনে খুব ধমকিয়ে তিনমাসের মধ্যে তবিল পূরণ করে দিতে হুকুম করলেন। বিপন্ন নায়েব মশাই কোনোরকমে উপস্থিত হলেন জমিদার হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর খাসকামরায়।

জমিদার জিজ্ঞাসা করলেন—তবিল ভাঙলেন কেন?

হুজুর, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ। দুটি বয়স্থা মেয়ের বিয়ে দিতে তবিল ভাঙা পড়েছে। হুজুরের দরবারে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। হুজুর দু'শ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন।

আপনি মাইনে পান কতো ?

মাসে সাত টাকা।

বছরে তহুরি কতো হয় ?

সাত আটশ' মতো হয়।

জমিজমা কি আছে ?

তিরিশ বিঘা আবাদী জমি আর এগার বিঘের ওপরে বাড়ী বাগান পুকুর আছে।

জমিতে ফসল হয় কেমন ?

বছরের খোরাকী আর খাজনাটা হয়।

আপনার দেখছি জমির ফসলে খোরাকী ও খাজনা চলে। পুকুরে মাছ আছে। বাগ-বাগিচা যা আছে, তাতে বোধহয় আম-কাঁঠাল-নারকেল-কলা কিনতে হয় না। চাকরি করেও বছরে হাজার টাকা পান। এ সত্ত্বেও মেয়ের বিয়ের টাকা জমাতে পারেন নি কেন ?

হুজুর আমি সুলতানপুরের খানচৌধুরী জমিদারের একটা কাছারির নায়েব। এজন্য দেশে আমার একটা বিশেষ সম্মান আছে। আমার চাইতে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা কোথাও যেতে হলে গরুর গাড়ি বা ডুলিতে যান। আমার বাড়ী মেয়েদের মান বাঁচিয়ে চলতে লাগে পালকি। পাল-পার্বন ব্যাপার-বিষয়ে অপরে যেখানে ভাত ডাল দিয়ে সারে, আমার সেখানে করতে হয় লুচি পোলাও, নইলে মুখ থাকে না। এ অবস্থায় এই ঠাঁট বজায় রাখতে যা পাই, সব খরচ হয়ে যায়। বছরান্তে এক পয়সাও জমে না। তাতে মেয়ের বিয়ের টাকা জমাব কি করে! হুজুর আমাকে বরখাস্ত করুন। তা হলে এই ঠাঁট বজায় রাখার দায় থেকে রেহাই পেয়ে জমিজমা যা আছে তাই নাড়াচাড়া করে একরকম চলতে পারব। সুলতানপুরের জমিদারের নায়েবী পদে বহাল থেকে ঠাঁট ছাড়তে পারব না।

আরে না না, আমি সে কথা বলছিনে। আপনি দেখছি চটে গেলেন। আপনার গিন্নীর আর ক'টি কন্যারত্ন ঘরে মজুত আছে ?

আজ্ঞে আরও দুটি আছে।

তা হলে তো ঠকে গেছেন। আপনাদের না কি 'পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং'। কাজেই এখনও একটির অভাব। যাই হোক এরপর মেয়ে পার করতে আর তবিল ভাঙ্গবেন না। ওটা খুব খারাপ নজির। মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে আমার কাছে আসবেন। এখন আপনি দেশে যান।

নায়েব মশাই বিদায় হলে জমিদার ডেকে আনলেন দেওয়ানজীকে। দেওয়ান এলে তাঁকে বললেন,—নায়েব মশাইর তবিলতছরুপের ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে ও টাকা আর আদায় হবে না। টাকাটা আমার নামে খরচ লিখে হিসাবসই করতে খাজাঞ্চিমশাইকে বলবেন।

হিদায়েত খাঁর যুবক পুত্র পিতার কাছে বসে ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখে বললেন,—বাপজান তা হলে নায়েব মশাইর সব কসুর মাফ করে টাকাটাও ছেড়ে দিলেন! নায়েব মশাই তো একবারও ক্ষমা চাইলেন না, টাকাটাও তো মাফ চান নি!

কেন, এতে ক্ষমা-মাফের কি আছে? তিনি তো খাতাপত্রে কোনো হিসাবের কারচুপি করেন নি। সে শয়তানী মতলব তাঁর থাকলে তাঁকে ধরা সহজ হত না।

টাকাটা তো তিনি তছরুপ করেছেন?

না, মোটেই তছরুপ করেন নি। কুলীনবামুন মেয়ের বিয়ের কঠিন দায়ে ঠেকে হাতের টাকা খরচ করে ফেলেছেন। এ টাকা তিনি সময় পেলে ফেরত দিতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে ফেরত নেওয়া চলে না। বাপু জমিদার হওয়া একটু শেখো, টাকার মায়া করলে জমিদার হওয়া যায় না।—

'এই নায়েব মশাই আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন সৎলোক। মেয়ের বিয়ের জন্য আমার কাছে সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। আমি কোনো খোঁজ না করে দু'শ' টাকা মঞ্জুর করেছিলাম। কুলীনবামুনের দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দু'শ টাকায় হয়? আর টাকা তিনি পাবেন কোথায়? সুদখোর মহাজনের কাছে টাকা কর্জ করলে, সে কর্জ শোধ করার ক্ষমতা নায়েবের নেই। ফলে দু'হাজার টাকা তিন বছরে পাঁচ হাজার হয়ে সুলতানপুর জমিদারের নায়েবের বসতবাড়ীতে যদি ডিক্রিজারীর ঢোল বাজত, তবে আমার সম্মান থাকত?—

'বাপু, জমিদারী থাকলেই জমিদার হওয়া যায় না। আজকাল অনেক সুদখোর মহাজন টাকার জোরে জমিদারী কিনেছে, কিন্তু জমিদার হতে পারে নি। আগে তারা টাকার ব্যবসা করত, এখন করে জমিদারীর ব্যবসা। এদের জন্যই বনেদী জমিদারাও দুর্নামের ভাগী হচ্ছেন।—

এই নায়েবমশাই টাকা শোধ করতে যে একেবারে অসমর্থ, তা নয়। পাঁচ শ' টাকার কিস্তি করলে তা তিনি দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে ফল হত এই যে, সুলতানপুরের জমিদারের নায়েব যে চালে চলেন, সে চাল ওঁর পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব হত না। তাতে যে অসম্মান হত, সে অসম্মান ঐ নায়েবের নয়, সে অসম্মান আমার।—

নায়েবমশাই যদি কৃপণ হতেন তা' হলেও কিছু বলা যেত ; কিন্তু লোকটি কৃপণ নন এ ছাড়া আর একটা কথা বুঝে দেখতে হবে, উনি চাকরি হতে বরখাস্ত করতে বললেন। 'এ কথায় বুঝা যায়, লোকটি লোভী নয়। সেই সঙ্গে নায়েবী পদের সম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল। এখন বুঝে দেখ, এই ব্রাহ্মণ নায়েবটির দৃষ্টি কোথায়। এই সমস্ত সম্মানী কর্মচারীরাই জমিদারের মর্যাদা রক্ষার জন্য জানকবুল করতে পারে। সামান্য দু'হাজার টাকার জন্য এমন একজন মানী কর্মচারীর সঙ্গে আমি দুর্ব্যবহার করব ?—

তুমি যখন জমিদারী হাতে পাবে তখন কর্মচারী নিযুক্ত করতে সতর্ক হবে। বনেদী সম্ভ্রান্ত বংশের কর্মচারী যদি কিছু খান, তোমার স্বার্থ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই খাবেন। লক্ষ্য করে দেখো, এঁরা যখন খেতে বসেন, তখন পাতের খাদ্য চেটেপুটে খান না, অনেক ফেলে রেখে খান। এঁদের উচ্ছিষ্ট খেয়েও অনেক জীব বাঁচে। চেটেপুটে খাওয়ার অভ্যাস ও মতলব এঁদের ধাতে নেই।

মানুষ যা গড়ে তোলে তা টিকিয়ে রাখার জন্য সতর্কতার অন্ত নেই। সংসারী মানুষ সংসার গুছিয়ে বেঁধে-তুলে মনে ভাবে তার বিষয়-সম্পদ অটুট থেকে পুত্র-পৌত্রাদির ভোগে লাগবে। কিন্তু খেয়ালী মহাকালের চলার পথে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। গড়া আর ভাঙ্গা, ভাঙ্গা আর গড়া, এই মহাকালের খেলা।

সুলতানপুরের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা এনায়েতুল্লা খাঁ ও তাঁর দেওয়ান বন্ধু শিবশঙ্কর রায় বুদ্ধি খাটিয়ে বেঁধেছিলেন খানচৌধুরী বংশের জমিদারী। সে জমিদারী সওয়া দু'শ' বছর অটুট থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তার ওপরে হল বজ্রাঘাত।

জমিদার হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর ছোটো ভাই রহমতুল্লা চৌধুরী ছিলেন ঢাকার উকিল। একদিন উকিলভাই জমিদারভাইকে 'উকিল চিঠি' দিয়ে জানালেন, তাঁর আইনত প্রাপ্য অংশ আপোষে বাঁটোয়ারা করে না দিলে জমিদারী ও অপরাপর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

রেজেষ্ট্রী চিঠি পেয়ে বিস্মিত হিদায়েতুল্লা চৌধুরী ডেকে আনলেন তাঁর দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়কে। দেওয়ান পত্র পড়ে চিন্তিত হয়ে বললেন—আপনি এখনই অন্দরমহলে গিয়ে সিন্দুক খুলে দেখুন তো, এনায়েত খাঁর সেই দলিলখানা আছে কিনা।

দেওয়ানের কথামত হিদায়েত চৌধুরী তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুললেন। দলিলখানা ছিল একটা সুদৃশ্য চামড়ার পেটীর মধ্যে। পেটীটা আছে, কিন্তু তার ভিতরে দলিলখানা নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন জমিদার হিদায়েতুল্লা খানচৌধুরী।

পুত্র জাফরুল্লা গিয়ে ডেকে আনলেন দেওয়ানজীকে। দেওয়ান ও জমিদার তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সব বাক্স সিন্দুক। নাঃ, দলিল নেই। বোঝা গেল, দলিল সরিয়ে তবে ভাগের দাবি তোলা হয়েছে।

দু'শ' বছরের মধ্যে কেউ দলিল অস্বীকার করে সম্পত্তি ভাগের দাবি করে নি। সে জন্য কোনো আদালতের নথিপত্রে এ দলিলের উল্লেখ নেই। যারা দলিলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে, তারাও বোধহয় সত্য কথা বলবে না। কারণ, এ দলিল খোয়া গিয়ে তাদেরও লাভ হয়েছে। দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন, ভাগের দাবি মাত্র এই একটিতেই শেষ নয়; আরও বহু আসবে কার্যতও তাই হল, দু' সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি দাবি-দারের উকিল চিঠি এসে গেল। দেখে শুনে হিদায়েত চৌধুরী পাগলের মতো হয়ে উঠলেন।

এনায়েতুল্লা খাঁ ও শিবশঙ্কর রায়ের আমল থেকে একাল পর্যন্ত বহুপুরুষ যাবৎ সুলতানপুরের জমিদার বংশ ও হোসেনপুরের রায়-দেওয়ান বংশ সমস্বার্থে সুখে-দুঃখে জড়িয়ে পাশাপাশি চলার ফলে উভয় বংশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা নিবিড় সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ আত্মীয়তা অপেক্ষাও বড়ো। জমিদার হিদায়েতুল্লা চৌধুরী ছিলেন দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়ের বয়সে ছোটো। দেওয়ান জমিদারকে ডাকতেন, ভাইসাহেব; জমিদার দেওয়ানকে ডাকেন, দাদাভাই।

দলিলখোয়ানো দুর্ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত জমিদারকে দেওয়ান ভরসা দিয়ে বললেন,—ভাইসাহেব, আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না। মামলা কি করে চালাতে হবে তা আমি জানি। সরিকান মামলা যে কি ব্যাপার তা' রহমত ভাইও জানে, কারণ সে উকিল। একটু অসুবিধা হবে আরগুলো নিয়ে। তবে যাই হোক না কেন, আপনি একেবারে পথে বসবেন না। প্রথমে আমি একটা আপোষ-মীমাংসা করার চেষ্টাই করব। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

জমিদার উত্তর করলেন. দাদাভাই, যা করতে হয় আপনি করবেন। এ নিয়ে আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। কাগজপত্রে যদি আমার স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়, তবে আনবেন; আমি সহি করে দেব।

দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। দাবিদার বহু হওয়ায় মীমাংসা সহজ হয় না। তথাপি দেওয়ান কাউকে আদালতে যেতে দিলেন না; দেড় বছর আলোচনা চালিয়ে আপোষেই মীমাংসা করলেন।

আপোষের দলিলপত্রে হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর স্বাক্ষর নেবার জন্য দেওয়ান তাঁর খাসকামরায় উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

কত কি বাঁচাতে পারলেন?

হাজার বিশেক টাকা আয়ের জমিদারী, কলকাতার বাড়ী দুখানা, আর সুলতানপুরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে।

ব্যাঙ্কের টাকার কি হল?

আপনার নামে যা ছিল তার ভাগ দিতে হয়েছে। জাফরের নামে যা আছে সেইটা রক্ষা পেয়েছে।

সে টাকা কি করে বাঁচালেন?

সে টাকার দাবিও উকিলভাই করেছিল। শুধু ঐ টাকাটাই নয়, এই বাড়ী ঢাকার পুরনো বাড়ী ও সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ভাগের কথা উঠেছিল।

তখন আপনি কি করে তাদের থামালেন?

নিজ মূর্তি ধরে থামালাম।

সেটা কি রকম?

বললাম,—দেখো, আমি দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়। মামলা মোকদ্দমা কেমন করে করতে হয় তা তোমাদের চাইতে ভালোই জানি। যদি তোমরা এনায়েত খাঁর দলিল চুরির সুযোগ নিয়ে দাবির পর দাবি বাড়িয়ে চলো, তবে তোমরা আদালতে যাও। আমি কোনো আপোষ না করে শেষ পর্যন্ত লড়ে তোমাদের শান্‌কি-বদনা বেচিয়ে ছাড়ব। জমিদারী আমার হাতে, কাল থেকেই আমি তোমাদের মাসিক ভাতা বন্ধ করে দুই সপ্তাহের মধ্যে রহমত উকিলকে ঢাকার পুরনো বাড়ী থেকে বের করে দেব। তারপর তোমাদের ভাতার টাকা দিয়ে তোমাদের সঙ্গে মামলা করব। তাছাড়া বছরে বিশ-তিরিশ হাজার টাকা মামলা খরচ করতে আমার বাধবে না। তোমাদের কিন্তু শেষে ভিটায় ঘুঘু চড়বে। এটা সরিকান বাঁটোয়ারার মামলা। এ মামলা যতকাল ইচ্ছা, ততকাল টিকিয়ে রাখা যায়। তোমরা যাও, আমি কোনো আপোষ করব না।

তারপর?—হিদায়েত চৌধুরী শুয়েছিলেন, উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন।

তারপর সেদিন আর তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করলাম না। পরে

পৃথক পৃথক ভাবে এক একজন আসতে আরম্ভ করলেন। আমি সকলকেই জানিয়ে দিলাম, এরকম এসে কোনো ফল হবে না। সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যদি আমার প্রদত্ত সর্ত বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে সম্মত হও, তবে এসে সোলেনামায় স্বাক্ষর দিয়ে রেজেস্ট্রি করে দিতে হবে। শেষে আজ সকালে সবকয়টি দাবিদার আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দলিলে স্বাক্ষর করেছে। এখন আপনার স্বাক্ষর নিয়ে আগামীকাল রেজেস্ট্রি করব।

ওই দেড় বছর কি ওদের ভাতা বন্ধ করেছিলেন ?

না, তা করি নি।

কেন করলেন না ? ওদের ভাতা বন্ধ করে মামলা চালালেই তো পারতেন।

দেখুন ভাইসাহেব, দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করে আমি যা বুঝতে পারছি, তাতে এদেশে জমিদারী প্রথা আর বেশীদিন চলবে না। অকারণ এই সব দাবিদারদের এত বড়ো আশায় নিরাশ করে তাদের অভিসম্পাত কুড়িয়ে লাভ কি! ওরা জমিদারী ভাগ করে নিয়ে অনেকেই বেচে দেবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ওদের কাছ থেকে অনেক শস্তায় জমিদারীর অংশগুলি কিনে দিতে পারি। কিন্তু যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে সময় থাকতে অন্য উপায়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করাই সঙ্গত। ওদের ভাতা বন্ধ করিনি তার কারণ, ভাতা বন্ধ করলে অনেকেরই ছেলেপুলের পড়া বন্ধ হয়ে যেত, এমন কি ভাত কাপড়ের কষ্টও হত। হাজার হলেও ওরা তো সুলতানপুরের জমিদার খানচৌধুরী বংশের আত্মীয়।

কিন্তু আপনি যে, বছরে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা পেতেন, আপনার চলবে কি করে ?

এর জন্য আপনি ভাববেন না। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমাদের হাতে বছরে বিশ-পঞ্চাশ হাজার এলেও অভাব ঘোচে না, না এলেও ঠেকে থাকে না। এখন থেকে মাসে তিন শ' টাকা মাইনে নেব।

অ্যাঁঃ, আপনাকে আমি মাইনে দেব!—হিদায়েত চৌধুরী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—শিবশঙ্কর রায়ের বংশধর উমাশঙ্কর রায়কে এনায়েত খাঁর বংশধর হিদায়েত খাঁ দেবে মাইনে। হা খোদা, এ আমারই অসঙ্গত লোভের শাস্তি। দাদাভাই, আপনি আজকের মতো যান; কাল প্রভাতে দলিল আনবেন আমি স্বাক্ষর করব।—এই বলে হিদায়েত চৌধুরী খাসকামরার পিছন দরজা খুলে অন্দরমহলে চলে গেলেন। খাসকামরায় থাকলেন দেওয়ানজী ও জাফরুল্লা।

বিস্মিত জাফরুল্লা জিজ্ঞাসা করলেন,—দেওয়ান চাচা, বাপজান ও কথা বললেন কেন?

কি কথা?

ঐ যে অসঙ্গত লোভের শাস্তির কথা?

বাপু, ভাবনা-চিন্তায় তোমার বাপজানের একটু মানসিক চাঞ্চল্য ঘটেছে।

না দেওয়ান চাচা, বাপজানের এ কথার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

সরিকান গণ্ডগোল মিটে গেলে একদিন দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় জমিদার হিদায়েতুল্লা চৌধুরীকে বললেন,—জাফরের নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে আছে ঐ টাকায় কলকাতায় একটা জমি কিনে আধুনিক ধরণের একখানা বাড়ী করলে একটা আয়ের পন্থাও হবে, প্রয়োজন হলে জাফরও গিয়ে বাস করতে পারবে।

বাপের কাছে বসেছিলেন জাফরুল্লা। তিনি প্রশ্ন করলেন,—দেওয়ান চাচা, সেদিন আপনি বলেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে জমিদারী প্রথা থাকবে না। আজও বলছেন কলকাতায় বাড়ী করাই ভালো। আপনার এই কথা ও পরামর্শের হেতু কি? আমরা কি কালে এদেশে থাকতে পারব না?

বাপজান, বর্তমানে আমাদের দেশের পরিস্থিতি দেখে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান আসন্ন। তারপর যাঁরা শাসন কর্তৃত্ব হাতে পাবেন, তাঁরা জমিদারী প্রথার বিরোধী না হলেও বনেদী জমিদারদের বিরোধী।

এর হেতু?

'বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব করছেন তাঁরা প্রায় সকলেই দেশের ধনীবণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। দেশের জনসাধারণ বনেদী রাজা জমিদারদের যেরকম শ্রদ্ধা-সম্মান করে, তা দেখে এই বণিক সম্প্রদায় ঈর্ষান্বিত। যতই ভারতের স্বাধীনতা এগিয়ে আসছে ততই টাকার জোরে কূটকৌশলে প্রচার চালিয়ে জনসাধারণের মনে জমিদার বিদ্বেষ জাগানো হচ্ছে। এই সব দেখে আমার মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম বলি হবে দেশের রাজা জমিদার গোষ্ঠী।'

হিদায়েতুল্লা পুত্র জাফরুল্লাকে বললেন,—বাপু, তোমার দেওয়ান চাচার পরামর্শ মতই কাজ কর। দেওয়ান দাদা দূরদর্শী। ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে তা অনেক আগেই বলে দিতে পারেন।

আচ্ছা দেওয়ান চাচা, ভবিষ্যতে আমরা দেশে থাকতে পারব না কেন ?—প্রশ্ন করলেন জাফরুল্লা।

এ আর একটা গুরুতর সমস্যা। দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষ যেভাবে ছড়ানো হচ্ছে, তাতে তোমাদের মত অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত পরিবার এসব অঞ্চলে সসম্মানে বাস করতে পারবে না। কলকাতায়ও এমন জায়গায় বাড়ী করতে হবে, যেখানে ধর্মের গোঁড়ামী নেই।

এরপর জমিদারের সম্মতি পেয়ে এক বছরের মধ্যে কলকাতার বালীগঞ্জে একখানা চারতলা বাড়ী করলেন দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়। চারতলায় আটটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। চারতলায় একটা ফ্ল্যাট নিজেদের জন্য রেখে আর সাতটা ভাড়া চলবে।

বাড়ী তৈরী শেষ হলে দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় জাফরুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা গেলেন গৃহপ্রবেশ করতে। দিনমতো গৃহপ্রবেশ ও কলকাতার অন্যান্য কাজ শেষ করে দু'জনে বাড়ী ফেরার পথে দুপুরে যশোহর স্টেশনে ট্রেন হতে নেমেই উমাশঙ্কর রায় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হলেন। রোগীকে স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে রেখে জাফরুল্লা যশোরে সব ক'টি বড়ো ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারেরা রোগী দেখে মন্তব্য করলেন, 'বিশেষ কোনো আশা নেই। বাঁচেন যদি তবে সে ভগবানের দয়া। রোগী বাড়ী নিয়ে যান।'

জাফরুল্লা দু'খানা ট্যাক্সি যোগাড় করে রোগী ও দু'জন ডাক্তার নিয়ে চললেন হোসেনপুর। হোসেনপুরের বাড়ীতে দেওয়ানজীকে রেখে সুলতানপুর গিয়ে সংবাদ দিলেন হিদায়েতুল্লা চৌধুরীকে। হিদায়েতুল্লা চৌধুরী হোসেনপুর দেওয়ান বাড়ী পৌঁছিয়ে দেখলেন সবশেষ হয়ে গেছে, দেওয়ান দাদা চিরতরে তাঁকে ছেড়ে গেছেন।

উমাশঙ্কর রায়ের তিন পুত্রের বড়ো দু'টি বিদেশে ভালো চাকরি করেন। কনিষ্ঠ গৌরীশঙ্কর জাফরুল্লার সমবয়সী বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে যশোর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতা গিয়ে একই কলেজে ভর্তি হয়ে একসঙ্গেই বি.এ. পাশ করেছেন। দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়ের ইচ্ছা ছিল তাঁর অভাবে গৌরীশঙ্কর দেওয়ান হবেন। সেজন্য তিনি ছেলেকে বাইরে চাকরি করতে না দিয়ে বাড়ীতে রেখে জমিদারীর কাজ শিখোচ্ছিলেন।

উমাশঙ্কর রায়ের শ্রাদ্ধাদি শেষ হলে একদিন হিদায়েতুল্লা চৌধুরী পুত্র জাফরুল্লাকে পাঠিয়ে ডেকে আনলেন গৌরীশঙ্করকে। জাফরুল্লার সঙ্গে গৌরী-শঙ্কর এসে দেখা করলে হিদায়েতুল্লা চৌধুরী বললেন—

বাপু, তোমার বাবা তো চলে গেলেন। আমারও যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এখন যা কিছু ছিটেফোঁটা আছে এই নিয়ে তুমি সুলতানপুরের ভাঙা হাটে দেওয়ানী করবে কি?

গৌরীশঙ্কর মাথা নত করে উত্তর দিলেন,—চাচাসাহেব, আপনাদের সঙ্গে আমাদের বহুপুরুষের সম্বন্ধ। জাফরভাই আর আমি ছেলেবেলা হতে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। বাবা চলে গেলেন, এখন আপনি যদি দয়া করে আশ্রয় না দেন তবে কোথায় যাব?

গৌরীশঙ্করের কথায় হিদায়েতুল্লা চৌধুরী বেশ একটু বিচলিত হয়ে ভারী গলায় বললেন—এটা আমার পক্ষে দয়া করার বিষয়ও নয়, আশ্রয় দেওয়াও নয়। সুলতানপুরের চৌধুরীদের কাছে তোমাদের অনেক কিছুই পাওনা ছিল। তা দেওয়া হয় নি বলেই আজ খোদার গজবে এতবড়ো জমিদারী ভেঙ্গে গেল। যা হোক্, তুমি যখন এই ভাঙ্গা টুকরো জমিদারীর দেওয়ান হতে চাইলে, তখন একটা ভালো দিন দেখে এসে দেওয়ানের গদীতে বস। তোমরা দু'জনেই দেওয়ান দাদার কাছে কিছু কিছু শিখেছ, এখন সেই বিদ্যে খাটিয়ে চেষ্টা করে দেখো এনায়েত খাঁর শান্‌কি আর শিবশঙ্কর রায়ের পাতা চেটে পেট ভরে কি না।

এই বলে উঠে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—আর একটা কথা শোনো। রোজ ছয় বেহারার পালকি হাঁকিয়ে যাতায়াত করার দিন সুলতানপুর জমিদারের দেওয়ানের চলে গিয়েছে। এখন এখানেই একটা বাসা করে নাও। একেবারে বেদের টোঙ করো না। আমি বেঁচে থাকা পযন্ত 'ঘরে ছুচোর কেত্তন চললেও বাইরে কোঁচার পত্তন' রেখেই চলতে হবে। খাজাঞ্চির কাছে খোঁজ নিয়ে দেখো, হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া যায় কিনা। তাই দিয়ে একটু ভদ্র ভাবের ছোটো বাংলো তৈরী করে তোমার মা ও বউমাকে এখানে নিয়ে এস।

হিদায়েতুল্লা চৌধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গৌরীশঙ্কর কিছুক্ষণ নীরব থেকে জাফরুল্লাকে বললেন,—এরপর চাচা সাহেবের সঙ্গে আমাদের আর বেশী বৈষয়িক আলাপ না করাই ভালো। পরপর দুটো আঘাতে চাচাসাহেব ভেঙ্গে পড়েছেন। এখন হতে আমরা দুজনে যা পারি তাই করব। না পারলে সদর নায়েব মশাইএর পরামর্শ নেব।

তা যা হয় হবে ; কিন্তু বাপজান আজও আবার ঐ কথাই বললেন কেন !

কি কথা ?

আমরা তোমাদের কাছে দেনা আছি !

তুমি সব বিষয়েই 'চায়ের কাপে তুফান তোলো।' এটা তোমার একটা বদ্‌অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। চাচাসাহেব বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন ভালোও বাসতেন। বাবা তোমাদের জন্য যা কিছু করেছেন, তাকেই চাচাসাহেব অনেক বড়ো করে দেখে ও কথাটা বলেছেন।

না ভাই, অত তুচ্ছ ব্যাপার এটা নয়।

তবে খুব গুরুতর ব্যাপার। রাত্রে বেগম সাহেবার কাছে বসে এই গুরুতর ব্যাপার নিয়ে গুরুগম্ভীর গবেষণা চালিও। এখন চল খাজাঞ্চি মশাই'র কাছে খোঁজ নিয়ে নায়েব মশাইকে কথাটা বলে যাই। ভালোই হল, এখন থেকে দু'জনে এক জায়গায়ই থাকব।

ভাঙাগড়ার খেয়ালে মত্ত মহাকাল চলেছেন এগিয়ে। তাঁর গতি যেন মিলিটারী মার্চ, পথের দুধারে কি হল তা দেখার অবকাশ নেই। কেবল এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, থামার হুকুম নেই।

মিলিটারী মার্চ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে থেমে যায়, মহাকালের গতি কিন্তু থামে না, বিশ্ব ধ্বংস হলেও থামবে না।

এই অবিরাম গতিপথে ভাঙ্গার কান্না মহাকালের বুকে ব্যথা দেয় না। গড়ার হাসিও তাঁকে উৎফুল্ল করে না। মহাকালই খাঁটি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী।

এই মহাসন্ন্যাসী মহাকালের গতিপথে ক্ষণিকের সঙ্গী মানুষ চেষ্টা করে তার দেখা ভাঙ্গা-গড়া হাসি-কান্নার ইতিহাস লিখে পিছনের পথযাত্রীদের জানাতে। কিন্তু সে ইতিহাসও বেশীদিন চালু থাকে না, বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায়। তথাপি ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখেন। কারণ, ক্ষণিক হলেও তার সার্থকতা আছে।

জমিতে পড়ে আছে একটা অতিক্ষুদ্র বট-বীজ। তার বিগত ইতিহাস দেয় অনাগত ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত, সে ইঙ্গিত উপেক্ষা করা যায় না। দেখা যায় বহু প্রাচীন অট্টালিকা দেবদেউল গ্রাস করে ঐ ক্ষুদ্র বট-বীজের ভবিষ্যৎ। যে বট-বীজ পথের পথিকের পায়ের তলে পড়ত, তারই ভবিষ্যৎ শীতল ছায়া দিচ্ছে কত পথশ্রান্ত পথিককে। তাই অনেক ঘটনার বিগত দিনের ইতিহাস ইঙ্গিত করে আগামীদিনের পরিণতি। এরই মধ্যেই ভাঙ্গাগড়ার কান্না-হাসি।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভৈরবের তীরে রাজনারায়ণপুর ও বাসুদেবপুরের দু'ঘর জমিদারের জমিদারী ভেঙ্গে মর্মান্তিক কান্নার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সুলতানপুরের জমিদারী। কালক্রমে সুলতানপুর জমিদারীর হাসির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল রাজনারায়ণপুর ও বাসুদেবপুরের কান্না। তারপর সওয়া দু'শ' বছর গত হয়ে আরম্ভ হল সুলতানপুরের জমিদারী ভাঙ্গার কান্না। সে কান্না জমিদার হিদায়েতুল্লা খানচৌধুরী বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না। ভাঙন আরম্ভ হওয়ার ছ' বছর পরে এ সংসারের সব দেনা-পাওনা মুলতুবী রেখে যেখানে চলে গেলেন, সেখানে বোধহয় এ জগতের হাসিকান্না পৌছায় না।

হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর মৃত্যুর পর সুলতানপুরের জমিদারীর ওপরে আর একটা আঘাত এল তাঁর জামাই ওমর সাহেবের পরামর্শে কন্যা জুলেখা বেগমের হাত হতে। নগদ বিশ হাজার টাকা ও কলকাতায় কলুটোলার বাড়ীখানা নিয়ে জুলেখা বেগম ভাই জাফরুল্লার বরাবর না-দাবী পত্র লিখে দিলেন।

সব মিটিয়ে যেদিন ওমরসাহেব ও জুলেখা সুলতানপুর ত্যাগ করলেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা জাফরুল্লা চৌধুরী ও গৌরীশঙ্কর রায় বেড়াতে বেরিয়ে ভেওয়া ফকিরের দরগার সম্মুখে ভৈরবের তীরে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে ছিল তাঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। গৌরীশঙ্করের ছেলে গোলাপ, বয়স সাত। জাফরুল্লা সাহেবের মেয়ে শিউলী, বয়স পাঁচ। তারা দুজন খোলা জায়গা পেয়ে মনের আনন্দে খেলা আরম্ভ করল।

ওমর সাহেব ও জুলেখা বিদায় হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত জমিদার ও দেওয়ান বন্ধুতে সে সম্পর্কে কোনো কথা হয় নি। ভৈরবের তীরে বসে দেওয়ান গৌরী-শঙ্কর বললেন,—আমাদের এই অবস্থায় দিদি এতটা দাবি করবেন, একথা আমি ভাবতেই পারি নি। বিয়ের সময় চাচাসাহেব নাকি নগদে ও যৌতুকে ষাট হাজার টাকার বুঝ দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও এখন তাঁরা তাঁদের দাবি কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিয়ে গেলেন। টাকাটা যোগাড় করার জন্যও সময় দিলেন না। সময় পেলে গোপালপুরের খাসমহলটা অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী হত।

ভাই, এতে সম্পূর্ণ দোষ দিদির নয়। ওমরসাহেব দিদিকে যা শিখিয়ে দিয়েছেন, দিদি তাই করেছেন। এর জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার একমাত্র মেয়ে শিউলী, তোমারও একমাত্র ছেলে গোলাপ। আমাদের দুজনেরই যখন আর সন্তানের আশা নেই, তখন যা আছে এতেই দুটো ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারব। আমি চিন্তিত হয়েছি অন্য কারণে। ওমরসাহেব নেশাখোর জুয়াড়ী। চিতপুরের আতরের দোকানে মূলধন নেই। বাড়ীখানাও দেনায়

দায়ে যেতে বসেছে। এখানে যা পেলেন; এ দিয়ে যদি বুঝে-সুঝে চলেন, তবে একরকম ভদ্রভাবেই চলতে পারতেন। কিন্তু তা হবে না, নেশা ও জুয়ায় সব উড়ে যাবে। শেষে দিদি আমাদের ঘাড়েই চাপবেন।

এটা যদি বুঝেছিলে তবে এখনই সব দিলে কেন?

না দিয়ে কি করি বল? দিদি কিছুতেই আমার পরামর্শ শুনলেন না। ওমরসাহেব তাঁকে শিখিয়েছেন, এখন ভাগ করে পাওনা বুঝে না নিলে শেষে আর পাওয়া যাবে না।

কলুটোলার বাড়ীখানা তো দেওয়া হল দিদির নামে। বাড়ীখানা আর কুড়িহাজার টাকা দিদির স্ত্রীধন। স্ত্রীধনের ওপরে তো কারও হাত দেবার অধিকার নেই!

দিদির শ্বশুরও তাই বুঝে সব সম্পত্তির অর্ধাংশ দিদির নামে করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিদি অত্যন্ত সরল নির্বোধ। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া ওমর সাহেবের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

তাহলে আর কি করা যাবে। তুমিও নির্বোধ কম নও। ভিতরের অবস্থাটা যদি আগে আমাকে বুঝিয়ে বলতে, তবে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেত। হাতের পাখি উড়ে গিয়েছে, এখন ওসব চিন্তা রেখে ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে একটু নজর রাখো। ওরা আজ অনেকদিন পরে এখানে এসে বড়ো চঞ্চল হয়ে পড়েছে, যেন জলের ধারে না যায়। আমি শিব বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আসি।

শেষ ফাল্গুনের বসন্ত-আমেজী সন্ধ্যারাত। আকাশে আছে দশমীর চাঁদ। ভৈরবের তীরে খোলা জায়গায় মনের আনন্দে ছুটাছুটি করে খেলা করছে দুটো সরল ছেলে মেয়ে শিউলী আর গোলাপ।

ভৈরবের বুকে ঢেউ-এর ওপরে কত চাঁদ নাচছে। আকাশের দুষ্টু চাঁদ ধরা যায় না। ঢেউ-এর ওপরকার চাঁদ ঢিল ছুঁড়ে জব্দ করা যায়, কি মজা! জোনাকি বাতি নিয়ে উড়ে বেড়ায়, ধরতে গেলেই বাতি নিভিয়ে দেয়, ধরে গোলার জামার পকেটে রাখলে সেখানে বসে বাতি জ্বালে, কি মজা! শিউলী দৌড়ালে তার মাথার বেণী দোলে, বেণীতে জোনাকি বসিয়ে দিলে কেমন হয়? বেণীর দোলনের সঙ্গে জোনাকির আলো ঝক্‌মক্ করে, কি মজা।

জাফর সাহেব বসে বসে শিউলী-গোলাপের খেলা দেখছিলেন। শিউলীর বেণীতে জোনাকির ঝিকিমিকি দেখে দুজনকে কাছে ডাকলেন। কাছে এলে

হেসে বললেন,—বাঃ বেণীতে তো বেশ জ্যান্ত হীরের ফুল পরেছিস। গোলাপ পরিয়ে দিয়েছে বুঝি? বেশ সুন্দর হয়েছে। জলের ধারে যেও না, ওপরে দু'জন খেলা কর। বেণীতে হীরেফুলের দোলন দেখতে বেশ লাগবে।

প্রশংসা পেয়ে দু'জনের স্ফূর্তি আরও বেড়ে গেল, আরম্ভ করল পাল্লা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি খেলা। এমন সময় ভেওয়া ফকির এলেন দুটো ফুলের মালা নিয়ে।

প্রতিদিনই দরগায় বহু ফুলের মালা আসে। যে দিন জমিদার মেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসেন সেদিন ফকির একটা ভালো মালা জমিদারের মেয়েকে দেন। সঙ্গে যদি দেওয়ানজীর ছেলে থাকে, তবে তাকেও একটা মালা দেন।

সে দিনও সেই সন্ধ্যারাতে ফকির সাহেব দুটি ছেলেমেয়ের জন্য দু'টো মালা এনেছেন। তাঁকে মালা হাতে আসতে দেখে শিউলী ও গোলাপ খেলা ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল ফকির সাহেবের সম্মুখে। মালা দু'টার একটা লাল গোলাপের, আর একটা গাঁদা ফুলের। ফকির সাহেব গোলাপের মালাটা দিলেন শিউলিকে, গাঁদার মালাটা গোলাপের। মালা পরে দুজনে আবার ছুটল খেলতে। ফকির গিয়ে বসলেন জাফরসাহেবের কাছে।

জাফরসাহেবের কাছে বসে দু'একটা কথা বলতেই ফকির সাহেবের চোখে পড়ল শিউলী ও গোলাপ খেলা ছেড়ে চাঁদের আলোয় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীরভাবে কি যেন বলাবলি করছে। তাদের কথা বুঝা গেল না কিন্তু ভাব দেখে ফকিরের মনে একটা অস্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত হল। ছেলেমেয়ে দুটির দিকে ফকির সাহেব উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাকিয়ে আছেন দেখে জাফরুল্লা চৌধুরীও তাদের দিকে তাকালেন।

জাফরুল্লা চৌধুরী দেখলেন শিউলী তার গলার মালা খুলে গোলাপের গলায় পরিয়ে দিল, গোলাপ তার গলার মালাটা পরিয়ে দিল শিউলীর গলায়। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের অপর পারের এক বিয়ে বাড়ীতে বেজে উঠল শঙ্খ ও হুলুধ্বনি। সেইসঙ্গে বিস্মিত ফকির সাহেবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, খোদার মরজিতে সাদীটা হয়েই গেল!

'খোদার মরজিমাফিক কার সাদী হল, ফকির সাহেব?' প্রশ্ন করলেন উৎকণ্ঠিত জাফরুল্লা।

আপনার মেয়ের।

আমার মেয়ের!!

হাঁ, হুজুর। আপনার মেয়ে শিউলীর সাদী হয়ে গেল ঐ দেওয়ানজীর ছেলে গোলাপের সঙ্গে। এ সাদী আর রদ্ হবে না, এ খোদার মরজি।

বলেন কি ফকির সাহেব !!

হুজুর, আমি হক্ কথাই বলেছি। 'আজ সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে ওঠার সময় মনে হল, রাত্রে এখানে একটা কিছু ঘটবে। এখানে এসে মনে হল, এই দুটো ছেলেমেয়ের নসিবেই একটা কিছু ঘটবে। সেজন্য আমি ওদের ওপরে নজর রেখেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম ওরা দু'জন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করছে, তখন আমার মনে হল ওরা দুজন মালাবদল করবে। তারপরেই দেখলাম খোদা আমার মনে যা জাগিয়েছেন, তাই ঘটে গেল। ওরা দুজন মালাবদল করে সাদী করল। ওরা দুজন বুঝুক চাই না বুঝুক এ সাদী রদ্ হবে না, এটা খোদার মরজি।'

বিস্মিত জাফরুল্লা দেখলেন, শিউলী আদর করে গোলাপের ডান হাত জড়িয়ে ধরে নীরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মুখে চোখে একটা অপূর্ব আনন্দোচ্ছাস চাঁদের আলোয় ভৈরবের ঢেউ-এর মতো খেলা করছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাফর সাহেব দুঃখিত কণ্ঠে বললেন,—এ আমি চাইনে ফকির সাহেব। আমার বন্ধু গৌরীর একমাত্র ছেলে আমার মেয়ের জন্য পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবে! এ আমি চাইনে, ফকির সাহেব।

সে রকমটা বোধহয় হবে না, হুজুর। সাদীটা হল হিন্দুমতে, হিন্দুর বিয়ের শুভ লগ্নে।

অ্যাঃ, তবে তবে এ-এ-এটা কি তবে প্রতিশোধ? আমার পূর্বপুরুষ এনায়েতুল্লা খাঁ সুযোগ পেয়ে সাদী করেছিলেন কালীনারায়ণ চৌধুরীর অনাথা মেয়েকে। এটা কি তবে তারই প্রতিশোধ?

হুজুর অত ব্যস্ত হবেন না। খোদা যা করেন দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা খোদার মরজি ঠিকমত বুঝতে পারিনে বলেই আপিশ্‌তাপিশ্‌ করি। আপনি যদি আমার পরামর্শ মঞ্জুর করেন, তবে এই খোদার হুকুম মেনে নিয়ে ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করে তুলুন। ওরা দু'জন বড়ো হয়ে নিজেদের কর্তব্য নিজেরাই স্থির করে নেবে। আমার মুর্শিদ প্রায়ই বলতেন, সব ধর্মই খোদার কুদ্‌রত্। আমার ধর্মই ধর্ম—একথা বলে শয়তান।

ভৈরবের তীরে শিউলী-গোলাপের মালাবদল খেলার সাতবছর আগে এমনি ফাল্গুন মাসের শেষে একদিন জমিদার হিদায়তুল্লা খান চৌধুরীর বেগম গিয়েছিলেন হোসেনপুর দেওয়ানবাড়ী দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়ের নাতি দেখতে।

দেওয়ান গিন্নী নাতি এনে বেগম সাহেবার কোলে দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

'দিদি, খোকার কি নাম রেখেছেন ?'

দেওয়ান গিন্নী উত্তর দিলেন—আজ কেবল ষষ্ঠী পূজো হল। আমাদের মধ্যে নাম রাখা হয় অন্নপ্রাশনের সময় কোষ্ঠী বিচার করে। এখন ডাকনাম রাখা যায়। আপনি নাতি দেখতে আসবেন শুনে এপর্যন্ত আমরা কোনো নাম রাখিনি। এখন আপনি নাতির নাম রাখুন।

বেগমসাহেবা খুশী হয়ে বললেন,—আপনার নাতি গোলাপ ফুলের মত সুন্দর হয়েছে। এর ডাক নাম থাকল গোলাপ।

একবছর আট মাস পরে কার্তিকের প্রথমে একদিন দেওয়ান গিন্নী এলেন সুলতানপুর জমিদার বাড়ী জমিদারের নাতনী দেখতে। নাতনী কোলে নিতেই বেগম সাহেবা বললেন,—দিদি, নাতির নাম রেখেছি আমি, এবার নাতনীর নাম রাখুন আপনি।

দেওয়ান গিন্নী হেসে বললেন,—বেশ আপনার ঘরের পাশেই দেখতে পাচ্ছি শিউলী গাছ ভরা ফুলের কুঁড়ি, নাতনীর নাম থাকল শিউলী।

তারপর চলে গেছে, ছয় বছর। এই ছয় বছরে সুলতানপুরের জমিদার ঘরের যে দিকে তাকানো গেছে, সেই দিকেই কেবল ভাঙন।

জাফরুল্লা সাহেবের বেগম বিবাহের পাঁচ বছর পরে মেয়ে শিউলীকে প্রসব করে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। পিত্রালয় ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ হলে অভিজ্ঞ ধাত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, বেগম সাহেবার আর সন্তান হবে না। সংবাদ শুনে হিদায়েতুল্লা চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন, সুলতানপুরের জমিদারীই যখন চলে গেল, জমিদার বংশ দিয়ে আর কি হবে! এ সব খোদার মরজি।

গৌরীশঙ্করের স্ত্রী প্রথম পুত্রের পর আরও তিনটি প্রসব করেন। তার দু'টি সুতিকাষষ্ঠী দেখল না, তৃতীয়টি দিনের আলোই দেখে নি। ব্যাপার দেখে গৌরীশঙ্করের স্ত্রী এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ চাইলেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক অবস্থাবুঝে স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে আর প্রসব-যন্ত্রনা ভোগ করতে না হয়। এটাও বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা।

হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর বেগম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। দেশে চিকিৎসায় কোনো ফল না পেয়ে জাফরুল্লা মা'কে নিয়ে গেলেন কলকাতা, সেই সঙ্গে শিউলীকেও নিয়ে গেলেন।

জাফর সাহেব ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। একদিন মেয়ে সঙ্গে

নিয়ে গেলেন এক বড়ো জ্যোতিষীর অফিসে। বেশীটাকা দক্ষিণা পেয়ে খোদ বড়ো জ্যোতিষী শিউলীর কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, মেয়েটির শিশুকালে অসবর্ণ বিবাহ হবে। হাত দেখে বললেন, বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়ে সধবা।

মা'এর চিকিৎসার জন্য জাফর সাহেব একমাস থাকলেন কলকাতা। তার মধ্যে একদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখলেন, গ্রাণ্ড-হোটেলে এসেছেন মিশর দেশের এক গ্র্যাণ্ড জ্যোতিষী। তিনি গ্র্যাণ্ড রকমের ফি পেলে যে কোনো ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব বলে দিতে পারেন।

জাফরুল্লা চৌধুরী মেয়ে নিয়ে গেলেন মিশরীয় জ্যোতিষীকে দেখাতে। জ্যোতিষী দেখে বললেন, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়ের স্বামী বর্তমানে জীবিত ভবিষ্যতে বিধবা হবার আশঙ্কা নেই।

এরপর জাফরুল্লা চৌধুরী মনে মনে স্থির করলেন, মেয়ের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ খোদার হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি কেবল তার লেখাপড়ার জন্য চেষ্টা করবেন।

কলকাতায় বড়োবড়ো ডাক্তার দেখিয়ে জাফর সাহেব বুঝলেন, বাবাকে হারিয়ে মা আর বেশীদিন এ দুনিয়ায় থাকবেন না, তাঁরও যাত্রার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় ভৈরবের তীরে জমিদার হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরীর কবরের পাশেই তাঁর বেগমের কবর প্রস্তুত করাই সঙ্গত।

কলকাতা থেকে সুলতানপুর ফিরে জাফর সাহেব তাঁর মা'এর সেবাযত্নে মন দিলেন। সেই সঙ্গে একজন ভালো মাস্টার রেখে পড়াতে আরম্ভ করলেন শিউলী ও গোলাপকে।

শিউলী ও গোলাপ একসঙ্গে পড়ে। দুজনেই মেধাবী। পড়ার সময় গোলাপ একটু চঞ্চল, শিউলী ধীর স্থির।

গৌরীশঙ্কর রায় দেওয়ান হয়ে যখন সুলতানপুরে বাস করতে আসেন, তখন, গোলাপ তিন বছরের আর শিউলী একবছর তিনমাসের। জমিদার বাড়ীতে আর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। চোদ্দ বছর বয়সের খানসামা করিম শিউলীকে খেলা দেবার জন্য দু'বেলা নিয়ে যেত দেওয়ানজীর বাসায়। সেখানে শিউলী গোলাপের সঙ্গে খেলা করত। গোলাপেরও ঐ শিউলী ছাড়া আর কোনো খেলার সাথী ছিল না। তারপর একটু বড়ো হয়ে গোলাপ দিনের বেলা প্রায় সব সময়ই থাকত জমিদার বাড়ী শিউলীর কাছে।

যে দিন প্রথম দু'টি শিশুর দেখা হয়, সেদিন শিউলী গোলাপের নাম দিল 'গোলা'। গোলাপ শিউলীর নামের উ-কারটা বাদ দিয়ে সরল করে নিল 'শিলী'।

সেই থেকে গোলা-শিলী একসঙ্গে খেলা করে, একসঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে পড়ে।

কলকাতা থেকে এসে জাফরুল্লা চৌধুরী গোলাপের লেখাপড়া ও আদব-কায়দা শিখানোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। গোলাপের সঙ্গে শিউলীর এত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা নিয়ে বেগমসাহেবা কোনো কথা জাফরুল্লা সাহেবের কানে তুললে তিনি সে কথা আমল দিতেন না। ব্যাপার দেখে শেষে বেগম সাহেবা একটু অন্যরকম বুঝে, তিনিও শিউলী-গোলাপের মেলামেশায় আর বাধা দিতেন না।

কলকাতা থেকে বাড়ী এসে দু'মাস পুত্র জাফরুল্লার যত্ন নিয়ে বেগম সাহেবা স্বামী হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর কবরের পাশে শয্যা গ্রহণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে পুত্রকে কাছে ডেকে বলে গেলেন—এ দুনিয়ায় মানুষ সব বিষয়ে সুখী হতে পারে না। আমার দুঃখ, তোমার বাপজান জুলেখাকে মানুষের হাতে দিতে পারেন নি। তুই জুলেখাকে একটু দেখিস, সে যেন ভাত কাপড়ের কষ্ট না পায়।

বেগম সাহেবার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে জাফর সাহেবের বেগম শিউলীকে নিয়ে গেলেন ঢাকা পিত্রালয়ে। শিউলী সে পর্যন্ত ঢাকায় নানা সাহেবের বাড়ী দেখে নি। নানা, নানী সকলেই শিউলীকে খুব আদর করলেন, কিন্তু কেউ তার মুখে হাসি ফোটাতে পারলেন না। বাড়ীতে ছিল অনেকগুলো ছেলে মেয়ে। তারা সকলেই শিউলীর সঙ্গে মিশতে চায়, কিন্তু শিউলী কারও সঙ্গে মেশে না, নিজে থেকে কথাও বলে না, মুখভার করে মা'র পিছনে পিছনে ঘোরে।

একদিন বেগমসাহেবার মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোর মেয়ে এত মুখচোরা লাজুক হয়েছে কেন রে ?

বেগম সাহেবা উত্তর দিলেন,—সুলতানপুরে তো বেশ হৈ চৈ করে খেলা করে। কোনোদিন বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে যায় নি। তাই ও রকম করছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই সেরে যাবে।

বেগমসাহেবা বললেন বটে, কিছুদিন থাকলেই সব সেরে যাবে ; কিন্তু দু'মাসেও শিউলীর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। উপরন্তু মেয়ের খাওয়া ক'মে স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল।

আরও একমাস পরে মেয়ের যখন পেটের অসুখ দেখা দিল, তখন বেগম সাহেবাকে তাঁর ভাই সঙ্গে করে গেলেন সুলতানপুর।

বাড়ী পৌঁছিয়ে একটু পরেই বেগম সাহেবা লক্ষ্য করলেন, শিউলী অন্দরমহলে নেই। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুররোদে মেয়ে কোথায় খোঁজ করার জন্যে পাঠালেন করিমের মা'কে। করিমের মা খোঁজ করে এসে জানাল, বাড়ীর পিছনের বাগানে গোলাপ গাছে চড়ে লিচু পেড়ে দিচ্ছে, শিউলী গাছতলায় লিচু কুড়িয়ে খাচ্ছে। ডাকলেও কথা কানে তুলল না।

সর্বনাশ! পেটরোগা মেয়ে লিচু খাচ্ছে! বেগমসাহেবা ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন বাগানে। তাঁকে আসতে দেখে গোলাপ সর্‌সর্‌ করে গাছ থেকে নেমে একদৌড়ে ভাঙাপ্রাচীরের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। বেগম সাহেবা শিউলীকে ফ্রকের কোঁচর ভরতি লিচু সমেত ধরে এনে হাজির করলেন জাফর সাহেবের সম্মুখে।

এক ছটাক চালের ভাত যার পেটে সহ্য হয় না, দেখো সেই মেয়ে বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই ঐ দুষ্টু ছোঁড়ার সঙ্গে গিয়ে গোগ্রাসে লিচু গিলছে।

জাফর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—এসেই বাগানে গেলি কেন?

গোলা যে ডাকল।

বাগানে গিয়েই লিচু খেতে আরম্ভ করলি কেন?

গোলা যে বলল, একটা লিচুও খায় নি। আমার জন্য সব লিচু থোকা বেঁধে রেখেছে।

কটা লিচু খেয়েছিস?

বেশী খাই নি।

কটা খেয়েছিস?

বড়ো বড়ো পাঁচটা।

আর খাস নি কেন?

গোলা যে নেমে আসে নি।

গোলা খেয়েছে?

না, খায় নি।

তবে তুই আগে খেলি কেন?

গোলা যে বলল, আমি না খেলে আর একটাও পাড়বে না সব থোকার কাপড় খুলে কাক আর বাদুড় দিয়ে খাইয়ে দেবে, একটাও খাবে না।

আচ্ছা, এখন সব লিচু আমার টেবিলের নীচে ঝুড়িতে রেখে দে। বিকালে গোলাপ এলে দু'জনে খাস।

বেগম সাহেবা ব্যস্ত হয়ে বললেন,—তাই বলে ঐ পেটরোগা মেয়ে লিচু খাবে নাকি?

জাফর সাহেব একটু হেসে উত্তর দিলেন,—কোনো ভয় নেই। রোগ ওর পেটে নয়। দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই দেখবে, ওর সব রোগ সেরে গেছে। ওকে ওর ইচ্ছামতো চলতে ফিরতে খেলাধূলা করতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

জাফর সাহেবের কথাই ঠিক হল। কয়েক দিনের মধ্যেই শিউলী হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেল।

মহাকালের গতিপথে আরও দু'বছর চলে গেল। সুলতানপুরের জমিদারী ও জমিদার বাড়ীর ভাঙন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

মেরামতের অভাবে সুবৃহৎ জমিদার বাড়ীর দালানের কার্ণিশ জানলার কপাট খসতে আরম্ভ করেছে। ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে বটের চারা মাথা তুলতে দেখা যায়। ফাটা ছাদের জল প'ড়ে অনেক ঘর স্যাঁৎসেতে হয়ে যাচ্ছে। অত বড়ো বাড়ীর উপযুক্ত লোকজনের অভাবে অনেক ঘরের দরজাই খোলা হয় না, সুযোগ পেয়ে চামচিকে বাসা বাঁধছে।

কাছারি বাড়ীতে পঁচিশ-তিরিশ জন আমলা-গোমস্তার জায়গায় বসেন মাত্র তিনজন। মালখানা ফৌজ মহল্লায় পঞ্চাশজন পাইক বরকন্দাজের ঘরে থাকে সাতজন। অন্দরমহলে লোকাভাবে নীচতলা আঁধ হয়ে উঠেছে। জমিদারীর আয় কমে যাওয়ায় এতবড়ো বাড়ী হয়ে পড়েছে গলগ্রহ। ভেঙে ছোটো করতেও সম্মানে বাধে।

জাফরুল্লা চৌধুরীর মায়ের মৃত্যুর পর দু'বছর একরকমভাবে কেটে গিয়ে চৈত্রমাসের শেষে সুলতানপুর জমিদারের জমিদারীর শেষ স্তম্ভটি কালস্রোতে ভেঙে পড়ল।

শেষরাতে জাফর সাহেব সংবাদ পেলেন, দেওয়ানজীর কলেরা হয়েছে অবস্থা খারাপ।

সংবাদ পেয়ে বড়ো ডাক্তার আনতে যশোরে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে জাফরুল্লা গেলেন গৌরীশঙ্করের বাংলোয়। বাংলোর বারান্দায় দেখা হল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার বললেন, অবস্থা সুবিধার নয়। দুটো স্যালাইন দিয়েও বিশেষ ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

জাফর সাহেব কাছে গিয়ে বসলে গৌরীশঙ্কর দুর্বলকণ্ঠে বললেন,—ভাই, এই ভোরে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তার কারণ আমার বিদায়ের সময়—'।

কক্‌খনো নয়। তুমি সেরে উঠবে। আমি বড়ো ডাক্তার আনতে যশোরে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছি।

সেরে যদি উঠি তো ভালোই। এখন তুমি আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও, বাধা দিও না।—

এই যে মহাযুদ্ধ বেধেছে, এই যুদ্ধ শেষ হলে পৃথিবীতে আসবে একটা বিরাট পরিবর্তনের যুগ। সেই যুগের জন্য এখন থেকেই তোমার প্রস্তুত হওয়া উচিত।—

আমি যদি বেঁচে উঠি তবে আমিই সব করে দেব। নইলে তুমি জমিদারীর ভরসা ছেড়ে খাসের জমিগুলো অল্প খাজনায় উপযুক্ত সেলামী নিয়ে মৌরসীপাট্টায় প্রজাদের মধ্যে বন্দোবস্ত দিও। জলকরগুলোও দীর্ঘমেয়াদী ইজারা দিয়ে যত বেশী টাকা পাওয়া যায় নেবে। কলকাতায় এখন তিনখানা বাড়ী আছে, আর বাড়ী করা ঠিক হবে না। টাকা যা যোগাড় হবে, তা কলকাতায় কোনো বড়ো ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখবে।—

জমাজমি বিলিবন্দোবস্ত করতে যে সব দলিল দস্তাবেজ প্রয়োজন হবে, সেগুলো আমি সংগ্রহ করে কাছারিতে আমার ঘরে আলমারির মধ্যে গুছিয়ে রেখেছি। ও ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দিও না। আমার অভাবে তুমিই কাজ চালিয়ে নিও।

এই পর্যন্ত বলতেই গৌরীশঙ্করের শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। ডাক্তার এসে অক্সিজেন দিতে আরম্ভ করলেন। দেওয়ান বন্ধুর পাশে জমিদার বন্ধু পাথরের মতো নীরব নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। রাত প্রভাত হল।

বেলা আটটা বাজতেই বড়ো ডাক্তার এলেন। বড়ো ডাক্তার সব দেখে শুনে বললেন, চিকিৎসায় কোনো ভুলত্রুটি হয় নি। চিকিৎসক রোগের চিকিৎসা করতে পারেন, পরমায়ু দিতে পারেন না। রোগী যদি আর ছ'ঘণ্টা টিকে যায়, তবে ফিরবে।

ছ'ঘণ্টা আর কাটল না, বেলা দুপুর না হতেই সুলতানপুর জমিদারের শেষ দেওয়ান গৌরীশঙ্কর রায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ দেওয়ানের মৃত দেহের অদূরে বসে কাঁদছেন সুলতানপুরের শেষ জমিদার মহম্মদ জাফরুল্লা খান চৌধুরী।

বাবা, মা আমাকে গোলাদের বাড়ীতে যেতে দেন না কেন?

তোমার দেওয়ান চাচা যে মারা গিয়েছেন।

গোলা আজ তিনদিন আসে না কেন?

দেওয়ান চাচা যে গোলাপের বাবা। বাবা মরলে কোথাও যেতে নেই।

গোলা আর কোনদিনই আসবে না?—শিউলীর বুকে কান্না জমে উঠেছে।

আসবে। তার বাবার শ্রাদ্ধ শেষ হলে আসবে।

কতদিনে শ্রাদ্ধ শেষ হবে?

বারো-তের দিনে শেষ হবে।

বা-রো তে-রো দিন! এর মধ্যে গোলা একদিনও আসবে না?—শিউলীর চোখে জল দেখা দিল।

জাফর সাহেব মেয়ের বিবর্ণ মুখ ও চোখে জল দেখে ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। গৌরীশঙ্কর এখানে বাস করতেন, সেজন্য তাঁর স্ত্রী ও গোলাপ এখানে ছিল। এখন তো আর থাকা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে মেয়েকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন?

বাবা আর কোনো কথা বলছেন না দেখে শিউলী উঠে তার পড়ার ঘরে গেল। ইংরাজী বই-এর পিছনে খানিকটা কাগজ সাদা ছিল সেখানে পেনসিল দিয়ে একটা দাগ দিল, কি জানি যদি দিন গুণতে ভুল হয়।

শিউলীর পড়তে মন বসে না, লিখতে বানান ভুল হয়, একটা অঙ্কও নির্ভুল কষতে পারে না। মাস্টার মশাই'র কাছে রোজ বকুনি খায়।

দুপুর বেলা বাগানে বড়ো লিচুগাছটার তলায় মাদুর বিছিয়ে শিউলী পড়তে বসে। পাশেই করিমের মা ঘুমায়। শিউলী পড়া ভুলে তাকিয়ে থাকে ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁকটার দিকে। ঐ পথ দিয়েই গোলা বাগানে আসে। বাবা মরলে কি বাড়ী থেকে বেরোতেও নেই?

ভাঙ্গাপ্রাচীরের ওপাশে রাস্তা। রাস্তার ওপাশেই দেওয়ানের বাংলো। বাংলোর সম্মুখে ফুলের বাগান। লিচুগাছের তলায় বসে বাগানটা দেখা যায়। শিউলী দেখে বাগানে অনেক গোলাপ ফুল ফুটে আছে; ভাবে, ফুল তুলতেও কি নিষেধ?

দুপুরে বাগানে আসার আগে শিউলীকে ভয় দেখানোর জন্য গোলা প্রাচীরের আড়াল থেকে অনেক কিছু ছুঁড়ে মারত। সেগুলো সবই খাবার জিনিস। একবার একটা কদ্‌মা ঘুমন্ত করিমের মা'র মুখের মধ্যে পড়েছিল। বাবা মরে গেলে কি একটা মাটির ঢিলও ছুঁড়ে মারতে নেই?

বৈশাখী দুপুরের দুরন্ত উদাসীন আকাশ-বাতাশ শিউলীকে কোনো আশ্বাস দেয় না, কেবল শোনায়, নেই নেই নেই।

ক্রমে শিউলীর বই-এর পিছনে এগারোটা দাগ পড়ে গেল। কাল হবে বারো দিন। কাল গোলা আসতে পারে।

পরদিন শিউলী ঘুম ভেঙেই উঠে বই বের করে গুণে দেখল, হ্যাঁ এগারটা দাগই পড়েছে। আজ এই বারো দাগ। আজ গোলা আসবে।

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে পড়ার ঘরে শিউলী বই নিয়ে পড়তে বসল, কিন্তু পড়া হল না। এতদিন পরে গোলা এলে সে কি বলবে ?

গোলা পড়তে আসে ছ'টায়, মাস্টার মশাই আসেন সাতটায়। ছ'টা বেজে গেল। সাতটায় মাস্টার মশাই এলেন। মাস্টার মশাই দু'ঘণ্টা পড়িয়ে ন'টা বাজলে চলে গেলেন। গোলা এল না।

বাবা বলেছিলেন বারো-তের দিন পরে গোলা আসবে। আজ গেল বারো দিন, কাল হবে তেরো দিন। কাল নিশ্চয়ই আসবে।

নাঃ তেরোদিনেও গোলা এল না। বই-এর পিছনে যেটুকু ফাঁকা ছিল সেখানে তেরো দাগ পড়ল, পনরো, ষোল, কুড়ি,—নাঃ গোলা আসে না।

বই-এর পিছনে নতুন দাগ দেবার মতো জায়গা আর নেই।

গৌরীশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পরের দিনই তাঁর স্ত্রী শ্রাদ্ধাদির জন্য গিয়েছিলেন হোসেনপুর। সব শেষ করে বৈশাখের শেষে এলেন সুলতানপুরে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে।

সংবাদ পেয়ে জাফরুল্লা চৌধুরী গেলেন দেওয়ানজীর বাংলোয়। বাংলোর বারান্দায় বসে গোলাপকে পাঠালেন তার মায়ের কাছে কথা আদান-প্রদানের জন্য। কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, গোলাপের মা'ই ঘরের ভিতর থেকে কথা বললেন।

জাফর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেওয়ান ভাই কি কিছু বলে গেছেন ?

না, কিছুই বলে যান নি। তিনি বোধহয় রোগের গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন নি। ভোর হতেই তো কথা বন্ধ হয়ে গেল।

না, তা নয়। শেষ রাত্রে আমি এলেই তিনি বলেছিলেন, রোগের যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে রোগী বাঁচে না। আমিই বরং বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি যে, গৌরী আমাকে ছেড়ে যাবে।—জাফর সাহেবের গলা ভার হয়ে পড়ল।

তবে তিনি কিছু বলে গেলেন না কেন! তাঁকে হারিয়ে এই নাবালক ছেলে নিয়ে আমি যে অকূল পাথারে ভাসলাম।

প্রয়োজন বোধ করেন নি বলে কিছু বলেন নি। আপনাদের সম্পর্কে আমাকেও কিছু বলেন নি। গৌরী জানত জাফর বেঁচে থাকতে তার ছেলে-বউ অকূল পাথারে ভেসে যাবে না। আপনি এখন কোথায় থাকা স্থির করেছেন।

হোসেনপুরের বাড়ীতে থাকতে পারি, কিন্তু সেখানে নিকটে কোনো স্কুল নেই। এতটুকু ছেলেকে বোর্ডিং-এ রাখতেও সাহস পাই নে।

কোথায় থাকলে গোলাপের পড়ার সুবিধা হবে?

আমার বাপের বাড়ী মুন্‌সিগঞ্জ, দাদা চাকরি করেন বহরমপুরে। দুই জায়গায়ই নিকটে স্কুল-কলেজ আছে। কিন্তু আমার বাবা বুড়ো অক্ষম, ভাইয়েরাও সকলে অল্প মাইনের চাকরি করে।

বেশ, আপনি মুনসিগঞ্জেই যান। আমার ঢাকা যাওয়ার পথে মুনসিগঞ্জে দেখাশোনার সুবিধা হবে। এখন মাসে দেড়শ' টাকা আপনাকে পাঠাব। আপনি হোসেনপুর গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসুন। আমি এখান থেকে নায়েব মশাই'র সঙ্গে আপনাকে পাঠাব। গোলাপকে মানুষ করার জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এর মধ্যে যদি আমি মরেও যাই তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

এই বলে জাফর সাহেব উঠে গেলেন। দেওয়ান গিন্নীও গোলাপকে নিয়ে পালকিতে উঠলেন। গোলাপ শিউলীর সঙ্গে দেখা করার অবকাশ পেল না।

বাবা বলেছিলেন, বারো-তের দিন পরে গোলা আসবে, বারো গেল, তের গেল, পনরো গেল, কুড়ি গেল, কতো-ও দিন গেল, গোলা তো আসে না, শিলী বলে ডাকে না!

বৈশাখ মাস শেষ হতে চলল। গাছে গোলাপজাম পেকে ফুরিয়ে গেল। শিউলী একটা গোলাপজামও চেখে দেখে নি। গোলা যে আসে না, গাছে চড়ে পাকা গোলাপজাম ছিঁড়ে শিলীর গায় ছুঁড়ে দেয় না।

সিঁদুরে আমে রঙ্ ধরেছে। কাঁচা মিঠে আম বড়ো হয়েছে। আমে আঁটি দড়িয়ে গেল। নুন-লঙ্কা নিয়ে মেখে কচি আম একদিনও খাওয়া হল না। গোলা যে বাড়ী থেকে নুন লঙ্কা এনে শিলীকে ডাকে না।

লিচু পেকে রস টসটসে হয়ে উঠল। দুষ্টু কাঠবিড়ালটা বড়ো বড়ো

লিচু ছিঁড়ে তুর্‌তুর্‌ করে খেয়ে ফেলে। করিম কাঠবিড়াল, কাক, এসব ঠেকাতে পারে না, গোলা যে আসে না, দুষ্টু কাঠবিড়ালটাকে তাড়ায় না।

গাছে বসে ডাকে ঘুঘু, দোয়েল, কোকিল। কোথায় লুকিয়ে ডাকে বউ কথা কও। জালালী পায়রাটা নেচে নেচে ডাকে বক্‌ বকুম কুম্‌। আকাশে উড়ে উড়ে ডাকে শঙখচিল—কোঁয়া কোঁয়া। ভাঙা প্রাচীরের ফাটলে ডাকে কট্‌কটে ব্যাং—কটর কট্‌ কট্‌। গোলা থাকলে ওদের মতো করে ডেকে শিলীকে হাসাত। গোলা তো আসে না, শিলীকে হাসায় না।

বড়ো পায়রাটা নেচে নেচে ছোটো পায়রাটার গায়ে পাখনার ঝাপ্‌টা মারছে, মাঝে মাঝে ঝুঁটি ধরে টানছে। গোলা থাকলে ওদের দেখাদেখি অমনি করেই নাচত, গায়ের জামা দিয়ে অমনি করেই শিলীর গায়ে ঝাপটা মারত, মাথার বেনী ধরে টানত। গোলা এত দিনেও কেন আসে না? গোলা না এলে শিলীর যে কোনো খেলাই হয় না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাগানে লিচুগাছ-তলায় মাদুর বিছিয়ে শিউলী পড়তে বসেছে। তার নিকটেই আর একটা মাদুরে করিমের মা ঘুমোচ্ছে।

মাস্টারমশাই অনেকগুলো অঙ্ক দিয়েছেন। অঙ্ক কষতে শিউলীর মন বসছে না, পেনসিলের গোড়াটা মুখে পুরে তাকিয়ে আছে প্রাচীরের গায়ে একটা হাতের ছাপের দিকে।

ছাপটা গোলার হাতের ছাপ। ফাল্গুন মাসে হোলির দিন হাতে আবির মেখে শিলীরজামায় ছাপ দিয়েছিল মুখে রঙ্‌ দিতে সাহস করেনি, চাচীবকবে।

দিলেই বা কি হত, শিলী কি মুখে রঙ্‌মেখে মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করত?

হোলির দিন পকেটে করে গোলা এনেছিল চারটে বড়ো কুল, শিউলী এনেছিল দুটো কমলা। গোলা হাতের রঙ্‌ দেওয়ালে মুছে ঐ জায়গায় বসে শিলীর দেওয়া কমলা খেয়েছিল। সে কমলার খোসা ঐ যে এখনও পড়ে আছে। গোলা কি আর আসবে না? পড়তেও আসবে না?

শিলী, কি করছিস?—পিছন থেকে ডাকল গোলাপ।

চমকে উঠে দাঁড়াল শিউলী। গোলা এসেছে।

গোলার মাথা ন্যাড়া, পরণে ময়লা ধুতি, গায় জামা নেই মুখে হাসি নেই, হাতে এক বোঁটায় দুটো কচি আম।

গোলাপের অবস্থা দেখে শিউলী স্তব্ধ হয়ে গেল।

শিলী, এই আম দুটো নে, নুন দিয়ে মেখে খাস। তোতে আমাতে বোনা সেই গাছের আম রে, শিলী।

কাঁচা পাড়লি কেন? পাকলে খেতাম।

আমরা যে চলে যাচ্ছি, শিলী।—বলেই গোলা কেঁদে ফেলল।

কোথায় যাবি?—শিউলী ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

মুনসিগঞ্জ, মামাবাড়ী, অনেক দূর।

কেন যাবি?

বাবা যে মরে গেছেন।

কবে আসবি?

'আর আসব নারে, শি—'। বুকফাটা কান্নায় গোলাপ ভেঙে পড়ল।

'তবে আমি কার সঙ্গে খেলব, গোলা?'—শিউলী এগিয়ে গিয়ে গোলাপের হাত ধরে কেঁদে ফেলল।

গোলা শিলীর প্রশ্নের উত্তর দেয় না, মুখ ফিরিয়ে নীরবে কাঁদে।

ও গোলা, তুই যাস নে, গোলা। তুই গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব, গোলা?

অবোধ বালিকার আর্তকণ্ঠের আবেদনে থেমে গেল পাখির কলকূজন, জ্যৈষ্ঠ দুপুরের দমকা হাওয়া।

শিউলীর হাত থেকে জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গোলাপ কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালাল।

পিছনেপিছনে ছুটল শিউলী প্রাচীর পর্যন্ত।

ও গোলা, তুই যাস নে, গোলা। ও গোলা, তুই ফিরে আয় গোলা। গোলা, ফিরে আয়, ফিরে আয়! গোলা, ফিরে আয়—।

আশ্বিন মাস। জাফরুল্লা চৌধুরী গিয়েছেন যশোহর; রাত আটটায় বাড়ী ফিরলে বেগমসাহেবা জানালেন, শিউলী সেই দুপুর থেকে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এ পর্যন্ত ও মেয়ের কান্না থামে নি। সন্ধ্যা হতে গা'টাও বেশ গরম হয়েছে।

কাঁদছে কেন?—প্রশ্ন করলেন জাফর সাহেব।

আজ সকালের দিকে ওর পড়ার ঘর গুছিয়ে সাফ করতে গিয়ে করিমের

মা দু'টো শুকনো আমের গুঁটি কোথায় ফেলে দিয়েছে। তার জন্য মেয়ের এই মড়াকান্না।

গুঁটি দুটো ছিল কোথায়?

আলমারির দেরাজে একটা রূপার কৌটার মধ্যে।

এত যত্ন করে রেখেছে যখন, তখন ফেলে দিল কেন?

বাঃ রে! দুটো শুকনো কালো আমের গুঁটি! করিমের মা আমাকে দেখিয়েই ফেলে দিয়েছে।

জাফর সাহেব আর কিছু বললেন না। হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলিয়ে গেলেন শিউলীর কাছে।

শিউলী বিছানায় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে নীরবে কাঁদছিল। জাফর সাহেব বিছানায় বসে আদর করে গায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে মা, বল তো?

শিউলী মুখ না ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল,—মাসী আমার আম দুটো ফেলে দিয়েছে।

সে তো শুনলাম দুটো কালো শুকনো আমের গুঁটি!

গোলা যাওয়ার সময় তার বোনা গাছের আম দুটো আমাকে দিয়েছিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জাফর সাহেব। শিউলীর কাছে ও দুটো শুকনো আমের গুঁটির যে কি মূল্য, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আরতো কেউ বুঝবে না।

চারবছর আগে দেওয়ানজী যশোর হতে একঝুড়ি হিমসাগর আম আনেন। ঝুড়ির সব চাইতে বড়ো আমটা শিউলী আর গোলাপ দুজনে পরামর্শ করে না খেয়ে ফুলবাগানে পুঁতে রাখে। গাছ হয়ে আম ধরলে দুজনে অনেক হিমসাগর আম খাবে।

যে দিন মাটি ফুঁড়ে আমের চারা দেখা দিল, সেদিন দুজনের কি আনন্দ। জাফর সাহেবকেও ধরে নিয়ে গিয়ে আমের চারা দেখিয়েছিল। তারপর এই চারবছর দুজনে গাছের গোড়া সাফ করেছে, জল দিয়েছে। তারপর গাছটায় প্রথম মুকুল দেখা দিলে দুজনে ছুটে এসে আবার জাফর সাহেবকে ডেকে নিয়ে দেখায়। গাছে পাঁচ-সাতটা মুকুল এসেছিল, মাত্র একটা মুকুলে এক বোঁটায় দুটো আম ধরে। সে আমও জাফর সাহেব দেখেছেন।

আম আর পাকার সময় পেল না। কালের নির্মম আঘাতে গোলাপ বহু দূরে চলে গেল। এত আশার, এত স্বপ্নের এত যত্নের গাছের প্রথম দুটো কচি আম গোলাপ নিজহাতে ছিঁড়ে শিউলীকে শেষ উপহার দিয়ে গিয়েছে। ও

আম দুটির মূল্য যা ঐ কচি বুকে বুঝেছে, তা তো সে ভাষায় কাউকে বুঝাতে পারে না, বুঝানো যায়ও না।

প্রকৃত সমবেদনা-সহানুভূতি নীরব। বাপের নীরব সমবেদনা শিউলীর বাইরের কান্না থামিয়ে দিল। নীরব জাফর সাহেব মেয়ের গায় হাত দিয়ে দেখলেন বেশ জ্বর উঠেছে। করিমকে পাঠিয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে দেখে বললেন, জ্বর একশ'র ওপরে আরও বাড়তে পারে, তিনের ওপরে উঠলে মাথায় জলপটি দিতে হবে।

রাত বারোটা বেজে গেছে। ঘরে মেঝেয় করিমের মা আর করিম ঘুমোচ্ছে। জাফর সাহেব শিউলীর কাছে বসে মাথায় জলপটি দিচ্ছেন। হঠাৎ শিউলী জাফর সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলল,—বাবা, কাল আমার আম দুটো খুঁজে এনে দেবেন ?

জাফর সাহেবের চোখ ছলছল হয়ে উঠল। এ অনুরোধের কি উত্তর দেবেন তিনি ? এ তো দু'টো শুকনো আমের গুঁটি খুঁজে আনার আব্দার নয়। এ যে তার হারানো গোলাপকে খুঁজে এনে দেওয়ার মর্মান্তিক অনুরোধ।

রাত ফরসা হতেই জাফর সাহেব করিমকে পাঠিয়ে ডেকে আনলেন সদর আমিনকে। তিনি এলে একখানা ফটো তাঁকে দিয়ে বললেন,—আপনি এখুনি এই ফটো নিয়ে কলকাতা যান। এখন রওনা হলে দশটায় যশোর ট্রেন ধরে একটার মধ্যে কলকাতা পৌছতে পারবেন। কলকাতা পৌছে কোনো ভালো স্টুডিও থেকে এই ফটোর ছেলে-মেয়ে দুটির যত বড়ো সম্ভব এনলার্জ করে একখানা এনলার্জমেণ্ট নিতান্ত প্রয়োজনীয় ফিনিশিং করিয়ে আজ রাত্রে বরিশাল মেল ধরবেন। আর একখানার জন্য অর্ডার দিয়ে আসবেন, ভালো ফিনিশিং করে পরে দেবে। আপনার জন্য আমি যশোর স্টেশনে গরুর গাড়ি পাঠাব। ট্রেন থেকে নেমেই গাড়িতে উঠলে ভোর পাঁচটার মধ্যে এখানে পৌছে যাবেন।

জাফর সাহেব যে ফটোখানা এনলার্জ করতে পাঠালেন, সেখানা গ্রুপ ফটো, এক বছর আগে তোলা। চেয়ারে বসে আছেন জাফর সাহেব আর গৌরীশঙ্কর রায়, মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শিউলী ও গোলাপ।

সকালের দিকে শিউলীর জ্বর কিছু কমল কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলল না। জাফর সাহেব ও করিমের মা একটু বেলা হলে আমের গুঁটি দুটো যথেষ্ট খুঁজলেন কিন্তু পাওয়া গেল না।

বিকালের দিকে আবার জ্বরের বেগ দেখা দিল। ডাক্তার এসে দেখে বরফ

আনতে বললেন। জাফর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার জানালেন, রোগটা যে কি, তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না। রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সন্ধ্যার পর রোগী বেহুঁস হয়ে পড়ল। শেষে অস্পষ্ট প্রলাপ আরম্ভ হল। সে প্রলাপ অস্পষ্ট হলেও জাফর সাহেব বুঝতে পারলেন, 'ও গোলা, তুই যাসনে, গোলা। ও গোলা, তুই ফিরে আয়, গোলা। গোলা, ফিরে আয়।'

শেষ রাত্রে জ্বর কমে শিউলী ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়ের শিয়রে বসে জাফর সাহেবের চোখে ঘুম নেই, তিনি কান পেতে আছেন, যশোর ফেরত গাড়ির শব্দের জন্য।

রাত একটু ফরসা হতেই আমিন মশাই এসে পৌছলেন। জাফর সাহেব ও আমিন মশাই একখানা পুরনো ছবির ফ্রেম খুলে নিয়ে এনলার্জ ফটোখানা লাগিয়ে টাঙিয়ে দিলেন শিউলীর খাটের পায়ের দিকে দেওয়ালে।

আশ্বিনের প্রভাত। মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়ে পূব আকাশে সূর্যদেব জেগে উঠছেন। জাফর সাহেব শিউলীর ঘরের সব জানালা খুলে পরদা সরিয়ে রেখে শিয়রে বসে অপেক্ষা করছেন মেয়ের ঘুম ভাঙ্গার।

শরতের ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব পাঠিয়ে দিলেন একঝলক স্নিগ্ধ রোদ শিউলীর ঘুম ভাঙ্গাতে। ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলতেই জাফর সাহেব মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন,—

ঐ দেখ, তোর জন্য কি এনেছি।

দেওয়ান গৌরীশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পর সাতবছর অতিক্রান্ত হয়ে এল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সাত বছরে পৃথিবীতে, দেশে ও সমাজে যে বিপ্লবের ঢেউ উঠেছে তা দেখে জমিদার জাফরুল্লা চৌধুরী বুঝেছেন, তাঁদের দেওয়ান উমাশঙ্কর রায় ও গৌরীশঙ্কর রায় যা বলেছিলেন, সব অক্ষরে অক্ষরে ফলতে চলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে পৃথিবীতে এসেছে এক মহাবিপ্লব। যে দেশের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না, সে দেশের দূরদর্শী সুদক্ষ নেতারা বিপ্লব স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধনে প্রয়োগ করছেন। যে দেশের দুর্ভাগ্য, সে দেশের অদূরদর্শী নেতৃত্ব এই বিপ্লব বিপথে পরিচালিত করে ভবিষ্যৎ বিপদের বারুদ সঞ্চয়ে লেগে পড়েছেন।

ভারতে বিপ্লবের মঙ্গল-হস্ত স্তম্ভিত করে পরম উদার ইংরেজ শাসক ঘোষণা করেছেন, তাঁরা স্বাধীনতা দান করবেন। বহুজাতি, বহুধর্ম, বহু সম্প্রদায়ের

দেশ ভারতবর্ষ। সেজন্য ইংরাজের এই অপূর্ব দান গ্রহণের প্রার্থীও বহু। ইংরাজের দ্বারপ্রান্তে সমাগত এতগুলি প্রার্থীর প্রার্থণাপাত্র পূর্ণ করে দান করায় বহু ঝামেলা। বুদ্ধিমান ইংরেজ বাহাদুর প্রার্থীদের ভিতর থেকে বড়ো দুই মাতব্বর বেছে নিয়েছেন। এই দুই মাতব্বরের হাতে স্বাধনীতা দিয়ে দেবেন। দুই মাতব্বর তাতে রাজিও হয়েছেন। রাজি হয়ে স্বাধীনতা দান গ্রহণের প্রাক্কালে দুই মাতব্বরে যে কাণ্ড বাধালেন, তার যেটুকু 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে' প্রকাশ পেল, সে সংবাদ খবরের কাগজে পড়ে শিউলী জাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল.—

বাবা, এ কি হল?

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের সঙ্গে আপোষ করতে গেলে এই রকমই হয়।

মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ধর্ম। কিন্তু কলকাতায় এরা যা করছে, এটা তো অমানুষের কাজ!

ধর্মকে তার আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে নামিয়ে এই বাস্তব জগতে সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করলে তার ফল হয় মারাত্মক। এই করেই এ পর্যন্ত বহু ধর্ম পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ান বিপ্লবে রুশদেশ থেকে ধর্ম অন্তর্হিত হওয়ার হেতুও এই।

কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রধান প্রবর্তক কার্লমার্কস্ ছিলেন ধর্মবিরোধী নাস্তিক। তাই যদি হয়, তবে মার্কস্‌পন্থীরা তাদের নীতিই অনুসরণ করেছে। এতে ধর্মকে দোষী করা কি সঙ্গত হবে?

আমার কথা একটু ভালোকরে বুঝে দেখ। কোনো ধর্মই নিন্দনীয় নয়। সব ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানবহিতার্থেই ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু স্বভাব-অসৎ শক্তিমান ব্যক্তি বিশেষ ধর্ম অবলম্বনে মানব-সমাজ ও জাতির ওপরে বহু অত্যাচার এপর্যন্ত করে আসছে। এতে ধর্ম বা ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদের দোষী করা যায় না। কার্লমার্কস ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু রাশিয়ার জনসাধারণ তাঁর নাস্তিক মতবাদ মেনে নিল কেন? মার্কস্-এর সব মতবাদই তো তারা মেনে নেয় নি!

তাহলে কি রাশিয়ায় ধর্মের অপব্যবহার হত?

নিশ্চয়ই। নইলে জনসাধারণ কেন ধর্ম ত্যাগ করবে?

আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে যা চলছে, তার ফল কি রাশিয়ার মতো হবে?

বাস তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ পাকিস্তান হলে তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক সংস্কার ও প্রগতিপন্থীদের স্থান হবে না।

যথাসময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হল। শিউলী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। মাস্টারমশাই গেজেট হাতে করে এসে জাফর সাহেবকে বললেন,— আমি যা বনেদ গড়ে দিলাম, তাতে বি. এ. পড়তে ইংরেজী, বাংলা আর অঙ্কে শিউলীর কোনো বেগ পেতে হবে না। অপূর্ব মেধাবিনী মেয়ে। আপনি শিউলীকে অঙ্ক আর ইতিহাস নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করবেন। আপনার মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়, এ মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশের ও দশের সেবা করে পূর্বপুরুষের মুখ উজ্জ্বল করবে।

জাফর সাহেব মাস্টারমশাইকে পাঁচশ' টাকা দিলেন। শিউলী একটা সোনার মালা দিয়ে প্রণাম করল। মাস্টার মশাই শিউলীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন,—মা, তুমি শিক্ষায় উন্নত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই অভাগাদেশের সেবা কোরো। কুশিক্ষায় অন্ধসংস্কারচ্ছন্ন সমাজের সম্মুখে সংস্কারমুক্ত শিক্ষিতা মেয়েরাই প্রকৃত পথ নির্দেশ করতে পারে। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি তিনি কৃপাকরে তোমাকে এমন সাহস ও শক্তি প্রদান করুন যাতে তুমি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থায় জয়ী হতে পারো। তোমার মতো মেয়েদের কাছে দেশ ও সমাজ অনেক কিছু আশা করে।—বলতে বলতে বৃদ্ধ মাস্টার-মশাই'র চোখে জল এসে গেল।

শিউলীকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করবেন, এ ইচ্ছা জাফর সাহেবের বরাবরই ছিল। কলকাতায় শিউলীর থাকার জন্য বালীগঞ্জের বাড়ীর চার-তলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া না দিয়ে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। সেই ফ্ল্যাটে শিউলী করিমের মা'কে নিয়ে থাকবে। জাফর সাহেবের এটর্নি ব্যারিস্টার অমিয় ব্যানার্জী ও তাঁর স্ত্রী অপর্ণাদেবী শিউলীর দেখাশোনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে জাফর সাহেব তাঁর এটর্নি অমিয় বাবুকে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় পাশের ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছেন, ব্যারিস্টার সাহেবের চেম্বার করার জন্য নীচতলায় একটা ঘর বেশ সাজিয়ে দিয়েছেন।

জাফর সাহেব তাঁর ইচ্ছামত শিউলীর জন্য কলকাতায় যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, কিন্তু কার্যকালে সে ব্যবস্থা হল না। বালীগঞ্জের বাড়ীতে অমিয় বাবুর হেপাজতে কেবলমাত্র করিমের মা'কে নিয়ে শিউলী থাকবে শুনে বেগমসাহেবা ঘোর আপত্তি তুললেন। ও বাড়ীতে সব ভাড়াটেই হিন্দু।

কাছেপিঠে একঘর মুসলমান নেই। এমন জায়গায় বয়স্থা মেয়েকে কখনোই রাখা যেতে পারে না। মেয়েকে যদি কলকাতাতেই পড়াতে হয়, তবে তার আপনজন ফুফু জুলেখার কাছে রেখে পড়াতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাফর সাহেব শেষপর্যন্ত বেগম সাহেবার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কেন যে তিনি শিউলীকে জুলেখার হেপাজতে রাখতে অনিচ্ছুক, সে কথা জাফর সাহেব বেগম সাহেবাকে খুলে বলতে পারলেন না কারণ, বলা সম্ভব নয়।

জাফরুল্লা চৌধুরীর ভগ্নীপতি ওমরসাহেব বহুপুরুষ যাবৎ কলকাতা চিৎপুরে আতরের নামকরা ব্যবসাদার। আতরের সঙ্গে জর্দা প্রভৃতি বহুরকম সুগন্ধি সৌখীন জিনিসও দোকানে বিক্রী হয়। ওমর সাহেবের বাপ-দাদার সময়ে কলকাতা চিৎপুরে নিজস্ব চারতলা বড়ো বাড়ী, বড়ো দোকান, জুড়িগাড়ি, অনেক কিছুই ছিল। সেই সব দেখেই জমিদার হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরী একমাত্র মেয়ে জুলেখার বিয়ে দিয়েছিলেন।

ওমর সাহেব ছেলেবেলায় অসৎসঙ্গে মিশে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখেন নি। সেই সময় থেকেই অসৎসঙ্গের দোষগুলি রপ্ত করে টাকা উড়োতে আরম্ভ করেন। বাপ মহব্বত খাঁ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন একেবারে বেপরোয়া হতে পারেন নি। বিয়ের দু'বছর পরে মহব্বত খাঁর মৃত্যু হলে রাশছেঁড়া ঘোড়ার মতো ওমরসাহেব ছুটেছিলেন অধঃপাতের পথে। শেষে যখন বাড়ী, গাড়ী, দোকানের মূলধন, সব শেষ হয়ে দেনার টাকা আদায়ের জন্য কোর্টের ওয়ারেন্ট বেরোল, তখন এসে কেঁদে পড়লেন জুলেখার কাছে।

মহব্বত খাঁ ছেলের স্বভাব-চরিত্র বুঝে কলুটোলায় একখানা তেতলা বাড়ী ও ব্যাঙ্কে কিছু নগদ টাকা জুলেখার নামে করে দিয়েছিলেন। স্বামীর এই বিপদে জুলেখা স্থির থাকতে পারলেন না ; বাড়ী বন্ধক দিয়ে ও ব্যাঙ্কের টাকা তুলে সেবারের মতো দোকান ও ওমর সাহেবকে রক্ষা করলেন।

দোকানে যথেষ্ট আয় ছিল। ওমর সাহেব সৎভাবে চললে বাড়ী বন্ধক খালাস করা কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু ওমর সাহেব কিছুদিন একটু বিশ্রাম করে নিয়েই আবার তাঁর অভ্যস্ত পুরনো পথেই ছুটে চললেন। জুলেখার অনুরোধ উপরোধ মান অভিমান কান্নাকাটি কোনো কিছুই তাঁকে থামাতে পারল না। শেষে যখন দেনার দায়ে কলুটোলার বাড়ী যেতে বসল, তখন

জুলেখা বাধ্য হয়ে বাপ হিদায়েতুল্লা চৌধুরীকে সব জানালেন। হিদায়েতুল্লা চৌধুরী তাঁর দেওয়ান উমাশঙ্কর রায়কে পাঠিয়ে বাড়ী বন্ধক খালাস করে দোকানে নিজেদের পছন্দমত একজন কর্মচারী রেখে দিলেন।

যাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সব বাধাই দূর করতে পারে। ওমর সাহেবের বুদ্ধি সেরকম তীক্ষ্ণ না হলেও তাঁর সঙ্গী মহলে বুদ্ধিমান লোকের অভাব ছিল না। তাদের পরামর্শে ওমরসাহেব আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় হিদায়েতুল্লা চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ায় বিশহাজার টাকা ও কলুটোলার বাড়ীখানা হাতে আসায় আবার কিছুদিন বেশ চলল। তারপর জুলেখার পত্র পেয়ে জাফর সাহেব এসে সব দেনা শোধ করে দিদির কাছ থেকে বাড়ীখানা আবার নিজ নামে কিনে নিলেন। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা হল, জুলেখার ছেলে ইব্রাহিম যতদিন উপার্জনশীল না হবে ততদিন তাঁরা বিনা ভাড়ায় বাড়ীতে থাকতে পারবেন।

এইবার ওমর সাহেবের প্রকৃত অভাব দেখা দিল; কারণ, কেউ আর মোটা টাকা কর্জ দেয় না। বন্ধুবান্ধবের কাছে হাওলাতী টাকাও বেশ জমে উঠল। যখন ওমর সাহেবের সব নেশা ও খেয়াল বন্ধ হতে চলেছে, তখন হঠাৎ আর একটা সুযোগে দশহাজার টাকা এসে গেল।

জুলেখার দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড়ো মেয়ে সোফিয়ার বিয়ে দিয়েছিলেন হিদায়েতুল্লা চৌধুরী, ভালো ঘরে শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে। ছোটো মেয়ে আনোয়ারা যখন বয়স্থা হল, হিদায়েতুল্লা চৌধুরী আর ইহলোকে ছিলেন না। ওমর সাহেব সুন্দরী কিশোরী আনোয়ারাকে এক ষাট বছরের বুড়ো ধনীর হাতে তুলে দিয়ে যা পেলেন তাতে হাওলাতী দেনা শোধ করে আরও কিছুদিন সরস পথে চলতে পেরেছিলেন।

বিয়ের কয়েক মাস পরে আনোয়ারার এক করুণ পত্র পেয়ে জুলেখা তাকে নিজের কাছে আনেন। আনোয়ারা মা'এর কাছে এসে যা বলল তাতে মায়ের প্রাণ হাহাকার করে কেঁদে উঠল। মেয়ে কুৎসিত রোগগ্রস্তা।

জুলেখার হাতে যা কিছু গয়নাগাটি অবশিষ্ট ছিল তাই বিক্রী করে মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আনোয়ারার রোগ আরোগ্য হল বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক জানিয়ে দিলেন,‧ঐ স্বামীর ঘর করলে আবার রোগ হবে। সেই পুনরাক্রমণে মেয়ে যদিও বা বাঁচে, সারা জীবন অকর্মণ্য হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

সুলতানপুরের খানচৌধুরীবংশের মেয়ে জুলেখার রুচিতে তালাক অত্যন্ত

ঘৃণ্য। তথাপি কিশোরী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মা জুলেখা বংশগত সংস্কার চাপা দিয়ে তালাকের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত।

বৃদ্ধ জামাই তাঁর সুন্দরী পঞ্চদশী বিবিকে তালাক দিতে সম্মত তো হলেনই না, অধিকন্তু আদালতের আইনবলে বিবি-উদ্ধারের ভয় দেখালেন।

ওমর সাহেবের আতরের দোকানে একজন বড়ো খদ্দের তাহের মিঞা। ঘটনাটা মিঞা সাহেবের কানে উঠতেই তিনি বললেন,—তিনদিনের মধ্যে দেনমোহর সমেত তালাক আদায় করে দিচ্ছি, কুছ্ পরোয়া নেই।

এ রকম ব্যাপারে তাহের মিঞার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির বাস্তবিকই কুছ্-পরোয়া ছিল না, বা নেই। তিনি একজন বড়ো চামড়ার ব্যবসাদার। বহু কসাই তাঁর হাতে। তিনদিনের মধ্যেই তালাক আদায় হয়ে গেল। তারপর সাতদিনের মধ্যে তাহের মিঞার চতুর্থী বিবি হয়ে আনোয়ারাকে যেতে হল মিঞা সাহেবের বাগমারির বাড়ীতে। জুলেখার কান্নাকাটি, চোখের জল, কোনো কিছুই কাজে লাগল না।

এ সব ব্যাপার জাফরুল্লা চৌধুরী জানতেন। সেইজন্যই শিউলীকে কলুটোলার বাড়ীতে জুলেখার কাছে রাখতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। জুলেখার প্রকৃত অবস্থাটাও তিনি বেগমসাহেবাকে বলতে পারেন নি।

শিউলীকে সঙ্গে নিয়ে জাফরুল্লা চৌধুরী এসে উঠলেন কলুটোলার বাড়ীতে। পূর্বেই পত্র লিখে সব ব্যবস্থা করা ছিল। শিউলী থাকবে তেতলায়, খাওয়া চলবে জুলেখার সংসারে।

জুলেখা শিউলীকে সাতবছর দেখেন নি। এখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। জাফরভাইয়ের মেয়ে যে এমন অপূর্ব সুন্দরী, তা তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। মেয়ের যেমন নিটোল স্বাস্থ্য, তেমনি নিখুঁত গড়ন, তেমনি কচি কলাপাতার মত স্নিগ্ধ গৌর গায়ের রঙ্। দেহের লাবণ্য যেন জামাকাপড় ছাপিয়ে উছ্‌লে পড়ছে।

প্রথম দেখার বিস্ময়ঘোর কেটে গেলে জুলেখার মনে একটা সুখ কল্পনা আষাঢ়ী মেঘের ফাঁকে সোনালী রোদের ঝলকের মতো দেখা দিল। এই মেয়ের সঙ্গে যদি ইব্রাহিমের সাদী কবুল করানো যায়, তবে তো রাজকন্যা ও রাজত্ব— দুইই লাভ হতে পারে! এই চিন্তায় বিভোর হয়ে জুলেখা শিউলীকে খুব আদর যত্ন করতে আরম্ভ করলেন।

শিউলীকে নিয়ে জাফর সাহেব সকাল আটটার মধ্যে কলুটোলার বাড়ীতে পৌছেছিলেন। সেখানে স্নান আহার করে দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়ে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে জাফর সাহেব শিউলীকে বললেন,—

মা, আমি এখন বালীগঞ্জে যাচ্ছি। আজ আর আসব না। কাল বিকেলে এসে তোমাকে দেখে যাব।

ওখানে আপনার কি অনেক কাজ আছে?

হ্যাঁ মা, অনেক কাজ আছে। বৈষয়িক কাজ তো আছেই, তা ছাড়া তোমাকে কোন কলেজে ভর্তি করা হবে, সে বিষয়ে অমিয়বাবু ও অপর্ণাদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করব। অপর্ণা দেবী এখানে অনেকগুলি গার্লস কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। সম্ভব হলে কাল বেলা বারোটায় অপর্ণাদেবীর সঙ্গে দু'একটা কলেজ দেখতে যাব।

এমন সময় জুলেখা কিছু খাবার ও চা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। শিউলী জুলেখার দিকে না তাকিয়ে জাফরসাহেবকে বলল,—

বাবা, করিমের মা না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু তেতলায় একাই থাকব। একা থাকতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

জাফরসাহেবকে শিউলীর কথার উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে জুলেখা ব্যস্ত হয়ে বললেন,—তা কি হয়! তুমি সোমত্থ মেয়ে। তুমি এই তেতলায় একা থাকবে কেন? তুমি থাকবে আমার ঘরে আমার কাছে। ইব্রাহিম বাড়ী নেই, সে এলে এই উপরের ঘরে থাকবে।

শিউলী অপূর্ব ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে সোজা জুলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল,—দশ বছর বয়স হতে আমি একা একঘরে থাকতে অভ্যস্ত। এখানে এই তেতলায় এই ঘরে আমি একাই থাকব। করিমের মা এসে পাশের ঘরে থাকবে।

শিউলীর কথায় ও সেকথা বলার ভঙ্গীতে জুলেখা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে আর কথা ফুটল না।

জাফর সাহেব ঘটনাটায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি একটু দম নিয়ে বললেন,—আচ্ছা মা, তুমি তাই থেকো। ভয় কি? আমরা তো জ্ঞাতসারে এমন কোনো পাপ করি নি যার জন্য আমরা ভয় করব। তুমি রাত্রে শোবার সময় এক রেকাত্ নামাজ পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিও, খোদার দোয়ায় কোনো অমঙ্গল তোমার কাছে আসতে পারবে না।

এরপর আর কোনো কথা হল না। জাফর সাহেব চা খেয়ে বেরিয়ে গেলে

চিন্তাকুল জুলেখা বিষণ্নমুখে প্লেট কাপ তুলে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন। শিউলী সংবাদপত্র খুলে পড়তে বসল।

এমন সময় আনোয়ারা এসে দাঁড়াল শিউলীর ঘরের দরজায়। আনোয়ারার ডাক নাম চাঁপা, দেখতে ঝড়ে আছড়ানো চাঁপা ফুলেরই মতো। বয়সে শিউলীর চেয়ে দুই বছরের বড়ো।

চাঁপাকে আসতে দেখে শিউলী হাসিমুখে উঠে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এনে বসিয়ে অনুযোগের সুরে বলল,—

দিদি, আমি সেই সকালে এসেছি। এর মধ্যে আপনি একবারও আমার ঘরে এলেন না কেন?

মামুর সামনে বেরোতে মা নিষেধ করেছেন।

কথাটা শুনে শিউলীর মুখের হাসি উবে গেল। রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—

কেন নিষেধ করেছেন?

মামু আমাকে ছেলেবেলায় খুবই ভালোবাসতেন। তিনিই আদর করে নাম দিয়েছিলেন চাঁপা। বড়ো হয়ে আমার নসিবে যা ঘটেছে, তাতে মামু খুব দুঃখ পেয়েছেন। এখন দেখলে আরও দুঃখ পাবেন বলে মা তাঁর সম্মুখে বেরোতে দেন না।

আনোয়ারার কৈফিয়ত শুনে শিউলীর মনের রুক্ষভাব দূর হয়ে আনোয়ারা ও জুলেখার জন্য সমবেদনা জেগে উঠল। সে মিনতির সুরে অনুরোধ করল,—

দিদি, আপনার নসিবে কি ঘটেছে, আমাকে সব খুলে বলবেন?

কেন, তুমি কি কিছুই জানো না!

না, বাবা এখানকার কোনো কথাই কোনোদিন আলোচনা করেন নি।

হ্যাঁ, এখানে যা সব ঘটে, তাতে মামু লজ্জা পান বলেই তা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেন না।

সেই জন্যই বোধহয় বাবা আমাকে বালীগঞ্জে অমিয়বাবুর কাছে রাখতে চেয়েছিলেন।

তবে এখানে এলে কেন?

মা আর ফুফুর জিদের জন্যই আসতে হয়েছে।

কাজটা ভালো হয় নি। তোমার মা জিদ করলেন কেন?

বালীগঞ্জের বাড়ীতে না কি সবই হিন্দু। কাছেপিঠেও কোনো মুসলমান নেই।

আমার বওনাই কলেজের প্রফেসর। পার্কস্ট্রীটে যে বাড়ীতে তিনি থাকেন সে বাড়ীর আর সব ভাড়াটে হিন্দু বা খৃস্টান। তাতে দিদির তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না! বরং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দেই আছে।

বড়দিদি তাদের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করেন?

দিদি স্বচ্ছন্দে তাঁদের ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করেন। তাঁদের সঙ্গে সিনেমা থিয়েটারে যান। দরকার হলে দোকানে গিয়ে জামা কাপড় কেনা-কাটা করেন। এর জন্য কেউ তাঁদের কিছু বলতে সাহস করে না।

আপনি এসব করতে পারেন না?

ওরে বাপ্‌রে, তাহলে আর আস্ত রাখবে না। বোরখা না পরে ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো চলে না।

বড়দিদির বেলায় একরকম, আর আপনার বেলায় ভিন্নরকম হল কেন?

নানা সাহেব দিদির সাদী দিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে। সেজন্য দিদির কপালে এ সুখ মিলেছে আমার তো-তা হয় নি।

আপনার ভাগ্যে এরকম সাদী হল কেন?

মা বলেন, তের বছর বয়সে বোরখা না পরে রাস্তায় গিয়ে আমার কপাল পুড়েছে।

সে কি রকম?

তের বছর বয়সে একদিন বোরখা না পরে বাপজানের নাস্তা দিতে দোকানে গিয়েছিলাম। সেই সময় ঐ বুড়ো আমাকে দেখে সাদী করার জন্য পাগল হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ বুড়োর ঘরেই যেতে হল।

ফুফু কেন এ সাদীতে রাজি হলেন?

মা প্রথমে রাজি হন নি, অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন। বুড়ো খুব টাকাওয়ালা, হাতেও বহু গুণ্ডা আছে। বাপজান দশহাজার টাকা পেয়ে রাজি হলেন। মা আর তখন কি করবেন।

সে বুড়ো আপনাকে তালাক দিলেন কেন?

ইনি যে ঐ বুড়োর চাইতেও বড়ো গুণ্ডার দলের সর্দার।

বেশ, এখন এই সর্দারের ঘরে কেমন আছেন?

আমাকে নিয়ে এঁর চার বিবি। তাছাড়া অনেকগুলো বাঁদীও আছে।

এতগুলো সতীন নিয়ে এক সঙ্গে ঘর করেন, ঝগড়াঝাটি হয় না? আমি বইতে পড়েছি, হিন্দু সমাজে সতীনের সংসারে ঝগড়ার ঠেলায় বাড়ীতে কাক-চিল আসে না।

না। আমাদের মধ্যে ঝগড়া করা দূরে থাক, কেউ কোনো বিষয়ে কোনো ওজর-আপত্তি করতেও সাহস করে না।

কেন করে না?

আমার শ্বশুর ঢাকা শহরে চক্‌বাজারে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ির মালিক ছিলেন। তিনি নাকি শস্তায় বজ্জাত ঘোড়া কিনে চাবুকের জোরে জাত করে গাড়ি টানাতেন। ইনি বলেন, 'বাপজান বজ্জাত ঘোড়া জাত করে গাড়ি টানিয়েছেন, আমি বেতরিবত আওরত তরিবত ক'রে ঘর করব।'

আপনি কেন এমন সাদী কবুল করলেন?

আমার কবুল আর অকবুলের তোয়াক্কা কে করছে বল!

কেন! মেয়েদের মতামতের কি কোনো দাম নেই?

দাম আছে কি না, তা জানিনে। আমার ও ঐ বাড়ীর আর সকলের বেলায় তো দেখি কোনো দাম নেই।

আপনি যে এখানে এসে আছেন এটা কি মিঞা সাহেবের ইচ্ছায়?

না, আমার এখানে আসার সংবাদ তিনি পেয়েছেন কিনা জানিনে।

কেন! তিনি কি কলকাতায় নেই?

না, তিনি কলকাতা থেকে পালিয়েছেন। শুনছি এখন নাকি ঢাকায় আছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আসবেন।

পালালেন কেন?

গত বছর বড়ো দাঙ্গার সময় তিনি তাঁর দলবল নিয়ে অনেক কিছু করেছেন। সেই ভয়ে পালিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করে কিছু বলে যাওয়ারও সময় পান নি।

এখানে এসে আপনি বাইরে বেড়াতে যান না?

বাইরে তো দূরের কথা এই তেতলার খোলা ছাদে এসে দাঁড়াই নে।

কেন দাঁড়ান না?

যদি কোনো পুরুষের চোখে পড়ে যাই।

তাতে দোষ কি?

বা রে! এই নিয়েই তো খুন খারাপি হয়।

আপনি কলকাতার চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন, এ সব দেখেছেন?

না ভাই, ছেলেবেলায় মামুর সঙ্গে গিয়ে একবার চিড়িয়াখানা দেখেছি। এখন তো বোরখা পরে গাড়িতে বাইরে চলতেও গা কাঁপে।

এসব দেখতে ইচ্ছা করে না ?

খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে করলে কি হবে, এ জন্মে আর কোনো সাধই পূর্ণ হবে না।

আনোয়ারার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। সে শিউলীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে খোলা জানালার বাইরে অবাধ উন্মুক্ত আকাশে উড়ন্ত একটা পাখির দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। শিউলী আর প্রশ্ন করল না।

আনোয়ারার কাহিনী শুনে সেদিন শিউলীর মনে প্রথম প্রশ্ন জাগল, সমাজে আনোয়ারা এই একটি, না আরও আছে ? যদি আরও থেকে থাকে তবে ধর্মীয় আইন, সামাজিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন এদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না কেন ?

ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিউলী সুলতানপুরের বাড়ীতে জাফরুল্লা চৌধুরীর কাছে লালিতা-পালিতা হয়েছে ? সমাজের বাস্তব চিত্র দেখার সুযোগ সে পায় নি। সেইজন্য শিউলী জানত না যে, যারা নিজের অধিকার নিজে রক্ষা করতে চেষ্টা করে না, তাদের রক্ষা করতে কোনো আইনই এগিয়ে আসে না। অধিকন্তু কোনো বেআইনী ব্যাপার যদি বেশ কিছুদিন সমাজে অবাধে চালু থাকে, তবে আর লোকচক্ষে বেআইনী বলে ধরা পড়ে না, নির্যাতিতরাও আর ওটাকে বেআইনী ভাবতে পারে না।

শিউলী যেদিন কলুটোলার বাড়ীতে এল সেদিন ইব্রাহিম বাড়ী ছিল না, গিয়েছিল ভগ্নীপতি আবদুলকাদের সাহেবের বাসায়। কাদের সাহেব গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়েছিলেন পাটনায় নিজ বাড়ীতে। দুই মাস পরে কলকাতার বাসায় এসে সংসার গোছানোর জন্য দিদি সোফিয়া ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ইব্রাহিম বেশ স্ফূর্তিবাজ ছেলে, বয়স বাইশ বছর; কলেজে আই. এস্-সি. পড়ে। সেদিন বিকালে তার আসার কথা ছিল, কিন্তু আসে নি। সংবাদ পাঠিয়েছে, রাত্রে বাড়ী এসে খাবে।

ইব্রাহিম যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত এগারটা। জুলেখা ছেলের খাবার সাজিয়ে বসেছিলেন। ইব্রাহিম খেতে বসলে জুলেখা বললেন,—

আজ তোর মামু আর তার মেয়ে এসেছে।

হুঁ।

তোর মামুর অনেক টাকা, কলকাতায় তিনখানা বাড়ী আছে।

হুঁ।

তোর মামুর মেয়েকে যে বিয়ে করবে সে সবকিছুই পাবে।

হুঁ।

তুই যদি বিয়ে করিস, তবে তুইই সব পাবি।

আর তোমরা তিন বছরে তিনখানা বাড়ী উড়িয়ে দিয়ে মেয়েটাকে পথে বসাবে।

এ সেরকম মেয়ে নয় রে। আজ একদিনেই যা বুঝলাম, ভয়ানক শক্ত।

তবে এ মেয়ে বিয়ে করে লাভ কি হবে?

একবার যদি বিয়েটা হয়ে যায়, তখন আপনা থেকেই নরম হবে।

কিন্তু আমার ও তোমার ইচ্ছা হলেই বিয়ে হবে, এটা কিসে বুঝলে?

তোর আমার ইচ্ছায় যে এ বিয়ে হবে না, তা এই একদিনেই বেশ টের পেয়েছি। এমন কি জাফর ভাই'র ইচ্ছাতেও হবে না। মেয়েটাকে বশ করতে হবে।

কি করে বশ করবে?

সেই তো কথা! তুই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা কর।

তা করব। মেয়েটা তো পাড়া গেঁয়ে উজ্‌বুক, কথাটথা বলতে পারে তো?

না রে, তা নয়। বললাম তো বড়ো শক্ত মেয়ে।

তা জানি। পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা টাকাপয়সা, খাওয়া-পরার ব্যাপারে শক্তই হয়।

এ মেয়ে সে রকমই নয়। আমি ভাবছি, এর সম্মুখে তুই কথা বলতে পারবি কিনা!

আমি কথা বলতে পারব না ঐ পাড়াগেঁয়ে পুঁচকে মেয়েটার সঙ্গে! তুমি মনে ভেবেছ, মেয়েটা ম্যাট্রিক পাস করে একেবারে কেউকেটা হয়ে পড়েছে। রেখে দাও তোমার ম্যাট্রিক পাশ, তাও আবার প্রাইভেট পড়ে ম্যাট্রিক পাস, জীবনে স্কুলের দরজায় পা দেয় নি। জানো, আমি কলেজে বি. এ. ক্লাসের হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করি? আমি ভাবছি তোমার শক্ত মেয়েটা ছিঁচ্‌কাঁদুনে পেঁচী হলে কিন্তু আমার সঙ্গে বনবে না।

আচ্ছা, কাল সকালে আমার ঘরে তোদের নাস্তার ব্যবস্থা করব। তখন দেখা যাবে।

পরদিন সকালে খাওয়ার আয়োজন করে জুলেখা আনোয়ারাকে পাঠালেন শিউলীকে ডাকতে। খাবার টেবিলে কে কোথায় বসবে, জুলেখা আগেই স্থির করে রেখেছিলেন। ইব্রাহিমের সম্মুখে বসবে শিউলী।

ইব্রাহিম আগেই তার জায়গায় বসেছিল। শিউলী এসে আয়োজনের অবস্থাটা একটু দেখে নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসল।

ঘরের সকলেই নীরব। ইব্রাহিম শিউলীকে একবার মাত্র দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জামার বোতাম খুঁটতে আরম্ভ করল। জুলেখা দেখছেন ইব্রাহিমের ভাব। শিউলী জুলেখার খাওয়া আরম্ভের অপেক্ষায় নিজের প্লেটে পাউরুটি-টোস্টে জেলি মাখাতে লাগল।

দু'তিন মিনিট চলে গেলেও যখন জুলেখা বা ইব্রাহিম খেতে আরম্ভ করল না, তখন শিউলী প্রথম ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে বলল,—

চাঁপাদিদি, খেতে আরম্ভ করুন। চা জুড়িয়ে যাবে।

চমক ভেঙ্গে জুলেখা বললেন—হাঁ, হাঁ, তোরা খেতে আরম্ভ কর। শিক-কাবাব, চপ্, সব যে জুড়িয়ে গেল।

জুলেখার নির্দেশ পেয়ে শিউলী টোস্ট মুখে দিতেই জুলেখা বললেন,—তুমি তো দেখছি এ সব খেতেও শেখো নি। আগে গোস্তের খানা খেতে হয়। শেষে রুটি।

আমি এ সব মাংস খাই নে। দোকানে তৈরী কোনো মাছ মাংসের খাবারও খাইনে। আমার জন্য এসব আনবেন না।

তুমি কি কোনোদিন গোস্ত্ খাও নি?—প্রশ্ন করল চাঁপা।

যখন ছোটো ছিলাম তখন খাসি আর মুরগীর মাংস খেয়েছি।

তুমি গোস্ত না বলে মাংস বল কেন?

গোস্ত বাংলা শব্দ নয়।

কত বয়সে মাংস খাওয়া ছেড়েছ?

বোধহয় দশ বছর বয়সে।

কেন ছাড়লে?

খেতে প্রবৃত্তি হল না।

মাছ খাও?

খাই। কিন্তু পিঁয়াজ-রসুন বেশী থাকলে খাইনে।

কেন খাও না?

গায়ে মুখে দুর্গন্ধ হয়।

যে সময় শিউলী ও চাঁপার মধ্যে কথা হচ্ছিল তখন জুলেখা ঠেলছিলেন ইব্রাহিমকে কথায় যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোনো ফল হল না। শেষে জুলেখা নিজেই আসরে অবতীর্ণ হয়ে শিউলীকে প্রশ্ন করলেন,—

তুমি তো এ সব খাবার খাও না, বাড়ীতে নাস্তায় কি খেতে?

সকালে খেতাম লুচি-তরকারি আর গরম দুধ। বিকালে দুধ, চিড়ে, কলা, আম, কাঁঠাল, যখনকার যে ফল।

এখানে কি খাবে?

কলকাতার দুধ কাল রাত্রে যা খেলাম, ও আমার ভালো লাগে নি। সকালে ব্যবস্থা করব পাঁউরুটি, মাখন আর কলা। বিকালে চিড়ে-দৈ। আমি সব ফর্দ করে টাকা দেব, আপনি আনিয়ে দেবেন।

বেশ, তোমার ফরমাশ মতো জিনিস বাজার থেকে আনার জন্য ইব্রাহিমের সঙ্গে আলাপ করে নাও। কলকাতার কোথায় কি ভালো পাওয়া যায় ইব্রাহিম জানে।

দাদা তো আমার সঙ্গে কথা বলছেন না।

এবার আর নীরব থাকা ইব্রাহিমের পক্ষে সম্ভব হল না। ঢোক গিলতে গিলতে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,—আ—আপ্—অ্যাঁ—তোমার নাম কি?

শিউলী একটু কৌতুকের হাসি হেসে উত্তর দিল,—শিউলী।

ইব্রাহিমের অবস্থা দেখে জুলেখা আগেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এখন শিউলীর মুখের হাসি তাঁর অন্তর জ্বালিয়ে দিল। ফলে জুলেখা চালে ভুল করে রুক্ষ মেজাজে ধমকের স্বরে শিউলীকে বললেন,—

ওটা তো হিঁদুয়ানী নাম। তোমার আসল নাম বল।

আগের দিন শিউলী আনোয়ারার কাহিনী শুনে জুলেখার জন্য অন্তরে দুঃখ ও সহানুভূতি অনুভব করেছিল। সেই সহানুভূতিই এতক্ষণ তাকে সরস ও সরল করে রেখেছিল। জুলেখার কড়া মেজাজে হুকুমের স্বর তাকে বিস্মিত করে সে সরসতা দূর করে মুখের ওপরে ফুটিয়ে তুলল কঠোরতার ছাপ। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড জুলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,—রোশেনারা খান চৌধুরী।—বলেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চা'এর কাপ হাতে তুলে নিল।

শিউলীর দৃষ্টি ও নাম বলার ভঙ্গীতে জুলেখা আরও চটে গেলেন আগের মতোই মেজাজী স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—

তবে ও নাম বললে কেন?

দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি নে। যদি সে শিক্ষা মেয়েরা পেত, তবে হারেম বা জেনানায় একাধিক বেগম বা বিবি জোগাড় করা নিশ্চয়ই সম্ভব হত না।

হিন্দুদের মধ্যেও তো বহু বিবাহ আছে?

আছে নয়, ছিল। এখন তাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হওয়ায় ও কুপ্রথা উঠে গেছে।

শুনছি, পাকিস্তান হলে নাকি সেখানে সরিয়তী শাসন কায়েম হবে। মেয়েদের নাকি শাড়ী ছেড়ে সালোয়ার-বোরখা পরা বাধ্যতামূলক হবে।

ও সব কতকগুলো অপগণ্ড কূপমণ্ডুকের খোয়াব। ও খোয়াব সার্থক করতে হলে বর্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত রোধ করতে হবে, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব?

ভারতে মুসলমান সমাজের পাশেই বিরাট হিন্দু সমাজে ঐ স্রোত বহু কিছু পুরনো ভেঙ্গে নতুন গড়ে তুলছে। মুসলমান সমাজের তরুণ তরুণীদের দৃষ্টি সেই ভাঙ্গাগড়া থেকে ফিরিয়ে রাখা যাবে না।

কিন্তু সংবাদপত্র ও আধুনিক সাহিত্য পড়ে তো মনে হয়, এখন হিন্দুর সমাজজীবনে চলছে একটা নিদারুণ বিশৃঙ্খলা।

একটা পুরানো বড়ো বাড়ীর ভাঙ্গাচুরা মেরামত করার সময় যেমন সে বাড়ীতে একটা বিশৃঙ্খল ভাব দেখা যায়, হিন্দু সমাজে এখন সেই ভাব চলছে।

মুসলমান সমাজেও কি এই অবস্থা আসবে?

নিশ্চয়ই। একটি পুরনো বাড়ী যদি সময়মতো মেরামত করা না হয়, তবে ধ্বসে যায়। সে বাড়ীর কোনো উপাদানই আর কাজে লাগে না। সময় থাকতে মেরামত করলে প্রয়োজনীয় বহু উপাদান ঐ বাড়ী থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের সমাজ ঐ পুরানো বাড়ীর মতো।

কিন্তু এতে ধর্মের কোনো ক্ষতি হয় না কি?

এসব প্রশ্ন অমিয়বাবুকে করলে ভালো উত্তর পাওয়া যাবে। তিনি পণ্ডিত লোক, যথেষ্ট পড়াশুনা করেন, এই রকম আলোচনাই ভালোবাসেন।

জাফর সাহেবের গাড়ি বালীগঞ্জের বাড়ীতে পৌঁছে গেল।

জাফর সাহেবের গাড়ি এসে থামতে অমিয়বাবু অপর্ণাদেবী আর তাঁদের

মেয়ে নমিতা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। অপর্ণাদেবী শিউলীর হাত ধরে গাড়ী থেকে নামাতে নামাতে বললেন,—মা, তোমাকে পাবার জন্য আজ পাঁচদিন আমরা অপেক্ষা করছি। নমিতা তো ছট্‌ফট্ করছে। নমিতা তোমার সমবয়সী, দু'জনে এক পড়াই পড়ছ। তোমরা তোমাদের নাম ধরেই ডাকবে। আমাকে তুমি কাকীমা বলে ডেকো।

তোমার কাকীমা কাকাবাবুকে নমস্কার কর।—বললেন জাফর সাহেব। লজ্জায় রাঙা হয়ে শিউলী হাত তুলে নমস্কার করল। এরকম অপরিচিত আত্মীয়তার সম্মুখে সে কোনোদিন পড়েনি। সেজন্য একটু বিহ্বল হয়ে নমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিল।

শিউলীর অবস্থাটা বুঝে নমিতা এগিয়ে এসে হাতধরে বলল,—

চলুন, আমরা দুজন ছাদে যাই। ছাদে বসে সুন্দর লেক দেখা যায়। আমার ফুলগাছগুলোও দেখাব।

কাকীমা, ছাদে যাব ?

তা যাও। এসেই যখন নমিতার হাতেপড়লে, তখন আর আমার কাছে দু'দণ্ড বসার সময় পাবে না, যতক্ষণ না ওর প্রশ্ন আর গল্পের ঠেলায় পালিয়ে আস।

আমি বুঝি খুব বাজে গল্প করি ?—ঘাড় ফিরিয়ে নমিতা বলল মাকে।

না, না। ভালো ভালো প্রশ্ন কর।—হেসে উত্তর দিলেন অপর্ণা।

নমিতা কি রকম প্রশ্ন করে, কামীমা ?

এই ফুল কেন রাতে ফোটে, আকাশের তারাগুলো যদি সচল হয়, তবে তাদের দু'পাঁচটা আমাদের কাছে আসে না কেন, এই রকম।

নমিতার এ সব প্রশ্ন তো বাজে নয় !—বললেন জাফর সাহেব।

হাঁ, তবে উত্তর দিয়ে ওকে বুঝাতে উত্তরদাতার কালঘাম ছোটে।

আমার শিউলীও এই রকম প্রশ্ন করে। ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, এখানে আসার পথে দুধারে কোনো কিছু বোধহয় দেখে নি। কেবল প্রশ্নের ওপরে প্রশ্ন করতে করতে এসেছে।—বললেন জাফর সাহেব।

এরকম জানবার আকাঙ্খা যে সব ছেলেমেয়ের আছে, তারাই কালে বড়ো হয়।—বললেন অমিয়বাবু।

সেই জন্যই আমি শিউলীকে আজ বলেছি, যা কিছু প্রশ্ন তোমার কাকাবাবু ও কাকীমাকে কোরো, তাহলে ভালো উত্তর পাবে।

বেশ. এখন থেকে প্রতি রবিবারে সকালে তোমাকে আমি নিয়ে আসব আবার সন্ধ্যায় পৌছিয়ে দেব।—বললেন অমিয়বাবু।

সত্যই প্রতি রবিবারে আমি এখানে আসতে পারব?—আনন্দোৎফুল্ল শিউলী জিজ্ঞাসা করল জাফর সাহেবকে।

হাঁ আসবি বৈকি। এখানে এলে তোর অনেক লাভ হবে। আচ্ছা অপর্ণাদেবী, আমরা এখন কাজে যাই, আপনারা ওপরে যান।—বলে জাফর সাহেব ও অমিয়বাবু চেম্বারে গেলেন।

কলকাতায় আসার পর এ ক'দিন শিউলীর মনের ওপরে যেন একটা ভ্যাপসা-গুমোট ভাব জমে উঠেছিল। বালীগঞ্জে এসে তার মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। শিউলী তার এই ষোলোবছর বয়সের মধ্যে কোনো সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে মেশে নি। বালীগঞ্জের বাড়ীতে নমিতা আছে শোনার পর থেকে তার মনে ভয় ও সঙ্কোচ মিশ্রিত একটা অভূতপূর্ব ভাব ছিল। বালীগঞ্জে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মনের সব সঙ্কোচ দূর হয়ে একটা অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে উঠল। মেয়েরা এই বয়সে তার মনের কথা বলে একটু হাল্কা হওয়ার জন্য উপযুক্ত সমবয়সী খোঁজে, এটা তাদের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। শিউলী এতদিন সে রকম কোনো মেয়ের দেখা পায় নি। বালীগঞ্জে এসে নমিতাকে দেখার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে তার অবচেতন মন জানিয়ে দিল, এতদিন পরে সে এমন একটি সখী পেল, যার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে পারবে।

ছাদে এসে নমিতা শিউলীকে বলল,—প্রথম আপনি আমার বর্ষাতি ফুলগুলি দেখুন, তারপর শুনব আপনার বাড়ীর ফুলের গল্প।

তা দেখছি। কিন্তু কাকীমা বলেছেন আমাদের নাম ধরে ডাকতে। তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন?

নমিতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—ভুল হয়ে গেছে। এখন থেকে ঠিক হবে। আমাদের প্রথম আলাপেই যখন তুমি আমার ভুল সংশোধন করে দিলে, তখন তোমার এ অধিকার কিন্তু সারাজীবন রক্ষা করে চলতে হবে।

সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিলে, সুযোগ পেলেই অপরের ঘাড়ে নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে তুমি ওস্তাদ মেয়ে।—বলে শিউলী হেসে ফেলল।

নমিতা হেসে বলল,—তা হলে আজ থেকে আমার ভুলত্রুটির দায়িত্ব তুমি নিলে, আর তোমার ভুলত্রুটির দায়িত্ব আমি নিলাম, এই রকম ভাগাভাগি হোক। কেমন রাজি আছ?

আজই রাজি হতে পারছিনে। কারণ, তোমার ভুলের বহর যা দেখছি, তাতে আমার সামর্থ্যে কুলাবে কিনা সন্দেহ।

আর কি ভুল দেখলে?

ঐ জাতের গোলাপ টবে বসিয়েছ কেন? টবে ও কখনও ফুল দেবে না।

সত্যিই তো! আজ দু'বছর চেষ্টা করে একটা ফুলও ফোটাতে পারলাম না। অথচ গাছটার ওপরে আমার অত্যন্ত মায়া। ওকে তো ফেলে দিতেও পারব না!

ফেলে দিতে হবে না। কেরোসিন কাঠের একটা বড়ো বাক্স আনতে হবে। সেই বাক্সে মাটি ভরে ওকে বসালে ফুল দেবে।

তাহলে তুমি গোলাপের বিশেষজ্ঞ। গাছ দেখেই যখন গোলাপ চিনতে পার, তখন এর যত্ন আজ থেকে তুমিই করবে। আমার হাতে ও গাছে গোলাপ ফুটবে না, তোমার হাতে ফুটবে। আমি দেখেই খুশি হব। আমি জল দেওয়ার ঝাঁঝরিটা নিয়ে আসি। এই বলে নমিতা নীচে নেমে গেল।

মানব মনের একটা রহস্যপূর্ণ দিক আছে। সেদিকের কথা সব সময় বাইরে প্রকাশ পায় না। একটা গানের সুর, একটু গন্ধ, কোনো একটা দৃশ্য বা কোনোকথা আচমকা মনের এই দিকের কিছু প্রকাশ করে থেমে যায়। ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকে পথ দেখে চলার মতো মনের এই দিকের ক্ষণিক প্রকাশ কোনো সময়ে বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, কোনোসময়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা উজ্জ্বল করে তোলে। এই ভাবে যে ঘটনা মনে জেগে ওঠে, সেটি যদি সুখকর হয়, তবে মানুষ সেই ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে তার রস উপভোগ করার জন্য নির্জন স্থান ও সময় পেতে চায়। সেই সঙ্গে যদি সেই স্মৃতির অনুকূল কিছু নিকটে পায়, তবে সেটাও গ্রহণ করে।

শিউলী সুলতানপুরের বাড়ীতে গোলাপের বাগান করে নিজে সে বাগানের যত্ন করত। কত জায়গায় কত গোলাপ গাছ ও ফুল সে দেখেছে। কিন্তু সেদিন নমিতার কথা—'আমার হাতে গোলাপ ফুটবে না, তোমার হাতে ফুটবে'—তার মনে যেমন চমক্ দিল, সেরকম আর কোনোদিন দেয় নি।

শিউলীর মনে পড়ল হোসেনপুরে দেওয়ান বাড়ীর দুর্গাপূজার কথা। পূজার তিনদিন আগে গোলাপ তার মা'র সঙ্গে যেত হোসেনপুর। ফিরে আসত লক্ষ্মী পূজার পর। এই পনরোদিনের মধ্যে মাত্র দুদিন শিউলী বাবার সঙ্গে গিয়ে পূজো দেখে বিজয়া করে আসত।

হোসেনপুরের বাড়ীতে সে সময় বহু ছেলে মেয়ে থাকত। কিন্তু গোলাপ শিউলীকে পেলে আর কারও সঙ্গে মিশত না কেউ ডাকলে রাগ করত।

ফেরার সময় শিউলী পালকিতে উঠলে সে মুখভার করে পালকির কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। তার সেই ভাব দেখে শিউলীর মনে খুব দুঃখ হত। শিউলী ভাবত, সুলতানপুরের বাড়ীতে পূজা করলেই তো বেশ হয়, গোলাপকে আর হোসেনপুর যেতে হয় না।

ভাবতে ভাবতে শিউলীর চোখে পড়ল বালীগঞ্জ লেকের দৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের চোখে দেখা দিল সুলতানপুরের বাড়ীর ছাদ থেকে ভৈরবের ছবি। সেই সঙ্গে তার শৈশবের কত ঘটনা। প্রথমে অনেকগুলি একসঙ্গে জড়াজড়ি করে শেষে একটা ঘটনা আর গুলিকে সরিয়ে দিয়ে তার মন জুড়ে বসল।

শিউলী ও গোলাপ করিমের সঙ্গে গিয়েছে ভৈরবে স্নান করতে। শিউলী স্নান করে ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। গোলাপ নতুন সাঁতার শিখেছে, সেজন্য খুব ঝাঁপাঝাঁপি করেছে। একবার সাঁতার কেটে গোলাপ একটু দূরে গেল। ভয় পেয়ে শিউলী তাকে ফিরতে বলল। গোলাপ না ফিরে আরও দূরে গেল। শিউলী এবার কেঁদে ফেলল।

শিউলীর কান্নায় করিমের তাড়া খেয়ে গোলাপ ফিরে এল। ওপরে উঠে ভিজে প্যাণ্ট করিমকে দিয়ে শুকনো প্যাণ্ট-জামা পরে দু'জনে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন গোলাপ জিজ্ঞাসা করল,—

তুই অমন কাঁদলি কেন? আমি সাঁতরাতে পারলাম না।

তুই অত দূর গেলি কেন?

তাতে তোর কি? দেখিস একদিন সাঁতার কেটে ওপারে চলে যাব আর আসব না।

শুনে শিউলী দাঁড়িয়ে আবার কেঁদে ফেলল।

আবার কাঁদছিস কেন?

তুই ও কথা বললি কেন?

না, আর বলব না।

না, তুই ও কথা বললি কেন?

আর বলব না।

নাঃ, তুই ও কথা বললি কেন?

করিম গোলাপের প্যাণ্ট-জামা কেচে নিয়ে পিছনে আসছিল, শিউলীকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে গোলাপকে ধমক দিয়ে বলল—তুই বুঝি ওকে মেরেছিস চল, আজ হুজুরের কাছে, আমি সব বলে দেব।

নাঃ, আমি মারি নি।

তবে ও এমনিই কাঁদছে? চল আজ আমি বলে দেব, তুই ফাঁকে পেলেই ওকে মারিস।

নাঃ, আমি মারি নি। তুমি শিলীকে জিজ্ঞাসা কর।

করিম শিউলীকে জিজ্ঞাসা করে যা উত্তর পেল, তা না বুঝে দু'জনকে উপস্থিত করল জাফর সাহেবের সম্মুখে।

জাফর সাহেব শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, —

গোলাপ তোকে মেরেছে?

না।

তবে কাঁদছিস কেন?

গোলা ও কথা বলল কেন?

কি কথা বলেছে?

সাঁতার কেটে চলে যাবে, আর আসবে না।

শুনে জাফর সাহেব হেসে বললেন, গোলা যদি সাঁতার কেটে চলে যায় তবে আমি পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে ধরে এনে খুব করে কান মলে দেব।

না।

না কেন?

ব্যথা লাগবে।

এ কথা শুনে তখন জাফর সাহেব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

দশবছর আগের এই ঘটনা মনে পড়তেই শিউলী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বাবা সেদিন কি ভেবেছিলেন! এখনও যদি সে কথা তাঁর মনে থেকে থাকে, তবে— ?

জল আনতে গিয়ে নমিতার বেশ বিলম্ব হল। ছোটো ভাই খোকন তার সৌখীন ঝাঁঝরিটা ভেঙে ফেলেছে, সেজন্য খোকনকে ধমকাতে কিছু সময় গেল। তারপর ফুলগাছে জল দেবার জন্য শিউলীর হাতে যে কি দেওয়া যায়, তা ভাবতে সময় গেল। শেষে, শিউলীর হাতে যে টিনের মগ দেওয়া যায় না, সে কথা মা'কে বুঝিয়ে জাপানী কাঁচের ফুলদার জাগটা বের করতেও অনেক সময় লাগল।

জাগ আর জলের বালতি হাতে নমিতা ছাদে এসে বিলম্বের জন্য প্রথমেই কৈফিয়ত দিল,—আমার ভাই খোকনটা ভয়ানক দুষ্টু। জল দেবার ঝাঁঝরিটা

আজ ভেঙে ফেলেছে। কাল ভেঙেছে আমার টেবিল ল্যাম্পটা, ভারী দুষ্টু।
তোমাদের সুলতানপুরে বাড়ীর খোকাখুকুরা কেমন?

শিউলী নমিতার হাত থেকে ঝাগটা নিয়ে গাছে জল দিতে দিতে বলল,—আমাদের বাড়ীতে কোনো খোকাখুকু নেই।

তোমার ছেলেবেলার সকলেই এখন বড়ো হয়ে গেছে।

আমার বাল্যকালেও বাড়ীতে কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না।

তবে তুমি খেলতে কাদের সঙ্গে?

এবার শিউলী একটু দম খেয়ে বলল, আমাদের বাড়ীতে আমার কোনে খেলার সাথী ছিল না।

তাহলে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে!

খেলা যে করতেই হবে, তার কি মানে আছে!

ওঃ, তাহলে তুমি এ পর্যন্ত গোলাপ নিয়েই খেলেছ। সেই জন্যই গোলাপগাছের পাতা দেখেই কোন জাতের গোলাপ তা বুঝতে পারো।

নমিতার কথায় শিউলী গাছে জল দেওয়া বন্ধ করে কিছুক্ষণ তার মুখে দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,—এই জন্যই কাকীমা বলেছিলেন, তোমার কং আর প্রশ্নের ঠেলায় পালাতে হবে।

শিউলীর মুখের ভাব ও কথায় নমিতা দমে গেল। দুঃখিত হয়ে বলল,—

আমি অজ্ঞাতে তোমাকে আঘাত করে ফেলেছি। সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি বাবা বলেন, শৈশবে কেউ যদি ভালো খেলার সাথী না পায়, তবে বে হয়ে সে হয় স্বার্থপর নিষ্ঠুর। তুমি দেখছি এ নিয়মের ব্যতিক্রম!

না, আমি ব্যতিক্রম নই। আমার সব কথাই একদিন তোমাকে বলব তবে আজ নয়। একটা কথা আজই তোমাকে বলছি, তোমার মত সমবয়স মেয়ের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। তোমাকে আমি আপ করেই পেতে চাই।

মা আমাকে বলেন, বোকা অকর্মা মেয়ে। একটু আগে তুমিই বলে আমার যথেষ্ট ভুল ক্রটি আছে। এ অবস্থায় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বিপা পড়বে না তো?

শিউলী হেসে বলল,—কথার আঘাত কথায় শোধ দিতে দেখছি তু ওস্তাদ। বন্ধুত্ব বলতে তুমি কি বুঝেছ, তা এখনও আমি জানিনে। আ কিন্তু ও শব্দটার অর্থ যা বুঝেছি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কি করে বুঝলে?

আমাদের বংশের ও হোসেনপুরের রায় বংশের কাহিনী পড়ে বুঝেছি।

কাহিনী দুটো আমাকে শোনাবে?

কাহিনী দুটো নয়, একই কাহিনী। আজ আর সে কাহিনী বলার সময় হবে না, পরে বলব।

তুমি সব কিছুই মুলতুবি রাখছ। এদিকে আমার যে ঘুম হবে না।

ওঃ তা হলে তুমি এরই মধ্যে আমাকে আপন করে নিয়েছ!

তুমি কি আমাকে আপন করে নিতে পার নি?

সে জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

ভালোবাসার জন্য আবার প্রস্তুত কি রকম! ঘষেমেজে ভেবেচিন্তে কি কেউ ভালোবাসতে পারে?

আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তো তাই।

তা যদি হয় তবে ও ভালোবাসা ভালোবাসাই নয়। সত্যিকারের ভালোবাসার কোনো হেতু থাকে না, ভাবনাচিন্তা করার অবকাশও পাওয়া যায় না।

এটা তুমি বুঝলে কি করে?—বিস্মিত শিউলী জিজ্ঞাসা করল।

এই প্রশ্নের সম্মুখে নমিতা বেশ একটু থমকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল,—

বইতে পড়েছি।

ওটা উত্তরই নয়।

এ ছাড়া আর কি উত্তর দেব?

হ্যাঁ, এটা একটা উত্তর বটে।

তোমাকে কিন্তু আমি দেখেই ভালোবেসে ফেলেছি।

ভালোবাসা এককথা, আর তাকে আপন করে পাওয়া ভিন্ন কথা।

সে কি রকম?

কাউকে ভালোবেসেও হয় তো তাকে আপন করে নেওয়া যায় না। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, এখন আপন করে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কিন্তু এই একটুতেই বুঝতে পেরেছি, সেটা সহজ হবে না।

কেন সহজ হবে না?

তুমি বাইরে একটু তরল হলেও ভিতরে কঠিন। তোমার মনের দরজা খোলা সহজ হবে না।

তুমি ভুল বুঝেছ। আমার মনে কিছু নেই।

এ কথাটা মন-দরজার খিল।—বলে শিউলী একটু হাসল।

তোমার সঙ্গে কথা বলা তো দেখছি খুব মুস্কিল। মা বলেছিলেন আমার কথার ঠেলায় তোমাকে পালাতে হবে; এখন দেখছি তোমার প্রশ্নের ঠেলায় আমাকেই অস্থির হতে হবে।

উপায় নেই যখন ভালোবেসে ফেলেছ, তখন ও ঠেলা সামলাতে হবেই।

কেন তুমি এত প্রশ্ন করবে?

তুমি যে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছ।

তার জন্য এত প্রশ্নের কি প্রয়োজন?

বন্ধুর সুখ-দুঃখের সব কথা জেনে নিয়ে সাধ্যমত সাহায্য করা ও সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়া।

তোমাদের সঙ্গে হোসেনপুরের রায়দের কি এই রকম বন্ধুত্ব ছিল?

হাঁ, এই রকম বন্ধুত্বই ছিল, এখনও আছে।

রায়দের এখন কে আছেন?

পুরুষানুক্রমে রায়েরা ছিলেন আমাদের দেওয়ান ও বন্ধু। শেষ দেওয়ান গৌরীশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই পরামর্শে আর দেওয়ান রাখা হয়নি।

গৌরীশঙ্কর রায়ের কে আছেন?

সকলেই আছেন। পরে আমাদের বন্ধুত্বের ইতিহাস তোমাকে শোনাব। এখন চল নীচে কাকীমা'র কাছে যাই।

শিউলী গিয়ে উপস্থিত হল অপর্ণাদেবীর রান্নাঘরে। তাকে দেখে অপর্ণাদেবী হেসে বললেন,—

কি মা, নমিতার বকুনির ঠেলায় পালিয়ে এলে?

না কাকীমা, খুব খিদে পেয়েছে।

তা তো পাবেই মা, কোন বেলায় খেয়েছ। তুমি নমিতাকে ডেকে এনে খাবার ঘরে টেবিলটা সাজিয়ে ফেল তো। রান্না ঘরে নমিতাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না। ও কিছুই জানে না।

আপনার মেয়ে হয়ে নমিতা রান্না শেখে নি কেন?

ওর দু'বছর বয়স থেকে লক্ষ্ণৌতে আমার বাবার কাছে ছিল। এই দু'বছর হল আমার কাছে এসেছে। লক্ষ্ণৌয়ে আমার বাপের বাড়ীতে বহু লোক। সকলে আদর করে কেবল কথা শিখিয়েছে, কোনো কাজ শিখোয় নি।

ও: তোমরা দু'জন বুঝি আমার নিন্দে করছ।—পিছন থেকে বলল নমিতা।

অপর্ণাদেবী হেসে উত্তর দিলেন,—না, নিন্দে করব কেন, তোর রান্নার প্রশংসা করছি। এখন তাড়াতাড়ি খাবার টেবিল সাজিয়ে খোকনকে চেম্বারে ডাকতে পাঠিয়ে দে।

তা হলে নমিতাও রান্না করে!—হেসে বলল শিউলী।

হাঁ, করে। চৌধুরী সাহেব খেয়ে খুব প্রশংসাও করেন।

কি রকম প্রশংসা?

সে তোমাকে শুনতে হবে না।—তাড়াতাড়ি বলল নমিতা।—এখন চল, আমরা ওঘরে গিয়ে সব ঠিক করি।

ঘর থেকে বেরিয়ে শিউলী নমিতাকে বলল,—তুমি কেমন রান্না কর একটু বল, শুনি।

রান্না আমি জানি, এই লবণ আর জল ঠিকমত দিতে পারিনে।—বলে নমিতা হেসে ফেলল।

বাবা কি খেয়ে প্রশংসা করেছিলেন?

মুশুরির ডালনা আর রুই মাছের টক।

সে কি রকম?

মুশুরির ডালে জল কম হওয়ায় চাচা সাহেব ওর নাম দিয়েছিলেন, মুশুরির ডালনা। আর রুই মাছের ঝোলে একটু লবণ বেশী হওয়ায় মা তেঁতুল দিয়ে টক করে দিয়েছিলেন।

তা হলে এমন কি আর দোষ হয়েছিল! আমি যে কিছুই রাঁধতে শিখি নি।

তা না শিখলে, ও সব শিখলেই হাঙ্গামা বাড়ে।

'ও সব'-এর মধ্যে রান্না তো একটা, আরগুলো কি?

এই ধর গান, বাজনা, অভিনয় করা।

তুমি গান-বাজনা-অভিনয় করে থাকো?

আমি সে রকম পারিনে, মা ভালো সেতার বাজাতে পারেন, গীটারও বাজিয়ে থাকেন।

তুমি কোনোদিন অভিনয় করেছ?

স্কুলে করেছি।

ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করেছ?

আমাদের স্কুলটা তো গার্লস্ স্কুল। সেখানে ছেলে আসবে কেন?

তুমি ছেলেদের কলেজে ভর্তি হলে কেন?

শিউলীর এ প্রশ্নে নমিতার মুখ লাল হয়ে উঠল, চট্ করে উত্তর দিতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল,—ছেলেদের কলেজে ভালো পড়ানো হয়।

কাছেও তো ভালো কলেজ ছিল, তা সত্ত্বেও এত দূরের কলেজে ভর্তি হলে কেন?

ও বাবাঃ, আমি ভেবেছিলাম চাচাসাহেবের মেয়ে শিউলী গ্রামে মানুষ হয়েছে। গ্রামের গোলাপ, গ্রামের পাখি, এই সব নিয়েই তার কাজকারবার। সে যে এত বড়ো ব্যারিস্টার তা বুঝতে পারিনি। বুঝলে আগে থেকে সাবধান হয়ে মুখ খুলতাম।

মুখ খোলায় দোষ হয় নি, দোষ হয়েছে বন্ধুত্ব করে।

কিন্তু এখন উপায় কি, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা তো ছাড়তে পারব না!

আর সেই জন্যই আমার কাছে তোমার মনের কবাট খুলতে হবে।

আমার মনে যে কিছু নেই!

মনে বেশ কিছু আছে। তবে বুঝতে পারছি, সেটা প্রাথমিক অবস্থা।

তোমার কথায় আমি বুঝতে পারছি, তোমার মনেই অনেক কিছু আছে।—ব'লে নমিতা হেসে ফেলল।

আমার মনে যা কিছু আছে তা প্রাণ খুলে বলে মনের গুমোট হালকা করে নেবার জন্য বন্ধু খুঁজছিলাম। এতদিন পরে তোমাকে পেয়েই বুঝেছি সে রকম বন্ধু তুমিই হবে। সেই জন্যই তোমার সঙ্গে এত কথা বলছি।

এমন সময় অপর্ণাদেবী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিছনে এলেন অমিয় বাবুর সঙ্গে জাফর সাহেব। এক টেবিলে বসলেন অমিয়বাবু ও জাফর সাহেব। আর এক টেবিলে বসল নমিতা, শিউলী ও খোকন।

খাবার প্লেটে চপ দেখে শিউলী বলল,—কাকীমা, আমি চপ খাইনে। এটা তুলে নিয়ে যান।

এ তোর ঢাকাই চপ নয়, খেয়ে দেখ।—বললেন জাফর সাহেব। এ তোর কাকীমা ঘরে তৈরী করেছেন।

জাফর সাহেবের কথায় অপর্ণাদেবী হেসে প্রশ্ন করলেন,—ঢাকাই চপ কি রকম?

ও ছেলেবেলায় একবার ঢাকায় নানার বাড়ী গিয়েছিল। সেখানে একদিন দোকান থেকে চপ এনে খেতে দেয়। সেই চপ একটু খেয়ে এমন বমি আরম্ভ করল যে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আনতে হয়েছিল। সেই থেকে চপ দেখলেই নাকি ওর গা বমি বমি করে।

শিউলী চপ খেয়ে উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কাকীমা এ কিসের মাংস দিয়ে চপ করেছেন ?

এটা মাংসের চপ নয়। কলার মোচা সিদ্ধ করে করেছি।

কাকীমা, আমাকে রান্না শিখোবেন ?

শেখাব। এখন কেবলমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছ, কিছুদিন যাক, তারপর ছুটিতে এসে শিখো।

না কাকীমা, কয়েকটা ছোটোখাটো খাবার, আমার ওখানে কোনো বন্ধু-বান্ধব গেলে অল্পের মধ্যে করে চা'এর সঙ্গে খাওয়াতে পারি, তা আমাকে এখনই শিখতে হবে।

কিন্তু তোর ওখানে যাবে কে বলতো ? প্রশ্ন করলেন জাফর সাহেব।

কেন! এই ক'দিনের মধ্যেই কলেজে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে যেতে আমন্ত্রণ করেছে। আমার ঘরখানা এখনও ঠিকমত সাজাতে পারি নি, আর মাসী আসে নি বলে তাদের আমি নিমন্ত্রণ করতে পারিনি। মাসী এলেই তাদের নিমন্ত্রণ করব। নমিতাও যাবে।

ওখানে ওরা কেউ যাবে না।—বললেন জাফর সাহেব।

কেন যাবে না ?

সেটা তোমার কাকা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর।

জাফর সাহেবের কথায় অমিয়বাবু হেসে শিউলীকে বললেন,—এখনও আমাদের দেশে এমন সব সমাজ আছে, যে সমাজের বয়স্ক মানুষেরা মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে-সাদী না দিয়ে স্কুল-কলেজে পড়ানো পছন্দ করেন না। বয়স্কা মেয়েকে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে পথেঘাটে বেড়াতে দেখলে তাঁরা নানা রকম মন্তব্য করেন। সে সব মন্তব্য মেয়েদের কানে যায়। সেই জন্য ঐ সব জায়গায় মেয়েরা যেতে চায় না।

অমিয়বাবুর কথায় শিউলী একেবারে গুম হয়ে গেল। খাওয়ার মধ্যে আর কথা বলল না। খাওয়া শেষে তার মনের অবস্থা বুঝে অপর্ণাদেবী অমিয়বাবুকে বললেন,—তুমি শিউলীকে সেতারে একটু আলাপ শোনাও, আমি খেয়ে আসি।

সেতার বাজানোর প্রস্তাবে শিউলী আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অমিয়-বাবুর সেতার শেষ হলে অপর্ণা দেবী এসে গীটারে দুটো পল্লীসঙ্গীত বাজিয়ে শোনালেন। বাজনা শেষ হলে শিউলী জাফর সাহেবকে বলল,—

বাবা, আমাকে একটা সেতার আর একটা গীটার কিনে দিন, আমি বাজনা শিখব।

আচ্ছা, তা দেব। তুমি যখন কলুটোলা ছেড়ে এখানে এসে থাকবে তখন সব কিনে দেব।

কেন, এখন কিনে দিলে ক্ষতি কি? আমি রবিবারে এখানে এসে কাকাবাবু কাকীমার কাছে কোচিং নিয়ে যাব। ওখানে থেকে হাত সাধব।

না, তা সম্ভব নয়। ও সব পাড়ায় ছেলেদের গান-বাজনা যদিও বা একটু আধটু চলে, তোমার মতো মেয়ের চলবে না।

শিউলী আবার দমে গেল।

রাত ন'টায় অমিয়বাবু তাঁর নিজের ট্যাক্সিতে শিউলীকে নিয়ে চললেন কলুটোলায়। সঙ্গে গেল নমিতা।

গাড়ির মধ্যে নমিতা শিউলীকে বলল,—তা'হলে তুমি কিন্তু আগামী রবিবারে আমাকে তোমার সব কথা শোনাবে। রবিবারে যদি না যাও, তা'হলে সোমবারে কলেজের ছুটি হলে আমিই তোমার এখানে এসে হাজির হব।

না, তা তুমি এস না। আমিই যাব।

তুমি কি তোমার এখানে আসতে আমাকে নিষেধ করছ?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি আমার সমাজ সম্পর্কে কিছুই এতদিন জানতে পারি নি। এতদিন আমি যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। কলকাতায় এসে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে বাস্তবের সম্মুখীন হচ্ছি। একদিনে বাস্তবের যে রূপ দেখলাম ও শুনলাম তাতে মন বড়ো অশান্তিতে ভরে উঠেছে। এ অশান্তির মধ্যে একটু শান্তির বাতাস তোমাদের বাড়ীতেই পাব বলে রবিবারে আমি কাকীমার কাছে গিয়ে থাকতে চাই।

বেশ, তা তুমি থেকো। কিন্তু অন্যদিনে তোমার এখানে আমাকে আসতে নিষেধ করছ কেন?

এখানে আমি যে পরিবেশে আছি, সেটাকে এখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারি নি সেই জন্য নিষেধ করছি।

বেশ তাহলে রবিবারে বেলা তিনটায় আমি তোমাকে নিতে আসব।

নাঃ, বেলা বারোটায় এস। তাহলে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে।

তাতে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে না?

আমার পড়ার কোনো ক্ষতি হবে না বরং লাভই হবে। তোমার ক্ষতি হবে কি তাই বল?

লাভ হবে কিসে?

বাবার মুখে শুনেছি কাকাবাবু ও কাকীমা ভালো পড়াতে পারেন। কোনো কঠিন বিষয় না বুঝতে পারলে তাঁদের কাছে গিয়ে বুঝে নেব।

হ্যাঁ, রবিবারে আমাদের ওখানে গিয়ে তোমাকে পড়তে দেব আর কি! সেদিন দু'জনে শুধু গল্প করব আর ফুলগাছগুলোর যত্ন করব। গোলাপগাছ ক'টা তো তোমার হাতের জল পাওয়ার জন্য এ ক'দিন বসে বসে স্বপ্ন দেখবে।

বসে বসে বুঝি স্বপ্ন দেখা যায়?

হ্যাঁ, তা দেখা যায়। যে যাকে ভালোবাসে সে তার স্বপ্ন সব সময়ই দেখতে পায়।

এটা কিন্তু তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়।

ভালোবাসার বস্তু তো বহু থাকতে পারে?

তা থাকতে পারে। কিন্তু সবসময় মনে থাকার মতো ভালোবাসার বস্তু বোধহয় মানুষের ঐ একটা ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই।

তাহলে তুমি এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ!

আমাদের মধ্যে কে বড়ো বিশেষজ্ঞ তা পরে দেখা যাবে। এখন আমরা কলুটোলা এসে পড়েছি। গাড়ি থামলে চল গিয়ে দেখে আসবে আমার অগোছানো ঘরখানা।

গাড়ি থামলে নমিতাকে নিয়ে শিউলী তেতলায় উঠে গেল। ঘরে গিয়ে নমিতা বলল,—

রবিবারে তোমাকে নিতে আমি যদি সকাল আটটায় আসি, তবে কেমন হয়?

তা আসতে পারো। কিন্তু বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে এস। আমার এখানে এখনও সে রকম ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি।

না, তা হবে না। আমি এখানে এসে তোমার সঙ্গে চা খাব।

তাহলে দোকানের মুড়ি খেতে হবে কিন্তু।

তাই খাব। তা হলে এখন আমি যাই।

না, একটু, অপেক্ষা কর। এই কাপড়টা পরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।

কেন, আমি কি কচি খুকী যে, সিঁড়িতে ভূতের ভয় করবে?—

বলেই নমিতা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল।

একটু পরেই জুলেখা এলেন শিউলী রাত্রে কি খাবে তাই জানতে। শিউলী জানাল, রাত্রে সে কিছু খাবে না বালীগঞ্জ থেকে খেয়ে এসেছে।

ও মেয়েটা কে এসেছিল?—প্রশ্ন করলেন জুলেখা।

ওর নাম নমিতা, ব্যারিস্টার অমিয়.ব্যানার্জীর মেয়ে।

বাপ্‌রে, মেয়েটা নেমে গেল যেন পাহাড় পর্বত ভাঙতে ভাঙতে।

হাঁ, ওটা পাহাড়ে'মেয়েই। এবার ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করে ছেলেদের কলেজে ভর্তি হয়ে ছেলেদের সঙ্গে ব'সে কলেজে পড়ে। নাচে, গায়, সেতার বাজায়, থিয়েটার করে। ওরই মতো পাহাড়ে দজ্জাল আরও দশ-পাঁচটা আমার এখানে আসতে পারে। আপনাদের মহলে সিঁড়ির পাশের দরজায় একটা কালো মোটা পরদা লাগাতে হবে।

এ সংসারে অত্যন্ত কুটিল প্রকৃতির মানুষ ছাড়া আর সকলেই চায় মনের কথা খুলে বলার মতো অন্তত একটি আপনজন। দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ যদি সেরকম কাউকে না পায়, তবে সে স্বভাব-সরল মানুষ হলে স্ত্রী বা স্বামীর নিকটে মনের দরজা খুলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিপন্ন হয়। নইলে মনের কথা মনে রেখে সারাজীবন গুমরিয়ে মরে।

শিউলী তার এই সতেরো বছর বয়সের মধ্যে কোনো সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব করার সুযোগ পায় নি। এ অবস্থায় সেদিনের ঘটনাগুলি তার কাছে একেবারে অভিনব। নমিতা তার সমবয়সী, পড়াশুনায়ও সমান। তার স্বভাব ও বুদ্ধির যে পরিচয় এই কয়েক ঘণ্টার মেলামেশায় শিউলী পেয়েছে, তাতে সত্যিকারের বন্ধুপ্রাপ্তির আনন্দে মন ভরে উঠেছে। সব চাইতে তাকে মুগ্ধ করেছে নমিতার সহজ সরল হাসিখুশি ভাব, যার জন্য দু'জনে দেখা হওয়া মাত্রেই পরস্পর অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে।

জুলেখা চলে গেলে শিউলী ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে সেদিনের বালীগঞ্জের ঘটনাগুলি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল,—

সুলতানপুর, ভৈরব নদে বান এসেছে। নদের তীরে দাঁড়িয়ে আছে শিউলী গোলাপের হাত ধরে।

আয় শিলী, আমরা দুজন সাঁতার কাটি।—বলল গোলাপ।

না রে! আকাশে বড়ো মেঘ করেছে ঝড় বৃষ্টি হবে।—বলল শিউলী।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই তো সাঁতার কাটতে মজা রে।

না, দরকার নেই, তুই বাড়ী চল।

তবে তুই থাক, আমি সাঁতার দিই।—বলেই গোলাপ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে শিউলীও গোলাপের সঙ্গে সাঁতার কেটে চলল।

নদের তীরে বহু লোক। তারা বলছে,—দেখ দেখ, বেহায়া দজ্জাল মেয়েটা একটা হিঁদু ছেলের সঙ্গে সাঁতার কাটছে! ধর ওদের, মার ওদের।

দূরে গর্জন উঠল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

গোলা, তোর কি ভয় করছে?

না রে, তুই সঙ্গে থাকলে ভয় করবে কেন!

তাহলে খুব জোরে সাঁতার কেটে চল। ওরা ধরতে পারলে তোকে মেরে ফেলবে।

কড়্ কড়্ কড়াৎ, মেঘ ডেকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল।

গোলা, তুই বড়ো খামখেয়ালী। এখন বল তো ফিরে যাব কি করে?

ফেরার ভাবনা নিয়ে কি আর কেউ ভরাগাঙের টানা স্রোতে সাঁতার কাটতে নামে?

তবে আমরা কোথায় যাব?

স্রোতের টানে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাব।

ঝড় বৃষ্টি থেমে আকাশে চাঁদ উঠেছে। গোলাপের সঙ্গে শিউলী বসে আছে ভৈরবের এক চরে। চরে কোথাও জনমানব নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভিজে কাপড়ে শীত লাগছে।

গোলা, তোর শীত করছে?

হ্যাঁ।

আয়, আমি তোকে জড়িয়ে ধরি। তাহলে তোর শীত কমবে।

তোর ফ্রকও তো ভিজে।

আচ্ছা ফ্রক খুলে ফেলছি।

গায়ের ফ্রক খুলে গোলাপকে জড়িয়ে ধরে শিউলী শীতে কাঁপছে।

ছোটো একখানা নৌকা নিয়ে জাফর সাহেব এসে বললেন,—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে-মেয়ে বাবাঃ! খুব হয়েছে, এখন এই নৌকায় উঠে দুজনে নৌকা বেয়ে বাড়ী ফিরে যা।

নৌকা রেখে জাফর সাহেব চরে নেমে কোথায় চলে গেলেন।

গোলাপ চলেছে নৌকা বেয়ে, শিউলী কাছে বসে আছে। আবার মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামল।

গোলাপ, আমাকে নৌকায় তুলে নাও।—তীর হতে কে বলল, গলার আওয়াজ শিউলীর চেনা। ফিরে দেখে নমিতা ডাকছে।

গোলা, নমিতাকে নৌকায় তুলে নে।—বলে শিউলী।

না, তা পারব না—উত্তর দিল গোলাপ।

নমিতা সাঁতার কেটে নৌকা ধরতে আসছে।

গোলা, নৌকা থামা, নমিতা আসুক।—বলে শিউলী।

নাঃ।—গোলাপ নৌকা বেয়ে চলে।

নৌকার কাছে এসে নমিতা ডুবে গেল, তার মাথার চুল জলের ওপরে ভাসছে।

গোলা, তুই বড়ো নিষ্ঠুর।—বলে শিউলী কেঁদে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শিউলীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। পূবের খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে গায়ের জামা, কাপড়, বিছানা, সব ভিজে শীত করছে। পিঠের কাছে বাড়ীর বিড়ালটা আরামে ঘুমাচ্ছে।

শিউলী উঠে বসল।

জুলেখার বড়ো মেয়ে সোফিয়ার বিয়ে দিয়েছিলেন হিদায়েতুল্লা চৌধুরী। জামাই সৈয়দ আবদুল কাদের পাটনার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, কলকাতায় মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া করে এম. এ. পাশ করেছেন। বিয়ে যখন হয় তখন তিনি ছিলেন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক ছাত্র। বিয়ে হওয়ার পাঁচবছর পরে কলকাতায় এক কলেজে অধ্যাপকের কাজ পেয়ে পার্কস্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে নিজস্ব সংসার পেতেছেন।

কাদের সাহেব সোফিয়াকে নিয়ে যেদিন নিজস্ব স্বাধীন সংসার পাতলেন, তার পাঁচদিন পরে কলেজ থেকে ফিরে সোফিয়ার হাতে একটা বাণ্ডিল দিয়ে বললেন,—এতে তোমার চারটা ব্লাউজ আর দুটো জানালার পরদা আছে। ব্লাউজ গায়ে দিয়ে দেখ, ঠিক হয়েছে কিনা।

সোফিয়া প্যাকেট খুলে দেখে বলল,—এ তো দেখছি সবগুলোই দামী আলপাখা! এখন এত টাকা খরচ করে এগুলো করার কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের নতুন সংসারে অনেক কিছুই কিনতে হবে যে।

কাপড়ের দাম লাগে নি, মজুরির কয়েকটা টাকা লেগেছে।—উত্তর দিলেন সৈয়দ সাহেব।

কাপড় পেলে কোথায়?

তোমার বোরখাটা কেটে ওগুলো হয়েছে।

আমার দামী বোরখাটা নষ্ট করলে?

নষ্ট মোটেই করি নি বরং ভালোভাবে দামী কাপড়টা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছি।

আমি কি তবে বাজে কাপড়ের বোরখা ব্যবহার করব?

এখন থেকে তুমি আর বোরখা ব্যবহার করবে না। কাজেই বাজে বা দামী বোরখার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে কোথাও যেতে হলে কি পরে আমি পথে বেরোব?

আর পাঁচটা ভদ্রঘরের মেয়ে-বউ যা পরে চলাফেরা করে, তুমিও তাই পরবে।

হিন্দু মেয়েদের মতো বে-আবরু হয়ে পথে বেরোব!

কেন, হিন্দু মেয়েরা কি অভদ্র?

কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেব বাড়ী যাব কি করে?

বোরখা পরে না গেলে যারা সম্মান করে না, তাদের কাছে যাবে না।

তবে আমি কোথায় বেড়াতে যাব?

আমি যেখানে যাই সেখানে যাবে।

সে কোথায়?

সভা, সমিতি, লাইব্রেরী, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান, গড়ের মাঠ, বেড়াবার কত জায়গা আছে।

আলাপ পরিচয় করব কাদের সঙ্গে?

উচ্চ শিক্ষিত মার্জিত রুচি ভদ্রপরিবারের সঙ্গে।

এ সব কথা কি তুমি সত্যিই বলছ?

আমি কি তোমাকে কোনোদিন মিথ্যা ধাপ্পা দিয়েছি?

সত্যিই আমি বোরখা না পরে বাইরে যেতে পারব?

নিশ্চয়ই।

পাশের ফ্ল্যাটের হিন্দু মেয়ে-বউদের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যেতে পারব?

শুধু পার্কে বেড়ানো নয়, এরপর থেকে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুমি নিজে দোকানে গিয়ে পছন্দ করে কিনবে। আমি আর ও ঝামেলায় যাব না।

সোফিয়া উঠে গিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, আমার জন্য জিনিস কেনা বুঝি তোমার ঝামেলা ?

ও রকম ভেবে কথাটা আমি বলিনি।

আমার সাজগোজ যে কেবল তোমাকে সুখী করার জন্য।

তা আমি জানি।

আমাকে একদিন চিড়িয়াখানা দেখাবে? সেই ছেলেবেলায় দেখেছি, আর দেখিনি।

নিশ্চয় দেখাব। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, গঙ্গারঘাট সব দেখাব। তার চাইতেও বড়োকথা, তোমাকে আমার সঙ্গে সভা-সমিতিতে যেতে হবে। সেখানে উপস্থিত শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আমার সম্মান বাঁচিয়ে তোমাকে আলাপ করতে হবে।

সোফিয়া স্বামীর গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল,—ত' হলে তো আমাকে পড়াশুনা করতে হবে। তুমি আমাকে পড়িয়ে তোমার উপযুক্ত করে নাও।

সে কথা আমি ভেবেছি। চল আজ পার্কে বেড়াতে যাই। ফেরার পথে কয়েকখানা বই আর সাময়িক পত্রিকা কিনে আনব।

তাহলে তুমি বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এস। আমি খাবার তৈরী করে আনি।

কাদের সাহেব স্নান করে এসে টেবিলে বসলে সোফিয়া খাবার এনে দিল। প্লেটের ঢাকনা খুলে গরম লুচি, কচুরি, আলুরদম দেখে কাদের সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—এ সব খাবার পেলে কোথায় ?

আমি নিজে করেছি।

কি করে শিখলে ?

পাশের ফ্ল্যাটের দিদি শিখিয়েছেন।

তাঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে ?

হ্যাঁ, তাঁরা আমার খোকাকে খুব ভালোবাসেন।

তুমি তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে ?

হাঁ যাই। তবে যখন ওঁদের ছেলেমেয়েরা গানবাজনা করে, তখন যাইনে।

সে সময় গেলে দোষ কি ?

তুমি কি যে বল! ঐ সব হিন্দু মেয়েদের গানের আসরে গেলে সে কথা যদি মোল্লাসাহেবদের কানে ওঠে, তবে তোমার মান থাকবে ?

আমার মান-সম্মান এত ঠুনকো নয় যে, মোল্লামৌলবিদের দশ বিশটা আরবী বয়াতের গুঁতোয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এই কিছুদিন পরেই সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমাদের কলেজ হোস্টেলে একটা ভালো জলসা হবে। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব। দেখবে জলসায় ক'জন বড়ো ওস্তাদ উপস্থিত হবেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান। মুসলমান বাদশারাই ভারতীয় সঙ্গীতের সর্বাধিক উন্নতি করেছেন।

তাহলে তুমি আমাকে ভালোকরে পড়াও, যাতে আমি অনেক কিছু জানতে শিখতে পারি। আমি রোজ তোমাকে ভালো খাবার তৈরী করে খাওয়াব।

ও: তুমি ঘুষ দিয়ে লেখাপড়া শিখতে চাও!

হ্যাঁ, তোমাকে ঘুষ দেব না তো কাকে ঘুষ দেব বল?

তা আজকের ঘুষটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

কাল ছোলার ডাল, আর পাঞ্জাবী পরটা খাওয়াব।

তাহলে তো দেখছি রাত্রে আমার ঘুম হবেনা।

কেন?

তোমার হাতের পাঞ্জাবী পরটা, আর ছোলার ডালের লোভে।

ও: তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

মোটেই না আমি দোকানে তৈরী কয়েকপদ মিষ্টি ছাড়া আর কোনো খাবারই পছন্দ করিনে। তুমি নিজ হাতে যা তৈরী করে দেবে, তাই আমি তৃপ্তির সঙ্গে খাব। আজ যা করেছ, এ তো চমৎকার হয়েছে। দেখছ না, সব চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছি।

আর কয়েকখানা দেব?

যাচাই করলে তোমার জন্য আর কিছুই থাকবে না।

সোফিয়া হাসতে হাসতে খাবার আনতে গেল।

কাদের সাহেব সোফিয়াকে পড়াতে আরম্ভ করলেন। সেই থেকে সে শিউলীর কলকাতা আসা পর্যন্ত আট বছরের মধ্যে বাংলা, ইংরেজী শিখে অনেক ভালো ভালো বই পড়েছে; ছুটির মধ্যে বহুদেশ ঘুরে অনেক কিছু দেখেছে।

শিউলী যখন কলকাতায় পড়তে এল তখন গ্রীষ্মের ছুটির পর সোফিয়া ও কাদের সাহেব পাটনা থেকে কলকাতার বাসায় কেবল এসেছেন। বাসা

গোছাতেও আগন্তুক ভদ্রমহিলা ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। ইব্রাহিমের মুখে শিউলীর সংবাদ শুনেও তার সঙ্গে দেখা কবার সময় হয়নি।

সপ্তাহান্তে সোমবারে কাদের সাহেব কলেজ থেকে ফিরলে সোফিয়া বলল, আজ চল, শিউলীকে দেখে আসি।

আমাকে শিউলী দেখিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাধাবে কেন?

কি ফ্যাসাদ?

এই যেমন আনোয়ারাকে যারা দেখেছে তারাই হস্তগত করতে চেষ্টা করেছে।

তার নসিব খারাপ, তাই ওরকম ঘটেছে।

দেখ, নসিবের দোহাই মুসলমানেব মুখে শোভা পায় না। নসিব মানতে হলে জন্মান্তর মানতে হয়। মুসলমান ধর্মে যখন জন্মান্তর স্বীকার করে না, তখন সব দুর্ভোগই এই জন্মের কর্মফল বলে মেনে নিতে হবে।

তুমি কি মানো?

আমি কোন অযৌক্তিক কথা মানিনে। যুক্তিসঙ্গত কথা হলে মাথা হেঁট-করে মেনে নেব। আনোযারা নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করেছিল।

সে মোটেই খারাপ মেয়ে নয়। দোষের মধ্যে তের বছর বয়সে সে একদিন বোরখা না পরে দোকানে গিয়েছিল। এই অবকাশে ঐ বুড়ো বদমাশটা তাকে দেখে।

তাই তো, তুমি যখন সেজেগুজে বুকফুলিয়ে রাস্তায় চল, তখন অনেকে তোমার দিকে ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে তাকিয়ে থাকে; দেখে আমার বুক শুকিয়ে ওঠে।

দোকানে সাজানো সন্দেশ দেখে পথের কুত্তা তাকিয়ে থাকে। তাতে কি সন্দেশের মর্যাদা নষ্ট হয়?

কুত্তার হাতে যদি টাকা থাকে?

থাকলেই বা, মেয়েরা তো আর প্রাণহীন সন্দেশ নয় যে, টাকা দিয়ে কুত্তায় কিনবে।

আনোয়ারার ঘটনা তো তাই হল।

সে লেখাপড়া শেখে নি। তারপর তখন তার বয়স অল্প ছিল।

তাহলে তুমি বলতে চাও, মেয়েদের লেখাপড়া শেখা খুব প্রয়োজন।

নিশ্চয়ই।

তারপর তাদের ভালোমন্দ বোঝার মতো বয়েস হলে বিয়ে দেওয়া উচিত।

নিশ্চয়ই।

যা হোক আমার কথার মুদ্রাদোষটা তুমিও রপ্ত করে ফেলেছ।

কি রকম?

ঐ যে কথায় কথায় নিশ্চয়ই বলা!

সোফিয়া হেসে বলল,—তুমি আমাকে গড়েপিটে মানুষ করে তুলছ। কাজেই তোমার দোষগুণ আমাতে বর্তাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

হাঁ, তবে একটা দোষ কিন্তু বর্তালো না। বর্তালে কিছুটা রেহাই পেতাম।

কি দোষ?

এই আমি যে কোনোপ্রকার পোশাক পরে সব জায়গায় যেতে পারি, পোষাকটা একটু ফরসা থাকলেই হল। কিন্তু তোমার পোশাক কিনতে কিনতে আমার ট্যাঁক সময়ে একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে পড়ে। তারপর 'গোদের ওপরে বিষফোড়া' আড়ংধোলাই খরচ।

সোফিয়া আদর করে কাদের সাহেবের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মিনতির স্বরে বলল,—

তা আমি কি করব বল? তুমি একজন নামকরা প্রফেসর। তোমার পরিচয়ে যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাদের সঙ্গে মেলামেশায় আধুনিক রুচি সম্মত জামাকাপড় অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন আর কেউ গয়না দেখে না, দেখে পোশাক পরিচ্ছদ। সেজন্য খরচ একটু বেশী হবে বৈ কি। এ মাসের মাইনে পেলে আমি তোমার দু'সেট পোশাক করাব। সত্যিই ধোপা দেরি করলে তোমার খুব অসুবিধা হয়।

না না, এখন আমার পোশাক করাতে হবে না। তার চাইতে বরং টাকা যদি জোটে তবে একখানা বড়ো সোফা কেন। দেখলাম কাল যাঁরা এসেছিলেন, তারা খাটের ওপরে গাদাগাদি করে বসেছেন।

সেটা আমিও ভেবেছি। একসঙ্গে পাঁচজন ভদ্রমহিলা এলে ঠিকমত বসাতে পারিনে। তবে তারজন্য অসুবিধা হবে না। সামনের মাসে বাবুর্চিটা ছাড়িয়ে দেব। তাতে যে টাকা বাঁচবে তাতেই হবে।

সর্বনাশ একটা খানসামা মাত্র। তাকে ছাড়ালে চলবে কি করে!

খুব চলবে। এরপর থেকে বাইরের কাজের জন্য একটা ঠিকা ঝি রাখব। আমিই পাক করব। তবে তোমার একটু অসুবিধা হবে বাজার বয়ে আনতে। বেশী মাল থাকলে কুলি কোরো।

বাজার করে বয়ে আনতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই রেলস্টেশনে নিজের মাল নিজে বইতেন। হাইকোর্টের জজ স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে হাট করে নিজে বয়ে আনতেন। আর আমি আধমন চাল ঘাড়ে করে বয়ে আনতে পারব না।

খুব পারব। কিন্তু তোমার যে কষ্ট হবে।

কিছু কষ্ট হবে না। তুমি আমার রান্না ভালোবাস বলে আমি রান্না শিখেছি। আমার শেখা বিদ্যে কাজে লাগাতে দাও।

আচ্ছা তোমার যা খুশি তাই কর। সাংসারিক ব্যাপারে তোমার জেদের কাছে আমাকে হার মানতে হবে। এখন বলতো শিউলী দর্শন করে কখন ফিরে আসছ?

কেন তুমি যাবে না?

না। আগে তুমি গিয়ে দেখে এস, তোমার বোনটি আঁধার গর্তের পেঁচা কিনা।

তুমি আমার বোনকে পেঁচা বললে?—বেশ চোখ পাকিয়ে বলল সোফিয়া?

না না, ভুল হয়েছে। এই নাক কান মলছি। তোমার বোন কি কখনো পেঁচা হতে পারেন! ভাষাটা হবে, তোমার বোনটি অসূর্যম্পশ্যা লজ্জাবতী লতিকা কি না, সেটা দেখে বুঝে এস। তারপর যা হয় করা যাবে।

তোমার অতসব সংস্কিড়িমিড়ি আমি বুঝি নে। বুঝিয়ে বল?

অর্থাৎ, তোমার বোনটি কোনো পুরুষের গলার আওয়াজ পেলেই ছুটে গিয়ে অন্ধকার ঘরে লুকোন কিনা। চলতি-মশারি হয়ে পথে বেরোন কিনা। এইসব বুঝে এস, তারপব শিউলী দর্শনে আমি যাব কিনা ভেবে দেখব।

শিউলী ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

তা জানি। পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের জন্য আধুনিক মোল্লা সাহেবরা পর্দানসীন স্কুল-কলেজ খুলেছেন।

কেন, সেসব স্কুল কলেজে কি পড়াশুনা হয় না?

ওগুলো 'সোনার পাথুরে বাটি'। সে বাটিতে যেসব কাকাতুয়া-ময়না-টিঁয়ে দুধ খান, তাঁরা খাওয়া শেষে বড়ো মিঞাদের জেনানার অন্ধকার খাঁচায়ই থেকে যান, বহির্জগতের কোনো খোঁজ জানতে পান না। তোমার বোনটি পাড়াগেঁয়ে জমিদারের মেয়ে। প্রাইভেট পড়ে ম্যাট্রিক পাস করেছেন, জীবনে স্কুলের মুখ দেখেন নি। এখানে এসে উঠেছেন ঐ বাড়ীতে। এ অবস্থায় তাঁর চালচলন

কথাবার্তা যে কিরকম হবে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেসেইজন্য এখনই। আমি যাব না, তুমি গিয়ে দেখে এস।

বেশ, আমিই যাচ্ছি।

সোফিয়া যখন কলুটোলার বাড়ীতে পৌঁছাল তখন শিউলী কলেজ থেকে ফেরে নি। মায়ের ঘরে বসে জিজ্ঞাসা করল,—

শিউলী কোন ঘরে থাকে?

তেতলায় সব ঘরেই থাকে।

তার মানে!

তার বিনা অনুমতিতে তেতলায় কারও যাওয়া নিষেধ।

তার কাছে কে থাকে?

এখন সে একাই থাকে। জাফরভাই বাড়ী গিয়ে করিমের মা'কে পাঠালে সে থাকবে।

এ ব্যবস্থা কে করল?

শিউলীই করেছে।

মামু সম্মত হলেন?

না হয়ে উপায় কি? মেয়ে ভয়ানক জেদী।

তোমাদের সঙ্গে খায় তো?

খায়, তবে আমরা যা খাই তা খায় না।

কেন খায় না?

আমাদের খানা তার পছন্দ হয় না।

কি খায়?

স্রেফ মুশুরির ডাল, আলুভাজা আর ঝিঙে-পটোল সিদ্ধ।

সকালে বিকালে কি খায়?

তা জানি নে। আমি কেবল চা পাঠাই।

তবে তো খুবই মুস্কিল!

হাঁ, খুবই মুস্কিল। আজ ক'দিন ধরে কেবল তোর কথাই ভাবছি। এখন তুই এসেছিস, চেষ্টা করে দেখ তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারিস কিনা।

আমি কি করব?

তুই তো জানিস, আমাদের দোকানে আর কিছু নেই, ঠাট্‌টা বজায় আছে

মাত্র। সংসার চলছে এই বাড়ীর নীচতলার ভাড়ার টাকায়। জাফরভাই দয়া করে এই বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে আর ঐ ভাড়ার টাকা ক'টা আমাকেই দেয় বলে কোনোরকমে খেয়েপরে ঘরের তলে মাথা গুঁজে আছি। শিউলীর অন্য কোথাও সাদী হলে এ সম্বলটুকুও থাকবে না, ছেলেটার হাত ধরে একেবারে পথে বেরোতে হবে। তুই চেষ্টা করে শিউলীর সঙ্গে ইব্রাহিমের সাদী কবুল করিয়ে দে।

তা আমি কি করব? তুমি চেষ্টা কর, মামুর কাছে কথা তোল।

তোর মামুর কাছে কথা তুলে কোনও ফায়দা হবে না। মেয়ের অমতে সে কিছুই করবে না।

তাহলে মেয়ের মত করতে চেষ্টা কর।

সে চেষ্টা করতে গিয়ে এই ক'দিনেই বুঝেছি, ও আমাকে ভালো চোখে দেখে না।

তাতে আর ওর দোষ কি! তোমরা এ পর্যন্ত মামুর সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যে ব্যবহার করেছ সেটা নিশ্চয়ই কেউ ভালো বলতে পারে না। তারপর এখানে এসে বোধহয় আনোয়ারার কেচ্ছা শুনেছে। আনোয়ারা কোথায়? তাকে তো দেখছিনে!

সে ও ঘরে ঘুমাচ্ছে।

পাঁচটা বেজে গেল, এখনও ঘুমাচ্ছে!

তা ছাড়া আর কি করবে বল?

হাঁ তা ঠিক। যে ঘরে গিয়েছে, সেখানে খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া নিজের ইচ্ছায় কিছু করার তো নেই।

তা বড়োলোকের ঘরে পড়েছে, কাজকর্ম করার জন্য বাঁদী, চাকরাণী, খানসামা, বাবুর্চির তো অভাব নেই।

ঠিক বলেছ। ধনী তাহের মিঞা তো ওকে নিয়েছেন তার খামখেয়ালীর পুতুল করে রাখার জন্য। ওর দেহে তো আর মন প্রাণ মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই।

তোর কথাবার্তা আজকাল বড়ো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।

তা আমি কি করব। তোমরা যে মেয়েকে যে রকম জামাই'র হাতে দিয়েছ সে সেই রকম হয়েছে।

ও সব কথা থাক, এখন তুই বল এই সাদীর জন্য কি করা যায়।

ইব্রাহিম তো খুব চটপটে মিশুকে ছেলে। তাকে বল, ওর সঙ্গে মিশে রাজি করতে চেষ্টা করুক।

তা আমি বলেছি, কোনো কাজ হয় নি।

কি হল?

যেদিন শিউলী এ বাড়ীতে এল সেদিন রাত্রে ইব্রাহিম তোদের বাসা থেকে এলে আমি কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম। আমার কথায় তখন খুব মরদানী দেখাল। কিন্তু তারপর দিন যখন দু'জনকে একটেবিলে নাস্তা খেতে বসালাম, তখন একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। একটা কথাও স্পষ্ট করে মুখ থেকে বেরুল না। সেই থেকে দেখছি শিউলীর সামনে পড়ার ভয়ে ছোড়াটা বাড়ীতে থাকে চোরের মতো।

তা যদি হয় তবে এ মেয়ে তোমরা চালাবে কি করে?

একবার যদি সাদী কবুল করে, তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। সুলতানপুরের খান চৌধুরী বংশের মেয়েদের তালাকও নেই, নিকেও নেই। সাদী কবুল করলে বাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর করতে হবে।

তোমাকে ভালো চোখে দেখে না, কিসে বুঝলে?

একটা ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবি। গতকাল বিকালে গিয়েছিল বালীগঞ্জের বাড়ী দেখতে। ফিরে এল রাত দশটায়। সঙ্গে এসেছিল একটা ধুমসা মেয়ে। আমি সদর দরজা খুলে দিলে দু'জনে তড়বড় করে ওপরে উঠে গেল। একটু পরেই সেই ধুমসাটা একাই লাফাতে লাফাতে নেমে রাস্তায় গিয়ে ঘটাং করে গাড়ির দরজা খুলে উঠে চলে গেল। আমি ওপরে গিয়ে শিউলীকে কেবল বলেছিলাম, মেয়েটা যেন পাহাড় পর্বত ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নেমে গেল। তাতে সে উত্তর করল,—হাঁ ওটা পাহাড়ে দজ্জাল। ও নাচে, গান গায়, বাজনা বাজায়, থিয়েটার করে। ওর মতো আরও দশবিশটা পাহাড়ে দজ্জাল আমার এখানে আসা-যাওয়া করবে। আপনাদের সিঁড়ির দরজায় মোটা পরদা টাঙিয়ে নেবেন।

মেয়েটা কে?

হিঁদুর মেয়ে। ব্যারিস্টার অমিয় বাবুর মেয়ে।

আমার পরামর্শ যদি শোনো তবে এ সাদীর চেষ্টা কোরো না। কারণ, করে কোনো লাভ হবে না। এ মেয়েকে তোমরা ঘরে আনতে পারবে না।

তবে কি আমরা পথে বসব?

সে অন্য কথা। দেখ তো কে যেন সিঁড়িতে উঠছে।

জুলেখা ঘর হতে বেরিয়েই ফিরে এসে বললেন,—শিউলী এল।

শুনে সোফিয়া তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে দেখল, শিউলী কোনো

দিকে না তাকিয়ে তেতলায় উঠে গেল। জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন ওর কাছে যাব?

না, এখন ও গোসল করবে, পোশাক পড়বে, চুল আঁচড়াবে, তারপর খাবে। খাওয়া হলে আনোয়ারাকে পাঠিয়ে অনুমতি নিয়ে তবে যেতে হবে।

শিউলীর ফিরতে দেরী হলো কেন?

সে কথা শুনলে তোর মাথা লজ্জায় হেঁট হবে।

কি এমন কথা?

ও যায় কলেজের গাড়িতে, ফিরে আসে হেঁটে বা রিক্সায়।

এতে লজ্জায় মাথা হেঁট করার কি আছে?

বলিস কি! সোমত্ত মেয়ে কলকাতার রাস্তায় বেপরদা হয়ে হেঁটে চলবে!!

হাজার হাজার মেয়ে চলে।

তারা হিঁদুর মেয়ে।

হিঁদু কি মুসলমান তা কোনো মেয়ের গায়ে লেখা থাকে না।

পথে পুরুষের মধ্যে মেয়েরা গেলে তাদের ইজ্জৎ থাকবে?

তোমার ধারণা, বেশীরভাগ পুরুষই বদমাশ। তারা পথে ঘাটে বয়স্থা মেয়ে দেখলেই বেইজ্জৎ করে। এতে অবশ্য তোমার দোষ নেই, এককালে এই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই মেয়েদের বোরখা পরিয়ে জেনানায় আবদ্ধ করা হয়েছিল। এখন আর সে পরিস্থিতি নেই। এখন পথে ঘাটে কোনো বদমাশ কোনো মেয়েকে কিছু বললে তার পিঠের চামড়া বাঁচানো কঠিন হয়।

কিন্তু মেয়েটাতো বেইজ্জৎ হয়।

সেজন্য মেয়েরাই নিজেদের ইজ্জৎ রক্ষা করে চলে।

সে কি রকম?

কোনো বদমাশ কিছু বললে ধরে মার লাগায়।

ও মা আমার কি হবে! মেয়েরা বেটাছেলের গায়ে হাত তোলে!

হাঁ, দরকার হলে তোলে। পুলিশ বা অপরের সাহায্য পরের কথা, আগে নিজের সম্মান নিজেই রক্ষা করতে হবে। কেমন করে ইজ্জৎ রক্ষা করতে হয়, তা এখন শিক্ষিতা মেয়েরা শিখেছে। যাক, তুমি এ সব কথা বুঝবে না। এখন আমি শিউলীর কাছে চললাম। আমার বেলায় কোনো অনুমতি লাগবে না। কারণ, আমিও একটা পাহাড়ে দজ্জাল ধুমসী।

শিউলী স্নান করে জামা-কাপড় পরে বড়ো আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নায় পড়ল দরজার কাছে সোফিয়ার ছায়া। ফিরে দেখল দরজার দুই কপাট দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে সোফিয়া হাসছে।

শিউলী সোফিয়াকে এর আগে কোনোদিন দেখেনি। আনোয়ারার চেহারা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গেও সোফিয়ার কোনো মিল নেই, বরং শিউলীর সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। বিস্মিত হয়ে শিউলী বলল,—

আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

তুই আমাকে চিনতে পারলিনে! আমি সোফিয়া।

অ্যাঁ, দিদি—!—বলেই শিউলী ছুটে গিয়ে সোফিয়ার দু'হাত জড়িয়ে ধরল।

আমি এখানে ছিলাম না, ছুটিতে পাটনায় বাড়ী গিয়েছিলাম। এসে এ ক'দিন বাসা গোছাতেই ব্যস্ত ছিলাম। তারপর রোজই কেউ না কেউ বিকালে দেখা করতে আসেন। সেজন্য এ ক'দিন আসতে পারি নি।

এখানে থাকেন কোথায়?

কেন, তুই কি আমাদের কোন খোঁজই রাখিস নে?

শিউলী লজ্জা পেয়ে বলল,—ছেলেবেলা থেকেই আমার একটা বড়োদোষ, কারও সম্পর্কে নিজের ইচ্ছায় কোন খোঁজ না করা। কেউ সম্মুখে এলে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, নইলে করিনে।

আজকাল আর এটা দোষ নয়, বরং ভদ্রতা। এখন এখানে এসে কেমন আছিস?

আমি এসেছি পড়তে। সেদিক থেকে ভালোই আছি।

এখানে আর কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে?

বালীগঞ্জের অমিয়বাবুদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

একদিন আমাদের বাসায় চল, তোর ভাইসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করে দেব।

তাঁর দাড়ি কতখানি লম্বা?—হেসে প্রশ্ন করল শিউলী।

এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

বুঝে নিতে চাচ্ছি, তিনি গোঁড়া মোল্লা বা মুছল্লী কিনা।

লম্বা দাড়ি থাকলেই কি গোঁড়া হয়? রবিঠাকুরের তো দাড়ি ছিল। আরও কত মনীষীর দাড়ি রাখতে দেখা যায়!

হাঁ, তা দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা দাড়ি মাহাত্ম্য প্রচার করেন না।

এ রকম গোঁড়ামী তো সব ধর্মেই কিছু না কিছু আছে?

হাঁ, তা আছে। হিন্দুদেরও টিকি-মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু দেখতে হবে কোনো মতবাদ বা রুচি অপরের ঘাড়ে জোর করে চাপানোর চেষ্টা আছে কিনা।

দাড়িওয়ালা মোল্লারা কি অপরের ঘাড়ে জোর করে দাড়ি চাপাতে চেষ্টা করেন ?

শুনছি তো এই জন্যই ভারত ভাগ করে পাকিস্তান পয়দা করা হচ্ছে। ভারতের বিপন্ন ইসলামকে পাকিস্তানে পুরুষের দাড়ি আর মেয়েদের বোরখা সালোয়ার পরিয়ে বাঁচানো হবে।

দেখছি, তুই দাড়ি আর বোরখার ভয়ানক বিরোধী।

হ্যাঁ, দাড়ি রেখে ধর্মের কতটা উন্নতি করা যায়, তা দাড়িওয়ালারাই জানেন, আমি জানি নে। কিন্তু মেয়েদের বোরখার পিছনে পুরুষদের যে মনস্তত্ত্ব রয়েছে, সেটা যেমন নোংরা তেমনি মনুষ্যত্ব বিরোধী।

হিন্দুদের মধ্যেও তো ঘোমটা ও পরদা প্রথা আছে ?

ওটা হিন্দু আচার ও সভ্যতার অঙ্গ নয়। আজ থেকে পাঁচ-সাতশ' বছর আগে ভারতীয় নারী সমাজ নিতান্ত বিপদে পড়ে আত্মরক্ষার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করেছিলেন। সে বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ওটা ত্যাগ করেছেন। এখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা যেটুকু আছে, সেটুকু গতানুগতিকতা মাত্র।

এ সব তুই জানলি কি করে ?

বই ও সাময়িক পত্রিকা পড়ে। বাবার মুখেও অনেক কথা শুনেছি।

তাহলে দেখছি দু'জনে মিলবে ভালো।

ভাই সাহেবও কি এই সব গোঁড়ামীর বিরোধী ?

আমরা যেদিন প্রথম স্বাধীনভাবে সংসার পেতেছি, তার পরদিন আমার বোরখাটা কেটে জানালার পরদা করে এনে দিয়েছেন।

অর্থাৎ বোরখা পরে বাইরে চলাফেরা করার যেটুকু স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও নেই, ঘরের জানালা-দরজাও পরদায় বন্ধ।

আমি নিজে বাজারে গিয়ে জামা কাপড় জিনিসপত্র পছন্দ করে কিনি। সভা-সমিতিতে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি।—গম্ভীর হয়ে বলল সোফিয়া।

তাজ্জব ব্যাপার। আমার তা'হলে ভুল হয়েছে, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ভাইসাহেব করেন কি ?

কলেজের অধ্যাপক।

ওঃ তাহলে তো আমি অনেক ভুল করে ফেলেছি। ভাই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

ক্ষমা চাইতে হবে না। তিনিও তোর সম্পর্কে এই রকম মন্তব্যই করেছেন।

কি মন্তব্য ?

তুই গর্তের পেঁচী কিনা, মানুষ দেখলে ছুটে পালাস কি না, কাকাতুয়ার মতো শেখানো বুলি আওড়াস কি না এই সব জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করলে সে রিপোর্ট তাঁর পছন্দ হলে দুজনের দেখা সাক্ষাত হবে।

তাহলে দিদি, আপনি আমার পক্ষ টেনে রিপোর্টটা দেবেন। আজ আপনাকে ছাতু-নুন-লঙ্কা খাওয়াতে না পারলেও দহি-চুড়া-কেলা খাওয়াচ্ছি।

শিউলীর কথা ও সে কথা বলার ভঙ্গীতে সোফিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল,—

তাঁর জন্ম পাটনায় হলেও এই কলকাতায় মানুষ হয়ে একেবারে বাঙালী বনে গিয়েছেন। সে যা হোক, তুই কলেজ হতে ফিরে এ পর্যন্ত খাস নি এখন খেয়ে নে।

আজ দোকানে ছোটো দই-এর হাঁড়ি পাই নি। সেজন্য একসেরী হাঁড়ি এনেছি। আসুন আমরা তিনজনে খাই।

আর একজন কে ?

আনোয়ারা আসবে।

সে তো ঘুমাচ্ছে।

কি আর করবে বলুন। ওকে দেখলে বড়ো দুঃখ হয়। ওর অন্তরে কত আশা-আকাঙ্কা, সাধ-আহ্লাদ আছে। কিন্তু এমন অবস্থায় পড়েছে যে, অন্তরের কথা বাইরে প্রকাশ করতেও ভয় পায়। এই একটি দৃষ্টান্তেই আমি বুঝে নিয়েছি, এই শ্রেণীর জেনানামহলে কি করে শান্তিরক্ষা করা হয়।

এরপর ওর ভাগ্যে আরও যে কি আছে তা কে জানে।

দিদি, আপনি চিড়েগুলো ধুয়ে সব ঠিক করুন আমি চাঁপাদিদিকে ডেকে আনি।

তিনজনে খেতে বসে সোফিয়া শিউলীকে জিজ্ঞাসা করল,—

এই দই কে এনে দেয় ?

আমি নিজেই আনি।

কলেজ থেকে ফেরার পথে হেঁটে আসিস নাকি ?

ছুটি হলে কলেজ-বাসে অত্যন্ত ভিড় হয়, সেজন্য একখানা রিক্সা বন্দোবস্ত করেছি। এতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনারও সুবিধা আছে। বাবা বলেছেন বালীগঞ্জে গেলে একখানা ট্যাক্সি কিনে দেবেন।

আগামী রবিবারে আমাদের বাসায় চল।

রবিবার বালীগঞ্জে যাব বলে কথা দিয়েছি।

কখন যাবি ?

সকালে ন'টার মধ্যে।

ফিরে আসবি কখন ?

রাত ন'টায়।

তাহলে পরের রবিবারে বেলা ন'টার মধ্যে আমি এসে তোকে নিয়ে যাব। সারাদিন আমার ওখানে থাকবি।

তাতে আমার পড়ার ক্ষতি হবে। বালীগঞ্জে নমিতা আমার সহপাঠী। কাকাবাবু ও কাকীমা দু'জনেই ভালো পড়াতে পারেন।

বেশ, তবে কখন যাবি ?

বেলা তিনটের পর যাব, সন্ধ্যার মধ্যে ঘুরে আসব।

আচ্ছা তাই হবে। আমি এসে তোকে নিয়ে যাব।

বাসায় পৌঁছে সোফিয়া হাসতে হাসতে উপস্থিত হল কাদের সাহেবের সম্মুখে। কাদের সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—

এত হাসির কি হল ?

দেখে এলাম 'যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল'।

ওল-টাই বা কে, আর তেঁতুলটাই বা কে ?

ওল তুমি, আর তেঁতুল শিউলী।

সে কেমন ?

তুমি যেমন জানতে চেয়েছ, শিউলী একটা গর্তের পেঁচী কিনা। তেমনি শিউলী জানতে চেয়েছে, তুমি একজন লম্বা দাড়িওয়ালা কাটমোল্লা কিনা।

স্বাস্থ্য কেমন ? স্বাস্থ্যহীন হ্যাংলা প্যাংলা মেয়ে কিন্তু আমার চক্ষুশূল।

আমার চাইতেও সুন্দরী, আর তোমরা দু'জনে যদি কুস্তি লড়, তবে কে জিতবে তা আগে থেকে বলা শক্ত।

তাহলে তুমি একজন সুন্দরী বলে তোমার মনে বেশ গরব আছে !

কেন তোমার চোখে কি আমি সুন্দরী নই ?

না। আমার চোখে এখনও তুমি পছন্দমত সুন্দরী হয়ে উঠতে পারো নি। যেদিন আমার সঙ্গে রবিঠাকুর, সেক্সপীয়র, শরৎ চাটুজ্যে, বার্ণড'শ, প্রভৃতি নিয়ে সমানে তর্কবিতর্ক করতে পারবে, সেইদিন তুমি আমার পছন্দমত সুন্দরী হবে। চামড়ার রূপই রূপ নয়, মনের সৌন্দর্যই প্রকৃত রূপ। চামড়ার সৌন্দয বয়সে নষ্ট হয়ে যায়, মনের সৌন্দর্য স্থায়ী।

রবিবারে আটটা বাজতেই নমিতা এল শিউলীকে নিতে। তেতলায় শিউলীর দুখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, সব কি কি আসবাব দিয়ে সাজানো যায় তার সলাপরামর্শ মাপজোখ ফর্দ করতেই বেলা ন'টা বেজে গেল। এই একঘণ্টা আনোয়ারা শিউলীর ঘরে বসেছিল, কিন্তু কোনো কথা বলে নি।

বেলা ন'টায় ট্যাক্সিতে উঠে নমিতা শিউলীকে জিজ্ঞাসা করল,—

চাঁপা দিদি কি খুব গরীব ?

স্বামী বড়ো ধনী ব্যবসাদার।

তবে চাঁপাদি'র মুখ ম্লান, চোখে অমন উদাস দৃষ্টি কেন ?

ধনদৌলত থাকলেই যে মেয়েরা সুখী হতে পারে, তা নয়। চাঁপাদি'র চাইতে পথের একটা কুলির বউ অনেক সুখী।

কেন এরকম হল ?

এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যাদের চোখে নারীর মর্যাদা ও মূল্য গরু-ঘোড়ার চাইতে বেশী কিছু নয়। গরু-ঘোড়া দুঃখ পেলে চিৎকার করে সকলকে জানাতে পারে, এরা তাও পারে না। চাঁপাদি'র সম্পর্কে এর বেশী আর তোমাকে কিছু বলতে পারব না। তুমিও জানতে চেও না।

এরপর ট্যাক্সির মধ্যে আর দু'জনে কোনো কথা হল না। বালীগঞ্জের বাড়ীতে পৌছলে অপর্ণাদেবী অনুযোগ করে বললেন,—

তোমাদের যে এত দেরী হবে তা ভাবতে পারি নি। নমিতা বলে গিয়েছিল তোমরা দুজনে এখানে এসে সকালের খাবার খাবে। এখন এই খেয়ে দুপুরের খাওয়া কখন খাবে ?

শিউলী অপর্ণাদেবীর কথার উত্তর না দিয়ে নমিতার দিকে ফিরে একটু উত্তেজিত হয়ে বলল,—

তুমি বাড়ী থেকে খেয়ে যাও নি, একথা আমাকে জানাও নি কেন ?

জানালে কি খাওয়াতে? তোমার ওখানে তো কোনো কিছু জোগাড় করার সুযোগ নেই।

বাঃ অন্ততঃ রুটি, মাখন, জেলি তো ছিল! যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। কাকীমা, দিন আমাদের কি খেতে দেবেন। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। কলকাতার মেয়েদের মতো না খাওয়ার কসরত দেখিয়ে সভ্য সাজার চেষ্টা আমার মোটেই নেই। যখন যা দেবেন সব খেয়ে নেব।

কলকাতার মেয়েরা না খাওয়ার কসরত দেখায়, এটা তুমি জানলে কি করে?—প্রশ্ন করল নমিতা।

একজন বিখ্যাত সমাজসেবীর লেখায় পড়েছি,—আধুনিক কালে কলকাতা ও বড়ো বড়ো সহরে এমন একটা সভ্যসমাজ গড়ে উঠেছে যে সমাজে নিমন্ত্রণ পেতে গিয়ে পেট ভরে খাওয়াটা অভদ্রতা। সম্মুখে ডিসে যা দেবে, তার অর্ধেক খাবার ফেলে না রাখলে ভদ্রতা রক্ষাই হয় না।

আচ্ছা তা না হোক। এখন তোমরা দু'জন খাবার টেবিলে গিয়ে বস। আমি খাবার আনছি।—বলে অপর্ণাদেবী রান্নাঘরে গেলেন।

খেতে খেতে শিউলী বলল,—কাকীমা, আজ আমি লুচি-তরকারি, আর এই মশলা দেওয়া আলুভাজা করা শিখব। সেদিন সোফিয়াদিদি এসেছিলেন। তাঁকে কিছু করে খাওয়াতে পারি নি।

আচ্ছা শেখাব। কেউ এলে দোকান থেকে এনে খাওয়ানো সত্যিই মেয়েদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

আপনারা তো বহু কলেজের সঙ্গে পরিচিত। আমার ভগ্নীপতি সৈয়দ আবদুল কাদের সাহেবের সঙ্গে কি পরিচয় আছে?

তাঁকে চিনি, তবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করার সুযোগ হয় নি।

তবে একদিন চলুন না, তাঁদের বাসায় যাই।

তার চাইতে একদিন তাঁদেরই এখানে নিমন্ত্রণ করব।

কথাটার তাৎপর্য বুঝে শিউলী আর কোনো কথা বলল না। খেয়ে উঠে নমিতার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে বসল।

বালীগঞ্জের বাড়ীতে অমিয়বাবুর ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটটা জাফর সাহেব নিজের জন্য রেখেছেন। সে ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘরের একখানা শিউলীর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে রেখে গেছেন। সেই ঘরে বসে নমিতা শিউলীকে অনুরোধ করল তাদের বংশের কাহিনী বলতে।

শিউলী সব কাহিনী বলল। রাজনারায়ণপুরের ব্রাহ্মণ জমিদারের পতন

থেকে আরম্ভ করে কল্যাণীর মৃত্যু, শিবশঙ্কর রায়ের দেওয়ানী গ্রহণ পর্যন্ত সব ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বলল,—এই কল্যাণীর পুত্র রামশঙ্করের বংশধর গৌরীশঙ্কর রায়ই আমাদের শেষ দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান চাচার মৃত্যুর পর আর দেওয়ান রাখা হয় নি।

দেওয়ান চাচার কে কে আছেন?—প্রশ্ন করল নমিতা।

এক ছেলে ও স্ত্রী আছেন।

এখন তাঁরা কোথায় আছেন?

দেওয়ান চাচার মৃত্যুর পর তাঁরা মুনসিগঞ্জ গিয়েছেন।

সুলতানপুরে তাঁরা কোথায় থাকতেন?

আমাদের বাড়ীর পাশেই তাঁদের বাংলো ছিল।

ছেলেবেলায় তুমি তাঁদের বাংলোয় বেড়াতে যেতে?

দেওয়ান চাচার ছেলে শিশুকাল থেকে আমার খেলার সাথী পড়ার সঙ্গী ছিল। আমার ন'বছর বয়স পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।

সে তোমার বড়ো না ছোটো?

দু'বছরের বড়ো।

দেখতে কেমন?

তার জন্ম হলে আমার দাদী দেখতে গিয়ে নাম রেখেছিলেন 'গোলাপ'।

তোমরা দুজনে কি এক স্কুলে পড়তে?

আমি কোনোদিন স্কুলে যাইনি। আমরা দুজনে বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়তাম।

এমন সময় খোকন এসে জানাল, দুই দিদিকেই মা ডাকছেন। শুনে শিউলী ও নমিতা অপর্ণাদেবীর কাছে গেলে তিনি বললেন,

তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে খেও। এখন ওঁর আর খোকনের খাবার জায়গা করে দাও।

নমিতা তাড়াতাড়ি বলল, না মা, আমার বড্ডো ঘুম পাচ্ছে। আমরা দু'জন বাবার সঙ্গে খেয়ে ওঘরে গিয়ে ঘুমোব।

এটা একেবারে মিথ্যেকথা।—হেসে বলল শিউলী। আপনার সঙ্গে খেতে দেরী হবে। সে দেরী ওর সইছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার আমাকে বকাতে আরম্ভ করবে।

ওঃ, তাহলে তোমার কাছে নমিতা গল্পের গন্ধ পেয়েছে। তাহলে এখানে এসে তোমার পড়াশুনার সঙ্কল্প আর সহজে কার্যকর হবে না।

না মা, এই আজকের দিনটা মাত্র। এরপর প্রত্যেক রবিবারে আমরা দু'জন লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে পড়াশুনা করব।

হাঁ তা বুঝেছি। এখন দু'জনে গিয়ে টেবিল সাজিয়ে বস। আমি খাবার আনছি।

শিউলী ও নমিতা খেয়ে ঘরে গিয়ে আবার দুজনে আরম্ভ করল তাদের গল্প।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল,—তোমরা দু'জন কি খেলতে ?

নানারকম খেলা। লুকোচুরি, কানামাছি, ভৈরবে সাঁতার কাটা, গাছথেকে ফুল ফল পেড়ে দিত, আমি কুড়োতাম। শেষের দিকে সে নানারকম পশুপাখির ডাকের অনুকরণ করতে পারত, আর বাঁশি বাজাত।

তোমাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি হত না ?

মারামারি হত, ঝগড়া হত না।

সে কি রকম, ঝগড়া না হলে মারামারি হয় !

সেই আমাকে মারত।

কেন মারত ?

আমাকে মারতে না কি তার খুব ভালো লাগত।

কেমন করে মারত ?

এই মনে কর দু'জনে যাচ্ছি, আচমকা বসিয়ে দিল পিঠে দুম্‌করে এক কিল। না হয় চুলের বিনুনী ধরে টান দিয়ে চিতপাত করে ফেলে দিল।

ওঃ এবার তোমার দুম্-চিতপাত ঠিকমত বুঝে ফেলেছি।

কি বুঝেছিস্ ?

সেটা পরে বলছি। এই মাত্র 'বুঝেছিস্' বলেছ। এরপর কিন্তু আর 'তুমি' বলতে পারবিনে।

আচ্ছা তাই হবে। এখন বল কি বুঝেছিস ?

যা বুঝবার তাই বুঝেছি। এখন সোজা কথায় বল, তোর তিনি কোথায় আছেন ?

যাঃ, আমি জানি নে।—বলে শিউলী মাথা নত করল।

ওঃ ভাই তুই রাগ করলি। রাগ করিস নে ভাই। বল, তোর সেই দুম্-চিতপাত এখন কোথায় আছেন ?

বললাম তো আমি জানি নে।

কতদিন জানিস নে?

আট বছর।

আ-আট বছর! এর মধ্যে কোনো খোঁজ করিস নি?

খোঁজ করে কি লাভ হবে? সে হিন্দু, আমি মুসলমান।

ওতে আজকাল কিছু বাধে না। লাভ যে কি হবে তা তোর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। চাচা সাহেব নিশ্চয়ই তাঁর ঠিকানা জানেন।

সাবধান, বাবার কাছে এ সম্পর্কে কোনো কথা কোনো ছলেও জিজ্ঞাসা করিস নে। অনেকদিন থেকে আমি এমন একজন আপনজন খুঁজছিলাম যার কাছে সব বলে মনটাকে একটু হাল্কা করে নিতে পারি। তোকে পেয়ে আমার সে অভাব পূর্ণ হয়েছে। এরপর একথা আর কেউ জানবে না।

তাহলে ভবিষ্যতে তোর বিয়ের কি হবে?

বিয়ে আমার হয়ে গেছে, নতুন করে আর কিছু হবে না।

আচ্ছা, গোলাপবাবুর ভালো নাম কি বল তো?

ভালো নাম আবার কি রকম!

আমাদের অনেকেরই একটা ডাক নাম আর একটা আসল নাম থাকে। যেমন তোর ডাকনাম শিউলী, আসল নাম রোশেনারা। সেই রকম গোলাপ তাঁর ডাক নাম। ও নাম স্কুল-কলেজের খাতায় নেই। তাঁর আসল নামটা কি?

তা তো জানি নে! ঐ নামেই সকলে ডাকত।

তুই বড়ো অদ্ভুত মেয়ে। যে তোর জীবনমরণ সমস্যা, তার আসল নামটা জানিস নে, আটবছরের মধ্যে একটা খোঁজও করলি নে!

কি করব বল, এ কথা যে কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না।

তোদের শেষ দেখা হয় কোথায়?

আমাদের বাড়ীর পিছনে বাগানে।

কি বলে বিদায় নিলেন?

'আমরা মামা বাড়ী যাচ্ছি, আর আসব নারে—' বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গেল।

নমিতা লক্ষ্য করল শিউলীর গলা ভার হয়ে গেছে, চোখ ছলছল। সে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল,—আমি কাল থেকে গোলাপবাবুর খোঁজ আরম্ভ করব। প্রথম দেখব, গত তিনবছরের ম্যাট্রিক ও আই. এ; আই. এস. সি'র রেজাল্ট গেজেট। তারপর খোঁজ করব কলকাতার কোনো কলেজে গোলাপ রায় আছেন কিনা। আমি তোর গোলাপকে খুঁজে বের করবই।

জাফরুল্লা চৌধুরী কলকাতা থেকে সুলতানপুর এলেই করিমের মা'কে কলকাতা পাঠালেন।

দেশের অবস্থা ক্রমেই জাফর সাহেবের প্রতিকূল হয়ে পড়ছে। সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় বলা হচ্ছে জমিদার জাফর চৌধুরী হিন্দুর দোস্ত, অতএব ইসলামের দুশমন। মেয়ে কলকাতার কলেজে ভর্তি করা নিয়েও জোর বিরুদ্ধ-প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখে শুনে জাফর সাহেব বেশ বুঝলেন, ভারত ভাগ হয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান পয়দা হলে সে পাকিস্তানে তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক মুসলমান নিরাপদে বাস করতে পারবে না।

জাফর সাহেব কলকাতা থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই ভারত স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল। সে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ ধার্মিকেরা যে উৎসব পশ্চিমে করলেন তার স্বরূপ বুঝে পূর্বাঞ্চল দিশেহারা হয়ে পড়ল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন পনেরো পরে জাফর সাহেব গেলেন যশোহর। সেখানে গিয়ে দেখলেন, ঝড়ো হাওয়ায় নদীর কচুরিপানার মতো হিন্দুরা সব ফেলে ছুটেছে পশ্চিমবঙ্গে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। তাদের মূল্যবান সম্পত্তি জলের দরে বিক্রী হচ্ছে, তাতেও যা পায় তার বেশীর ভাগ নানা অছিলায় দুর্বৃত্তরা কেড়ে নিচ্ছে।

বিস্মিত জাফর সাহেব কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন,—

এই কিছুদিন আগেও আপনারা দুর্ধর্ষ ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বস্বপণ করে লড়াই করেছেন; ফাঁসি, দ্বীপান্তর, জেল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কোনো কিছুরই পরোয়া করেন নি। এখন দেশ ইংরেজ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছে। এখন থেকে দেশের লোকই দেশ শাসন করবে। এতে আপনারা এরকম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সব ছেড়ে পালাচ্ছেন কেন?

উত্তর পেলেন,—

ইংরেজ শাসনের যত দোষই থাকুক না কেন, তাদের আমলে আমরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছি সেজন্য জেল খেটেছি। বিপ্লবী যুবকেরা ইংরেজ খুন করে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গেছে। ইংরেজের সঙ্গে এই সংঘর্ষে রাজদ্রোহীদের শাস্তি হলেও আমাদের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নি, বা ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত করে নি। ওটা ছিল বিদেশী সরকার বনাম ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে বিবাদ। এখন এই ধর্মভিত্তিক পৃথক সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদ অবলম্বনে দেশ

বিভাগ হওয়ার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদও সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে দাঙ্গা বেধে যাচ্ছে। সে দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণ-নারীর মর্যাদা রক্ষা করবে কে? দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে, যাঁরা ধর্মভিত্তিক জাতি-বিদ্বেষ অবলম্বনে দেশ ভাগ করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করলেন।

চিন্তাকুল চিত্তে জাফর সাহেব যশোর থেকে সুলতানপুরে ফিরে এলেন। এতদিন তিনি ভেবেছিলেন, জমিদারী যখন থাকবে না, তখন যা কিছু যোগাড় করা যায়, তাই নিয়ে শেষ জীবনটা কলকাতায় কাটাবেন। কিন্তু যশোরে হিন্দুদের মুখে যা শুনলেন, তাতে তাঁর মত পরিবর্তিত হয়ে গেল।

জাফর সাহেব বুঝলেন; যে ভয়, বিদ্বেষ ও পৃথক জাতীয় স্বার্থবাদ দেশ ভাগ করে পৃথক ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই ভয় বিদ্বেষ ও পৃথক স্বার্থবাদ এখন হিন্দুদের মধ্যে সংক্রামিত হতে চলেছে। পাকিস্তানের হিন্দুরা হয়তো সকলেই হিন্দুস্তানে এসে স্থান পাবেন, কিন্তু যে পাঁচকোটি মুসলমান হিন্দুস্তানে থেকে গেল, পাকিস্তানে তাঁদের মাথাগোঁজার স্থান কোথায়? সেজন্য এখন থেকেই সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের অন্তর থেকে এই সর্বনাশা ভয়-বিদ্বেষ-পৃথক স্বার্থবাদ দূর করতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। হিন্দুনেতাদের সাম্প্রদায়িক মিলন প্রচেষ্টা পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে শেষ হয়ে গেছে। এখন এজন্য চেষ্টা করতে হবে মুসলমান নেতাদের। সেজন্য জাফর সাহেব স্থির করলেন, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঢাকায় তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে অবশিষ্ট জীবন পাকিস্তানেই কাটিয়ে যাবেন।

সুলতানপুরের নিকটবর্তী গ্রামগুলির সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি ও দলিলপত্র জমিদার বাড়ীতে জাফর সাহেবের হেপাজতে রেখে পশ্চিমবঙ্গে যেতে আরম্ভ করেছেন। তিনমাসের মধ্যে এমন হল যে জমিদার বাড়ীতে মাল রাখার আর স্থান নেই। বহু হিন্দু হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

আশ্বিন মাসে পূজার ছুটিতে শিউলী এল সুলতানপুর। আসার পথে সে দেখেছে উদ্বাস্তু হিন্দুদের দুরবস্থা। দেখে শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। জাফর সাহেব যখন তাঁর সঙ্কল্পের কথা তাকে বললেন, তখন সে সর্বান্তঃকরণে তাঁকে সমর্থন করল। সেই সঙ্গে এটাও বুঝল, দু' শ' বছর পরে এবার খানচৌধুরী বংশ সুলতানপুর হতে বিদায় নেবে।

একদিন সকালে শিউলী বেড়াতে গেল দেওয়ান গৌরীশঙ্কর রায়ের বাংলো ভেঙ্গে যে ফুলের বাগান করা হয়েছিল সেই বাগানে। সঙ্গে গেল করিমের মা।

বাগানে শিউলী নিজ হাতে অনেকগুলো গোলাপগাছ বুনেছিল, আর একপাশে বুনেছিল একটা শিউলীগাছ। সেদিন গিয়ে দেখল, তার সবচেয়ে প্রিয় বড়ো লাল গোলাপগাছটার ওপরে শিউলীগাছের একখানা ডাল ঝুঁকে পড়েছে। অনেকগুলো শিশিরভেজা শিউলী ফুল গোলাপ গাছটার গায়ে ও তলায় পড়ে আছে। একটা বড়ো আধফোটা গোলাপ যেন শিউলী গাছটার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে।

শিউলী গোলাপটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে করিমের মা ফুলটা তুলতে গেল। শিউলী নিষেধ করে বলল,—না মাসী, ওটা তুলো না। ওর গোড়ায় যে ফুলগুলো পড়ে আছে ঐগুলো নেব। তুমি একটু কলাপাতা আনো।

ফুল কুড়িয়ে কলাপাতার ঠোঙা ভরতি করে নিয়ে শিউলী গেল তার সেই হিমসাগর আমগাছটার তলায়। আমগাছটা বেশ বড়ো হয়েছে, আমও ধরে। আম পাকলে শিউলী কাউকে গাছে উঠে আম পাড়তে দিত না। পেকে তলায় পড়লে সকাল-সন্ধ্যায় নিজ হাতে কুড়িয়ে সব আম ভেওয়া ফকিরের দরগায় ও শিবমন্দিরে পাঠিয়ে দিত, নিজে একটাও খেত না।

আমগাছটার গোড়ায় আবর্জনা জমেছে। শিউলী সেগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। দেখে করিমের মা বলল,—

তুই ও কি করছিস! করিমকে বললে সাফ করে দেবে।

গাছটা আমার। আমার কর্তব্য একে যত্ন করা।

তা তো জানি, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি হুজুর নাকি সুলতানপুর ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে থাকবেন। তখন তোর গাছের কি হবে?

আমি যে আর সুলতানপুর আসব না, তা জানি। এই শেষবারের মতো এদের একটু যত্ন করে যাচ্ছি।—বলেই শিউলী কেঁদে ফেলল।

আট বছর পরে সেদিন রাত্রে জাফর সাহেবকে শিউলী জিজ্ঞাসা করল,—বাবা, দেওয়ান-চাচী এখন কোথায় আছেন?

তিনবছর হল তিনি বহরমপুরে ভাইয়ের বাসায় মারা গেছেন। গোলাপ আই. এ. পাশ করে বি. এ. পড়ছে।—বলে জাফর সাহেব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শিউলী আর কোনো কথা জানতে চাইল না দেখে তিনিও আর কিছু বললেন না।

ছুটির কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকতে শিউলীকে নিয়ে জাফর সাহেব গেলেন

কলকাতা। কলুটোলার বাড়ীতে শিউলীকে রেখে তিনি গেলেন বালীগঞ্জের বাড়ীতে।

শিউলী কলকাতা ফিরেছে শুনে সোফিয়া এসে তাকে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। সৈয়দ সাহেব শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

তোমাদের দেশের খবর কি?

খুব খারাপ। উত্তর দিল শিউলী।

কেন! তোমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। নেতারা যা দাবি করেছেন, তা পেয়েছেন। এখন খারাপ হবে কেন?

যে দাবি পূরণে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপত্তা বোধের অভাবে ভিটাছাড়া হয়ে দেশান্তরে পালায়, তাকে অন্তত আমি ভালো বলব না।

ঠিকই বলেছ। এর আর একটা সর্বনাশা দিক আছে। যে ভয়, বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবোধ পাকিস্তানের দাবি তুলে ভারত খণ্ডিত করেছে, সেই ভয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবোধ এখন ভারতের অপরাপর সম্প্রাদায়গুলির মধ্যেও নানা আকারে সংক্রামিত হতে চলেছে।

সে আকারগুলি কি রকম? প্রশ্ন করল সোফিয়া।

ভাষাগত পৃথক স্বার্থবোধ, প্রদেশগত পৃথক স্বার্থবোধ, জাতিগত পৃথক স্বার্থবোধ, এই রকম বহু স্বার্থবোধ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এদিক থেকে বোধহয় পাকিস্তানের কোনো ভয়ের কারণ নেই। শিউলী বলল।

কেন নেই? প্রশ্ন কবল সোফিয়া।

আমি শুনেছি, দুনিয়ার সব মুসলমানই এক, ভাই ভাই। পাকিস্তান থেকে সব অমুসলমান চলে গেলে ওটা তো মুসলমানের দেশ হয়ে যাবে।

মুসলমানের দেশ হলেই যে সাম্প্রদায়িকতা লোপ পায়, ইতিহাস তো একথা বলে না! এই ভারতেই মোগল-পাঠান-আফগান-সিয়াসুন্নিদের মধ্যে যুদ্ধ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।

তাহলে কি ইস্‌লামিক কত্তম একটা বাজে কথা?

নাঃ, ওটা বাজে কথা নয়। বললেন সৈয়দ সাহেব।—মানুষ যখন ধর্মকে পরিবর্তনশীল জগতের বৈষয়িক স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যবহার করে, তখন ধর্ম বিকৃত হয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়। এখানেও তাই ঘটেছে ও ঘটছে।

তাহলে পাকিস্তানে কি ঘটতে পারে? শিউলী প্রশ্ন করল।

ভারতে যা ঘটতে চলেছে, পাকিস্তানেও তাই ঘটবে।

একটু বুঝিয়ে বল। অনুরোধ করল সোফিয়া।

ভাষা, ধর্মমত, বিভিন্ন প্রাদেশিকতা, এইসব পৃথক স্বার্থবোধ অবলম্বনে এদেশ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পরস্পর খুনোখুনি করবে। জনজীবন হবে বিপন্ন।

তাহলে এর শেষ পরিনতি কি হতে পারে? জিজ্ঞাসা করল শিউলী।

কোনো সামরিক শক্তিতে শক্তিমান নেতা এদেশ থেকে সব ধর্মমত নিঃশেষে মুছে ফেলে অখণ্ড ভারতে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। অথবা মাৎস্যন্যায় আবির্ভূত হয়ে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

তুমি কি কার্লমার্কসের কমিউনিজিমের কথা বলছ? জিজ্ঞাসা করল সোফিয়া।

আশ্চর্য! দিদি এখন কার্লমার্কসের খবরও রাখেন!

না বোন, ওসব বই পড়ার মতো বিদ্যে এখনও আমার হয় নি। তোর বওনাই'র সঙ্গে অনেক সভা-সমিতিতে যাই, বহু শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে মিশি। সেখানে যেসব আলোচনা হয় তাই শুনি, আর কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা পড়ি।

আপনার সঙ্গে আনোয়ারার তুলনা করে মন বড়ো ভেঙ্গে পড়ে।

এর প্রতিকার একমাত্র তোমার মতো মেয়েরাই করতে পারবে। বললেন সৈয়দ সাহেব।—তোমাদের অধিকার তোমরা আদায় করে রক্ষা করবে। আমরা স্বেচ্ছায় কখনো তোমাদের ওপরে কর্তৃত্ব ত্যাগ করব না।

কিন্তু আমাদের ধর্মশাস্ত্র সরিয়ত মতে তো নারী পুরুষের অধীন। পুরুষের নির্দেশ মতো চলাই নারীর ধর্ম।—বলল সোফিয়া।

হাঁ, শুধু আমাদের সরিয়ত নয়, সব ধর্মের ব্যবস্থা শাস্ত্র ঐ রকমই বলেছেন। কিন্তু ওসব ব্যবস্থা তো পুরুষ আমরা, আমাদের সুবিধামত করে নিয়েছি। আমাদের এই কর্তৃত্ব সম্পর্কে তোমরা যাতে আপত্তি না কর, তার জন্য ধর্মের দোহাই দিয়ে তোমাদের বিচারবুদ্ধি খতম করে রেখেছি।

তাহলে আপনি পুরুষ হয়ে কেন আমাদের চোখ ফুটিয়ে নিজেদের ক্ষতি করছেন?—প্রশ্ন করল শিউলী।

অধিকতর ক্ষতি ও অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তোমাদের চোখ কিছুটা ফুটাতে চাই।

সে ক্ষতি ও অসুবিধা কি রকম?—প্রশ্ন করল সোফিয়া।

নারী ও পুরুষে মিলে গঠিত হয় একটা পরিবার। বহু পরিবার মিলে হয় একটা সমাজ। রাষ্ট্রও এই রকম ব্যাপার। এখন পৃথিবীতে চলছে

বাস্তব বিজ্ঞান অবলম্বনে সব বিষয়ে দ্রুতগতির যুগ। এ যুগে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী অংশ যদি দূরপথযাত্রীর লগেজের মতো অচল হয়ে পড়ে থাকে, তবে পথ চলার অসুবিধা হয়। যাত্রী তাঁর লগেজ বুক করে লগেজ ভ্যানে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এ জ্যান্ত লগেজ তো, তা দেওয়া যায় না। সেজন্য নারী অংশ স্বয়ং চালু না হলে পুরুষ অংশ এই বৈজ্ঞানিক দ্রুতগতির যুগে সমান তালে পথ চলতে পারবে না।

বেশ। এখন আপনার ঐ মাৎস্যন্যায় ব্যাপারটা কি, একটু বুঝিয়ে বলুন।—অনুরোধ করল শিউলী।

অধিকাংশ মানুষেরই একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আছে। তারা সেই বুদ্ধি ও বিচার শক্তির সাহায্যে নিজেদের ভালো মন্দ বোঝে। জননেতাদের কার্যকলাপে যদি জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবে নেতাদের কোনো ধাপ্পাবাজীই বেশীদিন চলে না, ধাপ্পাবাজ নেতাদের নেতৃত্ব খসে যায়। যদি কোনোসময়ে অধিকাংশ জননেতা ধাপ্পাবাজ স্বার্থপর হয়ে নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব ও স্বার্থ নিয়ে বিবাদ আরম্ভ করে, তবে জনসাধারণ কোনো নেতাকেই আর বিশ্বাস করে না, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। এর ফলে দেশে নেতৃত্ব ও পরিকল্পনাহীন গণ-বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। এই প্রকার অবস্থাকেই হিন্দুশাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় বলে।

এ অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় নাম দেওয়া হল কেন?—প্রশ্ন করল সোফিয়া।

দেখা যায় বড়োমাছ ছোটো মাছগুলি ধরে খেয়ে বেঁচে থাকে। নেতৃত্ব ও পরিকল্পনাহীন গণবিদ্রোহে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সবকিছু নিরাপত্তার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ তখন একে অপরের যা কিছু আছে, তাই কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যতদিন পারে বাঁচতে চেষ্টা করে। এইজন্য একে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে।

কমিউনিজিম ও মাৎস্যন্যায়—এই দুটোর মধ্যে কোনটা ভারতে সম্ভবপর বলে আপনি মনে করেন? প্রশ্ন করল শিউলী।

আমি তো কমিউনিজিমের কথা বলি নি। আমি যেটা বলেছি ওটা জঙ্গী একনায়কত্ব। প্রকৃত কমিউনিস্ট নেতার আবির্ভাব হয় শোষিত প্রবঞ্চিত জনসাধারণের ভিতর থেকে। সে নেতা হন চিন্তাশীল দূরদর্শী স্বার্থত্যাগী ও জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সমভাগী। জঙ্গী একনায়ক যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক হতে পারেন। অসাধারণ সাহসী, নির্মম-নিষ্ঠুর, একগুঁয়ে—এইগুলি তাঁর স্বভাব। তিনি নিজমতের বিরুদ্ধবাদীদের নিঃশেষে হত্যা করেন।

সবরকম পৃথকস্বার্থবাদ ও তার অবলম্বন নির্মম হস্তে মুছে ফেলে একছত্র একনায়ক হন। ধর্ম যদি তাঁর একনায়কত্বের বাধক হয়, তবে তিনি ওটাকেও মুছে ফেলেন।

কিন্তু জনসাধারণ ওরকম একনায়কত্ব মেনে নেবে কেন?—প্রশ্ন করল সোফিয়া।

জননেতাদের মধ্যে আত্মকলহ, এবং তাঁদের স্বার্থপরতা ও ধাপ্পাবাজীতে জনসাধারণের স্বার্থ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখনই ঐ প্রকার জঙ্গী একনায়কের আবির্ভাব সম্ভব হয়। জঙ্গী একনায়কের অধীনে জনসাধারণের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, বরং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

কিন্তু এ প্রকার শাসন ব্যবস্থা বর্তমান যুগে কি বেশীদিন চলতে পারে? —প্রশ্ন করল শিউলী।

না, তা চলতে পারে না। জংলা জমিতে ভালো জাতের ফসল আবাদ করতে হলে জমির সব আগাছা ঘাস-জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে মাটি কুপিয়ে সমান করে দু'একবছর ফেলে রেখে দেখতে হয় কোনো আগাছার মূল মাটির নীচে লুকিয়ে থেকে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কিনা। মানব সমাজে যখন ঐরকম অনুপযুক্ত অপ্রয়োজীয় অহিতকর বিভিন্ন মতবাদ ও তার ধারক-বাহক স্বার্থপর ভণ্ডনেতার আস্ফালনে জনজীবন বিপন্ন হয়, তখন খোদার ইচ্ছায় ঐ প্রকার জঙ্গী একনায়কের আবির্ভাব ঘটে। জঙ্গী নায়ক সমাজ বা রাষ্ট্রজমি পরিষ্কার ও সমান করে দেন মাত্র, ফসল উৎপন্ন করেন পরবর্তী কালে নিঃস্বার্থ চিন্তাশীল স্বদেশ প্রেমিক দেশনায়কগণ। খোদার যদি এ দয়া না হয়, তবে খোদার গজবে মাৎস্যন্যায় আবির্ভূত হয়।

তোমার মাৎস্যন্যায়ের গল্প তো অনেক শুনলাম, আমার রুই মাছের কালিয়া আর পোলাও হবে কখন? বলল সোফিয়া।

তোমার বোন যে ভাবে আমার কথাগুলো গিলছে, তাতে ছাতু, নুন, লঙ্কা অথবা দহি-চুড়া কেলা দিলেও ওর চলবে।

ওঃ, আমার ওখানে যে সব কথা হয়, দিদি বুঝি বাসায় এসে সব আপনাকে বলেন।

না বলে করি কি বল। তোর সম্পর্কে ওর প্রশ্নের সম্মুখে সব কথা বেরিয়ে পড়ে—উত্তর দিল সোফিয়া।

তাহলে তোমরা দু'জন তোমাদের মুখ্য কর্মে যাও। আমি একটু বেরিয়ে দহি-চুড়া-কেলা যোগাড় করে আনি।

রান্না করাটা বুঝি আমাদের মুখ্য কর্ম? হেসে প্রশ্ন করল শিউলী।

ঋষিকল্প সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী তো তাই বলেছেন। স্বামী ও স্ত্রীর যৌথসংসারে স্বামীর মুখ্য কর্ম বাহিরে আর স্ত্রীর মুখ্য কর্ম ভিতরে।

তোমরা যদি তোমাদের এরকম আলোচনা চালিয়েই যাও, তবে আমার আর রান্না করা হবে না। শেষপর্যন্ত শিউলীকে ছাতুলঙ্কা খেয়েই বিদায় নিতে হবে।

আমি তারজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এরকম আলোচনা শোনার জন্য ছাতু-লঙ্কা খেয়ে দিনের পর দিন থাকতে পারব।

আনোয়ারার স্বামী তাহের মিঞার পৈতৃক নিবাস ঢাকা সহরে। পিতা ছিলেন অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ির মালিক। স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় প্রথম দিকে সাত বছরে চারটে ক্লাস অতিক্রম করার পর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসা পর্যন্ত তাহের মিঞার বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তার খাতা কোন কোন পরীক্ষকের কাছে যায় তার হদিস করতে না পারায় তিনবছর পরে ম্যাট্রিক পাশের আশা ছেড়ে দিয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন।

পৈতৃক ব্যবসা তাহের মিঞার পছন্দ হল না। কিছু মূলধন নিয়ে এক চামড়ার ব্যবসায়ীর সঙ্গে কলকাতায় এসে তিনি আরম্ভ করলেন চামড়ার ব্যবসা। এই ব্যবসা উপলক্ষে মিঞা সাহেবের পরিচয় হল কলকাতার কসাইদের সঙ্গে। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হলেন কসাইদের একজন বড়ো মাতব্বর সর্দার।

এই সময়ে বাংলাদেশে চলছিল মুসলমান-প্রধান মন্ত্রিত্বের আওতায় পাকিস্তান-আন্দোলন। তাহের মিঞা তাঁর কসাই বাহিনী নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকটা লড়াইতে যে কৃতিত্ব দেখালেন, তাতে কয়েকজন নেতা ও মন্ত্রীর নজরে পড়ে সরকারী কন্ট্রাক্ট পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই নিজস্ব বাড়ী, গাড়ি, ধনদৌলতের মালিক হয়ে সমাজে একজন খ্যাতিমান পুরুষ বলে গণ্যমান্য হলেন।

এরপর অবিভক্ত বাংলার বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ছারোয়ার্দি সাহেবের ঐতিহাসিক 'ডাইরেক্ট অ্যাক্শন'-এ যোগ দিয়ে তাহের মিঞা ও তাঁর দলবল তাঁদের যোগ্যতার পুরোপুরি পরিচয় দিলেন। তারপর যখন ডাইরেক্টঅ্যাক্শনের

'রি-অ্যাক্‌শন' আরম্ভ হল, তখন ছারোয়ার্দি সাহেব ও অন্যান্য বড়ো নেতারা যে উপায়ে আত্মরক্ষা করলেন, তাহের মিঞা সে উপায় অবলম্বন করতে ভরসা পেলেন না। কাজেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সুদৃঢ় ঘাঁটি ঢাকায় গিয়ে আত্মরক্ষা করাই সুবিধাজনক ও নিঃসন্দেহে নিরাপদ মনে করলেন।

আনোয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে তাহের মিঞা ঢাকায় যাচ্ছেন, হয়তো ভবিষ্যতে তাঁরা কলকাতায় নাও ফিরতে পারেন। সংবাদটা শুনে জুলেখা কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। তাঁর কান্নাকাটি ও আনোয়ারার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে মিঞা-সাহেব আনোয়ারাকে মা জুলেখার কাছে রাখার অনুমতি দিয়ে গেলেন।

ঢাকায় গিয়ে যতদিন পাকিস্তান না হয়েছিল ততদিন তাহের মিঞার আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট ছিল। কারণ, কলকাতায় তাঁর কৃতিত্ব বেশ ফলাও করে ঢাকায় প্রচার হয়েছিল। কিন্তু বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি দেখলেন, কেহই তাঁকে কোনো বিষয়ে পাত্তা দেয় না। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে হয়ে পড়লেন বিদেশী উদ্বাস্তু। ব্যাপার বুঝে তাহের মিঞা বড়ো মুষ্‌ড়ে পড়লেন।

তাহের মিঞার আশা ছিল, স্বাধীন পাকিস্তানে নিশ্চয়ই তাঁর একটা বিশেষ পদপ্রাপ্তি হবে, আর সেই পদগৌরবের সুযোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে আরও ফেঁপে উঠতে পারবেন। স্বাধীন পাকিস্তান হওয়ার পর একবছর পার হয়ে গেল, মিঞাসাহেবের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠল। ধনবলে বলীয়ান অবাঙালী মুসলমান উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যবসাক্ষেত্রে নামতে তিনি সাহস পেলেন না।

অবস্থা যখন এই রকম, তখন তাহের মিঞা কলকাতা থেকে সংবাদ পেতে লাগলেন, হিন্দুস্তানে মহাত্মা গান্ধীর আট হাত খদ্দরের ধুতির তলায় ছারোয়ার্দি সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন থেকে আরম্ভ করে অনেকের অনেক রকম অ্যাক্‌শন এমন ঢাকা পড়েছে যে, সে ঢাকা একটু ফাঁক করে দেখার মতো সাহস ও অবকাশ এখন কারও নেই। সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যত কর্তৃত্বে নিজেদের স্থান করে নিতে ব্যস্ত, আর সেইজন্য ভোট সংগ্রহ করতে তাঁদের সকল দুয়ারেই যেতে হয়, সকলকেই তোয়াজ করতে হয়। ভোটারের কার্যকলাপ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কোনো বিরূপ অভিমত পোষণ করা ভোটপ্রার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর যাঁর হাতে বেশকিছু ভোট আছে, নেতাদের নিকটে তাঁর যথেষ্ট সমাদর।

সুখবরটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তাহের মিঞা ফিরে এলেন কলকাতায়।

মাস দুই এদেশের হালচাল দেখে নিঃশঙ্ক হয়ে কলুটোলার শ্বশুরবাড়ীতে সংবাদ পাঠালেন, পরের সপ্তাহে একদিন তিনি নিজে এসে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করে আনোয়ারাকে নিয়ে যাবেন।

সংবাদ পেয়ে জুলেখা ব্যস্ত হয়ে গেলেন শিউলীর ঘরে। তাকে বললেন,—মা রোশোনারা, তুমি ব্যারিস্টার সাহেবকে খবর পাঠিয়ে আগামী রবিবার থেকে এক সপ্তাহ তাঁর বাড়ীতে থেকে এস।

কেন? প্রশ্ন করল বিস্মিতা শিউলী।

তাহের কলকাতা এসেছে। সে আনোয়ারাকে নিতে এসে এখানে হয়তো একদিন থাকবে। পত্রে লিখেছে সাতদিনের মধ্যে আসবে।

তাতে আমাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে কেন?

তুমি যে পরদা মেনে চল না, যদি তার চোখে পড়ো।

পড়লামই বা! আমি কি কোনো দোকানের পুতুল, আর তাহের মিঞা কি কচি খোকা যে, দেখলেই নেবার জন্য হাত বাড়াবেন? আমি যাব না।—বলে শিউলী মুখ ফিরিয়ে পড়ায় মন দিল।

আমি যা ভালো বুঝেছি তাই বললাম। তুমি জেদী মেয়ে, যা ভালো বোঝো তাই কর।—বলে জুলেখা চলে গেল।

ঘরে বসেছিল করিমের মা। সে বলল,—বেগম সাহেবার কথা শুনলে কি ভালো হত না?

কেন?—শিউলী বেশ একটু গরম হয়ে প্রশ্ন করল।

শুনেছি লোকটা নাকি ভারী বদ, হাতে বহু কসাই গুণ্ডা আছে।

আমিও সুলতানপুরের খানচৌধুরী বংশের মেয়ে।

করিমের মা আর কিছু বলতে সাহস করল না। শিউলী পড়া ছেড়ে নমিতাকে চিঠি লিখল, পনেরো দিনের মধ্যে সে বালীগঞ্জ যাবে না। নমিতাও যেন কলুটোলা না আসে। চিঠি লিখে করিমের মাকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিল।

দু'দিন পরে ছিল রবিবার। রবিবারে বেলা ন'টায় এলেন তাহের মিঞা। দুপুরে খাওয়ার পর মিঞাসাহেব ঘরে বসে দেখলেন শিউলী তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। দেখে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না।

আনোয়ারা এল পান দিতে। এসে মিঞাসাহেবের ভাব দেখে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—

ঐ খুব্‌ছুরৎ আওরতটা কে?

ও আমার মামুর মেয়ে। ওর দিকে নজর দেবেন না।

কেন ?

ওটা বাঘিনী।

আরে রেখে দে তোদের বাঘিনী! কত দজ্জাল মেয়ে দেখলাম! চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে ঘা'কতক লাগালে কুত্তীর মতো কেঁউ কেঁউ করতে করতে পা চাটে। দু'দিন পরে কোর্টে হাজির করলে জবানবন্দী দিয়ে আসে, 'দারুণ পিরিতের জ্বালায় ঘর থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসে নিকে পুষতে চাচ্ছি।' আর এটা তো মুসলমান ঘরের আওরত। মরদের কাছে সব আওরতই জব্দ।

তাহের মিঞার কথা শুনে আনোয়ারা একেবারে কাঠ হয়ে গেল তার গা দিয়ে ঘাম ছুটল।

আনোয়ারার অবস্থা দেখে মিঞাসাহেব হেসে বললেন,—

ভয় নেই। ইচ্ছে করলে ওরকম খুবছুরৎ হুরি পাকিস্তান থেকেই দশ-পাঁচটা ধরে আনতে পারতাম। এখন আমার ও খেয়াল নেই। এখন আমি হিন্দুস্থানী হয়ে খদ্দর পরে কংগ্রেসে ঢোকার চেষ্টায় আছি।

একশ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁদের চলতি ভাষায় 'নাছোড়বান্দা' বলে। তাঁরা কোনো উদ্দেশ্য সাধনে সহজে হাল ছাড়েন না। 'একবার না পারিলে দেখো শতবার' হচ্ছে তাঁদের নীতি। নীতিটা অবশ্য খুবই ভালো।

জুলেখা এই নাছোড়বান্দা শ্রেণীর একজন। যেদিন তিনি শিউলীকে দেখে তার সঙ্গে ইব্রাহিমের বিয়ে দিয়ে 'রাজকন্যা ও রাজ্য' লাভের রঙিন স্বপ্ন দেখলেন, সেইদিন থেকেই সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন।

কিন্তু জুলেখার কোনো চেষ্টাই কাজে লাগছে না। ইব্রাহিম শিউলীর সম্মুখেই যেতে চায় না। শিউলীকে ধমক চমক দিয়ে বশে আনা একেবারেই অসম্ভব; আদর যত্নেরও সে আমল দেয় না। সোফিয়া ও আবদুল কাদেরের সঙ্গে শিউলীর খুব ভাব, কিন্তু তারা কথাটা বুঝতে চায় না। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন জুলেখার মনে কার্যসিদ্ধির একটা চমৎকার পন্থা ভেসে উঠল।

ইব্রাহিমের ঝোঁক ছিল আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়ার। সেজন্য তার ঘরে টেবিলের ওপরে সবসময়ই দু'একখানা বাংলা উপন্যাস থাকত। জুলেখা গোপনে সেগুলো পড়তেন। তাতে তিনি দেখেছেন, আধুনিককালে ছেলে-মেয়েদের পিরিত সাধনের যতরকম পীঠস্থান আছে, তার মধ্যে প্রাইভেট

মাস্টার বা গানের মাস্টার ও ছাত্রীর পড়াশুনার আড্ডার মতো আশু-ফলপ্রদ সর্ববাধাবর্জিত সিদ্ধপীঠ আর নেই। কালবৈশাখীর জল পেয়ে বনে বাদারে যেমন বুনোওলের ডাঁটা সব বাধা ঠেলে তরতর করে গজায়, এই সিদ্ধপীঠেও একটু নিরালা পেলেই মাস্টার ও ছাত্রীর মনে পিরিত ডাঁটা একেবারে চড়বড় করে গজিয়ে ওঠে। এরজন্ত আনুসাঙ্গিক আর যে দুটো জিনিসের প্রয়োজন —মাষ্টারের একটু সুশ্রী গঠন ও উপযুক্ত বয়স—তা ইব্রাহিমের আছে। জুলেখা স্থির করলেন এই উপায়েই তাঁর কার্যসিদ্ধ হবে।

ইব্রাহিমের আই. এস. সি. পরীক্ষা শেষ হলে একদিন জুলেখা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে নিয়ে গেলেন শিউলীর ঘরে। সেদিন ছিল রবিবার। শিউলীর বার্ষিক পরীক্ষা এসে পড়েছে, সেজন্য বালীগঞ্জে যাওয়া বন্ধ করে দুপুরে ঘরে বসে পড়ছিল। জুলেখা ও ইব্রাহিম এসে কাছেই বসল। বসে জুলেখা বললেন,—

মা রোশনারা, তোর ভাই ইব্রাহিমের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফল বেরিয়ে বি. এস. সি-তে ভর্তি হতে চারমাস দেরী। আমি ওকে বলে-কয়ে এ ক'মাস তোকে পড়ানোর জন্য রাজি করেছি। ও তোকে দুবেলা দু'ঘণ্টা পড়াবে। তাহলে তুই ভালোভাবে পাস করতে পারবি। ওর তো বেশী সময় নেই। বাইরে বহু সভা-সমিতি ক্লাবে ওকে যেতে হয়, না গেলে তারা ছাড়ে না।

শিউলী অঙ্ক নিয়ে আই. এ. পড়ছিল। একটু ভেবে নিয়ে বই থেকে একটা অঙ্ক বের করে বই খাতা পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বলল,—এই অঙ্কটা কষে দিন তো?

মা'এর পেড়াপীড়িতে ইব্রাহিম এতক্ষণ শিউলীর কাছে বসেছিল 'রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া'। এবার তার গায়ে ঘাম ছুটল। খাতায় একবার কিছু করে, তার পরেই কাটে; আবার কষে আবার কাটে।

কয়েকবার কাটাকাটি করতেই শিউলী অঙ্কের বই সরিয়ে নিয়ে একখানা ইংরেজীর বই এগিয়ে দিয়ে বলল,—এই প্যারাটা সংক্ষেপে লিখুন তো?

ইব্রাহিম প্যারাটা পড়ে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল। কয়েক লাইন লিখতেই শিউলী বলল,—

ওটা থাক। রবিঠাকুরের এই কবিতাটার ভাবার্থ লিখুন তো?

এবার ইব্রাহিম অনেক ভেবেচিন্তে কিছু লিখে খাতাখানা শিউলীকে দিল।

শিউলী লেখাটা পড়ে জুলেখাকে বলল,—ফুফু, সামনে কয়েকদিন পরেই

আমার বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। সেজন্য মনোযোগ দিয়ে পড়তে হচ্ছে। আপনারা এখন আসুন।

সেইজন্যই তো ইব্রাহিমকে এনেছি। ও তোকে পড়াবে।

ইব্রাহিম ভাই কিছু জানেন না।

বলিস কি! ও যে এবার আই. এস. সি. পরীক্ষা দিল!

পরীক্ষা দিয়েছেন, ফেল করবেন।

এবার গর্জে উঠলেন জুলেখা,—ও লো পোড়ামুখী, যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! আমার সোনার চাঁদ ইব্রাহিম ফেল করবে, আর ঐ ধুমসী বিদ্বেন আলেম।—বলতে বলতে ইব্রাহিমের হাত ধরে টেনে নিয়ে জুলেখা ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন।

জুলেখা বেরিয়ে গেলে করিমের মা শিউলীকে বলল,—

সত্যিই তুই বড়ো মুখপোড়া হয়ে উঠেছিস। অমন অলক্ষুণে কথা কারও মুখের ওপরে অমন ঠাস্ করে বলতে হয়।

তা না বলে করি কি বল? না বললে উপদ্রবটা বাড়ত বৈ কমত না।

তোকে নিয়ে দেখছি জ্বালাতন হতে হবে।

তা মা-মাসীদের একটু জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে হয় বৈকি।

বেগম সাহেবা যে রকম চটে গেলেন, তাতে এখন তাঁর সামনে যাই কি করে বল তো!

ফুফু আমার কথায় রাগ করলেও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।—বলে শিউলী একটু হেসে পড়ায় মন দিল।

শিউলীর ভাব দেখে করিমের মা রেগে—হুঁ, জমিদার হিদায়েৎ চৌধুরীর নাতনী তো, সব সময় চড়া জমিদারী মেজাজেই থাকেন।—বলতে বলতে নীচে নেমে গেল।

জুলেখা বিয়ে হয়ে এসেছিলেন ধনী শ্বশুরের ঘরে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামী ওমর সাহেব জুয়া মদ আর নানারকম বদখেয়ালে সব শেষ করেছেন। জুলেখার কোনো আপত্তি মিনতি কান্নাকাটি তিনি শোনেন নি। ভাই জাফরুল্লার কাছে সাহায্য চাইবার মতো মুখও তাঁর নেই। এনায়েত খাঁর দলিল হারানোর সুযোগ নিয়ে ওমর সাহেব যেভাবে জাফর সাহেবের কাছে জুলেখার অংশ আদায় করে এনে উড়িয়ে দিয়েছেন, তা দেখে জুলেখা রাতের পর রাত নীরবে কেঁদেছেন।

ভাই জাফর সাহেবের সঙ্গে ওমর সাহেবের এরকম দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও জুলেখা যখন বুঝলেন, দেনার দায়ে কলুটোলার বাড়ীখানাও যেতে বসেছে, তখন ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সব লজ্জা, সব সঙ্কোচ দূরে ফেলে চিঠি লিখে জাফর সাহেবকে সব জানিয়েছিলেন। জাফর সাহেব এসে দেনা শোধ করে ওমর সাহেবের দোকানের মূলধন বাবদ আরও সাত হাজার টাকা দিয়ে বাড়ীখানা নিজের নামে কিনে নিয়েছেন। বাড়ীতে জুলেখা বা ওমর সাহেবের কোনো স্বত্ব নেই।

জাফর সাহেবের দেওয়া সেই সাত হাজার টাকা এবং দোকানের মূলধনও দু'বছরে উড়ে গেছে। তারপর সুন্দরী আনোয়ারাকে প্রথম সেই বুড়োর হাতে তুলে দিয়ে ওমর সাহেব গোপনে দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। সে টাকাও শেষ হয়ে গেছে। দোকানে কি আয়-ব্যয় হয়, তা জুলেখা শ্বশুরের মৃত্যুর পর জানতে পান না। ওমর সাহেবকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, 'মরদের বাচ্চা কোনো আওরতের কাছে জবাবদিহি করে না।'

শ্বশুরের মৃত্যুর পর জুলেখার হাতে যা কিছু ছিল তা সংসারের নিত্য-প্রয়োজনের দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করতে শেষ হয়ে গেল। শেষে এমন অবস্থা হল দু'বেলা ভাতই জোটে না। সংসারে অনটন দেখা দিলে ওমর সাহেব আর বাড়ী আসেন না, দোকানেই থাকেন, হোটেলে খান।

পাঁচ বছর আগে জুলেখার এই রকম এক দুর্দিনে এসেছিলেন জাফর সাহেব। তিনি দিদির দুর্দশা দেখে ব্যবস্থা করেছেন নীচতলার ভাড়ার টাকাটা জুলেখাই আদায় করে নেবে; না পারলে এটনি অমিয়বাবু আদায় করে মাসের দশ তারিখের মধ্যে জুলেখাকে টাকা পাঠিয়ে দেবেন। সেই থেকে জুলেখার সংসার ঐ ভাড়ার টাকা ক'টায় চলছে।

এ অবস্থায় জুলেখার দুঃখের সংসারে হতাশার অন্ধকারে একমাত্র আশার প্রদীপ ইব্রাহিম। মা জুলেখার আশা, তাঁর ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে। সেজন্য সংসারে কোনো চাকর-খানসামা না রেখে নিজে সব কাজ করেন, ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরেন। এই করে টাকা বাঁচিয়ে ছেলের পড়ার খরচ যুগিয়ে যাচ্ছেন।

শিউলী কলকাতা আসার আগে কোনোদিন জুলেখার মনে এ কথা জাগে নি যে, ভাইয়ের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে ইব্রাহিমের বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শিউলীকে দেখে কথাটা তাঁর মনে জেগেছে। সেজন্য ছেলে ও মেয়ের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা ঘটানোর চেষ্টায় তিনি ছিলেন। কিন্তু সেদিন শিউলী যেভাবে

যে ভাষায় ইব্রাহিমের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে মন্তব্য করল, তাতে দারুণ আঘাত পেয়ে দুঃখিনী মায়ের প্রাণ একেবারে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে। এ তো কেবল ইব্রাহিমকে ছোটো করাই নয়, এ যে দুঃখিনী মায়ের শেষ আশার প্রদীপটি নির্মম হস্তে নিভিয়ে দেওয়া!

করিমের মা কুঁজায় ঠাণ্ডা জল আনতে দোতলায় গিয়েছিল। ফিরে এসে শিউলীকে বলল,—

তোর ফুফু বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন।

ফুফু কাঁদছেন!—চমকে উঠল শিউলী।

হাঁ কাঁদছেন। তুই অমন কথা বললি কেন? তুই এদের সংসারের কথা কিছুই জানিস নে। আতর-আলা সাহেব জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দিয়েছেন, এখন আর কিছুই নেই। বেগম সাহেবার এখন একমাত্র আশা ভরসা ঐ ছেলে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম মানুষ হবে এই আশায় বুক বেঁধে বেগম সাহেবা সবরকম দুঃখকষ্ট সয়ে মুখ বুজে সংসার করছেন। আর তুই অমন নিষ্ঠুর কথাটা অনায়াসে তাঁর মুখের ওপরে বলে ফেললি। তুই বড়ো অমানুষ হয়ে উঠেছিস।

শিউলীর আর পড়া হল না। তার অন্তর ভরে উঠল একটা অভূতপূর্ব বেদনায়। সে বেদনার পিছনে ব্যথার স্বরে বাজতে থাকল, আজ তারই কথায় আঘাত পেয়ে তারই দুঃখিনী ফুফু বিছানায় পড়ে কাঁদছেন।

কিন্তু এর প্রতিকারেরও তো কোনো উপায় নেই! ইব্রাহিম যে সত্যই ফেল করবে।

শিউলী অস্থির হয়ে উঠল।

মানসিক উত্তেজনায় শিউলী যখন খুবই অশান্তি ভোগ করছিল, তখন হঠাৎ হাসিমুখে উপস্থিত হল নমিতা।

আজ তোর পড়া হবে না, মা ডেকেছেন, এক্ষুনি যেতে হবে।

তাই যা। বলল করিমের মা। আজ তোর মন খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, পড়াশুনায় মন বসবে না।

শিউলীর মন খারাপ হল কেন, মাসী?

জমিদারের মেয়ে সকলের সঙ্গেই জমিদারী মেজাজ দেখায়। ওর ফুফুও যে জমিদার হিদায়েত চৌধুরীর মেয়ে, এ কথাটাও মনে রাখে না।

শিউলী কোনো কথা না বলে জামাকাপড় বদলে নমিতার সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়লে নমিতা জিজ্ঞাসা করল,—

মাসী তোকে খুব ভালোবাসেন।

হাঁ, শিশুকাল থেকে মাসীই আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন।

মাসী কি তোর গোলাপের খোঁজ জানেন?

এই আবার তুই বাজে বকতে আরম্ভ করলি।

তুই রাগ করিস নে। আমি তোর বন্ধু। আমি যদি তোর মনের খবর না নেব, তবে কে নেবে বল?

এ খবর জানাজানিতে কার কি লাভ হবে তা'তো বুঝতে পারছি নে। আমার দিক থেকে তোকে বলে যেটুকু লাভ তা আমার হয়েছে। আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

আমি গত তিনবছরের গেজেট খুঁজে গোলাপ রায় নাম কয়েকটা পেয়েছি, কিন্তু সে তোর গোলাপ নয়।

আবার বাজে কথা। বলে শিউলী নমিতার মুখ চেপে ধরল।

নমিতা শিউলীর হাত ছাড়িয়ে হেসে বলল,—বাপ্‌রে, তোর হাতে কি জোর! আর একটু চাপ দিলে আমার দাঁতগুলো খসে যেত।

জানিস নে, আমরা ষাঁড়ের ডালনা খাই?

তুই তো মাংসই খাস নে। এখন বল মাসী আমার গোলাপবাবুর খোঁজ জানেন কি না।

তোর গোলাপবাবুর খোঁজ তুই জানবি, অপরের দায় কি।

ও বাবাঃ, তাতেও রাগ! আচ্ছা বেশ, গোলাপ কারও নয়। সে থাকে আকাশের চাঁদে। তাকে দেখে শিউলীগাছে ফুল ফোটে। সে গোলাপ চাঁদ উঠছে না, সেজন্য শিউলী ফুল ফুটছে না। এই আমার দুঃখ। আমি চাই চাঁদ উঠুক আমার শিউলী ফুটুক।

দেখ নমিতা, তুই সাহিত্যচর্চা আরম্ভ কর। কালে তুই ভালো লেখক হবি।

সেই চেষ্টাই তো করছি। কিছু লিখতে হলে উপাদান প্রয়োজন। কাল্পনিক উপাদান অপেক্ষা বাস্তব উপাদান নিয়ে লিখলে লেখা ভালো হয়। ভাগ্যক্রমে আমি প্রথমেই সেটা পেয়েছি।

তুই খুবই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। বাড়ী পৌঁছে আজ আর তোর সঙ্গে কথা বলব না, কাকাবাবুর কাছে বসে আলোচনা শুনব।

মেয়েরা কেন আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছে না ?

মুসলমান সমাজের অধিকাংশই মনে করেন মুসলমান মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা পেলে ইসলামের ক্ষতি হবে।

কি করে ক্ষতি হবে ?

আধুনিক শিক্ষা যুক্তিবাদী। এ শিক্ষায় অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই।

এ শিক্ষায় আপনাদের সমাজের ক্ষতি হয় নি ?

না। হিন্দুধর্মও যুক্তিবাদী, অন্ধবিশ্বাসের স্থান হিন্দুধর্মে নেই।

তবে আপনাদের সমাজে জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা দেখি কেন ?

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এককালে ওগুলো চালু করা হয়েছিল, এখন উঠে যাচ্ছে।

কি প্রয়োজনে এ সব প্রথা চালু করা হয়েছিল ?

মুসলমান ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলমান যোদ্ধারা যে সব অমুসলমানের দেশ জয় করে শাসন করেছেন, সে সব দেশের সমগ্র অধিবাসীদের ইসলাম কবুল করিয়েছেন। ভারতে পাঁচশ'বছর রাজত্ব করেও মুসলমান শাসকগণ সমগ্র হিন্দু অধিবাসীদের ইসলাম কবুল করাতে পারেন নি। তার কারণ, হিন্দু নেতারা জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা অবলম্বন করে জাতির আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো রক্ষা করেছিলেন।

এখন এ সব প্রথা উঠে যাচ্ছে কেন ?

মুসলমান রাজত্ব শেষ হওয়ায় ও সব প্রথার আর কার্যকারিতা নেই।

আজ দেড়শ' বছরেও নিঃশেষে উঠে যায় নি কেন ?

একটা প্রথা বহুদিন চালু থাকলে সেটা মানুষের সংস্কারগত হয়ে পড়ে। সংস্কার দূর করতে সময় লাগে। তারপর বিদেশী ইংরেজ সরকার হিন্দুর ঐ দুটো প্রথা রক্ষা করতে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

কেন সচেষ্ট ছিলেন ?

ঐ দুটি প্রথার জন্য অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও হিন্দু সমাজে স্থান পায় নি। হিন্দুর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের রক্ষাকবচের কাজ করেছে।

এখন কি এগুলো নিঃশেষে দূর হবে ?

হাঁ হবে। আমাদের সম্মুখে এখন এমন একটা পরিবর্তনের যুগ আসছে, যে যুগে সামাজিক আদান-প্রদানে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা লোপ পাবে। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ধর্ম কি করে ব্যক্তিগত ব্যাপার হবে ?

ঘরোয়াভাবে হিন্দুসমাজে এটা চিরকালই চলে আসছে। হিন্দুধর্মে বহু বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন আচার প্রচলিত আছে, তাতে সামাজিক বা পারিবারিক অসুবিধা হয় না।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুটি প্রধান মতবাদ। দুটি মতবাদের আচার ও উপাসনা পদ্ধতিও পৃথক। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, একই পরিবারে কেউ শাক্ত হয়ে জয়কালী বলে পাঁঠা বলি দিচ্ছেন, কেউ গায়ে হরিনামাবলী জড়িয়ে তুলসীর মালা জপ করে হবিষ্যান্ন করছেন। কেউ বা প্রথম জীবনে শাক্ত শেষ জীবনে একেবারে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হন। এই পার্থক্যে তাঁদের কোনো অসুবিধা নেই, কোনো গোলমালও বাধে না।

ওগুলো তো হিন্দুধর্মেরই বিভিন্ন মতবাদ। ভিন্নধর্মীদের বেলায় হিন্দু সমাজ কি করবেন।

হিন্দুর বেদ এমনই একখানা ধর্মগ্রন্থ যাতে ভিন্নধর্ম বলে বিশেষ কিছু নেই। মানুষের 'একজন্মবাদ' ছাড়া আর সব মতবাদের কথা ও সমর্থন বেদে পাওয়া যায়। বেদের জন্মান্তরবাদ এখন পৃথিবীর ঈশ্বর বিশ্বাসী সব দার্শনিক পণ্ডিত সমাজ মেনে নিয়েছেন। তাতে স্বাধীন ভারতে অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন সামাজিক অবস্থা গড়ে উঠবে, যে সমাজে কর্তা রবিবারে যাবেন কালীঘাটে পূজা দিতে, যাওয়ার পথে গিন্নীকে নামিয়ে রেখে যাবেন সেণ্টপলস্ গীর্জায়।

এ কি সম্ভব ?

সম্ভব বলছ কেন! এই করেই হিন্দু অনাদিকাল থেকে টিকে আছে। এ কাল পর্যন্ত হিন্দুসমাজে যে, কত ধর্ম মিশে গেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী যুগে, যে ধর্ম কালোপযোগী সামাজিক ও ধর্মীয় আচারের পরিবর্তন মেনে নেবে না, সে ধর্ম অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

আপনি কি ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত রুচির স্বাধীনতা স্বীকার করেন ?

কেবল যে আমিই স্বীকার করছি তা নয়, সব হিন্দুই স্বীকার করেন। এই জন্যই নানামুনির নানামত প্রচার করা সম্ভব হয়েছে।

এইনানা মত নিয়ে আপনাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয় না ?

যথেষ্ট হয়। পৃথিবীতে প্রচলিত সবগুলি ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের যত পরস্পর বিরোধী তর্ক যুক্তি আছে, আর কোনো ধর্মে এত নেই।

এর ফলে সাধারণ জনসমাজ বিভ্রান্ত হয় না?

তার্কিকরা তো তাঁদের মতবাদ জোর করে অপরের ঘাড়ে চাপান না।

আচ্ছা, হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আচার দেখা যায় কেন?

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই বিভিন্ন আচার প্রয়োজনানুরূপ গড়ে উঠেছে। যাঁরা একদেশের আচার নিয়ম আর একদেশের মানুষের ঘাড়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে বা জোর করে চাপিয়ে দেন, তাঁদের আমরা ধর্মান্ধ গোঁড়া বা বর্বর বলি।

বাবা, আজ আমাদের অনেক কথা শোনা হল। এখন আমরা একটু ছাদে যেতে চাই। বলল নমিতা।

ওঃ, তোর বুঝি এ সব আলোচনা ভালো লাগে না! বলল শিউলী।

খুব ভালো লাগে, এখন ছাদে চল।

আচ্ছা মা, এখন তোমরা ছাদে গিয়ে খোলা বাতাসে একটু বেড়াও। বললেন অমিয়বাবু।

ঘর থেকে বেরিয়ে নমিতা শিউলীকে জিজ্ঞাসা করল,—

বলতো, আজ আলোচনায় সব চাইতে ভালো কথা কোনটা?

তুই আগে বল।

ঐ যে কর্তা যাবেন কালীঘাটে আর গিন্নী যাবেন গীর্জায়, ঐ টে।

কেন? হেসে প্রশ্ন করল শিউলী।

ভবিষ্যতে শিউলীকে নাখোদা মসজিদে নামিয়ে দিয়ে গোলাপবাবু যাবেন শ্যামবাজারে ভাগবত পাঠ শুনতে।

শিউলী হেসে নমিতার পিঠে বসিয়ে দিল এক কিল। নমিতা একটুরাগ দেখিয়ে বলল,—তোর গোলা তোর পিঠে দুম্ করে কিল মেরে চিতপাত করত বলে কি তার শোধ আমার ওপরে তুলবি?

যাঃ তোর সঙ্গে আর ছাদে যাব না। আমি যাই কাকীমার কাছে পিঠে তৈরী শিখব। বলে শিউলী দৌড়ে রান্নাঘরে গেল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শিউলীর সুলতানপুর যাওয়া হল না। জাফর সাহেব পত্রে জানিয়েছেন, নানাকারণে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। হিন্দুদের মালপত্র যা সুলতানপুরের জমিদার বাড়ীতে গচ্ছিত আছে, সেগুলি মালিকের হাতে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বলে দেশে একশ্রেণীর মুসলমান জাফরসাহেবের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমন বলে প্রচার করছে।

এ অবস্থায় সুলতানপুরে থাকা তাঁরপক্ষে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যে সব হিন্দুর মাল এখনও তাঁর কাছে গচ্ছিত আছে সেগুলির বিলি ব্যবস্থা করে তিনি বেগম সাহেবাকে নিয়ে ঢাকা যাবেন।

চিঠি পড়ে শিউলী অত্যন্ত চিন্তিত হল, ভারতে ইসলাম ও মুসলমান সম্প্রদায়কে এরা কোথায় নিয়ে চলেছে?

ছুটির মধ্যে শিউলী প্রায়ই বালীগঞ্জ ও পার্ক স্ট্রীটে বেড়াতে যায়। সৈয়দ আবদুল কাদের ও সোফিয়ার সঙ্গে বালীগঞ্জের ব্যানার্জী পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছুটি থাকলে প্রায়ই দুই পরিবার একত্রিত হয়ে নানা বিষয় আলোচনা করেন। সে সব আলোচনায় শিউলী ও সোফিয়া হয় আগ্রহী শ্রোতা।

দেশের অবস্থা ও হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে কাদের সাহেব ও অমিয়বাবুর মধ্যে যে আলোচনা হয়, তা শুনে শিউলী বুঝল, এ সমস্যার মীমাংসার জন্য সবরকম কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের ঊর্ধে উঠে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা যদি সাম্প্রদায়িক মিলন চেষ্টা করে, তবে অন্য সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীরা সে চেষ্টায় সাড়া দেবে। নইলে, অন্যসম্প্রদায়গুলি আর মিলনের জন্য মুসলমানদের তোয়াজ করবে না। তাদের চেষ্টা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এই মিলনের জন্য মুসলমানদেরই চেষ্টা করতে হবে।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে কলেজ খুলেছে। কয়েক দিন পরে আই. এস. সি.র ফল বেরোল। ইব্রাহিম গেল সিনেট হলে তার রোল নম্বরটা খুঁজতে।

জুলেখা দুপুরে রান্না করে ওমর সাহেবকে খাইয়ে ইব্রাহিমের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেলা বারোটা বাজল, একটা বাজল, দুটো বাজল, অভুক্ত মা ছেলের জন্য খাবার সাজিয়ে বসে আছেন, ছেলের দেখা নেই।

শেষে যখন ইব্রাহিম এল, তখন আষাঢ়ী বেলা তিনটে বেজে গেছে। ইব্রাহিমের মুখ শুকনো, চোখ লাল, মাথার চুল এলোমেলো; এসেই ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

জুলেখা ব্যস্ত হয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে ইব্রাহিম, তুই কাঁদছিস কেন?

ইব্রাহিম মুখ না তুলে উত্তর দিল,—আজ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, আমি ফেল করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জুলেখা, দশমিনিটের মধ্যে মুখে কথা ফুটল না। শেষে একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—ঐ পোড়ামুখীর কথাটাই ফলে গেল!

জুলেখা আর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে পারলেন না, নিজের ঘরে গিয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পড়ে থাকল অভুক্ত দুঃখিনী মা ও ছেলের ক্ষুধার অন্ন।

বেলা চারটে বাজতেই সেদিন শিউলী ফিরল কলেজ থেকে। ঘরে গিয়ে বই রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় করিমের মা এসে বলল,—

আজ পরীক্ষায় ফল বেরিয়েছে। ইব্রাহিম ফেল করেছে। আহাঃ বেগম সাহেবা বড়ো আশায় বুক বেঁধেছিলেন, সে বুকে এতবড়ো বাজ পড়ল। আহাঃ মায়-বেটায় ঘরে পড়ে কাঁদছে, এপর্যন্ত কিছু খায় নি।

শুনে শিউলী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভেবে নিল তারপর টেবিলের দেরাজ খুলে দশ টাকার একখানা নোট বের করে করিমের মা'র হাতে দিয়ে বলল,—

এই টাকা দিয়ে এখুনি দারোয়ানকে বড়োবাজারে পাঠাও। আধঘণ্টার মধ্যে একসের ভালো সন্দেশ, দু'সের দই আর দু'টাকার ভালো আম চাই। দারোয়ানকে গাড়ি করে যেতে বলো। তুমি চারজনের মতো লুচি আর পটোল ভাজা করো। আধঘণ্টার মধ্যে আমি সব জিনিস খাবার টেবিলে প্রস্তুত চাই। আমি স্নান করে আসি।

করিমের মাকে পাঠিয়ে শিউলী গেল স্নান করতে। স্নান করে কাপড় পরে প্রস্তুত হতে হতেই দারোয়ান সব নিয়ে এল। শিউলী সেগুলি রেখে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল করিমের মা পটল ভাজা না করে আলুপটলের ডালনা নামিয়ে লুচি ভাজার যোগাড় করছে। শিউলীকে দেখে করিমের মা বলল,—

সারাদিন না খাওয়ার পর শুকনো গলায় লুচির সঙ্গে পটল ভাজা খেতে ভালো হবে না, তাই ঝোল করলাম।

বেশ করেছ। এখন লুচিটা ভেজে ফেল, আমি টেবিল সাজিয়ে ওঁদের ডেকে আনি।

টেবিল সাজিয়ে রেখে শিউলী প্রথমে গেল ইব্রাহিমের ঘরে। ইব্রাহিম বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখগুঁজে ছিল। শিউলী গিয়ে কাছে বসে ইব্রাহিমের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল,—দাদা, উঠুন। আমার সঙ্গে ওপরে চলুন।

ইব্রাহিম পাশ ফিরে শিউলীর মুখের দিকে নির্বোধের মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারল না।

উঠুন, আমার ঘরে চলুন।—বলে শিউলী ইব্রাহিমের হাত ধরে টেনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আসুন আমার সঙ্গে।

ইব্রাহিম মোহাচ্ছন্নের মতো উঠে শিউলীর পিছনে চলল।

ঘরে গিয়ে খাবার টেবিলের পাশে একখানা চেয়ার দেখিয়ে শিউলী ইব্রাহিমকে বলল,—দাদা, আপনি এখানে বসুন। আমি ফুফুকে ডেকে এনে একসঙ্গে খাব।

ইব্রাহিম কোনো কথা না বলে চেয়ারে বসল। শিউলী গেল জুলেখাকে ডাকতে।

শিউলী ঘরে আসতেই জুলেখা চমকে উঠে বসলেন। তাঁর বিস্মিত ভাবের দিকে লক্ষ্য না করে শিউলী সহজ কণ্ঠে বলল,—ফুফু, দাদাকে আমার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি, আপনি চলুন।

জুলেখা যেন নিজের চোখ ও কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না। অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শিউলীর চোখের দিকে।

এবার শিউলী জুলেখার মনোভাব লক্ষ্য না করে আর পারল না। এগিয়ে গিয়ে জুলেখার হাত ধরে বলল,—

ফুফু, আপনি সুলতানপুরের জমিদার হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরীর মেয়ে। আমি তাঁর ছেলের ঘরের নাতনী। আসুন আমার সঙ্গে।

জুলেখা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, শিউলী তাঁর হাত ধরে নিয়ে চলল। তেতলার খাবার ঘরে এসে জুলেখাকে খাবার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়ে শিউলী গিয়ে বসল টেবিলের অপর পাশে মুখোমুখী। তারপর জুলেখার সম্মুখের ডিসের ঢাকনা খুলে বলল,

ফুফু, আজ এখন পর্যন্ত আপনার পেটে কিছু পড়ে নি। এই দই-সন্দেশটুকু খেতে আরম্ভ করুন; মাসী লুচি-তরকারি আনছে। দাদা, আপনিও খেতে আরম্ভ করুন।

শিউলীর কথা মতো ইব্রাহিম খেতে আরম্ভ করল, কিন্তু জুলেখা প্রাণহীন পুতুলের মত তাকিয়ে রইলেন শিউলীর মুখের দিকে।

শিউলী জুলেখার অবস্থা বুঝে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বলল,—ফুফু, আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

এ খাবার যে আজ একবেলার জন্য যোগাড় করলাম, তা নয়। আজ থেকে আমি আপনার সব ভার নিলাম। দাদা যতদূর পড়তে চান আমি পড়াব। দাদা ও আপনার খাওয়া-পরার খরচ আমি চালাব। আজ হতে দাদা ও আপনি

টাকা পয়সা, জিনিসপত্র, কোনো কিছুর জন্য চিন্তা করবেন না, সব আমি দেব। দাদার মাথা আছে, তবে একটু বেশী রকম আড্ডাবাজ হয়ে পড়েছেন। আমি এ দোষ ছাড়িয়ে দেব। তাহলেই দাদা আসছে বছর ভালোভাবে পাস করবেন। আপনি এর পর থেকে আর কোনো কিছুর জন্য দুঃখ পেলে সেটাকে আমার গাফিলতি বলে আমি মনে করব। আপনি হিদায়েত চৌধুরীর মেয়ে, আমি তাঁর নাতনী।

শেষ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জুলেখা পাগলিনীর মতো ছুটে এসে শিউলীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হৃদয়ের আবেগ শান্ত হলে তাঁকে ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে শিউলী বলল,—

আমি আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না। মাসী ও বালীগঞ্জের কাকীমা আমাকে কিছু কিছু বলেছেন।

হাঁ মা, আমি বড়ই হতভাগিনী। জন্মেছিলাম বড়োঘরে, পড়েছিলামও বড়ো ঘরে। কিন্তু আজ ঐ এক ছেলে ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। জাফর ভাই যদি এ বাড়ীখানা রক্ষা না করত আর নীচতলার ভাড়ার টাকা ক'টা যদি আমার হাতে না দিত, তবে কোনকালে মরে যেতাম। বলে জুলেখা আবার চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ফুফু, আমি আপনার ভাইঝি। আপনার চোখের জল আমার অসহ্য। আপনি স্থির হয়ে খেতে আরম্ভ করুন।

খাচ্ছি মা, আমার দুঃখ এমন করে কেউ কোনোদিন বুঝতে চায় নি। মা, তোকে আমি কত কটুকথা বলেছি। তুই আমাকে ক্ষমা কর। আমি বড়ো দুঃখিনী।

ফুফু, আপনি চাচ্ছেন আমার কাছে ক্ষমা! আমি এখানে থেকেও যে দাদু, হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরীর মেয়ে জুলেখা বেগমের দুঃখ কষ্ট দূর করতে চেষ্টা না করে চোখ বুঁজে আছি, এ গ্লানি আমার অন্তর থেকে কোনোকালেই যাবে না। আপনি ক্ষমা করলেও না। এখন আপনি আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখে কিছু খান, সারাদিনই না খেয়ে আছেন।

জুলেখা প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে খেতে নিতেই গলায় বেধে গেল। শিউলী ব্যস্ত হয়ে জলের গ্লাস জুলেখার মুখে তুলে ধরে বলল,—ও শুকনো সন্দেশ আর খেতে হবে না। সারাদিন না খেয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এই দইটুকু খেতে থাকুন। মাসী লুচি আর আলুপটলের ঝোল এনে দিচ্ছে। শিউলীর কথামত খেতে নিয়ে জুলেখা বললেন,—মা, তুইও খেতে আরম্ভ কর।

সেই কোন সকালে দুটো খেয়ে গিয়েছিস। এসেই তো আবার এই ঝামেলা নিয়ে পড়েছিস।

হাঁ, আপনাকে নিয়ে ঝামেলা মিটে গেছে। এখন দাদার ঝামেলাটা মিটাতে হবে।—বলে শিউলী ইব্রাহিমের দিকে তাকাতেই সে মাথা তুলে শিউলীর চোখের দিকে তাকিয়েই মাথা নীচু করল।

শিউলী একটু হেসে বলল,—দাদা, এরপর থেকে আপনি আমার কথামতো চলবেন তো?

চলব। মাথা না তুলেই ইব্রাহিম উত্তর দিল।

ঐ সব আড্ডায় আর যাবেন না তো?

না। যাব না।

আমি দেখেছি আপনি ইংরাজী ও বাংলায় খুব কাঁচা। কোনো প্রাইভেট মাস্টার এই ক'মাসের মধ্যে ইংরেজী ও বাংলায় আপনাকে তৈরী করে দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমি যদি আপনাকে ওদুটো সাব্‌জেক্ট পড়াই তবে আপনি তাতে রাজি আছেন।

হাঁ আছি।

আপনার সায়েন্স কোর্স পড়ানোর জন্য একজন ভালো প্রফেসর ঠিক করুন, টাকা যা লাগবে আমি দেব।

করব।

এমন সময় সোফিয়া এসে ঘরে প্রবেশ করল।

সোফিয়াকে দেখে জুলেখা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—সোফি, আজ থেকে শিউলী আমার সমস্ত ভার নিয়েছে। ইব্রাহিমকেও পড়াবে। এতদিন পরে খোদা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

মায়ের কথায় কোনো মন্তব্য না করে সোফিয়া গিয়ে বসল শিউলীর পাশে। শিউলী করিমের মাকে আর এক প্লেট খাবার দিতে বলল।

সোফিয়া শিউলীকে বলল,—শুনলাম ইব্রাহিম ফেল করেছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ওকে অ্যালাও করতে চান নি। শেষে ওর দলের গুণ্ডাদের ভয়ে অ্যালাও করেছিলেন। এখন ফেল করেছে, বেশ হয়েছে। আমি একটুও দুঃখিত হই নি। অমন আড্ডাবাজ ছেলে ফেল করবে না তো কি পাস করবে! কথার শেষের দিকে রাগে সোফিয়ার গলা চড়ে গেল।

দাদা আমাকে কথা দিয়েছেন আর আড্ডায় মিশবেন না।

শিউলীর কথায় সোফিয়া ইব্রাহিমের দিকে ফিরে ধমক্ দিয়ে বলল,—

এই উল্লুক, এরপর থেকে শিউলীর কথামত চলবি তো?

হুঁ:।

হুঁ, কি রে? বলেই সোফিয়া অত্যন্ত রেগে উঠে গিয়ে ইব্রাহিমের মাথার বাবরি চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,

হুঁ, কি? বল, এখন থেকে শিউলীর কথামত চলবি কি না?

কথামত চলব।

বদ্ আড্ডায় মিশবি নে তো?

না।

মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবি তো?

করব।

কাল সকালে মাথার এই গুণ্ডামার্কা চুল কেটে ভদ্রলোকের মতো চুল রাখবি তো?

হাঁ, রাখব।

বেশ, কথা যেন ঠিক থাকে। বলে ভাইয়ের চুল ছেড়ে দিয়ে সোফিয়া এসে চেয়ারে বসে শিউলীকে বলল,—

আমি যতদিন এখানে ছিলাম ততদিন ওকে শায়েস্তা করে রেখেছিলাম। কোনোরকম বাঁদরামো করতে দিতাম না। আমি যাওয়ার পর এই ন'বছরে ও আস্ত একটা বাঁদর হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ দিদি, আপনি যে ছেলে ঠেঙিয়ে মানুষ করতে জানেন, তা এইটুকুতেই বুঝতে পেরেছি। হেসে বলল শিউলী।

কি করব বল। এই পাড়ায় বহু বদ্ ছেলের আড্ডা। ওর চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমার জন্যই বদ্ হতে পারে নি। আমি পার্ক স্ট্রীটের বাসায় গেলে ওকে দেখবার আর কেউ ছিল না। সেই সুযোগে ওর শিং গজিয়েছে। বলে সোফিয়া আবার ইব্রাহিমের দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলল,

এই বাঁদর, আমার হাতের বেতের কথা মনে আছে তো? এরপর যদি শুনি, কোনোরকম বেতরিবত কাজ করেছিস, তবে আবার ধরে চাবুক লাগাব।

দাদা দেখছি আপনাকে ভয়ানক ভয় করেন!

সেইজন্যই তো পারতপক্ষে আমার কাছে যায় না।

আপনি নিশ্চিন্ত হন, এখন থেকে দাদা ভালো হয়ে যাবেন।

ভালো হলেই ভালো। ও ভালো না হলে মা'র দুঃখ ঘুচবে না। এখন বল তো, এদের ভার নিয়ে তুই কি কি করতে চাস?

দাদাকে পড়ানোর জন্য যা কিছু করার তা আমি করব। এখন ফুফুর জন্য কি করতে হবে তাই পরামর্শ দিন।

তুই কি করবি মনে করেছিস তাই আগে বল।

না, আমি এখনও কিছু মনেটনে করি নি।

কেন করিস নি?

দাদাকে আপনি যে রকম ধমকালেন, ও দেখে আমার মনের সব কিছু গোলামাল হয়ে গেছে।

তাতে তোর মন গোলমাল হবে কেন?

কি জানি যদি আমার কোনো বেতরিবতপনা হয়ে পড়ে, তাহলে দিদি এসে চুলের ঝুঁটি ধরে বেত লাগাবেন। বলে শিউলী হাসল।

তা বেতরিবতপনা করলে নিশ্চয়ই লাগাব। এখন শোন, মা'র হাতে নগদ টাকা কখনো দিস নে।

কেন?

মা'র হাতে টাকা দেওয়া মানেই বাবার হাতে দেওয়া। সেই টাকায় সংসারের কোনো অভাব মিটবে না।

তবে কি করব?

মা'র যা দরকার হবে, তোকে বললে তুই কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করবি। একসঙ্গে বেশী জিনিস কিনে দিস নে, সাতদিনের মতো দিবি।

ফুফুর নিজপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কি হবে?

কাপড়, জামা, সব তোর ঘরে থাকবে। মা তোর বাথরুমে গোসল করে এখানেই পোশাক বদলাবেন।

দাদার জামা কাপড় কোথায় থাকবে?

ও শিংওয়ালা গুণ্ডার জিনিসে হাত দেবার সাহস কারও নেই। মা'র সব কিছু তোর হেপাজতে রাখিস। বলে সোফিয়া জুলেখার দিকে ফিরে বলল, —কেমন মা, আমার প্রস্তাবে রাজি আছ তো?

আজ থেকে তুই আর শিউলী আমার মা। আমি তোদের মেয়ে। তোরা যা বলবি তাই করব।

পূজার ছুটিতেও শিউলীর সুলতানপুর যাওয়া হল না। জাকর সাহেব বেগম সাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে এসে শিউলীকে দেখে গেলেন।

সম্মুখে পরীক্ষা। শিউলী ও ইব্রাহিম মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। নমিতাও পড়ায় লেগে গেছে। সেজন্য ছুটির মধ্যে শিউলীর সঙ্গে নমিতার একবারের বেশী আর দেখা হল না।

ইব্রাহিমের স্বভাব-চরিত্র চাল-চলন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শিউলীর নির্দেশ ছাড়া সে কোথাও যায় না, কথাও খুব কম বলে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপ করে না। শিউলী যেখানে যায় ইব্রাহিম সঙ্গে থাকে।

ক'মাস পরে পরীক্ষা হয়ে গেলে শিউলী কিছুদিনের জন্য করিমের মাকে সঙ্গে নিয়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে গেল। সেখানে থাকা কালে একদিন অমিয়বাবু জাফর সাহেবের একখানা পত্র পেয়ে শিউলীকে দেখালেন। পত্রে জাফরসাহেব দেশের যে অবস্থা লিখেছেন তা পড়ে শিউলী বিস্মিত হয়ে গেল।

সুলতানপুরের শিববাড়ী নিয়ে হাঙ্গামা হয়ে গেছে। হাঙ্গামা ঠেকাতে গিয়ে জাফর সাহেব ও ভেওয়া ফকির অপমানিত হয়েছেন। হাঙ্গামাকারীদের আপত্তি, দরগার কাছে শিবমন্দিরে পূজা-অর্চনায় বাজনা বাজানো চলবে না। হাঙ্গামাকারীরা সব দূরের লোক। স্থানীয় মুসলমান হাঙ্গামাকারীদের সঙ্গে যোগ না দিলেও তারা হাঙ্গামা ঠেকাতে জাফর সাহেব ও ভেওয়া ফকিরকে সাহায্য করে নি। মন্দিরে এখন পুলিশ পাহারা আছে। অপমানের ভয়ে জাফর সাহেব ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারছেন না।

সেদিন বিকালে সৈয়দ সাহেব ও সোফিয়া বেড়াতে এসে জাফর সাহেবের পত্রখানা পড়লেন। শিউলী সৈয়দ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল,—

আপনি তো আমাদের কোরাণ ভালো করে পড়েছেন। বলুন তো বাবা কি সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন?

কোনো ধর্মশাস্ত্রের লৌকিক ব্যবস্থা চিরন্তন হতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী প্রয়োজনায় সংস্কার করতে হয়। সেদিক থেকে মামু কোনো অন্যায় কাজ করেন নি।

তবে ওদেশে যারা এককালে বাবাকে ধার্মিক বলে শ্রদ্ধা করত তারা এখন তাঁর বিরুদ্ধে গেল কেন?

একশ্রেণীর বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষ বুঝেছে, ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে সেই দু'শ' বছর আগেকার ধর্মান্ধ যুগ ফিরিয়ে এনেছে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর কাকাবাবু দিলেই ভালো হয়। আমরা তাঁর ছাত্র।

অমিয়বাবু হেসে বললেন,—আমরা সকলেই ছাত্র। শিক্ষক একমাত্র

জগদীশ্বর। সেই জগদীশ্বরের বাণীই আমরা পাই সব ধর্মশাস্ত্রে। সে বাণীর সারমর্ম মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী ও সংচিন্তার স্বাধীনতা। যদি কেউ বলেন এই তিনটি মূল নীতি কেবল স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য, ভিন্ন জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য নয়, তবে আমার মনে হয় তিনি বড়ো রকমের অপরাধ করেন।

এ রকম কথা কি কেউ বলেন? প্রশ্ন করল শিউলী।

না বললে পরধর্ম বিদ্বেষ জন্মায় কি করে? জনসাধারনের মধ্যে খুব অল্প মানুষই ধর্মশাস্ত্র পড়েন। যারা পড়েন তাঁদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই শাস্ত্রের তাৎপয বোঝেন। বেশীরভাগ মানুষই ধর্মপ্রচারকদের বক্তৃতা ও গল্প-কাহিনার মাধ্যমে ধর্ম বোঝে।

তা যদি হয় তবে এ রকম অপপ্রচারের হেতু কি? প্রশ্ন করলেন অপর্ণা।

এ রকম অপপ্রচারের তিনটি হেতু হতে পারে। প্রথম হেতু—আমার ধর্মই ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম, আর সব অধর্ম—এই রকম অন্ধ কুসংস্কার। দ্বিতায় হেতু—অন্য কোনো ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় নিজধর্ম ও সম্প্রদায়ের হীনতা বোধ। তৃতায় হেতু—রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক।

আপনার প্রথম হেতুটা বুঝলাম। দ্বিতীয়টা বুঝিয়ে বলুন। বললেন সৈয়দ সাহেব।

ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রচার হলে ভারতের হিন্দুসমাজ ইসলামের যা কিছু ভালো এবং অভিনব তা আত্মসাৎ করে নিজেকে আরও উন্নত করেছে। কিন্তু এদেশের মুসলমান সমাজ হিন্দুধর্মের কোনো ঐশ্বর্যই আপন করে নেয় নি। তারজন্য অনেকের অবচেতন মনে একটা হীনতা বোধ আছে। এই হানতাবোধই ভয় ও বিদ্বেষের হেতু।

মুসলমান কেন হিন্দুধর্মের ঐশ্বর্য গ্রহণ করল না? প্রশ্ন করল শিউলী।

হিন্দুধর্মের সবচাইতে বড়ো ঐশ্বয তার যুক্তিবাদী দর্শনশাস্ত্র। এই যুক্তিবাদী দর্শনশাস্ত্রগুলিকে আর সব ধর্মের গোঁড়ারা অত্যন্ত ভয় করেন। সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশেকোকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করার মতো সাহস আওরংজেব এই সুযোগেই করেছিলেন। দারা হিন্দু-দর্শনের আলোচনা করতেন, সেজন্য গোঁড়া মুসলমান সমাজের অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

রাজনৈতিক হেতুটা বলুন। অনুরোধ করলেন সৈয়দ সাহেব।

সেটা তো চোখের ওপরেই দেখতে পাচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতারা 'ইসলাম বিপন্ন' প্রচার করে ভারত ভাগ করে নিলেন।

জনসাধারণ কেন তাঁদের সমর্থন করল? প্রশ্ন করলেন অপর্ণা।

জনসাধারণ—বিশেষ করে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ কূট-রাজনীতি ও বৃহত্তর অর্থনীতি বোঝে না। ধর্মের ভেজাল দিয়ে ওদুটো তাদের সম্মুখে ধরলে তারা বুঝুক চাই না বুঝুক, সমর্থন করে। অনেক সময় অত্যাচারী রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র এই ধর্মহাতিয়ারের জোরেই টিকে থেকেছে ও এখনও থাকছে।

এইজন্যই বুঝি রাশিয়ায় ধর্ম লোপ পেয়েছে! বলল শিউলী।

হাঁ, ঠিক ধরেছ। রাশিয়ায় ধর্ম ছিল রাজা, জমিদার ও ধনীদের আত্ম-রক্ষার প্রধান হাতিয়ার। সেজন্য ওটা লোপ পেয়েছে।

আমাদের দেশে ধর্মের এই অপব্যবহার বন্ধ করা যাবে কি করে সেটা বলুন। বললেন সৈয়দ সাহেব।

পৃথিবীতে এখন যে শিক্ষার ধারা চলছে, এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী শিক্ষা। সমাজে অধিকসংখ্যক তরুণ-তরুণীরা যদি এই শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তবে ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজী অচল হয়ে যাবে।

এবার সোফিয়া ও নমিতাকে লক্ষ্য করে সৈয়দ সাহেব বললেন, তোমরা দুজন তো একটা কথাও বলছ না!

সোফিয়া হেসে বলল,—যে আসরে কাকীমা, শিউলী আর তুমি প্রশ্ন কর্তা কাকাবাবু উত্তরদাতা, সে আসরে কথা বলে নিজেকে নির্বোধ প্রমাণ করার মতো বেকুব আমি নই। তবে কাকাবাবুকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

কর মা কর, নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। আমাদের সমাজে সব চাইতে বড়ো ভুল হয়েছিল, তোমাদের ঘরের ভিতরে সরিয়ে রেখে। এর ফলে সমাজের অর্ধাঙ্গ পঙ্গু হয়ে আছে। অর্ধাঙ্গ পঙ্গু মানুষ যেমন পথ চলতে ধীরে ধীরে খুঁড়িয়ে চলে, কোনো ধাক্কা সামলাতে পারে না, তেমনি যে সমাজে নারীজাতি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও যুগোপযোগী শিক্ষায় বঞ্চিতা, সে সমাজ যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে ভয়ে চিৎকার করে। আমার মতে সবরকম আলোচনায় তোমাদের যোগ দেওয়া কর্তব্য।

আমার প্রশ্ন,—হিন্দুদের এই মূর্তিপূজার রহস্যটা কি?

বেশ ভালো প্রশ্ন করেছ। এমনি করে আমরা সকলে যদি খোলামনে একত্রে বসে আলোচনা করি তবে, অনেক সন্দেহ অনেক সমস্যার সমাধান করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হতে পারি।

সোফিয়ার প্রশ্নের সঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন জুড়ে দিচ্ছি, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। বললেন সৈয়দ সাহেব।

সব শাস্ত্রই বলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাই যদি হয়, তবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে কোনো কিছু হতেই বাধা থাকতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করলে সব কিছুই হতে পারেন।

তিনি কি একটা পুতুল হতে পারেন? প্রশ্ন করল শিউলী।

যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর পক্ষে একটা পুতুল হতেই বা বাধা কোথায়?

তবে মানুষে মূর্তি করে কেন? ঈশ্বর নিজেই কাঠ-পাথরের মূর্তি হয়ে আসেন না কেন? প্রশ্ন করল সোফিয়া।

আমাদের বেদের মতে এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো কিছু নেই। কাঠ, পাথর, মানুষ, গরু, সবই সেই ঈশ্বরের অবয়ব। তাঁর এই সর্বব্যাপী স্বরূপ সহজে কেউ বুঝতে পারে না। মানব মন চায় তাঁকে দেখতে। সেজন্য যে মন ঈশ্বরকে পাপীর ভয়ঙ্কর দণ্ডদাতা রূপে বুঝেছে, সেই মন তৈরী করেছে ভীষণ মূর্তি। সৌন্দর্য-রস পিপাসু মন গড়েছে সুন্দর মূর্তি। পরমেশ্বর কৃপাময়, তিনি সাধকের মনোভাবানুযায়ী তৈরী মূর্তিতে প্রকট হয়ে তাকে কৃপা করেন।

সবই যখন সেই এক ঈশ্বর, তখন আমিও ঈশ্বর। তাহলে আমি কেন মূর্তিপূজা বা উপাসনা করব? প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

এখন আমাদের ঐ রকম প্রত্যক্ষজ্ঞান নেই। সাধন করে ঐরকম ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার পর আর কিছু করার থাকে না।

সাধন করে সবই ঈশ্বর এরকম জ্ঞান হয়? প্রশ্ন করল সোফিয়া।

হ্যাঁ হয়। আমাদের শাস্ত্র প্রত্যক্ষবাদী। সাধনের দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করা যাবে না, তাকে আকাশ-কুসুমের মত অস্বীকার করতে বেদাদি শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দুসমাজে কি অনাচার ও ধর্মের অপব্যবহার নেই? প্রশ্ন করল শিউলী।

প্রচুর আছে, বরং মুসলমান সমাজের চাইতে বেশী আছে। নইলে আজ ভারতের এ দুর্দশা হবে কেন?

এ অনাচার অপব্যবহার দূর করার জন্য আপনারা কি করছেন? প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

লক্ষ্য করে দেখুন, গত একশ'বছরের মধ্যে ভারতে হিন্দুসমাজে যত ধার্মিক মহাপুরুষ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জননেতা জন্মিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচারের তীব্র সমালোচনা করে জনমত গঠন করে চলেছেন। ফলে বহু অনাচার ও কুসংস্কার লোপ পেয়েছে। জোর করে সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচার দূর করা অপেক্ষা জনমত গঠন করে ওটা করা ভালো।

কায়েদে আজম জিন্নাসাহেব বহুবার বলেছিলেন, 'We separate to unite আমরা পাকিস্তান চাই হিন্দুদের সঙ্গে মিলনের জন্য।' কিন্তু দেশ ভাগ হওয়ার পর দেখা গেল মিলন তো দূরের কথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভয় আরও বেড়ে গেছে।

ব্যাপার দেখে চিন্তিত জাফরুল্লা চৌধুরী ঢাকা গিয়ে কিছু করাই স্থির করলেন। শিউলীর পরীক্ষার ফল বেরোনোর সময় হয়েছে, সেজন্য প্রথম গেলেন কলকাতা। সঙ্গে গেলেন বেগমসাহেবা।

জাফর সাহেব কলকাতা আসার কয়েকদিন পরেই আই.এ. ও আই.এস.সি-র ফল বেরোল। শিউলী ও নমিতা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে, ইব্রাহিম সেকেণ্ড ডিভিশনে।

শিউলী ও ইব্রাহিমকে বি. এ. ও বি. এস. সি-তে ভর্তি করে জাফর সাহেব ফিরে গেলেন সুলতানপুর। সুলতানপুর এসে জমিদারীর সব কাজ সদর নায়েব কালীবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে আশ্বিনমাসে বেগমসাহেবাকে নিয়ে গেলেন ঢাকা। সঙ্গে গেল খানসামা করিম।

ঢাকা গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই জাফরসাহেব বুঝলেন, তাঁর পরামর্শ শোনার মতো মানুষ আর বড়োবেশী নেই। যে দু'চারজন আছেন, তাঁরা অকর্মন্য বৃদ্ধ। তাঁরা বিছানায় শুয়ে গড়গড়ার নল মুখে পুরে চোখ বুজে ভাবেন, এ হল কি!

পাকিস্তান পাওয়ার পর ওপরতলার নেতারা ক্ষমতা হস্তগত করে সে ক্ষমতা রক্ষার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। অন্যকথায় কান দেওয়ার মতো অবকাশ তাঁদের নেই। যাঁদের হাতে টাকা আছে তাঁরা ঘুরছেন কি করে হিন্দুর মূল্যবান সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে হস্তগত করা যায়, সেই ফিকিরে। সাধারণ মানুষ ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম হওয়ার আনন্দেই বিভোর, ভবিষ্যত চিন্তার বালাই তাদের নেই।

জাফরুল্লা চৌধুরীর ঢাকা বাসের পাঁচমাস গত হলে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে বাধল হিন্দু খেদানো দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার মধ্যে একটি বিপন্ন হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন জাফর সাহেব। ফলে তাঁকে চোখের ওপর দেখতে হল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। সে হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে বেগমসাহেবা হার্টফেল করে মারা গেলেন, জাফর সাহেব হয়েছিলেন মূর্ছিত।

করিমের মুখে সংবাদ পেয়ে জাফর সাহেবের শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়স্বজন তাঁকে নিয়ে এলেন। সেই ঘটনা হতে দেখা দিল তাঁর দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগ।

দু'মাস চিকিৎসা করে দেখা গেল, রোগের কোনো উপশম হল না। ডাক্তারেরা যে সব ওষুধের কথা বললেন, তাও পাকিস্তানে তখন পাওয়া যায় না। তখন ভেবে চিন্তে জাফর সাহেব সুলতানপুর চললেন।

সাতমাস পূর্বে জাফর সাহেব যখন ঢাকা যান, তখন তিনি ছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের শক্তিমান উৎসাহী প্রৌঢ়। সাতমাস পরে যখন সুলতানপুর ফিরে এলেন তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হৃতোদ্যম বৃদ্ধ।

জাফর সাহেব এবার বেশ ভালো করে বুঝেছেন তাঁর দেওয়ানবন্ধু গৌরীশঙ্কর রায় কতবড়ো দূরদর্শী পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর পরামর্শে জাফর সাহেব দশবছর আগে থেকে যে জাল গুঁটোতে আরম্ভ করেছিলেন, ঢাকা থেকে ফিরে এসে সে জালের শেষ টান আরম্ভ করলেন।

প্রথমেই জাফর সাহেব ডেকে আনলেন শিববাড়ীর সেবাইত ভট্চাজ্জ মশাইকে। তিনি এলে জমিদার তাঁকে বুঝিয়ে বললেন,—

'গত শিবরাত্রি উৎসবের দিন শিববাড়ীর ওপরে হামলা হওয়াতেই আপনি বুঝেছেন আপনাদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আর নেই। বাংলাদেশ থেকে জমিদারীপ্রথাও লোপ হতে চলেছে। সেই লোপ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকব, এমন ইচ্ছা আমার নেই।'

'আমি সুলতানপুর ত্যাগ করে গেলে এতবড়ো জমিদার বাড়ী মেরামতের খরচ যুগিযে বাস করার মতো লোক পাওয়া যাবে না। হয় এ বাড়ী ভেঙ্গে ইঁট-কাঠ বিক্রী হবে, নয় তো মেরামতের অভাবে ধ্বসে যাবে। যাই হোক না কেন এ জায়গাটা যে কালে গভীর জঙ্গল হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে জঙ্গলে আপনার ছেলেরা বাস করতে পারবে না। তারপর ধর্মোন্মাদদের হামলার ভয়ও আছে।'

'এ ছাড়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যে হারে পাকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছে তাতে এরপর এ দেশে আপনার ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া কঠিন হবে। আপনাদের ধর্মকর্মে গয়াগঙ্গাও আর ইচ্ছামত পাওয়া যাবে না।'

'আমার মতে এ অবস্থায় আপনার এদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে কোনো পল্লী অঞ্চলে বাড়ী করে ঠাকুরদেবতার সেবা করাই ভালো হবে। এর জন্য আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে আমি দেব।'

এরপর ভট্চাজ মশাই একমাসের মধ্যে সবগুছিয়ে ঠাকুরদেবতা নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

জমিদার বাড়ীর অস্থাবর মাল শস্তায় বিক্রী হচ্ছে। প্রতিদিন বহু লোক

আসে মাল দেখতে ও কিনতে। সদর নায়েব মাল দেখিয়ে দরদস্তুর করে বিক্রী করেন।

একদিন জাফর সাহেব খাসকামরায় বসে শুনলেন, সদর নায়েব কালীবাবুর সঙ্গে এক খদ্দেরের বেচাকেনার আলাপ।

এ খাটের দাম কত?

তুমিই বল।

পনেরো টাকা।

ঝাড়ের বাঁশ কেটে খাটালি করে নাও গিয়ে। আরও শস্তায় হবে।

হাঁ আপনি বেচনদার, আমরা খদ্দের। আপনি আমাদের অপমান করবার কে? আমরা কি খাট দেখি নাই।

যে খাট দেখেছে সে এ রকম আহাম্মোকের মতো দাম করে না।

খাট আমরা ঢের দেখেছি। আমাদের খান্‌কা ঘরেও খাট আছে।

এ খাটে যে আয়নাখানা আছে ওর দাম কত জানো?

কত দাম?

এখনকার বাজারে এক'শ টাকারও বেশী। খাটে যে সাদা নক্‌সা দেখছ ঐ সাদা নক্‌সাগুলো কি দিয়ে করা হয়েছে জানো?

কিসের নক্‌সা?

হাতির দাঁতের গল্প শুনেছ? সেই হাতির দাঁত বসিয়ে নক্‌সা করা।

তবে বেচছেন কেন?

হুজুর কলকাতার বাড়ীতে এর চাইতে ভালো ভালো জিনিস কিনেছেন, পুরনো আসবাব পছন্দ করেন না।

তবে এত দামের জিনিস এখানে কিনবে কে?

ছোটোলোক ধনীরা পুরনো জিনিস একটু শস্তায় কিনে বড়োলোকী দেখায়, তারাই কিনবে।

খদ্দের আর কিছু না বলে চলে গেল। জাফর সাহেব করিমকে পাঠিয়ে নায়েব মশাইকে ডেকে এনে বললেন,—

দেখুন নায়েব মশাই, আজ আর আমরা জমিদার নই, আমরা পুরনো মালের নিলামদার। এ অবস্থায় কি আর জমিদারী মেজাজ চলে।

হুজুর, যে খাটে জমিদার হিদায়েতুল্লা খান চৌধুরী শুতেন, সে খাট আমি কোনো আহাম্মোকের কাছে বেচতে পারব না, উপযুক্ত দাম পেলেও না। আপনি হুকুম করুন, আমি যে কোনো উপায়ে খাটখানা কলকাতা পাঠিয়ে

দেব। যদি পাঠাতে না পারি তবে চেলা করে দরগায় পাঠাব, সিরণি পাক হবে।

নায়েব মশাই'র কথা শুনে জাফর সাহেব আর কিছু বলতে পারলেন না, দু ফোঁটা জল চোখের কোনে টল টল করে উঠল।

শ্রাবণ মাস, সেদিন আকাশে ছিল ভাঙ্গা মেঘ। সে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যদেব দেখা দিয়ে শেষ বিদায়-মালার মতো এক-এক ঝলক সোনালী রোদ ফেলে দিচ্ছিলেন সুলতানপুরের পুরনো বনেদী জমিদার বাড়ীর ওপরে। দমকা পুবন হাওয়া যেন ভৈরবের ঢেউ-এর মুখে সংবাদ পেয়ে শেষ দেখা করার জন্য প্রবেশ করছে বাড়ীর খোলা দরজায়। সুলতানপুরের প্রাচীন জমিদার বংশের শেষ জমিদার মহম্মদ জাফরুল্লা খান চৌধুরী সেদিন সুলতানপুর হতে চিরবিদায় গ্রহণ করবেন।

দূর দুরান্ত থেকে এসেছেন অনেকগুলি বৃদ্ধ মাতব্বর প্রজা, আর পুরনো কর্মচারী। সেই সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন হিন্দু সাধু ও মুসলমান ফকির। কাছারির প্রশস্ত দরবারী ফরাসে সকলে নীরবে বসে আছেন। সকলের মুখেই বিয়োগব্যথার করুণ ছাপ।

ছ'জন বৃদ্ধ পাইক বরকন্দাজ শেষবারের মতো তাদের জমিদারী পোশাক জমকালো শেরোয়ানী-তকমা পরে ঢাল পিঠে বেঁধে খোলা কিরিচ আর বর্শা হাতে দুই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে অন্দরমহলের দরজার বাইরে। কাছারি প্রাঙ্গণে প্রস্তুত হয়ে আছে মূল্যবান পরদায় ঢাকা আটবেহারার জমিদারী পাল্‌কি।

বেলা ন'টা বাজতে অন্দরমহলের দরজায় দেখা দিলেন জমিদার সদর নায়েবের সঙ্গে। ছ'জন পাইক বরকন্দাজ দরবারী কায়দায় কুর্ণিশ করে তিনজন পাইক জমিদারের আগে চলল খোলা কিরিচ হাতে; পিছনে চলল বরকন্দাজ তিনজন।

দরবারে এসে জমিদার বসলেন শেষবারের মতো লাল বনাত মোড়া দরবারী ফরাসে, সবুজ কিংখাবের ওপরে সোনার কাজকরা তাকিয়া ঠেস দিয়ে। দরবারে উপস্থিত প্রজারা একে একে জমিদারের সম্মুখে এসে কুর্ণিশ করে নজরাণা দিলেন। সকলের 'হাজির-নজরাণা' দেওয়া শেষ হলে খানসামার 'চোগা-চাপকান' পরা করিম রুপার আতরদান থেকে গোলাপী আতর মাখানো

'তুলার পুট' সকলের হাতে দিয়ে গায়ে ছিটিয়ে দিল 'ইরানী জেস্‌মিন' সুগন্ধি জল; তারপর সুগন্ধি পান ও এলাচ ভরা সুবৃহৎ 'জয়পুরী পানদানী' ধরল সকলের সম্মুখে।

দরবারের আনুষ্ঠানিক আদব-কায়দা শেষ হলে জমিদার জাফরুল্লা খান চৌধুরী উপস্থিত প্রজামাতব্বরদের লক্ষ্য করে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন,—

আজ আমার এই শেষ বিদায়-বেলায় আপনারা যাঁরা আমাকে বিদায় দিতে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা আমার সেলাম গ্রহণ করুন। আড়াইশ' বছর আগে একদিন যে খান চৌধুরী জমিদার বংশ ভৈরবের তীরে এই সুলতানপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই জমিদার বংশের শেষ জমিদার আমি আজ আপনাদের নিকট হতে চির বিদায় গ্রহণ করছি।—বলে জাফর সাহেব মাথা নত করলেন। তাঁর অন্তরের ব্যথা চোখের জলে দেখা দিল। নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে মুখ তুলে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—

'সুলতানপুরের খান চৌধুরী জমিদার বংশের লক্ষ্য ছিল, জমিদারীর প্রজা হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই হয়ে যাতে বাস করে, ধর্মের পার্থক্য যেন তাদের মধ্যে বিভেদ না ঘটায়। আড়াইশ' বছর পরে প্রবল কুচক্রীর চক্রান্তে আজ দেশ থেকে সে মহান আদর্শ প্রায় লোপ পেয়েছে তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট আত্মঘাতী উন্মাদনা। সে উন্মাদনায় দেশ হতে সুলতানপুরের জমিদার বংশের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক মিলনের উদার আদর্শ যখন সরে গেছে, তখন এ জমিদার ও জমিদারীর আর প্রয়োজন নেই। এক কালে এদেশে হিন্দু-মুসলমান যে ভাই ভাই হয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়ে বাস করত, সে কথা বিগত যুগের ইতিহাস হয়ে গেছে। সে ইতিহাস আপনাদের মতো বৃদ্ধেরাই হয়তো এখনও মনে করে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। আপনারা কবরে বা শ্মশানে গেলে আর কেউ সে কথা মনে করবে কিনা সন্দেহ।—'

'আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই দেখছি বৃদ্ধ। দেশের যুবক প্রৌঢ় কেউ আসেন নি। তাঁরা কেন আসেন নি তা আমি জানি। তাঁরা শুনেছেন, জমিদারশ্রেণী দেশের দুশমন, জমিদারীপ্রথা দেশের চাষীদের সর্বনাশ করেছে। তাঁদের এই শোনা কথার মধ্যে কতটা সত্য আছে তা ভবিষ্যত কালের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ হয় তো দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে লিখবেন। যদি সে রকম ইতিহাস ভবিষ্যতে লেখা হয়, তবে হয় তো এককালে আপনাদের পরবর্তী বংশধরেরা সে ইতিহাস পড়ে

বুঝতে পারবেন, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান জমিদারশ্রেণী প্রজাসাধারণের উপকারী বন্ধু ছিল, কি দুশমন ছিল।—'

'আজ আমার এই বিদায় ক্ষণে আপনাদের দরবারে একটি শেষ আরজ্ পেশ করে যাব। আমার এই আরজি আপনারা দেশে সকলের কানে তুলে দিতে চেষ্টা করবেন।—'

'ভাই সব, এই দেশ, এই বাংলা দেশ, এই ভারতবর্ষ, এই দুনিয়া, কেবল একটি জাতি, একটি ধর্মের জন্যই নয়। এ আমাদের সব জাতি সব ধর্ম যার যার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মিলেমিশে থেকে একই খোদার নানাভাবে খিদ্‌মৎ করার জন্য। যদি কোনো একটি জাতি, কোনো একটি ধর্ম, অপর জাতি ও ধর্মগুলির ওপরে নির্যাতন চালায়, তবে সে জাতি সে ধর্মের ওপরে খোদার গজব নেমে এসে, এককালে সে জাতি সে ধর্ম দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেয়।—'

'ভাইসব, আজ আমি আপনাদের নিকটে বিদায় নিচ্ছি। যেভাবে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে তাতে আপনাদের মধ্যে ফিরে আসার সম্ভাবনা আর নেই। এরপর আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমার জন্মভূমি, আমার সুলতানপুর, আমার ভৈরব নদ, আমার প্রজা আপনাদের কথা সবসময় মনে থাকবে। সুলতানপুরের খান চৌধুরী জমিদার বংশের পক্ষ থেকে আমার এই শেষ সেলাম আপনারা গ্রহণ করুন।'

জমিদার ফরাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সদর নায়েব কালীবাবু এসে কুর্নিশ করে একটা শ্বেতপদ্ম ফুল জমিদারের হাতে দিয়ে তাঁর হাত ধরে নিয়ে চললেন দরবারের বাইরে প্রস্তুত পালকিতে তুলে দেবার জন্য। দরবারে উপস্থিত সকলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চললেন জমিদারের পিছনে।

কাছারির প্রাঙ্গনে জমিদার এসে দাঁড়ালে ছয়জন পাইক বরকন্দাজ তাদের হাতের কিরিচ নামিয়ে তিনবার শেষ 'রিয়াছৎ কুর্নিশ' জানাল। তারপর সদর নায়েব পালকির দরজা খুলে জমিদারের হাত ধরে তুলে দিলেন।

জমিদারের চাকরান ভোগী আটজন বেহারা শেষবারের মতো জমিদারের পালকি কাঁধে নিয়ে ছুটল।

মহাকালের মহাপথে পথিক মানুষ পথ চলতে যা পিছনে ফেলে আসে তার কথা প্রায়ই ভুলে যায়। সেকথা যাদের মনে থাকে, তারাও পুরনো কথা, পুরনো ঘটনার গুরুত্ব কিছুদিন পরে অনেক লঘু করে দেখে। এই জন্যই মানুষ ইতিহাস লিখেও সে ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে না।

মহাকালের পথযাত্রী মানুষ বোধহয় ভাবে, যা একবার ঘটে গেছে সে রকম আর ঘটবে না। কিন্তু মহাকালের গতিপথটা বোধহয় সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতিপথের মতো বৃত্তাকার। তাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়।

সুলতানপুরের জনশূন্য জমিদার বাড়ীর ওপরে নেমেছে কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথির সন্ধ্যা-ঘনঘোর। আড়াইশ' বছর পূর্বে এমনি এক সন্ধ্যায় এ বাড়ীর ওপরে এমনি বিষাদ-ঘন-ঘোরই নেমে এসেছিল। সে সন্ধ্যার অন্ধকারে এ বাড়ীতে প্রদীপ জ্বালার মতো একটি লোকও ছিল না। আজ পাহারা দেবার জন্য দু'জন বরকন্দাজ থাকলেও তারা সন্ধ্যার পর ভয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করে নি। নিষ্প্রদীপ বিরাট বাড়ীখানা রহস্যময় প্রেত পুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আড়াইশ' বছর আগের সেই রাতে বিজয়ী এনায়েতুল্লা খাঁ জনশূন্য এই বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশ করে যা দেখেছিলেন তাতে, বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর সঙ্গী ফৌজদার সাহেবকে বলেছিলেন, 'এরকম হবে জানলে আমি এ জমিদারী দখল নিতে আসতাম না।'

আড়াই শ' বছর পরে এই রাতে জনশূন্য জমিদার বাড়ীর সম্মুখে ভৈরবের তীরে বসে আছেন উদাস নয়ন মেলে ভেওয়া ফকির।

হঠাৎ জমিদার বাড়ীর ছাদে ডেকে উঠল হুতোম পেঁচা। সঙ্গে সঙ্গে পড়ো শিববাড়ীতে ডেকে উঠল অনেকগুলো শেয়াল। পূব আকাশের মেঘে দেখা দিল বিদ্যুৎ ঝলক্‌।

ভেওয়া ফকির তাঁর চেলাকে বললেন,—বড়ো দুর্দিন আসছে। সব দিকেই মেঘ জমছে। দারুণ ঝড় উঠবে। চল, দরগায় যাই।

অশেষপর্ব

সুলতানপুর হতে জাফরুল্লা চৌধুরী জুলেখাকে পত্র লিখে জানিয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়। দেশে দেশে ছুটোছুটি করা আর চলবে না। এক মাসের মধ্যে কলকাতা এসে বালীগঞ্জের বাড়ীতে বাস করা স্থির করেছেন। শিউলী বালীগঞ্জের বাড়ীতে উঠে গেলে দোতলাটা কোনো পরিবারকে ভাড়া দিয়ে জুলেখা যেন তেতলায় থাকার ব্যবস্থা করেন।

জুলেখা ভাই-এর পত্র পাওয়ার একটু পরেই নমিতা এল শিউলীর সঙ্গে দেখা করতে। নমিতাকে তেতলায় উঠে যেতে দেখে জুলেখা তখন আর শিউলার ঘরে গেলেন না।

নমিতা শিউলীর ঘরে গিয়ে তাকে একখানা পত্র দিল। পত্রখানা জাফরুল্লা চৌধুরা লিখেছেন অমিয়বাবুকে। পত্র পড়ে শিউলী খুব চিন্তিত হয়ে নমিতাকে বলল,—বাবা প্রতি পত্রেই লিখছেন, তিনি অসুস্থ। কিন্তু রোগের কোনো বিবরণ লেখেন না

চাচী সাহেবার মৃত্যুতে মনে বড়ো আঘাত পেয়েছেন। আমার মনে হয় এইটাই রোগ। বলল নমিতা।

সে কথা ঠিক, তবে সবটা নয়। পত্রে দেখতে পাচ্ছি বালাগঞ্জের বাড়ীর দোতলার ভাড়াটে চারতলায় তুলে দিয়ে দোতলায় আমাদের বাসের ব্যবস্থা করার জন্য লিখেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, তার স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়েছে যে, চারতলায় ওঠা-নামা সম্ভব নয়।

এখানে এলে ভালো ডাক্তার দেখালে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভালো চিকিৎসা আর মনের প্রফুল্লতা সব রোগ সারাতে পারে। চাচাসাহেব আমার গান খুব ভালোবাসেন। আমি গান বাজনায় তাঁকে মাতিয়ে রাখব।

একটা দিক থেকে তুই একেবারেই ছেলেমানুষ, কারও মন বোঝার ক্ষমতা তোর কোনোকালেই হবে না।

তা না হয়, তো না হল।

না, এই বয়সে ও যোগ্যতাটা অত তুচ্ছ করা ঠিক নয়। তুচ্ছ করলে বিপদ ঘটতে পারে।

আমি বিয়েও করব না বিপদও ঘটবে না। তোর আর তোর গোলার মন

যে বুঝে নিয়েছি, এতেই আমার চলবে।

না দেখেই তাঁর মনের খবর বুঝলি কি করে?

তোর মুখে যা শুনেছি তাতেই বুঝেছি। আর যেটুক বাকি আছে সে এবার বুঝে নেব।

কি করে বুঝবি?

চাচাসাহেব তোর জন্য গাড়ি কিনতে লিখেছেন। গাড়ি কেনা হলে সেই গাড়িতে করে কলকাতার সব কলেজ ঘুরে খোঁজ করে গোলাপবাবুকে বের করব।

তুইই তো বলেছিস ওটা তাঁর আসল নাম নয়। সে রকম হলে কি নামে খোঁজ করবি?

তুই আমার সঙ্গে থেকে তাঁকে দেখিয়ে দিবি।

তাহলে তোর পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই, আমরা দুজন গাড়ি নিয়ে কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকব। কলেজের ছুটি হলে যখন সকলে বেরোবে তখন আমি তাঁকে দেখিয়ে দেব, আর তুই গিয়ে তাঁকে ধরবি। একেবারে একটা নিরেট গাধা।

ব্যাকরণ ভুল হয়ে গেল, গাধী বল। বলে নমিতা হেসে উঠল।

এমন সময় দরজায় মলিন মুখে দেখা দিলেন জুলেখা। ঘরে দুজনকে হাসি মুখে আলাপ করতে দেখে বললেন,—

মা, আমি নিতান্ত প্রয়োজনে অসময়ে তোমাদের ঘরে এলাম।

ফুফু, আপনি এভাবে কথা বলেন কেন। আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখনই আসবেন।—বলল শিউলী।

জাফর ভাই আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছে।

কি লিখেছেন?

একমাসের মধ্যেই সে কলকাতা আসছে।

আর কি লিখেছেন?

এসেই তোমাকে বালীগঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যাবে।

আর কিছু লিখেছেন?

তার শরীর খুব অসুস্থ।

কি রোগ, তা কিছু লিখেছেন?

না, তা লেখে নি।

বাবা কাকাবাবুকেও পত্র দিয়েছেন সে পত্রে বালীগঞ্জের বাড়ীর দোতলা খালি করে সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে বলেছেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে। বোধহয় তাঁর চারতলায় ওঠার সামর্থ্য নেই।

আমার ভাই লোহার মতো শক্ত মানুষ। সে যে এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়বে, তা বিশ্বাস করতে মন চায় না।

ফুফু, আপনি চিন্তিত হবেন না আমি যেখানেই থাকি না কেন, দাদা ও আপনাকে যে কথা আমি দিয়েছি, তা পালন করবই।

না মা, সেদিক থেকে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমার দুঃখ আজ আপনভাই অসুস্থ হয়ে এসে উঠবে অন্যবাড়ীতে, আমার নসিব এতই খারাপ। বলে জুলেখা কেঁদে ফেললেন।

শিউলী ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে জুলেখার হাত ধরে বলল,—

ফুফু, আপনি কাঁদবেন না, এতে আমি অন্তরে বড়ো আঘাত পাই। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনশীল। সে পরিবর্তন যদি আমরা মানিয়ে চলতে পারি তবে আল্লাহ তালার মেহেরবানি আমাদের ওপরে নেমে আসে। ভেবে দেখুন, সুলতানপুরে দাদুর আমলে কি ছিল, আর এখন কি চলছে। ইব্রাহিম দাদা মানুষ হলে আপনার সব দুঃখ দূর হবে। এখন বাবার সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য, তিনি যেখানে থেকে শান্তি পান সেখানেই তাঁকে রাখা। সেদিক থেকে ভেবে দেখুন এবাড়ীর চাইতে বালীগঞ্জের বাড়ী ভালো কিনা।

রাত্রে জুলেখা ওমর সাহেবকে জাফরুল্লা চৌধুরীর পত্র দেখিয়ে বললেন,— আজ তোমার ব্যবহারের জন্যই ভাই এবাড়ীতে আসতে চায় না।

আমি এমন কি করেছি যার জন্য তোমার ভাইএর গলায় বঁড়শি বেধেছে!

সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আজ একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না!

লজ্জা করবে কেন? যারা মরদ, তারাই এ দুনিয়া ভোগ করে। যারা আহাম্মোক ভেরুয়া, তারাই টাকা থাকলেও ভোগ করতে ভয় পায়। আমি মরদ, যতদিন টাকা ছিল ইচ্ছামত ভোগ করেছি। এখন নেই, করিনে। আবার সুযোগ পেলেই করব। সকলেই তো আর তোমার ভাইএর মতো ভেরুয়া নয় যে, এক বিবি মরেছে বলে বুক চাপড়িয়ে পাঁজড়ের হাড় ভাঙবে।

তোমার সঙ্গে কথা বললেও গোনা হয়।

তবে বলতে আস কেন?

বেশ আর আসব না। বলে জুলেখা রাগ করে উঠে গেলেন।

জুলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অল্পে অল্পে ওমর সাহেবের বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢুকল। তার সংসার যে শিউলী চালাচ্ছে সেটা তিনি জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন, যেহেতু শিউলী এখানে আছে সেহেতু জাফর সাহেবই সব খরচ চালাচ্ছেন। এখন শিউলী এ বাড়ী ছেড়ে গেলে কি করে সংসার চলবে ভেবে ওমর সাহেব বেশ একটু ঘাবড়িয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে গেলেন জুলেখার ঘরে।

তোমাকে একটা কাজের কথা বলতে এলাম।

কি কাজের কথা?

ঐ ছুঁড়ীটার সঙ্গে ইব্রাহিমের সাদী কবুল করাও।

তাতে তোমার লাভ?

কলকাতায় তিনখানা বাড়ী আর কয়েক লাখ টাকা।

তা হবে না।

কি হবে না?

তোমার মতলব হাসিল হবে না।

কেন হবে না? সাদী কবুল হোক তো তারপর দেখা যাবে।

সাদী হবে না।

কেন হবে না?

আমার মত নেই।

কেন নেই?

সে কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব না।

কেন দেবে না? উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ওমর সাহেব।

কৈফিয়ত দেব না, আবার কেন কি। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন জুলেখা।

কিঃ, এত বড়ো আস্পর্ধা! এত বড়ো বেয়াদপি। গর্জে উঠলেন ওমর সাহেব।

এখন থেকে আমার সম্মুখে হাজির হলে চিৎপুরের আতরওয়ালাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সে সুলতানপুরের জমিদার বংশের মেয়ে জুলেখা বেগমের সম্মুখে হাজির আছে। এরপর থেকে জুলেখা বেগম তার বাপের বাড়ীতে বসে কোনো বেয়াদপের বেয়াদপি বরদাস্ত করবে না। বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

ওমর সাহেব এতকাল জুলেখার যে পরিচয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সেটা ঢোঁরা সাপের মতো। যাকে ঢোঁরা সাপ মনে করা গিয়েছিল সে যদি হঠাৎ

কালসাপ হয়ে ফণা তোলে তবে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, ওমর সাহেবও সেই রকম দিশেহারা হলেন। জুলেখার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওমর সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে জুলেখা নীরবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দরজার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—'এ আমি কি করলাম', বলে কেঁদে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কেঁদে মন শান্ত হলে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওমর সাহেবের ঘরের দরজায়।

ওমর সাহেবের ঘরের দরজা বন্ধ। জুলেখা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের শব্দ শুনতে চেষ্টা করলেন। নাঃ, কোনো শব্দ শোনা যায় না। ধীরে ধীরে দরজার কড়া নাড়লেন, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় ঠেলা দিলেন, দরজা খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করে জুলেখা দেখলেন খাটের একপাশে ওমরসাহেব মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছেন। পাশে টিপয়ের ওপরে মদের বোতল আর গ্লাস। বোতলে আর এক বিন্দুও নেই। মেঝেয় একটা চরস মিশানো মোটা চুরুট পুড়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। সব দেখে জুলেখা বুঝলেন, ডেকে কোনো লাভ হবে না। ওমর সাহেব মদ ফুরলে চরস টেনেছেন।

জুলেখা সযত্নে ওমর সাহেবকে বিছানায় শুইয়ে মশারি ফেলে ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে যখন নিজের ঘরে এলেন, তখন তাঁর দুই গণ্ডবেয়ে চোখের জল পড়ছিল।

সারারাত জুলেখা চোখের পাতা বুঁজতে পারলেন না। ভোর হতেই তেতলায় গিয়ে স্নান করে করিমের মা'কে বললেন,—আমি আজ নাস্তা পাক করি, তুমি যোগাড় দাও।

সংসারের দায়িত্ব শিউলী নেওয়ার পর থেকে সকাল-বিকালের খাবার ও চা জুলেখাকে করতে হত না। শিউলীর নির্দেশমত করিমের মা সব করে দোতলায় সকলকে দিয়ে যেত। সেদিন জুলেখা নিজে সকালের নাস্তা হাতে যখন ওমর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখের স্নেহকোমল ভাব ও নম্র ব্যবহার দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

বাল্যকালে মানুষ যে পরিবেশে বড়ো হয়, যৌবনে সেই পরিবেশের ভাবধারা কার্যকর হয়ে সারা জীবনটাকেই প্রভাবান্বিত করে রাখে। ওমর সাহেব যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন সে পরিবেশে নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য বিশেষ। নারীর যে একটা পৃথক সত্তা আছে এ কথা তাঁদের মনে কোনোসময় স্থান পায়

না। বলবান পুরুষের কবলে পড়ে অবলা নারীর কাতর আর্তনাদ এই শ্রেণীর মানুষের কৌতুক বৃদ্ধি করে মাত্র। তাঁরা জানেন, নারী উৎপীড়িতা লাঞ্ছিতা হয়ে যে কাতর ক্রন্দন করে সেটা তাদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। জবাই করা পশু-পাখির ছট্‌ফটানি দেখে দয়া করতে গেলে যেমন গোস্ত খাওয়া সম্ভব হয় না, তেমনি নারীর কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করলে মরদের মর্দানি থাকে না।

জুলেখার বিনম্র ব্যবহার দেখে ওমর সাহেব প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপরই তাঁর মনে হল আওরত আওরতই। আঘাত পেয়ে ঢোঁরা সাপ ফোঁস করে মাথা তোলে বটে, কিন্তু টুঁটি চেপে ধরলেই সব থেমে যায়। গত রাত্রে জুলেখার সম্মুখ থেকে ওভাবে পালানোটা খুবই লজ্জার বিষয় হয়েছে।

যদিও রাত্রের ঘটনাটা ওমর সাহেবের মতো মরদের বিচারে খুবই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়. তথাপি সকালে নাস্তাহাতে জুলেখার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। কারণ, ওমর সাহেব জন্মেছিলেন ভদ্র বংশে। অসৎ সঙ্গে উচ্ছন্নে গেলেও সৎবংশের প্রভাব একেবারে মুছে যায় না।

জুলেখা খাবার প্লেট টেবিলে রেখে কুঁজা থেকে গ্লাসে জল ঢেলে এনে বললেন,—তুমি খেতে থাক, আমি চা নিয়ে আসি। আজ ক'দিন বড়ো গরম পড়েছে। তোমার ঐ মোটা পায়জামাটা ছেড়ে দাও, কাচিয়ে আনব। পাতলা পায়জামা ও শার্ট তোলা আছে, এনে দিচ্ছি। বলে জুলেখা বেরিয়ে গেলেন। ওমর সাহেব একটু মুচকি হেসে খেতে আরম্ভ করলেন।

পোশাক নিয়ে ফিরে এসে জুলেখা দেখলেন খাবার প্লেটে লুচি ফুরিয়েছে। দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—আর ক'খানা লুচি এনে দেব?

তা, দাও। সেই সঙ্গে একটু আলুপটলের ছালুন এনো। আচ্ছা, ও ছুঁড়ী কি একেবারেই গোস্ত খায় না?

না। এসব খেতে তোমার খুব অসুবিধা হয়, তা বুঝি। কাল থেকে কিছু শিককাবাব আনিয়ে দেব।

বেশ, তাই এনো। ছুঁড়ীটা সবদিক থেকে কাফেরী ঢং ধরেছে।

ওমর সাহেবের এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জুলেখা আরও কিছু লুচি, তরকারি ও চা এনে টেবিলে দিয়ে পাশেই দাঁড়ালেন। ওমর সাহেব নাস্তা খাওয়া শেষ করে চা খেতে খেতে বললেন,—

আজ আমাকে পঁচিশটা টাকা হাওলাত দিতে পারো?

কেন, টাকা কি হবে?

দোকানে ফরাসের চাদরটা ছিঁড়ে গেছে, একটা নতুন কিনতে হবে।

এই যে দু'মাস আগে চাদর কিনলে।

অত লোকের ডলাই-মলাইতে কি চাদর বেশীদিন টেঁকে।

তাতে পঁচিশ টাকা লাগবে কেন! আগের চাদর তো চোদ্দ টাকায় কিনেছিলে।

এ কি আমাদের পাকিস্তান যে, জিনিসের দাম মাসের পর মাস একই রকম থাকবে! এটা হিন্দুস্তান, এখানে মাসে মাসে নতুন নতুন ট্যাক্স বসছে। এই দুই মাসে চোদ্দ টাকার একখানা চাদরের ওপরে এগার টাকা ট্যাক্স বসেছে।

জুলেখা আর কিছু না বলে টাকা এনে দিলেন।

ওমর সাহেবের বাল্যবন্ধু মহম্মদ নাসিরউদ্দিন আহম্মদ ওরফে নছির সাহেব একজন চিৎপুরের ইউনানী হেকিম। চিৎপুরে তাঁর ইউনানী দাওয়াখানা আছে। দাওয়াখানার ভিতরের আসবাব অপেক্ষা বাইরের সাইনবোর্ড এবং আলমারির বোতল-বয়ম অপেক্ষা সাইনবোর্ডে দাওয়াই'র নাম অনেক বেশী, এতে হেকিম সাহেবের ইউনানী চিকিৎসায় কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ, বিশেষ এক ধরণের কয়েক পদ হালুয়া আর জরিবুটির খদ্দের ছাড়া আর কোনো দাওয়াই'র জন্য বড়ো কেউ দাওয়াখানায় আসে না।

হেকিম নছির সাহেব যেরকম আমিরী চালে চলেন, সে চালের রসদ হেকিমী হালুয়া-জরিবুটি বেচে যোগাড় হয় না। সে রসদ আসে অন্য উপায়ে। উপায়গুলো নছির সাহেবের চমৎকার লম্বা চাপদাড়ি আর মুখের বোলচালের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, প্রয়োজনমত কাজে লাগে।

এ যাবৎ নছির সাহেব যত শিকার ধরেছেন তার মধ্যে এক ওমর সাহেব ছাড়া আর সবগুলোই বুনো দুম্বা, দু'একবার লেজের গোস্ত কেটে খেতেই পালিয়েছে। ওমর সাহেবই কেবল টিকে আছেন।

শোনা যায় আতরের ব্যবসার মতো লাভের ব্যবসা নাকি আর নেই। যদি কেউ সেকেলে একটা তামার পয়সায় পারা ঘষে সাদা করে আতরওয়ালাকে আধুলী বলে ঠকিয়ে আট আনার আতর কেনে, তাতেও আতরওয়ালার আধ পয়সা লাভ হয়। এমন আতরের ব্যবসাতেও ওমরসাহেব যে কিছু করে উঠতে পারছেন না, তার মূলে এই নছির সাহেবের কেরামতী।

ধনী পিতার উচ্ছৃঙ্খল সন্তান ওমর সাহেবের কৈশোর বয়স থেকেই তাঁর সব রকম বদখেয়ালের পথপ্রদর্শক ও খেয়াল চরিতার্থ করার মালমসলার যোগানদার

এই নছির সাহেব। এই মালমসল্লা যোগাড় করার জন্য নছির সাহেব যে পরিমাণ অর্থ ওমর সাহেবের কাছে আদায় করেছেন, তাতে ওমর সাহেবের পৈতৃক বাড়ী বিক্রী হয়ে তিনবার দোকান ফেল পড়ার মতো হয়েছিল। সে তিন বারের দু'বার জুলেখার পিতৃসম্পত্তির দ্বারা সঙ্কট উদ্ধার হয়, একবার সুন্দরী আনোয়ারাকে ষাট বছরের বুড়োর হাতে তুলে দিয়ে দোকান রক্ষা পায়। এবার পুনরায় সেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে, দোকানে উপযুক্ত মূলধন নেই। এসব ব্যাপারেও নছির সাহেবই ওমর সাহেবের একমাত্র পরামর্শদাতা দোস্ত। দোস্তের পরামর্শেই ওমর সাহেব রাত্রে জুলেখার কাছে ইব্রাহিম ও শিউলীর সাদীর প্রস্তাব তুলেছিলেন।

সেদিন জুলেখার দেওয়া নাস্তা খেয়ে বেলা ন'টায় দোকানে গিয়ে ওমর সাহেব দেখেন দোস্ত নছির সাহেব তাঁর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে আছেন। ওমর সাহেব দোকানে পৌছিয়েই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন পিছনের নির্জন ঘরে। দোকানের খানসামা তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল। তামাক টানতে টানতে ওমর সাহেব বললেন,—আজ জরুরী খবর আছে।

কি খবর? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন নছির সাহেব।

এক মাসের মধ্যে জাফর সাহেব কলকাতা আসছে।

তারপর?

সে কলুটোলার বাড়ীতে থাকবে না, থাকবে বালীগঞ্জের বাড়ীতে।

মেয়েটা?

মেয়েটাকেও বালীগঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যাবে।

তাহলে তো ভয়ানক বেকায়দা হবে। আওরত আর ঘোড়া কখনো হাত-ছাড়া করতে নেই ওরা যার ঘরে যাবে তারই চাবুক খেয়ে কথামত চলবে। বালীগঞ্জে গিয়ে হিঁদুদের মধ্যে পড়লে ছুঁড়ীটাকে বাগে আনা কঠিন হবে। জাফর সাহেব কলকাতা আসার আগেই কিছু একটা করা দরকার। তোমার বিবিকে কি কথাটা বলেছ?

হাঁ, বলেছি। তার মত নেই।

কেন মত নেই?

তা কিছু বলে নি।

জানতে চেয়েছিলে?

জানতে চেয়ে কি হবে, উত্তর দেবে না।

তুমি একটা উজবুক। মরদে পাঁচটা আওরত নিয়ে ঘর করে। তুমি একটাকেই শায়েস্তা করতে পারলে না।

দোস্ত, তুমি বুঝেও অবুঝের মতো কথা বলছ। আমি কি আর নিজের ইচ্ছায় ঐ একটা বুড়ী নিয়ে ঘর করছি। সাদীর সময় ওরা খোদার নামে কসম করিয়ে নিয়েছে, ও বেঁচে থাকতে ঘরে অন্য কোনো বিবি আনতে পারব না, ওকে তালাক দিতেও পারব না। এ সত্ত্বেও যদি কিছু করি, তবে ওরা পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এসে দিনের বেলা এই দোকানঘর থেকে টেনে বের করে একেবারে আড়ংধোলাই দেবে। এ দুনিয়ায় যার হাতে টাকা আছে, সে সব পারে।

এ অজুহাত তোমার মুখে বহুবার শুনেছি। এখন বল, জাফর সাহেব কলুটোলার বাড়ীতে না উঠে কেন বালীগঞ্জে উঠছেন।

তার শরীর অসুস্থ। এ বাড়ী অপেক্ষা বালীগঞ্জের বাড়ী ভালো।

রোগটা কি?

সে বিষয়ে পত্রে সে কিছু লেখে নি। যশোর থেকে এসেছিল আমার এক খদ্দের। তার মুখে শুনেছি, রোগটা নাকি হার্টের দোষ।

তা যদি হয়, তবে তোমার নসিব খুব ভালো। এখন এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জাফর সাহেব এসে কলুটোলার বাড়ীতেই থাকেন।

তাতে কি লাভ হবে?

তাঁর কাছে সাদীর প্রস্তাব করবে। যদি তিনি প্রস্তাবে রাজি না হন তবে তাঁকে হার্টফেল করে সরে যেতে হবে।

তাতেই বা কি ফায়দা হবে। মেয়েটা কবুল করবে না।

জাফর সাহেব যদি সরে যান, তবে ঐ ছুঁড়ীকে বাগে আনতে কোনো অসুবিধা হবে না। মোল্লা, কাজী, সব আমাদের হাতে। সাদী হবে তোমার বাড়ীর ভিতরে। সাদীর পর যতদিন দু'তিনটে বাচ্চা না হবে ততদিন ওকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেওয়া হবে না, অপর কারও সঙ্গে কথা বলতে দেওয়াও হবে না।

ওমরসাহেবের পরামর্শে জুলেখা পত্র লিখে জাফর সাহেবকে জানালেন, এই রকম অসুস্থ শরীর নিয়ে আপন মায়ের পেটের ভাই, বোনের কাছে না উঠে যদি বালীগঞ্জের বাড়ীতে ওঠে, তবে লোকসমাজে ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

পত্রের উত্তরে জাফরসাহেব জানালেন, তিনি প্রথমে কলুটোলার বাড়ীতে উঠবেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে মাস দুই পরে বালীগঞ্জে যাবেন। তেতলায় থাকা সম্ভব হবে না, সেজন্য নীচ তলার ভাড়াটে তুলে দিয়ে ঘরগুলো বাসের উপযোগী মেরামত করে পত্রে জানালে তিনি আসবেন। অমিয়বাবুকেও পত্র লিখে সব জানিয়েছেন।

নীচতলায় ভাড়াটে ছিল এক চোরাকারবারী। বিড়ির তামাক ও পাতা পাকিস্তানে পাচার করা ছিল তার ব্যবসা। দু'বছরে কয়েকবার ধরাপড়ে অনেক টাকা লোকসান দিয়ে সে বুঝে ফেলেছে, এ ব্যবসা চালাতে পারে এক বড়ো ধনী ব্যবসাদাররা ; আর পারে, যারা পিঠে মাল বেঁধে নিয়ে রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বর্ডার পার হতে পারে, সেই ছ্যাঁচোরেরা। দু'পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যারা এ ব্যবসায় নামে, তারা ধরাপড়ে মার খায়। ব্যবসার এই মারপ্যাচ বুঝে লোকটা যোগ দিয়েছে বড়বাজারের এক বড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। সেজন্য এই ছোটো গুদামে তার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। অমিয় বাবু নোটিশ দিতেই সে ঘর ছেড়ে দিল।

ভাড়াটে উঠে গেলে কণ্ট্রাক্টর লাগিয়ে একমাসের মধ্যেই সব ঘর মেরামত ও বাসোপযোগী করে অমিয়বাবু পত্র লিখে জাফর সাহেবকে সব জানালেন। উত্তরে জাফর সাহেব কলকাতা পৌঁছানোর তারিখ ও সময় জানিয়ে অমিয়বাবু ও জুলেখাকে পত্র লিখলেন।

দিনমত ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে অমিয়বাবু গেলে শিয়ালদহ স্টেশনে। খুলনা মেল এসে থামলে অমিয়বাবু ফার্স্টক্লাস কামরার কাছে গিয়ে জাফর সাহেবকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, কথা বলতে পারলেন না।

জাফরসাহেব এক হাতে মোটালাঠি ভর করে করিমের হাত ধরে ধীরে ধীরে কামরা থেকে নেমে অমিয়বাবুর হাত ধরলেন। একটু হেসে বললেন,—বুঝেছি আপনি অবাক হয়েছেন আমাকে দেখে। যে কাণ্ড চোখের ওপরে দেখে আজ আমার এই দশা, সে কাণ্ড দেখে কোনো সৎলোক মাথাঠিক রাখতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে। এখন চলুন, সব আপনাকে শোনাব।

অমিয়বাবু জাফরসাহেবের কথার উত্তর না দিয়ে করিমকে বললেন,—তুমি ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে মালপত্র ছাড় করে পরে এস। আমি চৌধুরীসাহেবকে নিয়ে আগেই যাচ্ছি।

জাফর সাহেব অসুস্থ হয়ে কলকাতা আসছেন শুনে সেদিন অপরাহ্নে সৈয়দ সাহেব ও সোফিয়া এসেছে কলুটোলার বাড়ীতে। অমিয়বাবুর ট্যাক্সি এসে

বাড়ীর সম্মুখে থামতেই দোতলা থেকে সকলে নেমে এলেন সদর দরজার কাছে। অমিয়বাবুর হাত ধরে জাফরসাহেবকে নামতে দেখেই শিউলী—ও বাবা, আপনি এমন হলেন কেন? বলে চিৎকার করে ছুটে যেতেই সোফিয়া তাকে ধরে ফেলল।

অমিয়বাবু বললেন—মা শিউলী, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। এ অবস্থায় তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। চৌধুরী সাহেবের রোগ হয়েছে, ভালো চিকিৎসা করলেই সেরে উঠবেন।

শিউলী কাঁদতে কাঁদতে বলল,—কাকাবাবু, আপনি তাই করুন। এখনই সবচাইতে বড়ো ডাক্তার ডেকে আনুন।

না মা, এখনই বড়ো ডাক্তার ডেকে কোনো লাভ হবে না। চৌধুরী সাহেব ন'ঘণ্টা পথে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তোমরা এঁকে নিয়ে বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়ে দাও। আমি গিয়ে আমার পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার মৈত্রকে নিয়ে আসি।

সৈয়দসাহেব ও সোফিয়া অতি সন্তর্পণে জাফরসাহেবকে ধরে এনে বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়ে সৈয়দসাহেব ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিলেন। শিউলী বাপের কাছে বসে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সোফিয়া ইজিচেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের মাথায় বাতাস করতে লাগল।

আধঘণ্টার মধ্যেই অমিয়বাবু ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার মৈত্র রোগী পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—এ রোগে পূর্ণবিশ্রাম আর উপযুক্ত পথ্যই ওষুধ। আজ এখন কমলার রস, আর রাত্রে দুধ পাঁউরুটি খেতে দিন। কাল সকালে বাচ্চা মুরগির সুরুয়া করে দেবেন। আমি কাল বেলা দশটায় এসে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা করব।

পথ্যের ব্যবস্থা শুনে জাফর সাহেব বললেন,—ডাক্তার বাবু, আমার পথ্যের জন্য কোনো জীবহত্যা হয় এটা আমি চাই নে। আপনি নিরামিষ পথ্যের ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার সেইরকম ব্যবস্থা করে বিদায় হলেন। সোফিয়া তার ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিল, শিউলীর অনুরোধে সে থেকে গেল। সৈয়দ সাহেব চললেন অমিয়বাবুর ট্যাক্সিতে, বাসার সব দরজা জানালা ভালোকরে বন্ধকরে আবার এসে রাত্রে কলুটোলার বাড়ীতেই থাকবেন।

ট্যাক্সিতে উঠে সৈয়দ সাহেব অমিয়বাবুকে প্রশ্ন করলেন।—

আমি শুনেছিলাম মামুসাহেব কলকাতা এসে বালীগঞ্জের বাড়ীতে থাকবেন। তাঁর স্বাস্থ্যের দিক থেকে বালীগঞ্জের বাড়ীতে ওঠাই ভালো হত। এরকম ক্ষেত্রে কলুটোলার বাড়ীতে ওঠার হেতু আপনি কিছু জানেন কি?

জুলেখা বেগম ও ওমরসাহেবের আগ্রহে উঠতে হয়েছে।

আমি যতদূর বুঝি তাতে এ বিষয়ে শাশুড়ীর আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু শ্বশুরসাহেবের এ রকম আগ্রহ স্বাভাবিক হতে পারে না। যদি সত্যই তিনি আগ্রহ করে থাকেন তবে এর পিছনে কোনো মতলব আছে।

কি মতলব হতে পারে?

আমার শ্বশুরসাহেবের যত দোষই থাকুক না কেন তিনি স্বভাব-সরল মানুষ। কোনো বদ মতলব তাঁর মাথা থেকে বেরোয় না, বদ মতলব বেরোয় তাঁর দোস্ত ও পরামর্শদাতা হেকিম নছির সাহেবের মাথা থেকে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারেও নছির সাহেবের পরামর্শ আছে।

ইব্রাহিমের সঙ্গে শিউলীর বিয়ে দেওয়ার মতলব আছে নাকি?

প্রথমদিকে সেই রকম ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম রাজি হয় নি।

কেন রাজি হয় নি?

সে বলে, ও রকম মেয়েকে হিঁদুর দেবতা সরস্বতীর মতো শ্রদ্ধাভক্তি করা যায়, বিয়ে করা যায় না।

তাহলে আর কি মতলব হতে পারে?

সেই তো ভাবছি। আপনি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। যতশীঘ্র সম্ভব মামু ও শিউলীকে এখান থেকে সরাতে হবে। আমি শিউলীকে সতর্ক করব।

কলুটোলার বাড়ীর নীচতলায় পাঁচটা ঘরের সদর দরজার কাছে রাস্তার ওপরের বড়ো ঘরটা করা হয়েছে বৈঠকখানা। তারপর দু'টো ঘর জাফরসাহেব ও শিউলীর শোবার জন্য প্রয়োজনীয় সব আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে। তিনখানা ঘরেই যাতে ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা যায়, তার জন্ত দরজা বসিয়ে দরজায় মোটা পরদা টাঙানো হয়েছে।

রাত দশটা। জাফরসাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। দোতলায় সোফিয়া তার মায়ের কাছে ছেলেমেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নীচতলায় এসেছে। সোফিয়া শিউলী সৈয়দসাহেব ইব্রাহিম সকলে বৈঠকখানায় বসে ডেকে আনলেন করিমকে।

করিম এলে শিউলী তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। চেয়ারে বসতে করিম ইতস্তত করছে দেখে শিউলী বলল,—করিম ভাই, আজ থেকে ভুলে যাও তুমি এ বাড়ীর খানসামা। এখন থেকে মনে করবে এ পরিবারে তুমি আমাদেরই একজন। বস চেয়ারে।

করিম বসলে শিউলী তাকে প্রশ্ন করল,—মা'র মৃত্যুকালে তুমি কি ঢাকায় ছিলে?

হাঁ খুকুমণি, আমি বরাবরই হুজুরের সঙ্গে ছিলাম।

মা কি রোগে কতদিন ভুগে মারা গেলেন, সব আমাকে বল।

কোনো রোগে বেগমসাহেবা এন্তেকাল করেন নি।

অ্যাঁ, কোনো রোগে মারা যান নি! তবে কিসে মৃত্যু হল?

হিঁদু মুসলমানের দাঙ্গায় মারা পড়েছেন।

অ্যাঁ, হিন্দুরা মা'কে খুন করেছে!!—উত্তেজনায় শিউলী উঠে দাঁড়াল।

না না, হিঁদুরা খুন করে নি। হিঁদুদেরই তিনটি ছোট বাচ্চা বাঁচাতে গিয়ে বেগমসাহেবা এন্তেকাল করেছেন।

মুসলমান গুণ্ডারা আমার মা'কে খুন করেছে!!—উত্তেজনায় শিউলী কয়েক পা এগিয়ে গেল করিমের দিকে।

খুকুমণি, তুমি যদি এরকম কর, তবে কিছুই বলতে পারব না। তুমি স্থির হয়ে বস। আমি সব বলছি, শোনো।

হাঁ, এই আমি বসলাম, তুমি সব ঘটনা বল।—বলে শিউলী পিছিয়ে গিয়ে ঝুপ্ করে সোফায় বসে পড়ল।

সোফিয়া উঠে এসে শিউলীর কাছে বসে করিমকে আনুপূর্বিক ঘটনাটা বলতে অনুরোধ করলে সে বলল,—

দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর আমরা যেখানে ছিলাম সেই গলির বাসিন্দা এক হিন্দু বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর বেটার বউ আর তিনটে ছোটো বাচ্চা নিয়ে এসে হুজুরের আশ্রয় নেয়। বুড়োর ছেলেটি আফিসে চাকরি করত; সেইদিনই আফিসে যাওয়ার পথে সে খুন হয়েছে। রাত প্রায় ন'টার সময় একদল গুণ্ডা আমাদের বাড়ী চড়াও হয়ে হুজুরকে বলল, এ বাড়ীতে একটা খুবছুরত হিন্দু আওরত আছে, তাকে বের করে আমাদের হাতে দাও। হুজুর বললেন, এখানে কোনো হিন্দু আওরত নেই। সে কথা তারা বিশ্বাস না করে বলল, তুমি কোরাণ মাথায় করে একথা বলতে পারো? হুজুর আমাকে কোরাণ আনতে বললেন। আমি কোরাণ এনে তাঁর হাতে দিতেই তারা চলে গেল।—

রাতটা কেটে পরের দিনটাও গেল। হুজুর বহু চেষ্টা করেও ওদের কোনো নিরাপদ জায়গায় পাঠাতে পারলেন না। সন্ধ্যার পর বহু গুণ্ডা আবার আমাদের বাড়ী চড়াও করে দাবি করল, এ বাড়ীতে বহু হিঁদু আছে তাদের বের করে দাও নইলে আমরা বাড়ী খুঁজে দেখব। হুজুর বললেন, আমার জান থাকতে কেউ বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না। গুণ্ডারা হুজুরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে পড়ল।

মামুর তো রিভলবার ছিল, রিভলবার চালালেন না কেন!—প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

ওসব কি আর আছে! হুজুরের বন্দুক, রিভলবার, সব পাকিস্তান হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে।

কেন কেড়ে নিল? প্রশ্ন করল শিউলী।

হুজুর যে হিঁদুদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেন।

তাহলে পাকিস্তানে হিন্দুদের হাতেও কোনো বন্দুক রিভলবার নেই! প্রশ্ন করল সোফিয়া।

না। তা যদি থাকত তবে কি আর এইসব গুণ্ডা বড়োবড়ো হিঁদু ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে তাদের জেনানা মহলে অত্যাচার চালাতে পারত! হিঁদুদের ঘরে একখানা কিরিচও নেই।

আচ্ছা এখন বল, তারপর কি হল। বললেন সৈয়দ সাহেব।

গুণ্ডারা ভিতরে ঢুকে নীচতলায় খুঁজে সেই বুড়োকে বের করে জবাই করল।

বুড়োকে জবাই করল! উত্তেজিত ও বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল শিউলী ও সোফিয়া।

হাঁ দিদিমণি, বুড়োকে খাসীর মতো জবাই করল। বুড়োকে জবাই করতে দেখে বুঝলাম এখানেই এর শেষ নয়, শয়তানের দল দোতলায়ও যাবে। সদর দরজা বন্ধকরা, কাঠখানা নিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির ওপরে। কি করব দিদিমণি, একখানা বড়ো দা'ও যদি পেতাম, তবে আমি একাই শয়তানগুলোকে রুখতে পারতাম। ওরা জান খোয়ানোর সম্ভাবনা বুঝলে শিয়ালকুত্তার মতো পালায়।—

কাঠখানা হাতে নিয়ে সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়ালাম। শয়তানগুলো উঠে আসতেই একটার মাথায় বসিয়ে দিলাম এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এসে পড়ল লোহার ডাণ্ডা। মাথা ঘুরে নীচে পড়ে গেলাম।—

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি নীচতলায় সিঁড়ির কাছে পড়ে আছি। মাথার

ফাটা জায়গাটায় রক্ত জমাট হয়ে রক্তপড়া বন্ধ হয়েছে। উঠতে গিয়ে দেখি শরীর দুর্বল।

বাড়ী নিস্তব্ধ। নীচতলায় খুঁজে হুজুরের দেখা পেলাম না দোতলায় গিয়ে বেগম সাহেবার ঘরের পরদায় রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পর্দা সরিয়ে দেখলাম ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেছে। সেই রক্তের মধ্যে দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন হুজুর। ঘরের এক কোনে বেগম সাহেবা পড়ে আছেন উপুড় হয়ে।

মা'কে ওরা খুন করেছে।—চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়ে শিউলী থর থর করে কাঁপতে লাগল।

খুকুমণি, তুমি স্থির হয়ে বসে আমাকে সব কথা বলতে দাও। বেগম সাহেবার গায়ে কোনো আঘাতের দাগ আমি দেখি নি।

তবে মা'র মৃত্যু হল কি করে?

পরে শুনেছি বেগমসাহেবা হার্টফেল করে মারা গেছেন।

ঘরে অত রক্ত কেন?

সেই হিঁদু বউটার তিনটি বাচ্চাকেই খুন করেছে। ছোটো বাচ্চাটা বেগম সাহেবার বুকের মধ্যে ছিল। সেই অবস্থায়ই বাচ্চাটার পেটে ছুরিমেরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এতেই বেগম সাহেবা হার্টফেল করেছিলেন।

ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়ে কিরকম দানব তৈরী করে এটা তার একটা স্বরূপ চিত্র।—মন্তব্য করলেন সৈয়দ সাহেব।

সেই ভদ্রমহিলার কি হল?—প্রশ্ন করল সোফিয়া।

পাশের গলিতে তাঁর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বোধহয় চিলেকোঠার ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরেছিলেন।

আচ্ছা বল, তারপর তুমি কি করলে।—বললেন সৈয়দ সাহেব।

আমি হুজুরের জ্ঞান ফিরানোর জন্য চেষ্টা করলাম, না পেরে চললাম নানার বাড়ী। পথে মাথা ঘুরতে লাগল, রাস্তার পাশে দেওয়াল ধরে ধরে কিছু দূর যেতেই পুলিশে ধরল। তাঁকে সব ঘটনা বলে নানার বাড়ীতে খবর দিতে বললাম। দারোগাটা বেশ ভালো মানুষ, আমার অবস্থা দেখে বাড়ী ফিরে যেতে বলে নানার বাড়ীতে খবর দিতে গেলেন। আমি বাড়ী ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম, তারপর আর জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান হল তখন আমি হাসপাতালে।—

প্রায় একমাস হাসপাতালে ছিলাম, এর মধ্যে একদিনও হুজুরের দেখা না পেয়ে খুব ভাবনায় পড়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নানার বাড়ী গিয়ে দেখলাম, হুজুর কঠিন রোগে একেবারে বিছানায় মিশে গেছেন, দেখে চেনা যায় না। শুনলাম হুজুরের হার্টের ব্যারাম হয়েছে।

দেখি তোমার মাথায় কোন জায়গাটা ফেটেছিল। বলে শিউলী করিমের কাছে গিয়ে তার মাথার বাবরি চুল সরিয়ে ফাটা দাগটা দেখল।

করিমের বর্ণনা শেষ হলে ঘরের আর সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলেন। কেবল শিউলী হাত দু'খানা বুকের ওপরে আড়া-আড়ি রেখে নীরবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার চোখ দুটো শাবক হারা হিংস্র বাঘিনীর মতো জ্বলছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাক ফুলে ফুলে উঠছে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়িয়ে ধরেছে।

জাফর সাহেব কলকাতা আসার পর দু'মাস কেটে গেল। শিউলীর সতর্ক সেবাযত্নে ও ভালো চিকিৎসায় জাফর সাহেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মধ্যে মধ্যে করিমের হাত ধরে রাস্তায়ও একটু বেড়াতে যান।

এ দু'মাসের মধ্যে শিউলী বালীগঞ্জে বেড়াতে যায় নি। প্রায় প্রতি রবিবারেই অপর্ণাদেবী ও নমিতা আসে জাফর সাহেবকে দেখতে।

কলেজে পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে রবিবারে বেলা ন'টায় অমিয়বাবু এলেন শিউলীকে বালীগঞ্জে নিয়ে যেতে, কথাটা আগের রবিবারেই ঠিক করা ছিল। অমিয়বাবুর সঙ্গে নমিতা আসে নি দেখে শিউলী জিজ্ঞাসা করল।—

কাকাবাবু, নমিতা এল না কেন?

সে আজ রান্নাঘর থেকে তার মা'কে সরিয়ে দিয়ে নিজে রান্না করছে।

তাহলে তো আজ আপনার ভোজ। হেসে বললেন জাফরসাহেব।

ভোজ কি একাদশী তা এখনই বলা যায় না। হয় তো খেতে বসে দেখা যাবে লবণের পরিবর্তে চিনি দিয়ে বসে আছে।

কিন্তু পড়াশুনায় তো নমিতা খুবই ভালো।

মেয়েটা আগে ছিল খুব চঞ্চল, এখন হয়েছে অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

আপনি তো ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। আপনাদের মধ্যে কি বিবাহে পণপ্রথা আছে?

প্রত্যক্ষে নেই, পরোক্ষে আছে।

সে কি রকম!

ছেলের বাপ-মা যদি বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের কর্তা হন, তবে খোঁজেন বড়লোকের মেয়ে, যেখানে না চাইলেও মোটারকম দান-যৌতুক পাওয়া যাবে। আর যদি ছেলেই বিয়ের কর্তা হয়, তবে সে ঘনিষ্ঠতা করে এমন বাপের মেয়ের সঙ্গে, যে বাপ জামাই'র বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা বা মোটা চাকরি দিতে পারবেন।

তবে যে বাংলা সাহিত্য-উপন্যাসে পড়ি আপনাদের হিন্দুসমাজে এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব হয়ে বিয়ে হয়। সে রকম বিয়েতে জাতির বিচারও করা হয় না, দান-যৌতুকের প্রশ্নও ওঠে না!

কালে হয় তো ঐ রকমই চালু হবে। তবে এখনও ওটা একশ্রেণীর বেকার সাহিত্যিকের মগজে আর সিনেমার পরদায় চলছে। যেসব ছেলে-মেয়ে ঐ সব বই পড়ে ও সিনেমা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঐ রকম কাণ্ড করে বসে, তাদের বয়স অল্প হলে অভিভাবকেরা পুলিশ দিয়ে ধরে জেলে পোরেন। আর যারা উপযুক্ত বয়সে ওরকম বিয়ে করে, তারা তাদের চোখের নেশা কেটে গেলে ঘোর অশান্তিতে কাল কাটায়।

কেন অশান্তিতে কাল কাটায়?

হিন্দুসমাজের সব স্তরের পুরুষই মেয়েদের পিতলের ঘটি-বাটির মতো মনে করে না। অপরের ব্যবহৃত পিতল কাঁসার ঘটিবাটি মেজেঘষে ব্যবহার করতে বড়ো কেউ আপত্তি করে না কিন্তু নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এ রকম ব্যবহার কোনো হিন্দু করতে চায় না।

কিন্তু আপনাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ তো চালু হয়েছে!

হাঁ, তা হয়েছে। যারা বিধবা বিবাহ করে, তারা আগে থেকেই মন প্রস্তুত করে নেয়, সেজন্য কোনো গোলমাল হয় না। কিন্তু এইসব ভাবকরা বিয়ের শেষ পরিনামে ছেলেরা সন্দেহ করে তাদের স্ত্রীদের।

কি সন্দেহ করে?—প্রশ্ন করল শিউলী।

সন্দেহ করে—'আমার সঙ্গে ওর যেমন ভাব ছিল তেমনি হয় তো আরও দু'পাঁচ জনের সঙ্গেও ছিল। তারা চালাক বলে বিয়ের ফাঁসে ধরা দেয় নি।' এ রকম মামলা আজকাল প্রায়ই কোর্টে আসছে।

তাহলে আপনারা আইন করে পণ প্রথা তুলে দেন না কেন?

তাতে বিয়ের কালোবাজার গড়ে উঠবে।

সে কালোবাজার কি বন্ধ করা যাবে না?

না কালোবাজারীরা সব রকমেই আইন কর্তা ও আইন প্রয়োগকারীদের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও ফন্দীবাজ হয়।

তবে কি এর কোনো প্রতিকার হবে না?

কালে সব অন্যায় অত্যাচারেরই প্রতিকার হয়। এই পণের অত্যাচারও কালে লোপ পাবে।

কি করে লোপ পাবে? প্রশ্ন করল শিউলী।

মেয়েরা এখন আধুনিক শিক্ষার দিকে খুব ঝুঁকে পড়েছে। এর ফলে তারা অনেকটা আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠছে। মেয়েদের এই আত্মমর্যাদাজ্ঞানই কালে পণ-প্রথা দূর করবে।

আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জী, আপনাদের সমাজে বহু ছেলে ইয়োরোপে গিয়ে ঐ দেশের মেয়ে বিয়ে করে এসে সমাজে বেশ স্থান পাচ্ছে। কিন্তু কোনো মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করার কথা তো বড়ো একটা শুনিনে। এর হেতু কি?—প্রশ্ন করলেন জাফর সাহেব।

ইয়োরোপীয় মেয়ে বিয়ে করলে কোনো ধর্মের প্রশ্ন উঠে না। মুসলমান মেয়ে বিয়ে করলে ছেলেটিকে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে হয়, তা না করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার ভয় আছে।

হিন্দু মেয়ে মুসলমান বিয়ে করলে দাঙ্গা বাধে না কেন? প্রশ্ন করল শিউলী।

সে ক্ষেত্রে দাঙ্গা বাধাবে কে? হিন্দুর চোখে সব ধর্মই সমান। ধর্মের প্রশ্নে হিন্দুরা কোনোকালেই উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা বাধায় না।

মুসলমান মেয়ে হিন্দু বিয়ে করে হিন্দুসমাজে গেলে মুসলমান সমাজ এত উত্তেজিত হয় কেন?

এর অনেকগুলি কারণ আছে। তারমধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, হিন্দুর তুলনায় নিজেদের হীনমন্যতা, যাকে ইংরেজীতে বলে inferiority complex।

এটা আপনি বুঝলেন কি করে?

বহু মূর্খ ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করে তার মুসলমানী নামের সঙ্গে হিন্দু উপাধিটা বজায় রেখে অনায়াসে তোমাদের সমাজে বড়ো আলেম হয়ে বেশ চড়েবড়ে খাচ্ছে। এই ব্যাপারটা একটু বুঝে দেখলেই আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

মুসলমান সমাজে এই হীনমন্যতার হেতু কি?

এর হেতুও বহু, তারমধ্যে প্রধান হেতু দু'টি। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমান যোদ্ধারা যে সব দেশ জয় করে শাসন করেছেন, সে সব দেশে অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র অধিবাসীদের ইসলাম কবুল করিয়ে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সব মুছে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভারতে তা সম্ভব হয় নি। ভারতে হিন্দুধর্মের যে প্রাণশক্তি পাঁচশ' বছর মুসলমান শাসনকালে ইসলাম প্রচারে প্রবল বাধা দিয়ে এখনও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই প্রাণশক্তির তুলনায় নিজেদের এই হীনমন্যতা। যার অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম রক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

হিন্দুধর্মের এই প্রাণশক্তিটি কি? প্রশ্ন করলেন জাফর সাহেব।

সহনশীলতা, সুদৃঢ় দার্শনিক যুক্তিবাদে শ্রদ্ধা ও দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি।

আচ্ছা, এখন এই হীনমন্যতার দ্বিতীয় হেতুটি বলুন।

বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান। এই বিরাট মুসলমান জনসমষ্টির প্রায় সকলেই মনে করেন তাঁদের পূর্বপুরুষ বিদেশ থেকে এদেশে এসে তরবারির সাহায্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গৌরব, কিছুই তাঁদের আপন নয়। তাঁদের গৌরব আরব পারস্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি। এই অবাস্তব মনোভাবই হীনমন্যতার দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

কিন্তু আপনারাও তো আমাদের 'যবন' বলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আপন বলে কাছে টেনে নেন নি।

যবন কথাটা যদিও এখন ঘৃণাসূচক, কিন্তু পূর্বে ঐ শব্দটার তাৎপর্য এরকম ছিল না। আমাদের বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে বহু যবন ঋষির বাণী আছে। ভারতের বাইরের লোকদেরই যবন বলা হত। আমরা আপনাদের যে আপন করে নিতে পারি নি তার হেতু, আপনাদের সমাজে মেয়েদের যেভাবে কঠোর পরদায় ঢেকে রেখেছেন, তাতে প্রথম থেকেই আপনারা আপনাদের অর্ধাংশের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা করতে দেন নি। আপনাদের জামাই সৈয়দসাহেব যদি সোফিয়াকে সঙ্গে না নিয়ে আমার ওখানে যেতেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁকে আমার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দিতাম না।

তাহলে আপনি বলতে চান ভারতে সব সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে সব অনাচার, বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার দূর হয়ে সাম্প্রদায়িক মিলন হবে।

হাঁ, আমার অভিমত এই রকমই

নমিতা কোথায় কাকী মা ?

সে আজ রান্না করছে। তোমার এত দেরি হল কেন মা ?

বাবা দশটায় খান। আজ কাকাবাবুর সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল যার জন্য আমরা সময়ের হিসাব ভুলে গিয়েছিলাম

এমন কি গুরুতর বিষয়।

প্রথম কথা উঠেছিল আপনাদের হিন্দুসমাজে মেয়ের বিয়ে নিয়ে।

সেই তো মা, নমিতার ভাগ্যে যে কি আছে!

কেন কাকীমা, আপনি নমিতার জন্য এত ভাবছেন কেন ? ওর মতো মেয়ে যে দেখবে সেই পছন্দ করবে।

না মা, ওর বিয়ে বোধহয় অত সহজে হবে না।

কেন!

লক্ষ্ণৌ থেকে আমার দাদা একটা সম্বন্ধের কথা তুলেছিলেন। সম্বন্ধটি সবদিক থেকেই কাম্য। কিন্তু নমিতা অস্বীকার করেছে।

ওর বোধহয় মতলব পড়া শেষ করে বিয়ে করবে।

সেদিক থেকেও কোনো বাধা হত না। বি. এ. পরীক্ষার পর বিয়ে হয়ে ছেলেটি বিলেত যাবে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। সে সময় নমিতা এম. এ. পড়তে পারত।

তবে কেন অস্বীকার করল ?

সেই কথাটা জানার জন্য আজ আমিই তোমাকে আনিয়েছি। নইলে চৌধুরীসাহেবের এই অসুস্থ অবস্থায় তোমাকে এখানে আনতাম না।

কিন্তু কাকীমা, নমিতা বাইরে খুব সরল মনখোলা মেয়ে হলেও ভিতরে ভয়ানক চাপা। এদিক থেকে তার মনের কথা বের করা খুব সহজ হবে না।

আমার মনে হয় একমাত্র তুমিই একাজ পারবে। আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর এত ভাব নেই। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই হাসতে হাসতে নমিতা এসে উপস্থিত হল।—এর আগে আমি তোকে নেমন্তন্ন করে আনতাম, মা রান্না করে খাওয়াতেন। আজ মা তোকে নেমন্তন্ন করেছেন, আমি রান্না করলাম।

হঠাৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হল কেন ?

আমি নাকি পড়াশুনা করছিনে। তাই তোকে দিয়ে আমার কিছু সুবুদ্ধির উদয় করানোর মতলবে এই ব্যতিক্রম।

সামনে ক'মাস পরে পরীক্ষা। এ অবস্থায় পড়াশুনায় মন দিচ্ছিসনে কেন?

কে বলে আমি পড়াশুনায় মন দিচ্ছি নে! বরং মা'ই পড়ার বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

সে কি রকম?

নে, এখন আমার কাছে আর ন্যাকা সাজিস নে। মা নিশ্চয়ই সব তোকে বলেছেন।

হাঁ, বলেছেন। যা বলেছেন তাতে তো পড়াশুনায় ক্ষতি হওয়ার কথা নয়।

বলিস কি! আজ থেকে মাত্র আটমাস পরে বিয়ে হবে, আর পড়াশুনার ক্ষতি হবে না!

কি করে ক্ষতি হবে?

বাঃ, এখন থেকেই নানারকম রঙিন স্বপ্ন মনে জাগবে না? বিয়ের রঙ যদি একবার মনে ধরে, তবে ওটার শেষ পরিণতি না দেখে কি আর অন্য কিছু করা যায়।

তোর মজামারা কথা এখন রাখ। সোজা কথায় বল তো, এ বিয়েতে তোর আপত্তির হেতু কি?

একমাত্র হেতু, আমি বিয়ে করব না।

এটা কি তোর প্রতিজ্ঞা?

এ নিয়ে কি কেউ প্রতিজ্ঞা করে?

লক্ষ্ণৌর সে ছেলেটিকে তুই দেখেছিস?

বহুবার। একসঙ্গে বেড়িয়েছি গান গেয়েছি।

তবে অপছন্দ করলি কেন?

অপছন্দ তো করিনি। বিয়ে করব না,—এই কথা বলেছি।

হুঁ, তা তোর পড়াশুনা কেমন চলছে?

ভালোই চলছে।

তবে কাকীমা কেন বললেন তোর পড়ায় মন নেই?

মা'র ইচ্ছা, আমি কেবল পড়ার বই নিয়ে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করি। সবসময় ও ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভালোলাগে না।

তবে আর কি করিস?

অন্য সব বই পড়ি, বেড়াই।

কোথায় বেড়াতে যাস ?

আগে লেকের ধারে যেতাম। এই দু'সপ্তাহ হল কলেজে যাই।

বিকালে আবার কলেজে যাস কেন ?

পূজার ছুটির মধ্যে আমাদের কলেজে রি-ইউনিয়ন হবে। সে সময় আমরা শরৎচন্দ্রের বিজয়া অভিনয় করব। তারই রিহার্সাল দিতে যাই।

বিজয়ার পাঠ কে নিয়েছে ?

আমি নিয়েছি।

নরেন কে হবে ?

অজিত রায়।

অজিত রায় কি কলেজেই আছেন ?

না, তিনি গত বছর বি. এ. পাস করে এখন ল'কলেজে পড়ছেন।

এর আগে তঁরে সঙ্গে থিয়েটার করেছিস ?

আমি এইবারই প্রথম থিয়েটারে নামছি। তুই আমাদের থিয়েটার দেখতে যাবি ?

যেতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পর বাবার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। অজিত রায়ের সঙ্গে তোর পরিচয় কতদিনের ?

ওঃ, তোমার এই ওকালতী জেরার তাৎপর্য আমি বুঝে ফেলেছি। আর উত্তর দেব না।

তা না দিলি। এখন বলতো অজিত রায় থাকেন কোথায়, তাঁর ঠিকানা কি ?

আমি জানি নে। আমাকে এখন রান্নাঘরে যেতে হবে কাজ আছে— বলেই নমিতা উঠে গেল।

এরপর নমিতার সঙ্গে শিউলীর এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হল না। খাওয়া শেষ হয়ে ফেরার সময় অপর্ণাদেবী শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

কিছু বুঝতে পারলে ?

যা বুঝলাম তাতে লক্ষ্ণৌ-এর সম্বন্ধ হবে না। অন্য কিছু বলার মতো কোনো কথা এখনও সঠিক ধরতে পারি নি। নমিতাদের কলেজে রি-ইউনিয়নে থিয়েটার হবে। আপনি থিয়েটারে গিয়ে অজিত রায় নামে যে ছেলেটি নরেনের পাঠ করবে তাকে একটু লক্ষ্য করবেন।

লক্ষ্য করতে যাব কেন! অজিত আমাদের পরিচিত ছেলে।

কতদিনের পরিচয় ?

যেবার নমিতা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে আসে। সেই

বারই এক সন্ধ্যায় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অজিত ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসেছিল। তারপর আরও দু'তিন বার এসেছে। ছেলেটি খুব ভালো বাঁশি বাজায়।

তাহলে এই দিকেই নজর রাখুন।

কিন্তু ছেলেটির যা পরিচয় পেয়েছি তাতে তার মা-বাপ, চাল-চুলো কিছুই নেই।

তা না থাকল। নমিতার দিকে তাকিয়েই আপনাকে সব কিছু করতে হবে।

কিন্তু এদিক থেকে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো আছে।

কি সে ব্যাপার?

নমিতার ওপরে অজিতের তেমন কোনো আগ্রহ নেই।

এটা কিসে বুঝলেন?

অজিত বার তিনেক এ বাড়ীতে এসেছিল। আমিও কয়েকবার ওদের কলেজের জলসায় গিয়েছি। জলসায় অজিতের বাঁশির সঙ্গে নমিতা এসরাজ বাজায়। সব জায়গায়ই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। এমনকি এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেটুকু স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, সে টুকুও নেই।

আপনি দেখছি আর একটা সমস্যায় আমাকে ফেললেন।

হ্যাঁ মা, নমিতার ভবিষ্যত চিন্তা করে আমি বড়ো ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। মা, তুমি একটু এর মধ্যে এগিয়ে এস। তোমার কাকাবাবুকে এ পর্যন্ত আমি কিছু বলি নি। পুরুষমানুষে এ সব ঘোর প্যাঁচ বুঝবে না। তুমি সব বুঝে কিছু কর।

কাকীমা, এর জন্য আমাকে অনুরোধ করার কোনো মানে হয় না। এটা আমার কর্তব্য।

কার্তিক মাস। বেশ একটু শীতের আমেজ পড়েছে। চিৎপুরে আতরের দোকানের পিছনে ছোটো ঘরে ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ওমর সাহেব গুড়গুড়ি টানছেন। হেকিম নছির সাহেব দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন।

আঃ রেঃ, এ যে দোস্ত! পাকিস্তান থেকে কখন এলে?

এই তো সন্ধ্যায় ঢাকা মেলে এসে পৌঁছেছি।

পাকিস্তানের খবর কি?

খবর আর কি, হিন্দুরা সব ছেড়ে পালাচ্ছে। ইচ্ছা করলেই হিঁদুর বাড়ী সম্পত্তি দখল করা যায়।

বল কি! টাকাপয়সা লাগবে না?

সেটা আমাদের মেহেরবানি, দিলে পায়, না দিলে পায় না।

খাবার জিনিস কি রকম পাওয়া যায়?

গোস্ত্, মাছ, দুধ, ঘি খুব শস্তা আর খাঁটি।

তাহলে তুমি কি ঢাকায় কোনো বাড়ী দখল করেছ?

দখল করে কি হবে, বাড়ী দখল করে তার তদ্‌বির চালাব কি করে?

কেন! যদি একখানা বড়ো বাড়ী দখল করতে পারো, তবে বাড়ী ভাড় দিয়ে তদ্‌বির চালাবে।

যারা ভাড়া নেবে তারাও তো ইচ্ছা করলে বাড়ী দখল করতে পারে। বহু হিঁদু তাদের বাড়ী মুসলমানকে ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু এক পয়সাও ভাড়া পায় না। অধিকন্তু মুসলমান ভাড়াটেরা হিঁদু বাড়ীওয়ালার কান ধরে খুশিমত বাড়ী মেরামত করিয়ে নেয়।

হিঁদুরা এর জন্য মামলা করে না?

মামলা করার মতো আস্পর্ধা যদি তাদের থাকবে, তবে আমাদের পাকিস্তান কায়েম করার কি দরকার ছিল?

তাজ্জব কাণ্ড! তাহলে আমরা সত্যিই পাকিস্তান কায়েম করেছি!

জরুর, পাকিস্তান কায়েম হো গিয়া। হিঁদুদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে গেছে। এখন আমরা যা করব তাতেই তাদের হাঁ বলে সাতবার সেলাম ঠুকতে হবে।

তাহলে তুমি কি পাকিস্তানেই যাবে?

গিয়ে কি করব। পাকিস্তানে ব্যবসার তেমন সুবিধা নেই। তারপর ঢাকায় অনেকেই বলেছে, হিন্দুস্তানে থেকেই পাকিস্তানের খিদ্‌মৎ করার সুযোগ বহুত মিলবে।

'বহুত আচ্ছা মেরে দোস্ত।' বলে ওমর সাহেব নছির সাহেবের পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন।

বেশ, এখন তোমার এদিকের খবর বল?

এদিকের খবর, জাফর সাহেব বেশ সেরে উঠেছেন। এখন খানসামার হাত ধরে রাস্তায় বেড়াতে যান।

বালীগঞ্জে যাওয়ার চেষ্টা চলছে না কি?

চলেছিল, আমি কায়দা করে ঠেকিয়ে রেখেছি।

কতদিন থাকবে?

ছুঁড়ীটার পরীক্ষা হয়ে গেলে যাবে।

যাক, তাহলে এখনও কয়েক মাস সময় হাতে আছে।

কিন্তু কাজ উদ্ধার কি করে করবে?

কাজ উদ্ধার আমি ঠিকই করে দেব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা পাকা চুক্তি হওয়া দরকার।

কি চুক্তি?

এই কাজের ফয়সালা করে আমি কি পাব, সেই চুক্তি।

তুমি কি চাও?

আমাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার আর আতরের দোকানটা দিতে হবে।

এত!

বাঃ, তুমি পাবে ব্যাঙ্কের পাঁচ-সাত লাখ টাকা, আর কলকাতায় তিনখানা বাড়ী। সে তুলনায় আমি কি খুব বেশী দাবি করেছি?

আচ্ছা, কাজের ফয়সালা হোক তো।

না, তা হবে না। আগে তুমি খোদার কসম করে চুক্তির দলিল লিখে দাও, তারপর আমি কাজে হাত দেব।

কি লিখতে হবে?

দলিল করতে হবে দু'খানা। একখানায় থাকবে আমি যা পাব তার চুক্তি। আর একখানায় থাকবে তুমি কি করে কাজ হাসিল করছ তার বিবরণ।

সে বিবরণ লিখব কেন?

কাজ হাসিল হলে তুমি যদি আমার পাওনা দিতে গড়িমসি কর, তবে এই দলিলে তোমাকে ফাঁসাব।

তুমি আমার ছেলেবেলার দোস্ত। তুমি এমন কথা বললে!

দ্যাখো, এ লাখ লাখ টাকার কারবার। টাকার কারবারে দোস্তীর কোনো দাম নেই।

কি করে কাজ হাসিল করবে সেটা আগে শুনতে চাই।

তুমি বলেছ জাফর সাহেব ও তোমার বিবি এ সাদীতে রাজি হবে না। সেজন্য প্রথমে ঐ দু'জনকেই সরিয়ে ফেলতে হবে।

আমার বিবিকেও!

তাতে ঘাবড়াচ্ছ কেন? এই সম্পত্তি হাতে এলে বিবির অভাব হবে না। তুমি যে ক'টা বিবি চাও আমি যোগাড় করে দেব। টাকা হাতে থাকলে কত খুবছুরত ছুকড়ি বিবি পাওয়া যাবে।

বল কি! টাকাপয়সা লাগবে না?

সেটা আমাদের মেহেরবানি, দিলে পায়, না দিলে পায় না।

খাবার জিনিস কি রকম পাওয়া যায়?

গোস্ত্, মাছ, দুধ, ঘি খুব শস্তা আর খাঁটি।

তাহলে তুমি কি ঢাকায় কোনো বাড়ী দখল করেছ?

দখল করে কি হবে, বাড়ী দখল করে তার তদ্‌বির চালাব কি করে?

কেন! যদি একখানা বড়ো বাড়ী দখল করতে পারো, তবে বাড়ী ভাড়া দিয়ে তদ্‌বির চালাবে।

যারা ভাড়া নেবে তারাও তো ইচ্ছা করলে বাড়ী দখল করতে পারে। বহু হিঁদু তাদের বাড়ী মুসলমানকে ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু এক পয়সাও ভাড়া পায় না। অধিকন্তু মুসলমান ভাড়াটেরা হিঁদু বাড়ীওয়ালার কান ধরে খুশিমত বাড়ী মেরামত করিয়ে নেয়।

হিঁদুরা এর জন্য মামলা করে না?

মামলা করার মতো আস্পর্ধা যদি তাদের থাকবে, তবে আমাদের পাকিস্তান কায়েম করার কি দরকার ছিল?

তাজ্জব কাণ্ড! তাহলে আমরা সত্যিই পাকিস্তান কায়েম করেছি!

জরুর, পাকিস্তান কায়েম হো গিয়া। হিঁদুদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে গেছে। এখন আমরা যা করব তাতেই তাদের হাঁ বলে সাতবার সেলাম ঠুকতে হবে।

তাহলে তুমি কি পাকিস্তানেই যাবে?

গিয়ে কি করব। পাকিস্তানে ব্যবসার তেমন সুবিধা নেই। তারপর ঢাকায় অনেকেই বলেছে, হিন্দুস্তানে থেকেই পাকিস্তানের খিদ্‌মৎ করার সুযোগ বহুত মিলবে।

'বহুত আচ্ছা মেরে দোস্ত।' বলে ওমর সাহেব নছির সাহেবের পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন।

বেশ, এখন তোমায় এদিকের খবর বল?

এদিকের খবর, জাফর সাহেব বেশ সেরে উঠেছেন। এখন খানসামার হাত ধরে রাস্তায় বেড়াতে যান।

বালীগঞ্জে যাওয়ার চেষ্টা চলছে না কি?

চলেছিল, আমি কায়দা করে ঠেকিয়ে রেখেছি।

কতদিন থাকবে?

ছুঁড়ীটার পরীক্ষা হয়ে গেলে যাবে।

যাক, তাহলে এখনও কয়েক মাস সময় হাতে আছে।

কিন্তু কাজ উদ্ধার কি করে করবে?

কাজ উদ্ধার আমি ঠিকই করে দেব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার একটা পাকা চুক্তি হওয়া দরকার।

কি চুক্তি?

এই কাজের ফয়সালা করে আমি কি পাব, সেই চুক্তি।

তুমি কি চাও?

আমাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার আর আতরের দোকানটা দিতে হবে।

এত!

বাঃ, তুমি পাবে ব্যাঙ্কের পাঁচ-সাত লাখ টাকা, আর কলকাতায় তিনখানা বাড়ী। সে তুলনায় আমি কি খুব বেশী দাবি করেছি?

আচ্ছা, কাজের ফয়সালা হোক তো।

না, তা হবে না। আগে তুমি খোদার কসম করে চুক্তির দলিল লিখে দাও, তারপর আমি কাজে হাত দেব।

কি লিখতে হবে?

দলিল করতে হবে দু'খানা। একখানায় থাকবে আমি যা পাব তার চুক্তি। আর একখানায় থাকবে তুমি কি করে কাজ হাসিল করছ তার বিবরণ।

সে বিবরণ লিখব কেন?

কাজ হাসিল হলে তুমি যদি আমার পাওনা দিতে গড়িমসি কর, তবে এই দলিলে তোমাকে ফাঁসাব।

তুমি আমার ছেলেবেলার দোস্ত। তুমি এমন কথা বললে!

ভ্যাখো, এ লাখ লাখ টাকার কারবার। টাকার কারবারে দোস্তীর কোনো দাম নেই।

কি করে কাজ হাসিল করবে সেটা আগে শুনতে চাই।

তুমি বলেছ জাফর সাহেব ও তোমার বিবি এ সাদীতে রাজি হবে না। সেজন্য প্রথমে ঐ দু'জনকেই সরিয়ে ফেলতে হবে।

আমার বিবিকেও!

তাতে ঘাবড়াচ্ছ কেন? এই সম্পত্তি হাতে এলে বিবির অভাব হবে না। তুমি যে ক'টা বিবি চাও আমি যোগাড় করে দেব। টাকা হাতে থাকলে কত খুবছুরত ছুকড়ি বিবি পাওয়া যাবে।

কি করে এদের সরাবে ?

জাফর মিঞাকে সরাতে খুব অসুবিধা হবে না, সে আগে থেকেই রোগী ! তোমার এই বুড়ীবিবি দু'তিন দিন রোগে ভুগে এন্তেকাল করবেন।

শেষে পুলিশী হাঙ্গামা হবে না তো ?

জাফর সাহেব হার্টের ব্যায়রামে ভুগছে, হঠাৎ হার্টফেল করলে ডাক্তারেও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। তোমার বিবি মুসলমান জেনানা, ডাক্তার দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ইব্রাহিম যদি ডাক্তার আনে, তুমি উপস্থিত থেকে গায় হাত দিতে দিও না, মুখের আবরাও খুলো না। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ও দুটোকে না হয় সরালে, কিন্তু সাদী হবে কি করে ?

ও দু'টো সরে গেলে বাড়ী থেকে করিমের মা ও করিমকে সরিয়ে মেয়েটাকে জেনানায় আটক করতে হবে।

কিন্তু আর এক অসুবিধা আছে, জাফর সাহেবের এটর্ণি অমিয়বাবু তো গোলমাল করতে পারেন।

কিছু করতে পারবে না। এটা হিন্দুস্তান, এখানে কোনো মুসলমান পরিবারের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে পারবে না, সাহসও করবে না।

আরও একটা অসুবিধা আছে। আমার মেয়ে সোফিয়া আর জামাই আবদুল কাদের এখানে আছে। তারা প্রায়ই ঐ ছুঁড়ীটার কাছে আসে। তারা যদি ব্যাপারটা বুঝতে পারে, তবে সব ভেস্তে যাবে।

হাঁ, এটা একটা সমস্যা বটে। তবে এরও একটা ফয়সালা করা যাবে। তোমার ছোটো জামাই তাহের মিঞা এখন একজন বড়ো দরের কংগ্রেসী নেতা। তাকে দিয়ে তদ্‌বির করিয়ে আবদুল কাদেরকে কলকাতার বাইরে দূরে কোনো কলেজে বদলি করতে হবে।

দোস্ত, তুমি পাকিস্তানেই যাও। তোমার যেরকম বুদ্ধি, তাতে সেখানে তুমি মন্ত্রী হতে পারবে।

কি করব দোস্ত, খোদা মাথায় মগজ দিয়েছিলেন, কিন্তু হাতে টাকা দেন নি। নইলে কি আর তোমার মতো রামছাগলের দোস্ত হয়ে এখানে পড়ে থাকি !

মাঘ মাস তার শীতের ডালা পরিপূর্ণ করে সাজিয়ে এনেছে। বাজারে শাক-সবজি-ফল-ফুল প্রচুর। জাফর সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী শিউলী খাবার

ব্যবস্থা করেছে পুরোপুরি নিরামিষ। ডাক্তার কিছু আপত্তি করেছিলেন, উত্তরে জাফর সাহেব আবার বলেন, জীব হত্যার যে বিভীষিকা আমি চোখের ওপরে দেখছি তাতে মাছ-মাংস দেখলেই আমার মনে ঐ দৃশ্য জেগে উঠে ক্ষুধা লোপ পায়।

পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে না পেলেও জাফর সাহেব সুস্থ হয়ে উঠেছেন, রোগের আক্রমণ আর হয় নি। মাঝে মাঝে বালীগঞ্জেও বেড়াতে যান, ওপর তলায় ওঠেন না, নীচতলায় অমিয়বাবুর চেম্বারে বসে গল্প করেন, চা ও খাবার চেম্বারেই আসে। বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলেই কলুটোলা ছেড়ে বালীগঞ্জে আসা হবে।

সরস্বতী পূজার এক সপ্তাহ বাকি থাকতে নমিতা এল শিউলীর কাছে।

তোর পড়াশুনা কেমন চলছে ভাই? প্রশ্ন করল নমিতা।

চলছে একরকম। উত্তর দিল শিউলী।

একরকম মানে ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নির্ঘাত।

নির্ঘাত কি অপঘাত তা বলতে পারি নে। কিন্তু কাল কাকাবাবুর মুখে শুনলাম তুই নাকি আবার কলেজে থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছিস!

সেই জন্যই তো এসেছি। তোকে কিন্তু এবার যেতে হবে।

তা যাব। এখন বল তো থিয়েটারে তোর এত ঝোঁক চাপল কেন?

ঝোঁক দেখলি কোথায়? সেই রি-ইউনিয়নের সময় নেমেছিলাম আর এই সরস্বতী পূজায় নামছি।

যাদের দুমাস পরেই বি. এ. পরীক্ষা দিতে হবে তারা কথনো সরস্বতী পূজায় থিয়েটারে নামে না।

তা নামি আর যাই করি, পরীক্ষায় ঠিক পাস করে যাব।

তা আমি জানি। কিন্তু এইসব না করে পড়ায় মন দিলে আরও ভালো ভাবে পাস করতে পারতিস।

কি জানি, আমার অত সবসময় কলেজের পড়া নিয়ে থাকতে ভালোলাগে না।

হুঁ, সেই জন্য সুযোগ পেলেই থিয়েটারে নামতে ভালোলাগে। তা বেশ, এখন বল তো, কি বই নামানো হচ্ছে?

সিরাজদৌলা।

সিরাজের ভূমিকায় নামছেন কে?

অজিত রায়।

আলেয়ার পার্ট কে করছে ?

আমি।

তাহলে আমি গিয়ে কি করব ?

সত্যি ভাই, গতবার বিজয়ার পার্ট করতে গিয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এ পার্ট যদি তুই করতিস তবে কি সুন্দর মানাতো। আমার স্বভাবে ও রকম গাম্ভীর্যপূর্ণ পার্ট মানায় না, তোর বেশ মানায়।

তা বললেই হত, আমিই পার্টটা করে দিতাম।

বললেও তুই যে করবিনে তা আমি জানি বলেই সে অনুরোধ করি নি।

কেন করব না ?

গোলাপ বাবুকে খুঁজে এনে যদি নরেনের ভূমিকায় নামাতে পারতাম তবে তোকে বিজয়ার ভূমিকায় নামানো সম্ভব হত। তা যখন পারি নি তখন ব্যর্থ অনুরোধ করে কোনো লাভ নেই।

যা হোক একটা সমস্যার এবার কিছুটা সমাধান হয়ে গেল। এখন অবশিষ্টটুকু সমাধানের জন্য তোদের থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।

তোর মনটা বড়ো কুটিল।

আর তোর মনটা বড়ো সরল ?

কিসে আমার মন সরল নয় ?

আজ তিনবছরের বেশী হল তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। আমার সবকথা তোকে বলেছি, কিন্তু তোর কথা তুই এখন হাতেনাতে ধরাপড়েও গোপন করতে চেষ্টা করছিস। তোর সঙ্গে অজিতবাবুর পরিচয় হয়েছে আমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগে। অথচ এই সাড়ে তিনবছরের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও একথা আমাকে জানতে দিস নি।

জানানোর মতো কিছু ঘটে নি তাই জানাই নি। তা যাক, থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ করতে এসে যে হবু ব্যারিস্টার শিউলী চৌধুরীর জেরার পাল্লায় পড়ে এমন নাজেহাল হতে হবে, তা জানা থাকলে এমন কুকর্ম করতে আসতাম না।

তা কি আর হয় ? মনে নেই সেই প্রথম যেদিন পরিচয় হয়, সেদিন তুইই আমার সঙ্গে যেচে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলি। আমি বরং আপত্তি করে বলেছিলাম, সত্যিকারের বন্ধুত্ব একটা গুরুতর ব্যাপার। সে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমাদের পারিবারিক ইতিহাস তোকে শুনিয়েছিলাম। শুনে তুই বলেছিলি ঐ রকম বন্ধুত্বই আমার সঙ্গে করবি। তারপর আমরা দু'জন বন্ধু হয়েছি। এখন তুই যদি এ বন্ধুত্বের মর্যাদা না রাখিস, আমি রাখবই।

সত্যিই আমি একটা অতি ফালতু মেয়ে। তোকে যে কথা আমি সেদিন দিয়েছিলাম এপর্যন্ত সে কথানুযায়ী কিছুই করিনি।

কি কথা!

সেদিন বলেছিলাম, তোর গোলাপকে আমি খুঁজে দেব।

তাহলে এখন থেকে বুঝি খোঁজ করবি?—বলে শিউলী হাসল।

হাঁ, আজ থেকেই আরম্ভ করব।

কি ভাবে আরম্ভ করবি?—শিউলীর মুখের হাসি দূর হয়ে শঙ্কা প্রকাশ পেল।

কৌশলে চাচাসাহেবের কাছ থেকে গোলাপবাবুর ঠিকানাটা জেনে নেব।

খবরদার, অমন কাজ কখনো করতে যাস নে। অল্প একটা কথা বা ছোট্টো একটা ঘটনায় বাবা অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন। তাঁর যে রোগ তাতে মানসিক শান্তির বিশেষ প্রয়োজন। তোর মুখে এ ব্যাপারে কোনো একটু আভাস পেলে ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হবেন।

আচ্ছা, আমি এখন যাই। তোর থিয়েটার দেখতে যাওয়ার অনুমতি আমিই চাচাসাহেবের কাছে আদায় করে নিচ্ছি। বলে নমিতা উঠে জাফরসাহেবের ঘরে গেল।

চাচাসাহেব কেমন আছেন?

ভালোই আছি মা। ট্যাক্সিখানা তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো?

বাবার সঙ্গে গিয়ে আমিই তো পছন্দ করে কিনেছি। শিউলী বলেছে তার নাকি গাড়ির ভালোমন্দ নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

ওঃ এ নিয়ে তাহলে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে।—বলে জাফর সাহেব হেসে উঠলেন।

শিউলীর পছন্দ লাল গোলাপীরঙ, আমার,—।

না বাবা, এ নিয়ে কোনো কথাই হয় নি।—পিছন থেকে বলে উঠল শিউলী।—ও পরীক্ষার পড়া ফেলে থিয়েটার করছে।

তোকে বুঝি থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ করতে এসে বেশ কিছু বকুনি খেয়েছে।—বলে জাফর সাহেব প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

কিন্তু এটাও তো দেখতে হবে, দেড়মাস পরে যার বি. এ. পরীক্ষা; সে থিয়েটার নিয়ে নাচানাচি করে কি করে!

তা করুক, মনে স্ফূর্তি থাকলে পড়াশুনাও ভালো হয়। পড়াশুনার সঙ্গে খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, ব্যায়াম এ সবও প্রয়োজন।

তাহলে শিউলী বুঝি রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করে? প্রশ্ন করল নমিতা।

দেশে থাকতে তো করত। এখন করে কিনা, জানি নে।

তোর কাজ তো হয়েছে, থিয়েটার দেখার আরজি বাবা মঞ্জুর করেছেন। এখন উঠে আয়। বেশীকথা বললে বাবার মাথা গরম হয়।

কোথায় আমি বেশীকথা বলছি, মা। নমিতা এইমাত্র এসেছে। ওর হাসিখুশি কথা আমার বড়ো ভালোলাগে।

বাবা, আমি আজ মটরশুটির কচুরি করব। নমিতা খুব ভালো কচুরি করতে পারে।

কে বলল আমি ভালো কচুরি করতে পারি! একবার করেছিলাম. বাবা খেয়ে বলেছিলো সেগুলো নাকি বিলেতী ডগস্ বিস্কুটের মতো হয়েছে।

তোমার বাবা ভারতে ও ভারতের বাইরে বহুদেশ ঘুরে বহু রকম খাবার খেয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। আমি কিন্তু একবার দিল্লী গিয়ে বিখ্যাত দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে বেশ ঘায়েল হয়েছিলাম। গোলাপী আতর মাখা লাড্ডু খেতে বেশ ভালো, কিন্তু বাঙালী পেটে গোলমাল বাধিয়ে নাজেহাল করে ছাড়ে।

চাচাসাহেব, শিউলী নাকি সুলতানপুরে ভালো গোলাপের বাগান করেছিল?

নে তুই এখন ওঠ, বেলা চলে যাচ্ছে। আমি দুপুরে মটরশুটি, ফুলকপি সিদ্ধ করে রেখেছি। আধঘণ্টার মধ্যে সব তৈরী করে বাবাকে খাওয়ানো চাই।—বলে শিউলী নমিতার হাতধরে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শিউলীর এই অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে জাফরুল্লা চৌধুরী প্রথমে বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মুখ থেকে যেন অজান্তে বেরিয়ে এল, মেয়েটা তাহলে গোলাপকে ভুলতে পারে নি!

সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেবের বদলির জন্য তাহের মিঞা তদ্‌বির চালাচ্ছেন। এজন্য নছিরসাহেব ও ওমর সাহেবের সলাপরামর্শের যতটুকু তাহের মিঞাকে জানানো প্রয়োজন ততটুকুই জানানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাঁরা যে জাফর সাহেব ও জুলেখা বেগমকেও কবরে পাঠাবেন, সেটুকু আর জানান নি।

তাহের মিঞা সব শুনে পরামর্শ দিয়েছেন, জাফর সাহেবের সম্মুখে

প্রস্তাবটা একবার তুলে দেখা উচিত, তিনি সম্মত হন কিনা। এই উদ্দেশ্যে, যেদিন অপরাহ্নে শিউলী গেল থিয়েটার দেখতে, সেইদিন সন্ধ্যার পর ওমর সাহেব, নছির সাহেব ও তাহের মিঞা এলেন জাফর সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে। করিম যখন এসে জাফরসাহেবকে তাঁদের আগমন সংবাদ জানাল, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন,—হঠাৎ এই ত্রয়োস্পর্শের আগমনের উদ্দেশ্য কি! যখন এসেছেন, তখন এনে বসাও।

জাফরুল্লা চৌধুরী হাসিমুখেই তিনজনকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রাথমিক কুশলাদি প্রশ্নোত্তরের পরে তাহের মিঞা বললেন,—

নানাকাজের চাপে এমন একটু ফুরসত পাইনে যে আপনার কাছে আসি। এখানে তো কাজ আছেই, মাসের মধ্যে দু'একবার পাকিস্তানেও যেতে হয়।

তাহলে আপনার ব্যবসা এখন বেশ ভালো চলছে।—বললেন জাফর সাহেব।

ব্যবসার জন্য আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় না, আমার কর্মচারীরাই ঠিকমত চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, কংগ্রেসের ভিতরে থেকে ইসলাম ও পাকিস্তানের খিদমতের জন্য।

কংগ্রেসের ভিতরে থেকে ইসলামের খিদমত করছেন কি করে?

হিঁদুরা আইন করে তাদের সমাজের অনেকপ্রথা তুলে দিচ্ছে। কিন্তু দেখুন, আমাদের ওপরে কোনো আইন চাপাতে সাহস করে না।

কোন আইন চাপাতে সাহস পায় নি?

কেন, সাদীর আইন! আবার শুনছি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইনও করবে। আমরা কংগ্রেস সরকারকে সোজা জানিয়ে দিয়েছি, ও সব আইন আমাদের ঘাড়ে চাপানো চলবে না যতখুশি সাদীকরে বাচ্চা পয়দা করা মুসলমানের জন্মগত অধিকার। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গেলে আমরা ভোট দেব না।

কিন্তু আপনারা এক-একজন যদি তিন-চারটে সাদী করেন, তবে এত মেয়ে জুটবে কোথা থেকে?

সেকালে যখন মুসলমানরা আরব-পারশ্য তুরস্ক থেকে এদেশ এসে বাদশাহী করতেন, তখন তাঁরা ওদেশ থেকে জেনানা সঙ্গে করে আনেন নি। এই দেশেই প্রয়োজনমতো জেনানা সংগ্রহ করেছিলেন। আমরাও তাই করব।

এতে আপনাদের কি লাভ হবে?

এখন দুনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের যুগ চলছে। পশ্চিম ও পূর্বভারতে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম বলেই পাকিস্তান পেয়েছি। এখন হিন্দুস্তানে হিঁদুরা

অনেক বয়সে একটা মাত্র বিয়ে করছে। কালে নাকি তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণও করবে। হিঁদুদের এই বোকামির সুযোগ নিয়ে আমরা যদি তিন-চারটে সাদী করে আওরতদের চৌদ্দ-পনর বছর বয়স থেকেই বাচ্চা পয়দা করার কাজে লাগাতে পারি, তবে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে অন্তত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে এ দুটোকেও পাকিস্তান করতে পারব।

এ সব যুক্তিবুদ্ধি কি আপনার নিজস্ব ?

জে ঃ না। এ সব আমাদের লীডারদের মতলব।

এই জন্যই বুঝি লড়কে লেঙ্গে করে পাকিস্তান আদায় করার পরও হিন্দুস্তানেই থেকে গেলেন!

হাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। এখন আমরা এই কাফেরীস্তানে আছি আরও বেশীকরে পাকিস্তান ও ইসলামের খিদ্‌মত্ করার জন্য।

বেশ। তা দেখুন, ডাক্তার আমাকে বেশীক্ষণ আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন।

আমরা আপনার দরবারে আজ এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবটা হেকিমসাহেব পেশ করবেন।

আপনাদের কি প্রস্তাব ?—প্রশ্ন করলেন হেকিম সাহেবকে।

আপনার মেয়ে রোশনারার সঙ্গে ইব্রাহিমের খুব মিলমহব্বত চলছে। আপনি এই দু'জনের সাদী কবুল করালে আমরা খুব খুশী হব, সবদিক থেকেই ভালো হবে।

রোশনারা ও ইব্রাহিমের মিলমহব্বতি দেখে আপনারা যা ভেবেছেন ব্যাপারটা তা নয়। সে রকম যদি হত, তবে আমি প্রথমেই আপত্তি করে দুজনকে মেলামেশা করতে দিতাম না।

কিন্তু এরকম সাদী তো ইসলাম সম্মত।

অর্থনৈতিক কারণে এরকম সাদী ইসলাম সম্মত হলেও আধুনিক নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্মত নয়। আমার মনে হয় আমাদের সমাজে এইরকম নিকটতর রক্ত সম্বন্ধের মধ্যে বিয়ে সাদী খুব বেশী প্রচলিত থাকায় সেরকম কোনো বিখ্যাত মনীষী জন্মায় না।

কায়েদে আজম জিন্না সাহেব, মহাকবি ইকবাল,—এঁরা কি মনীষী নন?

যে দুজনের নাম করলেন এঁদের বাপ-ঠাকুরদাদা হিন্দু। সেই হিন্দু মনীষাই এঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ওমরসাহেবের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন পারস্য থেকে। সেজন্য আপনি এঁর পরামর্শদাতা হয়ে ইচ্ছামত এঁকে চালাতে

পারছেন। আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির হেতু, আপনার বড়োঠাকুরদাদা ছিলেন হিন্দু বণিক।

তাহলে এ সাদীতে আপনার মত নেই।

হাঁ। ইব্রাহিমেরও মত নেই।

ইব্রাহিমের মত নেই, এটা কি করে জানলেন?—প্রশ্ন করলেন ওমরসাহেব।

সোফিয়া আমাকে বলেছে।

কলেজে নমিতা নামকরা মেয়ে। একে সে ভালো ছাত্রী, তারপর সুন্দরী সুকণ্ঠী ও ভালো অভিনেত্রী। পিতৃপরিচয়েও নমিতা শিক্ষিত উচ্চবংশের মেয়ে।

অভিনয়ের দিন নমিতা অমিয়বাবুর সঙ্গে বেলা তিনটা বাজতেই কলেজে গেছে। কলেজে গিয়ে সে তার বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছে শিউলীর আসার কথা। শিউলী আসবে শুনে নমিতার বন্ধুরা সকলেই খুব উল্লসিত হল, কিন্তু প্রধান অভিনেতা অজিত রায় কোনো কিছু বললেন না।

বেলা পাঁচটায় আরম্ভ হবে সারস্বত সম্মেলন, একঘণ্টা পরে হবে থিয়েটার। পাঁচটা বাজার কিছু পূর্বে জাফর সাহেবের নতুন কেনা গাড়িতে এসে পৌঁছলেন অপর্ণাদেবী, সোফিয়া, শিউলী ও সৈয়দ সাহেব।

কলেজের অধ্যাপক মহলে অপর্ণাদেবী ও সৈয়দ সাহেব সুপরিচিত। সোফিয়ার পরিচয় পেয়ে সকলে আনন্দে তিনজনকে অভ্যর্থনা করে নিজেদের মধ্যে বসালেন। শিউলীকে অভ্যর্থনা করল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

নমিতা তার বন্ধুদের সঙ্গে শিউলীর পরিচয় করে দিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে গেল। একে শিউলী অপূর্ব রূপসী, তারপর তার সহজ আভিজাত্য ব্যঞ্জক হাবভাব পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা সেখানে উপস্থিত সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রঙ্গমঞ্চে সারস্বত সম্মেলনের আয়োজন চলছে। মঞ্চের সম্মুখে মহিলাদের আসনে কয়েকটি ছাত্রীর সঙ্গে বসল শিউলী। অনেকগুলি মেয়ে শিউলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করতে আগ্রহী দেখে সে বলল,—

আপনারা আজ এখানে যেরকম বন্ধুভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন, তাতে আমি আশা করি এ পরিচয় আমাদের মধ্যে স্থায়ী হবে। আমার বাবা আপনাদের মতো শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করতে খুব ভালোবাসেন।

সুযোগ সুবিধামত আপনারা যদি আমাদের বাড়ী যান তবে বাবা খুব খুশী হবেন। আমার বাবা মহম্মদ জাফরুল্লা খান চৌধুরীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে নোটবই বের করে জিজ্ঞাসা করল,—আপনার ঠিকানা?

কলুটোলা।

ক-লু-টো-লা!!

আমাদের আর একটা বাড়ী আছে বালীগঞ্জে। শীঘ্রই আমরা ঐ বাড়ীতে উঠে যাব। আপনারা বালীগঞ্জের ঠিকানা লিখে নিন।

মেয়েরা বালীগঞ্জের ঠিকানাই লিখে নিল।

সারস্বত সম্মেলন আরম্ভ হল। সভাপতির অনুরোধে সৈয়দ সাহেবও ছোট্টো একটা বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তব্য হল, যে শিক্ষা মানবের মন থেকে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার দূর করে মানুষকে যুক্তিবাদী সত্যানুসন্ধিৎসু করে তোলে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষের চিত্তের প্রসারতা বৃদ্ধি করে নব নব তথ্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত করে। তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত মানব গোষ্ঠীর স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হয়। প্রাচীনকালে ভারতে এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিদ্যাচর্চা করা হত। আজ স্বাধীন ভারতে আবার আমাদের সেই আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।

সৈয়দ সাহেবের বক্তৃতার জের টেনেই সভাপতি তাঁর অভিভাষণ দিলেন। সারস্বত সম্মেলন শেষ হয়ে আরম্ভ হল অভিনয়।

অভিনয় আরম্ভের প্রথমে ছিল বাঁশি। মঞ্চের পরদা সরে গেল, দেখা দিল বাঁশি হাতে অজিত রায়, এস্‌রাজ নিয়ে নমিতা আর একজন তবলচি। তিনজন দর্শকমণ্ডলীকে নমস্কার করে বাজাতে বসল। নমিতার এস্‌রাজ আরম্ভ হয়ে গেল কিন্তু বাঁশি বাজেনা। বাঁশিওয়ালা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিউলীর দিকে, মাঘমাসের শীতেও কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

শিউলী তাকিয়ে আছে বাঁশিওয়ালার দিকে। চোখে তার পলক নেই, বুকে স্পন্দন নেই, মুখের রক্ত সরে গিয়ে সরস্বতী প্রতিমার মতো সাদা হয়ে গিয়েছে।

তবলচি সতর্ক করে দিতেই বাঁশি বেজে উঠল, কিন্তু তার তাল সামলাতে হল এস্‌রাজে। বাঁশি শেষ হয়ে আরম্ভ হল অভিনয়। সিরাজদ্দৌলা নাটক ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী সংক্ষিপ্ত করে দেড়ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় শেষ হল। শেষে ছিল আবার সেই বাঁশি। বাঁশিতে এবার বেজে উঠল

একখানা ভাটিয়ালী সুর। এবার আর এসরাজকে তাল সামলাতে হল না, বাঁশিওয়ালা যেন তার প্রাণের সবকিছু উজার করে বাঁশির সুরে ঢেলে দিল।

অভিনয় আরম্ভে রঙ্গমঞ্চে পরদা প্রথম ওঠার পর বাঁশিওয়ালা অজিত রায়কে দেখে শিউলী যে রকম আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, পরবর্তী দেড়ঘণ্টা অভিনয় কালের মধ্যে সে আর প্রকৃতিস্থ হতে পারল না। অভিনয়ের শেষে বাঁশির ভাটিয়ালী সুরের প্রথম ঝঙ্কারে শিউলী একবার চমকে উঠেছিল, এ যে চেনা সুর! চেনা সুর একবার মাত্র একটা চমক জাগিয়েই তার মন টেনে নিয়ে গেল সুদূর অতীতে সুলতানপুরের বাড়ীর পিছনে ভৈরবের তীরে চৈতি দুপুরে ছায়াশীতল বকুলগাছের তলায়।

বকুলগাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শিউলী উপুর হয়ে শুয়ে দেখছে ভৈরবের বুকে ছোটো ছোটো ঢেউগুলো কেমন নাচে। পাশে বসে গোলাপ বাঁশি বাজাচ্ছে। ভাটিয়ালী গানের সুর। মাত্র একটা কলি বাজাতে শিখে তাই ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কি মিষ্টি সে সুর। ভৈরবের বুকে ঢেউ-এর নাচের সঙ্গে বাঁশির সুরের যেন বেশ মিল আছে।

হঠাৎ আকাশে ডেকে উঠল একজোড়া শঙ্খচিল, কোঁয়া কোয়া কোঁ-আঁ-আ। চঞ্চল গোলাপ বাঁশি থামিয়ে শঙ্খ চিলের মতোই ডাকল কোঁয়া কোঁয়া কোঁ-আঁ-আ।

শিউলী রেগে গেল, উঠে বসে বলল,—তুই বাঁশি থামালি কেন?

গোলা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবার শঙ্খচিলের ডাক ডাকল।

এবার শিউলী আরও রেগে বলল,—আজ আমি কিছুতেই বকুল ফুল কুড়বো না, মালাও গাঁথবো না।

বৈঁচি খাবি? অনেক বৈঁচি পেকেছে।

না, খাব না।

আমি যে বাঁশি বাজাতে ভালো শিখিনি।

যা শিখেছিস তাই বাজা।

গোলার বাঁশি আবার বেজে উঠল।

গোলার বাঁশি শোনা সেই শেষ। তারপর এই বারো বছর শিউলী কোথাও ও সুরে বাঁশি শোনে নি।

অভিনয় শেষ হলে সকলে বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শিউলী তার চেয়ারে বসে আছে। তখনও তার দৃষ্টি রয়েছে রঙ্গমঞ্চের দিকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে হুঁ বা না, এই সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া আর কিছু বলেনা।

সোফিয়া বসেছিল অধ্যাপকদের মধ্যে। সে এসে শিউলীকে দেখে প্রশ্ন করল—তোর কি অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ। বড়ো মাথা ঘুরছে।

এ রকম ভিড় হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে যাওয়া অভ্যাস নেই তো, সেইজন্য এরকম হয়েছে। বাড়ী গিয়ে ঘুমোলে সেরে যাবে। আমরা অপর্ণা দেবীর সঙ্গে যাচ্ছি, তুই আর নমিতা কাকাবাবুর গাড়িতে যা। এই বলে সোফিয়া চলে গেল।

একটু পরে এল নমিতা, তার সঙ্গে এল যারা অভিনয় করেছে তাদের অনেকে। কিন্তু তাদের মধ্যে শিউলী যাকে দেখতে চায় সেই অজিত রায় আসে নি। নমিতা তার সঙ্গীদের সঙ্গে শিউলীর পরিচয় করে দিল। তারা সকলেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ইচ্ছুক। সে ইচ্ছায় সহজ সরল ভাবে শিউলী সাড়া দিতে পারল না, কথা যেন কেমন জড়িয়ে গিয়ে অসংলগ্ন হতে লাগল।

একজন অভিনেতা শিউলীকে বলল,—আমাদের দর্শকেরা অনুরোধ করেছেন, 'বিজয়ার' অভিনয় আর একবার তাঁরা দেখতে চান। যদি সম্ভব হয় তবে আগামী শনিবারে আমরা 'বিজয়া' অভিনয় করব। সে অভিনয়ে কিন্তু আপনি আসবেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। কে অভিনয় করবে ?

আমাদের নমিতা হবেন বিজয়া।

আর কে কে অভিনয়ে নামবেন ?

আমি হব রাশবিহারী আর অজিতবাবু নামবেন নরেনের ভূমিকায়।

হ্যাঁ, আমি আসব। কবে আপনারা থিয়েটার করবেন ?

আগামী শনিবারে।

বেশ, আমি আসব। আজ কি বার ?

সোমবার।

ওঃ এখনও পাঁচদিন বাঁকি। বেশ আমি আসব। নিমন্ত্রণের জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এরপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে শিউলী নমিতার সঙ্গে গাড়িতে উঠল। অমিয়বাবু গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

গাড়ীতে বসে নমিতা তার অভিনয়ের কৃতিত্বে উৎফুল্ল হয়ে সমানে বলে চলল,—আজ অভিনয় মোটেই ভালো হয় নি। অজিতবাবু যে এত খারাপ করবেন, তা জানলে আমি কখনো স্টেজে নামতাম না। সহ-অভিনেতার

দোষে ভালো অভিনেতার অভিনয়ও খারাপ হয়। এর চাইতে বিজয়া অনেক ভালো হয়েছিল। আজ যা হল, তাতে আমার খুবই লজ্জা করছে। এ রকমটা হবে বুঝলে তোকে কখনো আসতে বলতাম না। কিন্তু অজিতবাবুকেও দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বাঁশি বাজিয়ে এসেই বলেছিলেন, তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর গায় হাত দিয়ে দেখেছি মাথা খুব গরম, হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, অথচ ঘেমে জামা ভিজে গিয়েছে। এমন অসুস্থ শরীরেও তিনি যা অভিনয় করেছেন তা আর কেউ করতে পারত না। মাঝে মাঝে যে তাঁর পাঠ ভুল হচ্ছিল, ওটা অত্যন্ত মাথা ধরার জন্য। অজিতবাবু খুব ভালো অভিনেতা। এ পর্যন্ত অনেক অভিনয় তিনি করেছেন, এ রকম কোনোদিন হয় নি। তা সত্ত্বেও কিন্তু সকলেই তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। অজিতবাবু যদি সুস্থ থাকেন আর আগামী শনিবারে যদি থিয়েটার হয়, তবে দেখতে পাবি তিনি কত উঁচুদরের অভিনেতা।

যার কানের কাছে নমিতা এই মন্ত্র পড়ে চলেছে, সে কিন্তু নির্বাক। গাড়িতে উঠেই শিউলীর মনে জেগেছে সুলতানপুরের বাগানে বকুলতলায় গোলাপের বাঁশির সুরের পাশে আজ রাতের অজিতের বাঁশির সুর। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন, আর একটা সুস্পষ্ট কলধ্বনি, কিন্তু দুটোই এক!

নমিতা তার নিজের ভাবে বিভোর থাকায় গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে শিউলীর এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারল না। এমন কি গাড়ি কলুটোলা বাড়ীর দরজায় পৌছলে শিউলী যে মামুলী বিদায় নিয়েই ভিতরে চলে গেল, এটাও নমিতার নজরে পড়ল না।

ঘরে গিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই শিউলী বিছানায় বসে পড়ল, চোখে জেগে রইল একটা স্বপ্নজড়ানো ভাব। করিমের মা নিয়ে এল খাবার। শিউলী জানাল সে খাবে না, ক্ষুধা নেই। রাত ন'টা বাজলে করিম এসে জানাল, হুজুর ডাকছেন। শিউলী উঠে জাফর সাহেবের ঘরে গিয়ে নীরবে রাতের ওষুধ, খাবার জল, সব সাজিয়ে রেখে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জাফর সাহেবও শিউলীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না।

শিউলী নিজের ঘরে এসে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর খুললো বড়ো একটা টিনের বাক্স। বাক্সের ওপরের সব জিনিসপত্র নামিয়ে নীচ থেকে বের করল একখানা ফটো। ফটোখানা টেবিলের ওপরে রেখে রীডিংল্যাম্প জেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর টেবিলের ওপরে কনুই রেখে দুই হাতে মাথার দুই পাশ ধরে আপন মনে বলতে লাগল,—

সব এক। চোখ, কান, নাক, মুখ, সব এক। কেবল বয়সের যা তফাত। কিন্তু এ কি সম্ভব? গোলা কলকাতায় আছে আর আমার সঙ্গে দেখা করে না! সুলতানপুর হতে দেওয়ান চাচী চলে যাওয়ার আট বছর পরে বাবা একদিন বলেছিলেন বহরমপুরে ভাই-এর বাসায় তিনি মারা গেছেন, গোলা আই. এ. পরীক্ষায় পাস করে বৃত্তি পেয়েছে। গোলা কোন কলেজ থেকে আই. এ. পাস করল, কোথায় আছে তা কিছুই বাবা বলেন নি। তিন বছর আগে গোলা আই. এ. পাস করেছে। তাহলে গতবার বি. এ. পাস করার কথা। সবই মিলে যাচ্ছে। কি-ন্-তু-উ গোলা কলকাতা আছে অথচ আমার সঙ্গে দেখা করল না! কলুটোলায় এ বাড়ীতে তার আসা সম্ভব নয়, এ কথা ঠিক। কিন্-তু-উ বাবার সঙ্গে কি দেখা করে না?

অনেকক্ষণ ভেবে শিউলী উঠে ঘরের দরজা খুলে করিমকে ডাকল। করিম এলে তাকে বলল,—তোমাকে একবার কাকাবাবুর কাছে যেতে হবে।

এই রাত্রে!

আচ্ছা, কাল ভোরে গেলেই চলবে। কাল বেলা দশটায় যেন কাকাবাবু গাড়ি পাঠান আমি বালীগঞ্জ যাব। আর নমিতাকে বলবে, সে যেন বাড়ীতে থাকে।

ভোরে করিম বালীগঞ্জে গিয়ে ফিরে এল সাতটার মধ্যেই। সঙ্গে এসেছে নমিতা। নমিতাকে দেখে শিউলী বলল,—তুই পড়া ছেড়ে এলি কেন? আমিই তো যেতে চেয়েছিলাম।

না এসে করি কি বল! রাত বারোটায় করিমভাইকে তলব; ভোরে বালীগঞ্জে করিমভাই'এর আবির্ভাব, আমাকে বাড়ী থাকার জন্য কড়া নির্দেশ, এতগুলো গুরুতর ঘটনার পরেও কি তিন চারঘণ্টা অপেক্ষা করা সম্ভব?

বেশ, তাহলে গাড়ি ফিরিয়ে দে। ড্রাইভারকে বলে দে, এখন তুই যেতে পারবি নে, দুপুরের পর যাবি।

নমিতা শিউলীর কথামতো করিমকে পাঠিয়ে গাড়ি বিদায় করে দিয়ে শিউলীকে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কি বল তো?

সে অনেক কথা, ধীরে সুস্থে বলতে হবে। তুই তো দেখছি ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছিস। এখন বাথরুমে গিয়ে স্নান করে নে। আজ মাসীকে ছুটি দিয়ে আমরা দুজনে রান্না করব। রান্না করতে করতে সব আলোচনা করব।

তাহলে করিমকে বাজারে পাঠিয়ে ভালো রুইমাছ আর গল্‌দা চিংড়ী নিয়ে আয়। চাচাসাহেব আমার রান্না খুব পছন্দ করেন।

বাবা মাছ-মাংস একেবারেই খেতে চান না। তুই বলে যদি খাওয়াতে পারিস তবে ভালোই হয়।

আচ্ছা, তবে চল, চাচাসাহেবকে বলে আমাদের রান্নার তালিকা ঠিক করব।

জাফর সাহেব জানালার কাছে ইজিচেয়ারে শুয়ে সংবাদপত্র পড়ছিলেন। নমিতাকে ঘরে আসতে দেখে সোজা হয়ে বসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—

এত সকালেই যে নমিতা মা এসে পড়েছে; ব্যাপার কি! কাল থিয়েটার কেমন হল?

খুব ভালো হয় নি!—উত্তর দিল নমিতা।

কেন ভালো হল না?

সিরাজের পাঠ ছিল অজিত রায়ের। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

তবে কে সিরাজের পাঠ করল?

অজিতবাবুই করেছেন।

অজিত তো এখন তোমাদের কলেজে নেই!

হাঁ, তিনি আমাদের কলেজ থেকেই গত বছর পাস করে ল'কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ভালো অভিনয় করতে পারেন বলে এখনও আমরা তাঁকে ডেকে আনি।

তোমাদের কলেজে সকলের সঙ্গে শিউলীর আলাপ পরিচয় হল কেমন?

আমি থিয়েটার নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। থিয়েটার ভাঙলে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

অজিতের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হল?

না, শরীর অসুস্থ বলে তিনি আগেই চলে গিয়েছিলেন।

সোফিয়া সকলের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করল?

দিদি বসেছিলেন অধ্যাপকদের মধ্যে। সৈয়দ সাহেব সারস্বত সম্মেলনে চমৎকার বক্তৃতা করেছেন। সকলেই তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন। দিদিও সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এসেছেন।

এই সোফিয়া ছেলেবেলায় যেভাবে মানুষ হয়ে বিয়ে হয়েছিল। তাতে তখন কেউ ভাবতেই পারত না যে, সে একদিন কলেজের অধ্যাপক ও তাঁদের শিক্ষিতা স্ত্রীদের মধ্যে বসে সমানে আলাপ আলোচনা করতে পারবে। আসল কথা হচ্ছে শিক্ষা। সে শিক্ষায় যদি সমাজের মেয়েরা বঞ্চিত থাকে তবে সে সমাজ হয় অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো।

নমিতা বুঝি এসে গল্প জুড়ে দিয়েছে।—বলতে বলতে শিউলী ঘরে প্রবেশ করল।

না মা। নমিতাকে আমিই জিজ্ঞাসা করছি, কাল থিয়েটারে গিয়ে সোফিয়া সকলের সঙ্গে কেমন মেলামেশা করল।

দিদি তো আজ সাত-আট বছর এ রকম মেলামেশা করে আসছেন!

হাঁ, সেই কথাই বলছিলাম। ছেলেবেলায় সোফিয়া সে রকম শিক্ষা না পেলেও আবদুল কাদের তাকে শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত করে নিয়েছে।

বাবা, আজ নমিতা এখানে থেকে নিজহাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াবে বলছে।

তাহলে তো আজ ভোজ খাব!

নমিতা আমাকে ভালো রুইমাছ আর গল্‌দা চিংড়ী আনতে বলছে।

আমি তো ও সব খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছি। নমিতা মা যদি খাওয়াতে চায় তবে খাব।

তাহলে চাচাসাহেব বলুন, সকালে কি রান্না করব।

তোমরা আগে বল ক'পদ খাবার রান্না করতে চাচ্ছ।

সকালে চার পদ আর দুপুরে সাত পদ।

ও খুব কম হয়ে গেল, মাত্র এগার পদ। এতে সময় লাগবে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা।

তবে কি আমি মুশুরির ডাল আর আলুভাজা আপনাকে খাওয়াব!

না, তা আমি বলছিনে। আমি বলছি পৃথিবীতে বোধহয় ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়েদের মতো রন্ধনবিলাসিনী আর কোন দেশের মেয়েরাই নয়।

এটা কি আমাদের দোষ?

এটা যদি তোমরা শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে এক-একদিন এক একটা পদ রান্না কর তবে গুণ। আর তা না করে যদি দু বেলায় এগার পদ রান্না কর, তবে দোষ।

তাহলে চাচা সাহেবের মতে সকাল বেলা একটা কিছু ভাজা আর খানকতক লুচি করলে আমরা গুণবতী হব। অত গুণবতী হয়ে আমাদের দরকার নেই। চল শিউলী, আমরা আমাদের পছন্দমতো সব করি গিয়ে।

সকালে চা ও জলখাবার খাওয়া হয়ে গেলে দুপুরের রান্নার যোগাড় করতে বসে নমিতা শিউলীকে বলল,—

এইবার শুনতে চাই তোর জরুরী ব্যাপারটা।

অজিত রায়ের পুরো পরিচয়টা জানতে চাই।—বলেই শিউলী চমকে উঠে দাঁড়াল।

নমিতা বাঁধাকপি কুটছিল, মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করল,—উঠলি যে?

শিউলী একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল,—আমি একটু তেতলায় যাচ্ছি। তুই কপি কুটে আলু আর ফুলকপিটাও কুটিস্।

জীবমাত্রেই স্বরূপত স্বার্থপর। মানুষও জীব। শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে মানুষ পরোপকারী হতে পারে, কিন্তু নির্ভেজাল নিঃস্বার্থ হতে পারে না। কারণ, যেটা স্বভাব সেটা ত্যাগ হবে কি করে! যাঁদের আমরা নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী আত্মত্যাগী মহাপুরুষ বলে জানি, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাঁরাও জনসাধারণের প্রশংসা লোভী। যাঁরা জনসাধারণের প্রশংসাও চান না, তাঁরা স্বর্গ বা মোক্ষ লোভী। সব ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ঐ এক স্বার্থ।

শিউলীর মন অধিকার করে আছে গোলাপ। তার মনের যে দিকটা গোলাপ অধিকার করেছে, এ বয়সে মেয়েদের সেই দিকটাই প্রধান। সেদিকে উত্তেজক কিছু ঘটলে আর সব চাপা পড়ে যায়। বাঁশিহাতে অজিতকে দেখে ও অভিনয়ের শেষে তার পরিচিত ভাটিয়ালী সুর শুনে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। অর্পণাদেবীর সঙ্গে এই অজিত রায় ও নমিতা সম্পর্কে তার যে আলোচনা হয়েছিল, সে কথা এ পর্যন্ত একবারও তার মনে পড়ে নি। সে কথা মনে পড়ল নমিতাকে অজিত রায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

কোনো খাতের প্রখর জলস্রোত যদি হঠাৎ প্রবল বাধা পায় তবে যেমন বাঁধ ভেঙ্গে দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করে, শিউলীর চিন্তাপ্রবাহে ঘটে গেল হঠাৎ সেই রকম বিপর্যয়। নমিতা অজিত রায়কে কি চোখে দেখে, সে বিষয়ে সঠিক কোনো কথা অপর্ণাদেবী শিউলীকে বলতে পারেন নি, বরং শিউলীই সন্দেহ করেছিল। এখন সেই অজিত রায়ই যদি গোলাপ হয়? হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট; চোখের দৃষ্টি, নাক, কান, মুখের গড়ন, সব এক!

অনেকক্ষণ লাগল শিউলীর মনস্থির করতে। শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিতে এসে সে স্থির হল, অজিত রায়ই যদি গোলাপ হয়, তবে তাতে তার ক্ষতি বৃদ্ধির কি হেতু থাকতে পারে! শিউলী মুসলমান, গোলাপ হিন্দু। হিন্দু গোলাপ বড়ো হয়ে যদি হিন্দু নমিতাকে বিয়ে করে, তবে মুসলমান শিউলীর ক্ষুব্ধ হওয়া নিশ্চয়ই অসঙ্গত।

যেখানে গভীর জল থাকে, সেখানে বাতাসের বেগে জলের ওপরে তরঙ্গ উঠলেও গভীরে থাকে স্থির। মানুষের মনের ব্যাপার কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। তর্কযুক্তির সাহায্যে মনের ওপরের দিকটা শান্ত করা যায়, কিন্তু মনের গভীরে কোনোদিক থেকেই তর্কযুক্তির কোনোস্থান নেই। সেখানে স্থান পায় একমাত্র অকৃত্রিম অনুভূতি। তথাপি মানুষ কিন্তু তার মনের ওপরের ভাবটা নিয়েই চলে, আর না চলেও তার উপায় নেই।

শিউলীও যুক্তির আশ্রয়ে মন শক্ত করে নিয়ে গেল নমিতার কাছে। রান্নার যোগাড় সব হয়ে গেছে। শিউলীকে দেখে নমিতা বলল,—

এইবার তাহলে রান্না চড়িয়ে দেওয়া যাক?

এর জন্য কি তুই আমার অপেক্ষা করছিস?

বাঃ, রান্না যে দু'জনেই করব কথা আছে।

না, রান্না কখনো দুজনে করতে পারে না। একজনে রান্না করবে তার নিজের পছন্দমত, আর সকলে তার যোগাড় দেবে। তবেই রান্না ভালো হবে?

তুই কবে থেকে রান্না বিশেষজ্ঞ হয়েছিস বল তো?

তার আগে আমার সেই প্রশ্নটার উত্তর চাই।

কি প্রশ্ন?

অজিত রায়ের পুরো পরিচয় কি।

নমিতা একটু হেসে বলল, এই জন্যই কি জোর তলব পাঠিয়ে আমাকে এনেছিস?

যদি বলি তোর অনুমানই সত্য?

তবে তোর এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমি বিশেষ কিছুই জানিনে।

পরিচয় জানতে চেষ্টা করেছিলি?

তিনি বড়ো বেশী কারও সঙ্গে মেশেন না, মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই।

কোনোদিন পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিস?

না।

কি জাতি?

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বুঝলি কি করে?

সরস্বতী পুজায় যোগাড় দিতে দেখেছি, গলায় পৈতে আছে।

পুরো নামটা কি?

অজিত শঙ্কর রায়।

শিউলী মাছে মশলা মাখাচ্ছিল, নামটা শুনে চমকে উঠায় ডিস থেকে একখানা মাছ পড়ে গেল। একটু দমধরে থেকে জিজ্ঞাসা করল,—

বাপের নাম জানিস?

না। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগই কোনোদিন পাই নি।

আর্থিক অবস্থা কেমন?

খরচ-খরচা তো খুবই করেন দেখেছি।

কিসে খরচ করেন?

গরীব ছাত্র কোনো অভাব জানালে বেশ ভালোরকম সাহায্য করেন। দেশ ভ্রমণের নেশাও বেশ আছে। গানবাজনা খেলাধুলায়ও প্রচুর ব্যয় করেন।

তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায়, কি ভাবে?

এ সব খোঁজ করে তোর কি লাভ হবে? তুই যা মনে করেছিস তা হবে না।

কেন হবে না?

উনি বিয়ে করবেন না।

এটা বুঝলি কি করে?

লোকটা ঘোর নারীবিদ্বেষী। আমার মনে হয় কোনো মেয়ে তাঁর অন্তরে দারুণ আঘাত দিয়েছে।

শিউলী আবার চমকে উঠে কিছুক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করল,—

তিনি যে নারীবিদ্বেষী, তা তুই বুঝলি কি করে?

তা বলতে পারব না।

মেয়েদের সঙ্গে কি খুব খারাপ ব্যবহার করেন!

মোটেই না। ব্যবহারে তিনি অতিশয় ভদ্র।

কাল যে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, থিয়েটার আরম্ভের আগে কি তিনি সে সংবাদ জানতেন?

বোধহয় জানতে পান নি।

তুই আমার কথা তাঁকে কিছু বলেছিলি?

না। তাঁকে কোনো মেয়ের কথা বলতে গেলে সে কথা মনোযোগ দিয়ে বড়ো একটা শোনেন না।

তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কবে ও কোথায়?

চারবছর আগে লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে এসে বিকালে লেকের ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়।

তখন কি কলেজে ভর্তি হয়েছিলি ?

না। দেখা হওয়ার দশ-বারোদিন পরে ভর্তি হই।

অর্থাৎ নিজে চেষ্টা করে অজিত রায় যে কলেজের ছাত্র, সেই কলেজে ভর্তি হয়েছিস। বেশ, এখন বল তো কি অবস্থায় তোদের প্রথম দেখা হল।

তোর কথা বাঁকা পথ ধরেছে। আমি আর উত্তর দেব না।

আচ্ছা এই একটা প্রশ্নের উত্তর দে।

এখন রান্না করতে হবে। ঐ সব বাজে আলাপ করার মতো সময় আমার নেই।

বেশ, তুই রান্না কর মাসী যোগাড় দেবে। আমি দেখে আসি বাবা কি করছেন।

বলে শিউলী গেল জাফরসাহেবের ঘরে। সেখানে বিশেষ কিছু করার ছিল না, এটা ওটা একটু নেড়েচেড়ে গুছিয়ে রেখে গেল তার নিজের শোবার ঘরে। বের করল সেই ফটোখানা অনেকক্ষণ ধরে বেশ করে দেখে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল,—নাঃ, আমি ভুল করেছি। অজিত রায় গোলা নয়, রাত্রে দেখতে ভুল করেছি। মানুষের মতো মানুষ অনেক দেখা যায়। একই সুরে বাঁশি অনেকেই বাজায়। যাক, আগামী শনিবারে যদি ওদের থিয়েটার হয় তবে যাব।

এবার শিউলী মনস্থির করে গেল রান্না ঘরে। রান্নায় সময় আর কোনো আলোচনা করল না, খাওয়া শেষ হলে শোবার ঘরে খাটে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে নমিতাকে বলল,—

এখন আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দে।

কি প্রশ্ন ?

অজিত বাবুর সঙ্গে তোর কি অবস্থায় প্রথম দেখা হয়েছিল।

আমি বুঝেছি, এই জন্যই কাল থিয়েটারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে ছিলি। কিন্তু ওটা বাজারের আপেল নয় যে, খুশিমতো কিনে এনে কারও হাতে তুলে দিবি।

সে কথা আমার বুঝতে বাকি নেই। সুন্দরী নমিতা তার অশেষ গুণেও যাকে চারবছরে আঁচলে বাঁধতে পারে নি, সে যে সাপের মাথার মণি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাপের মাথার মণিও তো মানুষে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে!

করে কি হবে ? ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, যে ঘোড়া জল খাবে না তাকে ঘাটে নেবার জন্য টানাটানি করে নির্বোধে।

তাহলে তুই আমাকে কথা দে, অন্যত্র ভাল পাত্র পেলে বিয়ে করবি।

তার আগে তুই আমাকে কথা দে যদি গোলাপবাবুর সঙ্গে বিয়ে অসম্ভব হয়, তবে অন্য কোনো ভালো বর বিয়ে করবি।

তা হয় না।

কেন হয় না ?

তার বিশেষ হেতু আছে।

হেতুটা কি, শুনি।

শিউলী তার সেই শিশুকালে মালাবদল ও ভেওয়া ফকিরের উক্তি শুনিয়ে বলল,—তখন ওর কোনো গুরুত্ব বুঝি নি, বয়স হলে বুঝেছি।

এইবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর বেশ ভেবে চিন্তে দিবি। তোর সেই ছেলেবেলায় যদি ঐ মালাবদল না হত তবে কি এখন তুই অপর কাউকে বিয়ে করতে পারতিস ?

আমি একটা লেখা তোকে দেখাচ্ছি। একবার সুলতানপুরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এক পণ্ডিত গোস্বামী। সে সময় কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি থাকায় আমি বাড়ীতে ছিলাম। কোনো ভালো পণ্ডিত বা আলেম বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি আমাকে ডেকে তাঁদের আলাপ-আলোচনা শোনাতেন। সেই গোস্বামীর আলোচনা যা শুনেছিলাম তা আমি লিখে রেখেছি। কথাগুলো আমার মুখস্থও আছে।

তবে আর খাতা বের করতে হবে না, মুখেই বল।

বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রেম ও ভালোবাসায় তফাৎ কি। উত্তরে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন,—

পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, গরু-ঘোড়া, কুকুর-বেড়াল, টাকা-পয়সা, অনেক কিছুই মানুষ ভালোবাসতে পারে। প্রেম কিন্তু ভক্ত-ভগবান আর নায়ক-নায়িকা, এই দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও হয় না।—

ভালোবাসায় থাকে উভয়পক্ষের আদানপ্রদান, যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে দিয়ে নিজেকে ভালোবাসিয়ে নিতে চায়, এটা ভালোবাসার স্বভাব। প্রেমের স্বভাব আদৌ ও রকম নয়। প্রেম ভালোবাসতেই জানে, ভালোবাসাতে জানে না, সে চেষ্টাও করে না।—

ভালোবাসা প্রেমের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, সে অবস্থায় ভালোবাসার স্বভাব আদান-প্রদানটা দেখা গেলেও স্বার্থপরতা থাকে না। প্রেম কিন্তু ভালোবাসার অন্তর্ভূক্ত নয়, সেজন্য আদানপ্রদানহীন প্রেম সম্ভব হয়।

ভালোবাসায় থাকে লাভলোকসানের হিসাব। প্রেমে কিন্তু এ হিসাবের নামগন্ধও থাকে না। ভালোবাসা তার বিষয়ের উপেক্ষা বেশীদিন সহ্য করে না। উপেক্ষিত হলে সে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অন্য ভালোবাসার পাত্র খুঁজে নিতে পারে। প্রেম তার প্রিয়ের শতসহস্র উপেক্ষায়ও প্রতিহত হয় না। অবিনাশী প্রেম পর্বত নির্গত সমুদ্রগামী জলস্রোতের মতো। তার গতিপথে যদি উপেক্ষার মরুভূমি দেখা দেয়, তবে বাইরের প্রকাশ বন্ধ হয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অলক্ষ্যে তার গতি অব্যাহত থাকে।

প্রেমের অমৃতধারা যার জন্য প্রবাহিত হয়. সে ছাড়া আর কেউ ও ধারার নিকটে আসতে পারে না। কারণ,—প্রেম আজীবন একনিষ্ঠ।

ভালোবাসা সরব, প্রেম নীরব। ভালোবাসা যদি প্রেমের স্পর্শ পায়, তবে সে নীরব হয়ে যায়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে শিউলী তার পাশে নমিতার দিকে তাকিয়ে দেখল সে নীরবে কাঁদ্‌ছে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে নমিতার সঙ্গে শিউলী আলোচনা করতে চেয়েছিল সেটা সে ভুলে গেল। নমিতা অজিতকে ভালোবাসে, অজিত নমিতার প্রতি উদাসীন, এই চিন্তাই তাকে পেয়ে বসল।

দুপুরের একটু পরেই বালীগঞ্জ থেকে গাড়ি এসে নমিতাকে নিয়ে গেলে শিউলী পড়তে বসল, কিন্তু পড়ায় মনস্থির হল না। কিছুক্ষণ এ বই ও বই নাড়াচাড়া করে উঠে বিছানায় গিয়ে বসে ভাবতে লাগল।

ব্যাপার কি! নমিতা পরমাসুন্দরী বহুগুণে গুণান্বিতা বড়োঘরের মেয়ে, তারপর অজিত রায়ের স্বজাতি। বিয়ে করতে হলে পুরুষে যেরকম মেয়ে কামনা করতে পারে নমিতা তাই। তা সত্ত্বেও অজিত উদাসীন কেন?

অনেকক্ষণ ভেবে শিউলী উঠে ঘড়ি দেখল, বেলা তিনটা বেজেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে করিমকে ডেকে একখানা ভাড়াটে ট্যাক্সি আনতে বলে গেল জাফর সাহেবের ঘরে।

বাবা, আমি মাসীকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টা দু'এর জন্য বালীগঞ্জে যেতে চাই। করিম ভাইকে সব বুঝিয়ে রেখে যাচ্ছি, যখন যা প্রয়োজন সে দেবে।

এখানে গ্যারেজ না থাকায় গাড়ি কিনেও তোর অসুবিধা দূর হল না। এখন পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বালীগঞ্জে যেতে পারলে বাঁচা যায়।

কেন বাবা, এখানে কি বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে ?

এখানে প্রথম থেকেই নানা অসুবিধা, তারপর গতকাল সন্ধ্যায় ওমরসাহেব নছিরসাহেব ও তাহের মিঞা এসেছিলেন।

কেন এসেছিলেন ?

কোনো মতলব ছাড়া এরা কোথাও যায় না। আমি সোজা জানিয়ে দিয়েছি, তাদের মতলব হাসিল হবে না। কিন্তু, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। ঐ নছির আর তাহের দু'জনেই শয়তান। এখন তুই বালীগঞ্জ থেকে ঘুরে এলে সব বলব।

বালীগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে শিউলীর সঙ্গে প্রথম দেখা হল অপর্ণা দেবীর। তিনি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—

মা যে এখনই এসে পড়লে !

প্রয়োজন আছে কাকীমা। নমিতা কোথায় ?

সে এসেই ছাদে গিয়েছে, আর নামে নি। তুমি একটু বস, কথা আছে।

শিউলী চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল,—কাল থিয়েটার দেখে কি বুঝলেন ?

গত পূজার ছুটিতে আমি ওদের অভিনয় দেখে যা বুঝেছিলাম তা তোমাকে আগেই বলেছি। গতকাল থিয়েটার দেখে বুঝেছি আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

আপনি ঠিকই বুঝেছেন।

তবে উপায় ?

অবস্থা খুবই গুরুতর। আজ নমিতার মুখে সবই শুনেছি, আর সেইজন্যই এখন এসেছি।

কিন্তু ছেলেটির যে নমিতার ওপরে কোনোরকম আগ্রহ নেই !

সেই তো সমস্যা।

হিন্দুর মেয়ে প্রথম জীবনে একজনকে ভালোবেসে তার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে ঘর করবে, একথা ভাবতেও যে ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

ওটা হিন্দু মেয়েদের জন্য সীমাবদ্ধ করে রাখছেন কেন ! আমার ফুফুর অবস্থাটা তো চোখের ওপরেই দেখতে পাচ্ছেন ! সত্যিকারের ভালোবাসা যার হৃদয়ে একবার প্রকাশ পায়, সে জীবনে আর কারও কথা চিন্তা করতে পারে না।

শিউলীর কথা শুনে অপর্ণা দেবী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—তুমি এ তত্ত্ব বুঝলে কি করে ?

শিউলী লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি নত করে উত্তর দিল,—সুলতানপুরে এক পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর মুখে শুনেছিলাম।

আর কি শুনেছিলে?

ভালোবাসায় থাকে দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদান, প্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেজন্য প্রতিদান না পেলেও প্রেম স্থির থাকে। প্রেম অবিনাশী ও একনিষ্ঠ।

নমিতার এটা কি?

এটা প্রেম।

তবে যে প্রথম বললে ভালোবাসা?

আমি তো ভালোবাসা বলি নি! বলেছি সত্যিকারের ভালোবাসা! আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখকই প্রেম নিয়ে এমন নোংরামি আরম্ভ করেছেন যে, ও শব্দটার অর্থতাৎপর্য বিকৃত হয়ে গেছে। সেইজন্য প্রেম না বলে সত্যিকারের ভালোবাসা বলেছি।

মা শিউলী, নমিতা তোমার বন্ধু। আমার চাইতেও তুমি ওকে ভালো বুঝতে পেরেছ, আরও পারবে। নমিতা যেন ভেসে না যায়।—বলে অপর্ণাদেবী শিউলীর হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেললেন।

কাকীমা, আজ দুপুরে নমিতার মুখে কিছু শুনে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছি। সেই জন্যই আবার এখনই ছুটে আসতে হল। কয়েকটা কথা আমার এখনও জানা হয় নি। সেইটুকু জেনে কালই আমি ইব্রাহিম ভাইকে পাঠাব অজিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় করে বন্ধুত্ব করতে। তারপর এই সূত্র ধরে আমি তার সঙ্গে দেখা করে সাধ্যমতো সব দিক থেকে চেষ্টা করে দেখব কি করতে পারি। আমি এখন নমিতার কাছে যাই।

শিউলী ছাদে উঠে দেখল নমিতা ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। শিউলী এসে পাশে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠে প্রশ্ন করল,—

এখনই যে আবার এসে পড়লি!

কেন তাতে কি তোর অসুবিধা হল?

না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তবে কিনা কলেজের ভালো ছাত্রী শিউলী চৌধুরী পরীক্ষার আগে বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না, তাই বলছি।

কিন্তু শিউলী চৌধুরীর একমাত্র বন্ধু নমিতা ব্যানার্জী যদি কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই শিউলী চৌধুরী নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে না।

তা বেশ। রোগের দাওয়াই কি বাতলিয়েছিস?

রোগের উৎপত্তির ইতিহাস না জানা থাকলে দাওয়াই বাতলানো যায় না। এখন বল তো অজিতবাবুর সঙ্গে তোর প্রথম দেখা হয় কোথায়?

নমিতা হাতের একটা আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল,—ঐ লেকে।

কি অবস্থায় দেখা হল?

ছুটি থাকলে এসে নৌকায় চড়ে বাঁশি বাজাতেন।

কতদিন আগে দেখা হয়েছিল?

লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে আসার চার-পাঁচদিন পরে।

কোথায় আলাপ হল?

লেক থেকে ফেরার পথে।

কি অবস্থায় আলাপ হল, সব খুলে বল।

সেদিন আকাশে মেঘ ছিল। লেক থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জন্ত রাস্তার ধারে এক বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ালাম, উনিও এসে দাঁড়ালেন। বৃষ্টি যখন থামল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। পথে সেরকম লোকজন না থাকায় একা বাড়ী ফিরতে ভয় হচ্ছিল। উনি নিজেই আগ্রহ করে আমার পরিচয় নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

তারপর আর কোনোদিন এ বাড়ীতে এসে আলাপ করেছেন?

কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষে বার দুই এসেছিলেন।

কলেজে আলাপ হত?

হবে না কেন! কোনো কাজ থাকলেই আলাপ হত।

সে সব আলাপে তাঁর মনের ভাব কি বুঝেছিস?

তাঁর মনের যে স্থানটি আমি চেয়েছিলাম, সে স্থানে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

অনেকে এমনভাবে নিজের মনোভাব চেপে রাখে যে, বাইরে থেকে কিছুই বুঝা যায় না।

সেদিক থেকে আমায় ভুল হয় নি।

শনিবারে শিউলী গেল কলেজে অভিনয় দেখতে। সেদিন সে নিজেই উৎসাহী হয়ে সোফিয়া ও ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে গেল। নমিতার সহপাঠী মিতা নামে একটি মেয়ে এসে শিউলীদের অভ্যর্থনা করল। শিউলী মিতাকে অনুরোধ করল তাকে যেন এমন একটা বসার জায়গা দেওয়া হয় যেখানে স্টেজের আলো

চোখে না পড়ে। মিতা তাকে সেইরকম জায়গায়ই বসাল।

আগের অভিনয়ে প্রথম পরদা উঠলে অজিতকে দেখে শিউলী এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, কে কেমন অভিনয় করল তা সে লক্ষ্যই করে নি, কিছু শোনেও নি। এবার সে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে লাগল নমিতা ও অজিত রায়ের অভিনয়।

শিউলী সঙ্কল্প করে এসেছে, এই অভিনয়ের ভিতর দিয়ে সে বুঝে নেবে অজিত রায়ের মনের অবস্থা, নমিতাকে সে কি চোখে দেখে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অজিত রায় প্রথম প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সে সঙ্কল্প ভুল হয়ে গেল। দেড় ঘণ্টা অভিনয়ের মধ্যে আর সে ভুল ভাঙ্গল না।

ফেরার পথে নমিতা ও সোফিয়া গেল এক গাড়িতে, আর একখানায় উঠল শিউলী ও ইব্রাহিম। বাড়ী এসে শিউলী জাফর সাহেবের ঘরে সব গুছিয়ে গেল নিজের ঘরে। বের করল আবার সেই ফটোখানা। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় অনেকক্ষণ ফটোখানা দেখে ভাবতে বসল, সব এক। কথা বলার ভঙ্গী, হাত নাড়া, চলাফেরা, সব এক। কিন্তু স্বভাবের মিল তো নেই!

গোলা চঞ্চল হাসিখুশী স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। শিউলীর একটু চোখের জল সে সইতে পারত না। অজিত রায় স্বভাবগম্ভীর, বাইরের চাইতেও ভিতরটা বোধহয় আরও কঠিন। নইলে নমিতার এতবড়ো আবেগের সম্মুখে অটল অচল থাকছে কি করে!

ভাবতে ভাবতে শিউলীর মনে পড়ল ছেলেবেলার একটা ঘটনা।—

বৈশাখমাস, দুপুরের একটু পরে গোলা এনেছে কাসুন্দি দিয়ে মাখা কাঁচা আমছেঁচা। খেতে খুব ভালো লেগেছিল। রাত্রে পেটে ব্যথা হয়ে তিনবার পায়খানা হল। মা ধমকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খেয়েছিস?

ধমকের চোটে বলতে হল,—আমছেঁচা।

শুধু আমছেঁচা?

কাসুন্দি কাঁচালঙ্কা নুন দিয়ে মাখা।

কোথায় পেলি?

শিউলী নীরব।

বুঝেছি, ঐ দুষ্টু ছোঁড়াটা এনে খাইয়েছে। কাল সকালে ও এলে একটু হজিমত দিতে হবে।

সে রাত্রে আর শিউলীর ঘুম হল না। সকালে গোলা এল পড়তে। মা তাকে ডেকে এনে খুব ধমকালেন। পড়তে বসে গোলা একবারও শিলী বলে

ডাকল না, শিলীর দিকে একবার তাকালও না; পড়া শেষ হলে একটা কথাও না বলে চলে গেল। শিলী মা'র ঘরে গিয়ে টেবিলে বই গুছিয়ে রেখে দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল।

দুপুরে গোলা বাগানে এসেই খুব চোটপাট করে বলল,—তুই রাক্ষসের মতো অতগুলো আমমাখা খেলি, আবার চাচীকে বলে বকুনি খাওয়ালি। আর আমি তোকে কিচ্ছু দেব না, গোলাপ জাম পেড়েও দেব না, পেয়ারা পেড়েও দেব না, লিচু পাকলে লিচু পেড়েও দেব না, কিচ্ছু দেব না। যাই আমি ভৈরবের তীরে গাছে বড়ো বড়ো বৈঁচি পেকেছে, তুলে এনে কাউকে দেব না।—বলে গোলা দু'এক পা যেতেই শিলী কেঁদে তার হাত চেপে ধরেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে গোলা ব্যস্ত হয়ে শিলীর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল,—কাঁদিস নে। ঐ দেখ সেই বড়ো গোলাপ জামটা আজ থেকে একেবারে হলদে হয়ে উঠেছে। তুই দাঁড়া আমি পেড়ে আনি।

গোলাপ জামটা ছিল সরু ডালের আগায়, আরও দু'দিন চেষ্টা করে পাড়া যায় নি। সেদিন জামটা পাড়তে গিয়ে গোলা ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেল। নীচে কিসের খোঁচা লেগে উরুর খানিকটা কেটে রক্ত বেরুল।

দেখে শিলী চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই গোলা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার মুখ চেপে ধরে বলল,—কাঁদিস নে। চাচী জানতে পেলে বকে ভূত ভাগিয়ে দেবেন।

তোর খুব লেগেছে যে?

না, লাগে নি।

ঐ যে কেটে রক্ত পড়ছে।

তা পড়ুক, ওষুধ লাগালে সেরে যাবে। তুই থাক, আমি ওষুধ লাগিয়ে আসি।—বলে গোলা ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে কি একটা পাতার রস কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে ফিরে এসে ভাঙ্গা ডালটা থেকে গোলাপজামটা ছিঁড়ে এনে বলল,—

নে, খা।

তুই খা, আমি খাব না।

কেন খাবি নে?

তুই যে পড়ে গেলি।

তাতে কি হয়েছে? নে, খেয়ে দেখ খুব মিষ্টি হয়েছে।

না, আমি খাব না।

বাঃ রে, এত কষ্ট করে পাড়লাম আর খাবি নে! নে, খা।

না, খাব না।

খাবি নে?

নাঃ।

গোলা রেগে গোলাপজামটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে শিলীর পিঠে দুম করে এককিল বসিয়ে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। শিউলী পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সেই থেঁতলানো গোলাপ জামটা কুড়িয়ে এনে জলে ধুয়ে খেয়েছিল। সন্ধ্যায় মাস্টারের কাছে পড়তে এসে গোলা শিলীর দিকে পিছন ফিরে বসল। শিলী সেই গোলাপ জামটার বীচি দুটো দেখিয়ে তবে তাকে খুশী করে।

সেই গোলা কখনো অজিত রায় হতে পারে না। গোলার মন মাখনের মতো, একটু আদরের উত্তাপ পেলে গলে যায়। গোলা কারও চোখের জল সইতে পারে না। অজিত রায়ের মন পাষাণ, কারও কোনো আবেগ সে পাষাণ মনকে একটুও বিচলিত করে না। গোলা ও অজিত রায় এক ব্যক্তি নয়।

কিন্তু নমিতার উপায় কি? নমিতা যে হৃদয় উজাড় করে সব অজিতকে দিয়ে রিক্তা হয়েছে! আর কেউ তো ও হৃদয়ে স্থান পাবে না।

এই কথাটা মনে হতেই কাছে ভয়ানক শব্দে বজ্রপাত হলে মানুষ যেমন চমকে উঠে বিহ্বল হয়ে পড়ে শিউলীর অবস্থাও হল সেই রকম। তবে-তবে-তবে গোলাই কি অজিত রায়? সেই জন্যই কি নমিতা তার মনের নাগাল পাচ্ছে না?

শিউলী চেয়ার থেকে উঠে টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এই কান্না সুখের কি দুঃখের তা জিজ্ঞাসা করলে শিউলী সঠিক উত্তর দিতে পারত কিনা সন্দেহ।

প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই শিউলী ডেকে আনল ইব্রাহিমকে। শিউলীর সম্মুখে ইব্রাহিম নিজে থেকে কোনো কথা বলে না, নীরবে নির্দেশ পালন করে।

ইব্রাহিম এলে শিউলী তাকে বসতে বলে প্রশ্ন করল,—

আচ্ছা ভাইসাহেব, গতকাল যে ভদ্রলোক থিয়েটারে নরেনের পাঠ করলেন তাঁকে তুমি চেন?

হাঁ চিনি। তাঁর নাম অজিত রায়। বিস্মিত ইব্রাহিম শিউলীর চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েই দৃষ্টি নত করল।

তিনি থাকেন কোথায় ?

আগে ল'কলেজ হোস্টেলে থাকতেন, এখন সেখানে থাকেন না।

প্রয়োজন হলে খোঁজ করে জানাতে পারি কোথায় থাকেন।

তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে ?

চিনি মাত্র পরিচয় নেই।

অজিত বাবুর পরিচয় কিছু জানো ?

খুব বড়লোকের ছেলে, অত্যন্ত সৌখীন, গানবাজনা খেলাধূলায় ঝোঁক আছে, এ সব ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যয় করেন। শুনেছি তিনি নাকি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন না।

কেন করেন না ?

পূর্ববঙ্গের জমিদারের ছেলে, এখন জমিদারী নেই, বোধহয় সেইজন্য।

কোথাকার জমিদারের ছেলে ?

কথায় বোঝা যায় জন্মস্থান ঢাকা বা ফরিদপুর জেলা।

ভাই সাহেব, তোমাকে একটা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে হবে।

কি কাজ ? ইব্রাহিম আবার মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল। তার চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা দারুণ বিস্ময়।

এই অজিত রায়ের সঙ্গে আমার বন্ধু নমিতার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে।

সেজন্য তো কাকাবাবুই চেষ্টা করতে পারেন !

এটা ভালোবাসার ব্যাপার। সবদিক না বুঝে অভিভাবক অগ্রসর হতে পারেন না। সেইজন্য তোমার সাহায্য চাচ্ছি।

বেশ, এ ব্যাপারে যদি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি তবে খুবই খুশী হব। এবার ইব্রাহিমের মুখের বিস্ময় ভাব কেটে দেখা দিল উৎসাহ, একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তবে এটা হিঁদুর বিয়ে। বিয়ের ব্যাপারে হিঁদুদের মধ্যে বহুত ঝামেলা। আমরা চেষ্টা করে কি কিছু করে উঠতে পারব !

চেষ্টা করে দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা। নইলে নমিতার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

যদি ওদের জাতিতে না বাধে, তবে আর বাধা কোথায় ? নমিতা সুন্দরী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, এর চাইতে আর কি বেশী মানুষে কামনা করতে পারে।

জাতির দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অজিত কেন নমিতার প্রতি উদাসীন, সেইটা খোঁজ করে দেখতে হবে।

বোধহয় কোন জমিদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে আছে। আজকাল হিঁদুরা আর দু'তিনটে বিয়ে করতে চায় না।

যাই হোক তুমি অজিত রায়ের সঙ্গে মেলামেশা করে ভিতরের খবর নিতে চেষ্টা কর। কলেজের মেয়েদের ধারণা, অজিত রায় নারী বিদ্বেষী। যদি তাই হয় তবে তার হেতু কি, জানতে চেষ্টা করবে। আমার বা নমিতার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে বা তুমি যে আমার ভাই এটা জানতে দিও না।

দিন পনরো পরে ইব্রাহিম শিউলীকে জানাল, অজিত রায় থাকেন মির্জাপুরে এক বড়ো হোটেলে। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, তিনি অকারণে অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করেন না।

শিউলীর বি. এ. পরীক্ষা শেষ হল, এইবার জাফর সাহেব কলুটোলা ছেড়ে বালীগঞ্জ যাবেন। জাফর সাহেবের শরীর অনেকটা সুস্থ হওয়ায় বালীগঞ্জের বাড়ীর চারতলায়ই থাকা চলবে।

শিউলীর পরীক্ষা যেদিন শেষ হল তার পরদিনই করিম তিনসপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে গেল। করিম ফিরে এলেই বাড়ী বদলানো হবে।

করিম দেশে যাওয়ার দু'দিন পরে তাহের মিঞার খানসামা রহমত এল জুলেখার কাছে আনোয়ারার লেখা একখানা পত্র নিয়ে। পত্রে লিখেছে, মা জুলেখার এখন বয়স হয়েছে এই বয়সে সংসারের সব কাজকর্ম একা নিজহাতে করা আর সম্ভব নয়। এতদিন করিমের মা ও করিম অনেক কাজ করে দিত, এখন তারা বালীগঞ্জের বাড়ীতে যাবে। এ অবস্থায় মায়ের অসুবিধা বুঝে আনোয়ারা তাদের একজন খানসামা রহমতকে পাঠাল। রহমত খুব বিশ্বাসী ও কাজের লোক, সে একাই খানসামা ও বাবুর্চির কাজ করতে পারবে। তার মাইনে ও পোষাক আনোয়ারাই দেবে।

পত্র ও রহমত-কে পেয়ে জুলেখা খুব খুশী হলেন।

পরীক্ষার পর ইব্রাহিম গিয়েছিল দার্জিলিঙ বেড়াতে। সাতদিন পরে ফিরে এসে রহমতকে দেখে জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করল,—

ওটা এখানে এসে জুটল কি করে!

আমার কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে বুঝে আনোয়ারা পাঠিয়েছে। মাইনে, পোশাক, সব আনোয়ারাই দেবে।

ওকে এখুনি তাড়িয়ে দাও। এখুনই।

কেন?—জুলেখা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

কেন!—তা তুমি বুঝবে না। আমার কথা শোনো, নচেৎ সর্বনাশ হবে।

একটু বুঝিয়েই বল না ছাই। আমি কি একেবারেই বোকা।

এটা তাহের মিঞার কোন বদ মতলব হাসিল করার শয়তানী ষড়যন্ত্র।

ওকে তো পাঠিয়েছে আনোয়ারা!

আনোয়ারা ওখানে যে অবস্থায় আছে, তাতে খানসামা পাঠিয়ে তোমাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, নিজের প্রয়োজনে একখানা পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লেখার স্বাধীনতাও তার নেই, সাহস ও সঙ্গতিও নেই।

পত্রখানা তো আনোয়ারা নিজ হাতে লিখেছে।

আনোয়ারাকে দিয়ে লিখিয়েছে।

তুই আগাগোড়াই তাহেরকে দেখতে পারিস নে। ও আগে যা করেছে, করেছে; এখন ভালো হয়ে গেছে। এখন তাহের গান্ধীর চেলা হয়ে খদ্দর পরে, চরকা কাটে, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে। কত বড়ো বড়ো হিন্দু ওকে মানে গণে, সম্মান করে।

হিন্দুরা ওকে কি বুঝে সম্মান করে তা আমি জানি নে। আমি জানি, ও পাক্কা শয়তান বেইমান পাকিস্তানের গুপ্তচর। এখানে থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে দল পাকিয়ে আর একটা গোলোযোগ বাধানোর চেষ্টায় আছে।

তাতে ওর লাভ কি?

যেমন আগে দল পাকিয়ে লড়কে লেঙ্গে করে বাংলা ও বাঙালীর সর্বনাশ করেছে, এখন আরও কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টায় এই কলকাতায়ই থেকে গেছে, পাকিস্তানে গেল না।

তার সঙ্গে রহমত খানসামাকে পাঠানোর কি সম্পর্ক থাকতে পারে! খানসামা ফেরত পাঠানো যাবে না, পাঠালে ওদের অপমান করা হবে। তাতে আনোয়ারার যন্ত্রণা আরও বাড়বে।

কিন্তু মা, এর পরিণাম আমাদের পক্ষে খুবই খারাপ হবে।

আল্লাহ তালা যদি নসিবে খারাপ লিখে থাকেন তবে আর কি করা যাবে বল।

দেশ হতে ফিরে এসে দু'দিন পরে করিম জাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, —হুজুর এ বাড়ী ছেড়ে কবে যাচ্ছেন?

কেন, বল দেখি!

হুজুর, ওপরে যে খানসামা এসেছে, লোকটা বোধহয় ভালো নয়। ওর কোন বদ মতলব আছে।

কিসে বুঝলি?

হুজুরের সঙ্গে কে কি কথা বলে, তা ও আড়িপেতে শোনে। ঘরের কোথায় কি আছে তাও লক্ষ্য করে।

করিমের কথা শুনে একটু ভেবে নিয়ে জাফর সাহেব বললেন,—তুই গিয়ে অমিয়বাবুকে আজ সন্ধ্যায় ডেকে নিয়ে আসবি। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যত শীঘ্র সম্ভব এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

সন্ধ্যার পর অমিয়বাবু এলেন। তাকে দেখে শিউলী করিমকে সন্দেশ আনতে বড়োবাজারে পাঠিয়ে নিজে গেল লুচি ভেজে চা করতে।

অমিয়বাবুর সঙ্গে জাফর সাহেব পরামর্শ করে স্থির করলেন, আর চারদিন পরে রবিবারে কলুটোলা বাড়ী ছেড়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে যাওয়া হবে। এই যাওয়ার কথা রবিবারের আগে কাউকে জানানো হবে না।

শুক্রবারে জাফর সাহেব তাঁর নিয়ম মতো বেলা এগারটায় খেয়ে সংবাদপত্র পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। শিউলী খেয়ে এসে লেবুর রস দেওয়া এক গ্লাস মিছরির সরবত জাফর সাহেবের খাটের পাশে টেবিলের ওপরে ঢেকে রেখে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখে ঘুম এল না। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে শেষে বিরক্ত হয়ে একখানা বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, তাতেও মন বসল না।

বেলা তখন একটা বাজতে কিছু বাকি আছে, জাফর সাহেবের ঘরের দরজা খোলার মৃদু শব্দ শিউলীর কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল বাবা যদি অসময়ে ঘুম থেকে জেগে বাইরে আসেন তবে যাতে কারও বিশ্রামে বিঘ্ন না হয় সেই ভাবেই নিঃশব্দে দরজা খোলেন, এরকম শব্দ তো হয় না!

একটু পরে আবার দরজা বন্ধ করার শব্দও পাওয়া গেল। এবার শিউলী উঠে তার ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখল, নীচতলায় কোথাও কেউ নেই। করিমের মা ও করিম তাদের ঘরের দরজা খুলে রেখে মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জাফর সাহেবের ঘরের কাছে গিয়ে প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করল তিনি জেগে আছেন কিনা। সেরকম কিছু বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে

দরজা একটু ফাঁক করে পরদা সরিয়ে দেখল জাফর সাহেবও ঘুমাচ্ছেন। তবে এ শব্দ কোথা থেকে এল!

ভাবতে ভাবতে শিউলী নিজের ঘরে গিয়ে আবাব বই নিয়ে বসল, কিন্তু পড়া হল না, মন একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।

এর ঘণ্টাখানেক পরেই জাফর সাহেবের ওঠার সাড়া পেয়ে শিউলী গেল তাঁর ঘরে। জাফর সাহেব বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে সরবত খেয়ে মুখ একটু বিকৃত করে বললেন,—সরবতটা এমন বিস্বাদ হয়েছে কেন?

করিম তামাক সেজে এনে গড়গড়ায় নল হাতে তুলে দিতে দিতে বলল,—খুকুমণি বোধহয় লেবুটা একটু বেশী চিপেছে।

না, আমি'তো বেশী চিপি নি! বলল শিউল।

তোর কি আর এখন সে খেয়াল আছে। তুই এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস এ বাড়ী ছাড়ার জন্য।

হাঁ বাবা, এ বাড়ীতে আমার আর মন টিকছে না। এটা যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ীর মতো হয়ে উঠেছে।

ভুতুড়ে বাড়ী হল কি করে?

সে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। প্রায়ই যেন মনে হয় জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে, কার যেন ছায়া এসে ঘরে পড়ল, কে যেন দরজা খুলছে। অথচ কিছুই দেখি নে! এই আজই বেলা একটায় কানে এল আপনার ঘরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। অথচ বেরিয়ে—।

শিউলীর আর বলা হল না। গড়গড়া নলে কয়েকটা টান দিয়েই জাফর সাহেব একটা অস্ফুট শব্দ করে বুক চেপে ধরে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। মারাত্মক রকমের বুক ধড়ফড়ানি আরম্ভ হল।

শিউলী ও করিম প্রথম কিছু বুঝতে না পারে হতভম্ব হয়ে গেল তারপর ব্যাপার বুঝে শিউলী চিৎকার করে জাফর সাহেবকে জড়িয়ে ধরল, করিম ছুটল ডাক্তার আনতে।

শিউলীর চিৎকার শুনে জুলেখা ছুটে এলেন, সঙ্গে এল ইব্রাহিম। ইব্রাহিমকে দেখে জাফর সাহেব ইশারায় অমিয়বাবুকে ডাকতে বললেন। ইব্রাহিম গেল হাইকোর্টে তাঁকে সংবাদ দিতে।

করিম ডাক্তার নিয়ে এল। অবস্থা দেখে ডাক্তার ইনজেকসন দিলেন। রোগের প্রকোপ কমল না। একঘণ্টার মধ্যেই অমিয়বাবু এলেন বড়ো ডাক্তার নিয়ে। বড়ো ডাক্তার আগের ডাক্তারের মুখে রোগের ও রোগীর অবস্থা শুনে

আর নতুন কোনো ওষুধ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন সেদিন রোগী কখন কি খেয়েছেন এবং কোনো কিছু খেয়ে কোনো মন্তব্য করেছেন কিনা। শিউলী ও করিম ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে সরবতের কথা বলল। শুনে ডাক্তার সরবতের গ্লাসটা দেখতে চাইলেন। দেখা গেল টেবিলের ওপরে গ্লাস নেই। ঘর বা'র সব জায়গা খোঁজা হল, গ্লাস নেই।

বড়ো ডাক্তার চিন্তিত হয়ে একটা ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে অমিয়বাবুকে পাঠালেন ওষুধ আনতে। ওষুধ এলে রোগীকে খাইয়ে ফলাফলের জন্য দুই ডাক্তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রোগীর খুব ঘাম হতে লাগল, ঘণ্টাখানেক পরে পায়খানা হল। পায়খানায় দেখা গেল প্রচুর তাজা রক্ত পড়েছে।

পায়খানা হওয়ার পর রোগী কিছু সুস্থ হলেন। বড়ো ডাক্তার রোগীর রক্তমলের কিছু নিয়ে গেলেন পরীক্ষা করতে।

দু'ঘণ্টা পরে ডাক্তার ফিরে এসে অমিয়বাবুকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন, জাফর সাহেবকে হত্যা করার জন্য বিষ খাওয়ানো হয়েছে। পায়খানায় প্রচুর রক্ত বেরিয়ে বিষের তীব্রতা অনেকখানি কমেছে। যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হয়। জাফর সাহেব হৃদ্‌রোগগ্রস্ত এটা জেনে চতুর হত্যাকারী এই বিষ প্রয়োগ করেছে। কেসটা এখনই পুলিশে জানানো উচিত।

অমিয়বাবু উত্তর করলেন,—এ বাড়ীতে তো আমি এমন কাউকে দেখছি নে, যে একাজ করতে পারে। তারপর জাফর সাহেবের খাদ্যাদি সব শিউলী ও করিম যোগায়। এ অবস্থায় পুলিশী হাঙ্গামা করতে গেলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হবে না কি ?

কথাটা আমি বলেছি আইনগত দিক থেকে। রোগীর শুশ্রূষার দিক থেকে কোনো হৈ হাঙ্গামা তো দূরের কথা ঘরে বেশী লোকসমাগম ও বড়ো করে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। যাই হোক আমি গিয়ে দু'জন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে তারাই সব করবে।

ডাক্তার চলে গেলেন। অমিয়বাবু ডাক্তারের মল পরীক্ষার ফলের কথা আর কাউকে জানালেন না।

রোগের প্রথম আক্রমণের পর আরও একদিন চলে গেল, এর মধ্যে জাফর সাহেব বিশেষ কোনো কথা বলেন নি, ডাক্তারেরও নিষেধ ছিল। তৃতীয় দিন

প্রভাতে খুব খানিকটা পচা মাংসের মতো পায়খানা হয়ে জাফর সাহেব সুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

বেলা আটটায় বড়ো ডাক্তার এলেন রোগী দেখতে। প্রাথমিক দেখাশোনা হয়ে গেলে জাফর সাহেব ঘরের অপর সব লোক সরিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে বললেন,—দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি যে আর বাঁচব না এটা আপনিও জানেন আমিও বুঝেছি। যা বুঝেছি তাতে আজকের দিনটা আছি, কাল আর থাকব না—এইটুকু বলে জাফর সাহেবে হাঁফাতে লাগলেন। ডাক্তার কোনো কথা বললেন না।

একটু বিশ্রাম করে নিয়ে জাফর সাহেব আবার বলতে আরম্ভ করলেন,—আমার পারিবারিক এমন কয়েকটা কথা আছে, যা আমার মেয়েকে বলে বুঝিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার। আপনাদের এমন কোনো ওষুধ আছে কি যা খেলে বা ইনজেকশন করলে আমি একটু সুস্থ অবস্থায় আমার মেয়ের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কথা বলতে পারি?

আছে। কিন্তু তাতে আপনার জীবনী শক্তি কিছু কমে যাবে।

তা যাক। আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন।

কখন আলাপ করতে চান?

বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

আচ্ছা তাই হবে। আমি ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, বেলা বারোটায় একটা ইনজেকশন দিয়ে পনরো মিনিট পরে একটা ওষুধ খাবেন।

তারপর ঘণ্টাখানেক কথা বলতে পারবেন। আমি দু'টো বাজলে আবার এসে দেখে যাব।

ডাক্তারের ব্যবস্থা মতো বেলা বারোটায় ইনজেকশন ও ওষুধ ব্যবহার করে জাফর সাহেব শিউলীকে বললেন,—বাইরে করিমকে পাহারা রেখে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে আলোটা জ্বেলে দে। দিয়ে আমার কাছে বস, কথা আছে।

শিউলী বিস্মিত হয়ে বলল,— কেন বাবা, এমন কি কথা আছে যা এখনই না বললে নয়! আপনি তো সেরে উঠছেন।

সেরে যদি উঠি তো ভালোই। আমি যা বললাম তাই কর।

জাফর সাহেবের কথামতো শিউলী করিমকে বাইরে সতর্ক পাহারায় রেখে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে এসে বসল জাফর সাহেবের খাটের কাছে টেবিলের পাশে চেয়ারে। জাফর সাহেব কিছুক্ষণ নীরবে চোখবুঁজে থেকে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন,—

মা আজ তোকে আমি কয়েকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। চার বছর আগে তোকে নিয়ে যখন কলকাতায় আসি তখনই আমার বক্তব্য ও উপদেশ কাগজে লিখে খামে ভরে সীলকরে অমিয়বাবুর হেফাজতে রেখেছি। তাঁকে বলা আছে, এর মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তোর একুশ বছর বয়সে সেই খাম তোকে দেবেন।—

এবার অসুখ হয়ে কলকাতা আসার পর এমন কয়েকটা ব্যাপার আমার চোখে ধরা পড়েছে, যা তোকে বলে তোর মতামত জেনে যেতে না পারলে আমি কবরে গিয়েও শান্তি পাব না। এই ব্যাপারটার গুরুত্ব ও গভীরতা একমাস পূর্বেও সেরকম বুঝি নি। তারপর বুঝে এই সপ্তাহ খানেক হল অমিয়বাবু, সোফিয়া ও আবদুল কাদেরকে বলে বুঝিয়ে রেখেছি। আমার ইচ্ছা ছিল এ বাসা ছেড়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে তোকে বলব। তুই সত্যিই সেদিন বলেছিলি এ বাড়ীটা ভূতের বাসা হয়ে উঠেছে।

আপনি কি কিছু দেখেছেন?

কিছু দেখি নি, তবে আমার এই মারাত্মক অসুস্থতার মূলে যে ঐ রকম একটা কিছু আছে তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এখন এসব কথা থাক; আমি যা বলতে চাচ্ছি তাই শোন। হোসেনপুরের রায় বংশের ইতিহাস তোর মনে আছে?

হাঁ আছে।

ঐ ইতিহাসের একটা গুরুতর কথা তোকে এপর্যন্ত বলি নি। কথাটা অমিয়বাবুর কাছে রক্ষিত খামে লেখা আছে। এখন আমার প্রধান বক্তব্যটি বুঝাবার জন্য সেটাও বলছি। আমাদের পূর্বপুরুষ এনায়েতুল্লা খাঁ তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের হুকুমে হোসেনপুরের রায়দের জমিদারী দখলে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ওটা হক্‌পাওনা বলে মেনে নিতে পারেন নি। ও সম্পত্তি রায়দের ফিরিয়ে দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নবাব সরকারের ভয়ে তখন তা সম্ভব হয় নি। এনায়েত খাঁ মৃত্যুকালে তাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁকে রায়দের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বলে যান।

সেই থেকে এ ব্যাপারটা আমাদের বংশে পিতার মৃত্যুকালে পুত্রের প্রতি উপদেশ হয়েই চলছে।—

আজ আর সে জমিদারী নেই। সময়মত গৌরীশঙ্কর রায় যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী কাজ করে এখন কলকাতায় তিনখানা বাড়ী আর ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখ সত্তর হাজার টাকা জমা করেছি। তুই এর থেকে অজিতকে কিছু দিয়ে এনায়েত খাঁ'র সদিচ্ছা পূরণ করিস।

অজিত কে ? চমকে উঠে অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল শিউলী।

গোলাপের ভালো নাম অজিতশঙ্কর রায়। সে কলকাতাতেই আছে। বলে জাফরসাহেব থেমে শিউলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। আলোটা ছিল শিউলীর পিছনে। শিউলী যখন কিছু বলল না তখন জাফর সাহেব বললেন,—

অজিতকে তুই দেখেছিস। সরস্বতী পূজায় নমিতাদের কলেজের থিয়েটারে অজিতই সিরাজদৌলার পাঠ করেছিল। বলে জাফর সাহেব আবার থামলেন। কিন্তু শিউলী এবারও কোনো কথা বলল না। জাফর সাহেব আবার বলতে আরম্ভ করলেন,—

দেওয়ানজী মৃত্যুকালে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে কেবল আমার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দিয়ে যান, তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জন্য তিনি কিছুই বলে যান নি। এমনি ছিল আমার ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কথা ক'টা বলতে যে জাফর সাহেবের চোখ সজল হয়ে গলা ভেঙ্গে এল তা শিউলী লক্ষ্য করল।

জাফর সাহেব একটু সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—আমি আমার সাধ্যমতো দেওয়ানজীর স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করতে চেষ্টা করেছি। গোলাপের মা মারা গিয়েছেন। গোলাপ গত বছর বি. এ. পাস করে এখন এম. এ. আর ল' পড়ছে, থাকে মির্জাপুরে এক হোটেলে। এই তিন সপ্তাহ হতে চলল দার্জিলিঙ-এ বেড়াতে গিয়েছে। আর ছয়-সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

তিনি এই মির্জাপুরেই ছিলেন অথচ একদিনও এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করেন নি কেন ? প্রশ্ন করল শিউলী।

আসত তো ! সপ্তাহে দু'তিনবার এসে আমাকে দেখে যেত।

আমার সঙ্গে দেখা হয় নি কেন ?

সেই কথা বলার জন্যই আজ তোকে আমার কাছে বসিয়েছি। গোলাপ যতদিন সুলতানপুর ছিল ততদিন তোদের খুব ভাব ছিল। মুনসীগঞ্জ গিয়েও গোলাপ আমার ও করিমের কাছে তোর খোঁজ নিত। মুনসীগঞ্জ থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা আসার পর সে আর কোনোদিন আমার কাছে তোর সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নি। করিমকেও নাকি নিষেধ করেছে তোর সম্মুখে তার নাম করতে। এখানে যখন আসে তখন এমন সতর্ক হয়ে আসে যাতে তোর সঙ্গে তার দেখা না হয়।

এর হেতু ?

প্রত্যেক মানুষই তার নিজের ভাবধারা অবলম্বনে অপরকে বুঝতে চেষ্টা

করে। সে ভাবধারায় যদি মিল হয়, তবে তুজনের ঘনিষ্ঠতা হতে দেখা যায়। গরমিল হলে ঘনিষ্ঠতা হয় না, হলেও বেশীদিন টেকে না। গোলাপ সুলতানপুর ছেড়ে যাওয়ার পর তুই আর তার কথা মুখে আনিস নি। আমার মনে হয় এ অবস্থায় সে তোর সম্মুখে আসা সঙ্গত মনে করে না।

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে!

আমিও এতদিন বুঝতে পারিনি। এই মাস খানেক আগে গোলাপ আমার কাছে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিল, তাতে কিছুটা তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছি।

কি প্রস্তাব করেছিল?

সে আমার কাছে তিরিশ হাজার টাকা কর্জ চেয়েছিল। টাকা পেলে বিলাত গিয়ে ব্যারীস্টারী পাস করে ভারতের বাইরে কোনোদেশে ব্যবসা করে টাকা শোধ করবে, এদেশে আর আসবে না।

কেন আসবে না?

সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রথমে উত্তর দিতে চায় নি, আমি পেড়াপীড়ি করায় শেষে বলল, এ নাকি এমন একটা ব্যাপার যা সে আমাকে বলতে পারবে না। কিন্তু তখন তার চোখমুখের ভাব দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি।

আসল ব্যাপারটা কি বুঝেছেন?

সে এমন দূরে সরে যেতে চায় যেখানে থাকলে তার কোনো কথা তোর কানে না পৌছায়।

আমার কানে পৌছলে তার ক্ষতি কি?

গোলাপের ধারণা, তার কথা তোর কানে পৌছলে হয়তো তুই মানসিক অশান্তি ভোগ করবি। সে তোকে কোনোরকম তুঃখ দিতে চায় না।

এবার শিউলীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চোখে জল দেখা দিল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। শিউলীকে মাথানত করে শাড়ীর পাড় খুঁটতে দেখে জাফর সাহেব বললেন,—

সেদিন গোলাপের প্রস্তাবানুযায়ী টাকা না দিয়ে ধমকিয়ে দার্জিলিঙ পাঠিয়েছি। আমার ইচ্ছা ছিল তোর মত জেনে এই বছরের মধ্যে তোর বিয়ে দিয়ে তারপর গোলাপকে যা দিতে হয় দেব। এখন এই অসুখে পড়ে ভবিষ্যত চিন্তা করে জানতে চাই তোর মত কি।

কোন বিষয়ে মত?

তোর বিয়ে সম্পর্কে। আজ তোর মা বেঁচে নেই, সেজন্য আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে।

ভেওয়া ফকিরের কথা ও জ্যোতিষীদের গণনা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। এরপর আর এ প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু মনের দিক থেকে প্রশ্ন আছে!

সেদিক থেকেও কোনো প্রশ্ন নেই। ভেওয়া ফকির ও জ্যোতিষী না বললেও আমার আর অন্য গতি নেই; এ কথা চার বছর আগে নমিতাকে বলে রেখেছি।

তাহলে গোলাপ তোকে ভুল বুঝেছে!—উৎসাহে জাফর সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন।

হাঁ। কিন্তু সে হিন্দু, আমি মুসলমান। এক্ষেত্রে দু'জনের একত্র হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু হিন্দু সমাজে আজকাল এরকম বহু হচ্ছে।

সেগুলি মুসলমান মেয়ে নয়। মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে হলে তাকে মুসলমান হতে হয়। আমার জন্য তিনি ধর্মত্যাগ করবেন এটা আমি চাই নে।

আজকাল ছেলেমেয়েরা যে যার ধর্মে থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, আইনে সে ব্যবস্থা আছে।

সে আইন থাকলেও মুসলমান মেয়ে এরকম বিয়ে করতে গেলে মুসলমান গুণ্ডারা দাঙ্গা বাধাবে।

বেশ, যদি তা বাধে বাধুক। এটা ধর্মনিরপেক্ষ আইনের মর্যাদা রক্ষাকারী রাষ্ট্র। এতদিন ধরে তোকে যে শিক্ষা দিয়েছি তাতে তোর মন থেকে এখনও যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও আত্মমর্যাদা বিরোধী ভয় দূর হয় নি দেখে আমি দুঃখিত হচ্ছি।

বাবা, আমার দিক থেকে কোনো কুসংস্কার বা ঐরকম ভয় নেই। আমি ভয় পাচ্ছি সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার হাতে তাঁর কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনায়। এই চার বছর কলকাতায় থেকে যা দেখলাম ও শুনলাম তাতে আমার ধারণা হয়েছে গুণ্ডারাই সমাজ ও ধর্মের রক্ষক।

কুৎসিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে নেতারা যে ভুল করেছেন তাতে ব্যাপারটা ঐ রকমই দাঁড়িয়েছে। এখন তোদেরই সাহস করে এগিয়ে এসে এ ভুল সংশোধন করে মহান আকবর বাদশার হিন্দুমুসলমান মিলন স্বপ্ন সার্থক করে ভারতে এক মহাজাতি গঠনের ভার নিতে হবে।

আমি তাই নেব। এই উপায়েই আমি আমার মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। বলুন এখন আমাকে কি করতে হবে।

গোলাপের মনোভাব সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ, এখন তোর মনোভাব খোলাখুলি জানতে চাই।

জীবনপথে আমরা দু'জনে একত্রিত হতে পারব কিনা তা জানি নে। শুধু এইটুকুই বলতে পারি তিনিই আপনার জামাই। এ কথা আজ আপনার কথা শুনে বলছি নে বা সেই মালাবদল ব্যাপারটাকে হেতু করে বলছিনে, আমার জ্ঞান হয়ে যা তিনি আছেন চিরকালই তাই থাকবেন।

তবে তুই এখনই একখানা পত্র লেখ। আমি সই করে দেব।

শিউলী কাগজ কলম নিয়ে বসল, জাফর সাহেব বলতে লাগলেন—

'স্নেহের গোলাপ, তুমি দার্জিলিঙ যাওয়ার পর হঠাৎ আমার সেই হৃদরোগ দেখা দিয়েছে। কখন কি হয় বলা যায় না। হয় তো তোমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। সেজন্য তোমার ও শিউলীর সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা তোমাকে এই পত্রে জানিয়ে রাখছি।'

'শিউলী সম্পর্কে তোমার মনোভাব আমি প্রথম থেকেই জানি। শিউলীর মনোভাব এতদিন আমি বুঝতে পারি নি, এখন বুঝেছি। শিশুকাল থেকে তোমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা গড়ে উঠেছে তাতে কোনো ত্রুটি না ঘটে এখন পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার ইচ্ছা এখন তোমরা দু'জন যার যার ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজের সেবা কর। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে এরকম বিবাহে কোনো বাধা নেই। হিন্দু সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তর এখন এ বিষয়ে উদার হয়ে উঠেছে। মুসলমান সমাজ থেকে যদি বাধা আসে তবে আমি আশা করি তোমরা সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করবে।'

'আমি যে প্রস্তাব করছি এতে যদি তুমি মনে কর তোমার মনোভাব বুঝতে আমি ভুল করেছি এবং এ বিবাহ সম্ভব নয় তবে তোমার ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে আমার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিও না।'

'আমি এ পর্যন্ত তোমার জন্য যে অর্থব্যয় করেছি সেটা তোমার ন্যায্য পাওনা। এ ছাড়া আরও পাওনা তোমার আছে। এই পাওনার ইতিহাস ও পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ আমার এটর্নি অমিয় ব্যানার্জীর হেপাজতে রেখেছি। তুমি তাঁর কাছে গেলেই তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন।'

লেখা শেষ হলে জাফর সাহেব সহি করলেন। পত্রখানা খামে ভরে শিউলীর হাতে দিয়ে বললেন,—খুব সাবধানে রেখে দে, যেন খোয়া না যায়। গোলাপ দার্জিলিঙ থেকে ফিরলে করিমের হাত দিয়ে পত্রখানা পাঠিয়ে দিস। এখন তোকে আর কয়েকটা দরকারি কথা বলি শোন।—

আমাদের এ বাড়ীতে ওঠাই ভুল হয়েছে। যাই হোক আমার শরীর আর একটু সুস্থ হলেই এ বাড়ী ছেড়ে যাব। আর যদি এখানেই এন্তেকাল করতে হয় তবে তুই এ বাড়ীতে বেশীদিন থাকিস নে। বালীগঞ্জে অমিয়বাবু ও অপর্ণাদেবীই তোর নিরাপদ আশ্রয়। আমার অভাবে এ বাড়ীতে বেশী আসা-যাওয়া করিস নে, এলেও দিনেদিনেই ফিরে যাবি। তোর ফুফু ও ইব্রাহিম কোনো অনিষ্ট করবে না, কিন্তু অনিষ্ট করার মতো লোকের দৃষ্টি যে এ বাড়ীর ওপরে আছে, তাতে আমি এখন নিঃসন্দেহ।—

গোলাপের সম্পর্কেও তোকে কিছু সতর্ক হতে হবে। তোর সম্পর্কে মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যদি তার মনে এরকম সন্দেহ জাগে যে, তুই আমার চাপে পড়ে এ বিবাহে রাজি হয়েছিস, তবে কিন্তু সে ধরা দেবে না। যদিও আমি পত্রে একটা বিকল্প ব্যবস্থা লিখলাম, তথাপি তোর সম্পর্কে তার মনের অবস্থা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে এসেছি। তোর মনে কোনোরকম একটু দুঃখ আফসোস স্পর্শ করতে পারে এমন কাজ সে করবে না। তোর মনের কথা যদি আমি আগে জানতাম, তবে আমিই তার ভুল ভেঙ্গে দিতে পারতাম। এখন তোকেই এ কাজ করতে হবে।—

আচ্ছা এখন তুই গিয়ে বিশ্রাম কর, আমিও একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি।

সময়ে সময়ে মানুষ এমন ঘটনার সম্মুখীন হয় যখন তার অত্যন্ত প্রয়োজন কিছুকালের জন্য অখণ্ড নির্জনতা। জাফরসাহেবের সম্মুখে শিউলী তার ধৈর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল। যে মুহূর্তে সে শুনেছে অজিত রায়ই গোলাপ সেই মুহূর্তেই তার মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে ঘূর্ণিঝড়ে ধূলা ওড়ার মতো; কেবল একেবারে নিকটে যা আছে তাই হাতিয়ে পাওয়া যায় দূরে কোথায় কি আছে তা দেখাও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শিউলী গিয়ে বসল বিছানায়। পাঁচ-সাত মিনিট বসে থেকে উঠে দরজার কাছে গেল। দরজা খুলতে গিয়ে না খুলে ফিরে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। টেবিলের দেরাজ খুলতে গিয়ে না খুলে

জলের কুঁজা থেকে গ্লাসে জল ভরতে গেল। গ্লাস ছাপিয়ে জল পড়ে টেবিলের আস্তরণ ভিজে গেল। জলভরা গ্লাস টেবিলে রেখে খুলল আলমারি। আলমারি থেকে গোলাপের সেই ফটোখানা নিয়ে আবার বসল গিয়ে বিছানায়।

বিছানায় বসে ফটোর দিকে তাকাতেই শিউলীর মনের এলোমেলো ভাবের ঝড় থেমে গিয়ে চিত্তাকাশে জেগে উঠল তার বাল্যকালের একটা প্রধান স্মৃতি।

সুলতানপুরে বাড়ীর পিছনে বাগানে বকুলতলা। গোলা বকুল ফুল আর গাবের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে শিউলীর গলায় পরিয়ে দিয়েছে। গাবের ফুলের কি মিষ্টি গন্ধ, বাগানে গাবগাছ নেই, গোলা শিউলীর জন্য শিববাড়ীর গাবতলা থেকে কুড়িয়ে মালা গেঁথে এনেছে। মালায় বকুল ফুল না দিলেই ভালো হত।

শিউলী চোখ বুজে ফেলল। সারামুখে দেখা দিল রক্তিম আভা। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে হঠাৎ আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মনের চোখে ফুটে উঠেছে আর একটা দৃশ্য।

সুলতানপুরে মাস্টারমশাই'র কাছে বসে গোলা ও শিলী পড়ছে। মাস্টারমশাই গেলেন তামাক খেতে। গোলা অমনি উঠে গিয়ে ফুলবাগান থেকে ধরে আনল মস্তবড়ো একটা গঙ্গা ফড়িং। ফড়িংটা বসিয়ে দেবে শিউলীর মাথার বেণীতে। ভয় পেয়ে শিউলী বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। মাস্টারমশাই এসে ব্যাপার দেখে গোলার কানধরে পিঠে বসিয়ে দিলেন এক ঘা বেত। বেত খেয়ে গোলা কেঁদে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিউলীও কেঁদেছিল।

দুপুরে বাগানে খেলতে এসে গোলা জিজ্ঞাসা করল,—মাস্টারমশাই আমাকে মারলেন, তুই কাঁদলি কেন?

তোর খুব লেগেছে?

কি লেগেছে?

মাস্টার মশাই'র বেত?

না, লাগে নি।

দেখি তোর পিঠ।—বলে শিউলী গোলার পিঠের জামা তুলে দেখল সোনার পাতের মতো পিঠে নীল দাগ, দেখে চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু কাঁদলে গোলা কি মনে করবে ভেবে কাঁদল না।

তুই এই ডালটা দিয়ে আমার পিঠে মার দেখি।

কেন?

দেখি তোর পিঠে লেগেছে কি না।

গোলা বসিয়ে দিল দুম্ করে এক কিল শিলীর পিঠে।

তুই আমাকে মারলি কেন? শিলী রেগে গেছে।

তুই যে মারতে বললি।

সে তো ভাল দিয়ে মারতে বলেছিলাম।

তোর পিঠে কিল মারতে বেশ ভালোলাগে, কেমন দুম্ করে শব্দ হয়।

পড়তে বসে আবার যদি দুষ্টমি করিস তবে মা'কে বলে দেব, তুই আমাকে মারিস। তাহলে মা আমাকে আর বাগানে আসতে দেবে না।

না, আর দুষ্টমি করব না

গোলা ভারী দুষ্টু, মাস্টার মশাই এত যে মারেন তাতেও দুষ্টুমি করতে ছাড়ে না। সেদিন কথা দিল আর দুষ্টুমি করবে না, দু'দিন যেতে না যেতেই আবার দুষ্টুমি করে মার খেল।

শিলী ধারাপাত পড়ছে, গোলা অঙ্ক কষছে, মাস্টারমশাই গেলেন তামাক খেতে। সামনে ফুলবাগানে একজোড়া জালানী কবুতর বক্ বকুম্ করে ডাকছে আর নাচছে। বড়ো কবুতরটা মাঝে মাঝে পাখনা দিয়ে ছোটো কবুতরটাকে ঝাপটা মারছে, ঠোঁট দিয়ে ঝুঁটি ধরে টানছে।

গোলা অঙ্ককষা রেখে গায়ের আলোয়ানখানা দু'হাতে পিঠের ওপরে পাখনার মতো মেলে ধরে বড়োকবুতরটার মতো দিব্বি নাচতে নাচতে শিলীর গায় চাদরের ঝাপ্টা মারতে লাগল, আর গাল ফুলিয়ে বক্ বকুম কুম ডাকতে ডাকতে এসে শিলীর মাথার বেণী কামড়িয়ে ধরে টানতে লাগল। গোলার কাণ্ড দেখে শিলী হেসে কুটপটি।

করিমের সঙ্গে স্নান করতে ভৈরবে গিয়ে গোলা সাঁতার শিখেছিল। দুর্দান্ত ছেলে, সাঁতার কেটে অনেক দূর যায়। দেখে শিলীর ভয় হয়, যদি ফিরে না আসতে পারে, যদি কুমিরে ধরে!

অনেক কেঁদেকেটে করিমকে রাজি করে শিলী সাঁতার শিখল, কিন্তু গোলার মতো অতদূর যেতে সাহস হয় না। একদিন সাহস করে গোলার সঙ্গে দিল সাঁতার। জায়গাটা ভৈরবের মধ্যে ডোবা চর, জল অল্প। সেজন্য করিম আপত্তি করে নি। কিছুদূর গিয়েই শিলী আর পেরে উঠল না। গোলাকে বলল,—আমি আর পেরে উঠছি নে ডুবে যাচ্ছি।

গোলা বলল,—তবে ফিরে যা।

ফিরতে পারছিনে ডুবে যাচ্ছি।—বলেই শিলী পা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোলা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই নে। করিম এবার রেগে গিয়েছে।

করিমের রাগ দেখে শিউলী আরও হেসে বলল,—যার প্রেমে পড়েছেন, তাকে আমি চিনি।

কে সে?

নমিতা।

খুকুমণি, তুমি গোলার সম্পর্কে কিছুই জান না। এখন আমাকে ডেকে আনলে কেন, তাই বল।

আজ বাবার মুখে শুনলাম, আমাদের যা কিছু আছে তার অর্ধেকের মালিক তোমার গোলাপবাবু।

সত্যি নাকি !!—করিম একেবারে চমকে উঠল।

হাঁ, একেবারে খাঁটি সত্যি। এর দলিল-দস্তাবেজ সব অমিয়বাবুর কাছে আছে।

তা যদি হয় তো খুব ভালোই হবে।

আমার সম্পত্তি অর্ধেক বেরিয়ে যাচ্ছে আর তুমি বলছ ভালো হবে?

বাঃ, তার হক্‌পাওনা তুমি দেবে না!

যাতে না দিয়ে একটা আপোশরফা করা যায় তার জন্যই তো গোলাপবাবুর পক্ষের লোক তোমাকে ডেকেছি।

তা তুমি যাই বল না কেন, এখন তোমার মতলবটা কি, তাই বল।

মতলবটা অত্যন্ত সোজা। তোমার গোলাপবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে আমার সঙ্গে সাদী দিয়ে দাও।

তোমাকে যেরকম আমি এতদিন ভেবেছি এখন দেখছি তুমি সেরকম নও।

আর তোমার গোলাপবাবু বুঝি ছেলেবেলায় যা ছিল এখনও তাই আছে?

নিশ্চয়ই। সে খাঁটি সোনা। তার মনে এতটুকু খাদ নেই।

বেশ আমি তাহলে পিতল।—বলে শিউলী আবার হেসে উঠল।

দেখ, তুমি গোলাকে নিয়ে হাসিমস্করা কর না।

তা না করলাম, কিন্তু তোমার খাঁটি সোনা তো ছেলেবেলায় আমাকে খুবই ভালোবাসতেন, এখন তোমার কথামতো তাঁর মনের ভাব নিশ্চয়ই সেই রকমই থাকা উচিত।

হাঁ, তা ঠিকই আছে। সেইজন্যই তো দেশ ছেড়ে বিলেত যাবে।

তাহলে সাদী করলেই তো সব চুকে যায়।

না, তা সে করবে না।

কেন করবে না?

তুমি সম্পত্তি হাতে রাখার জন্ম তাকে সাদী করতে চাইছ বুঝলে সে সাদী করা তো দূরের কথা, সম্পত্তির ভাগও বোধহয় নিতে চাইবে না।

রাগ করে এতবড়ো সম্পত্তির ভাগও নেবে না?

তুমি তাকে চেন না। সে তোমাকে একটু খুশী করার জন্ম সব কিছুই করতে পারে।

কিন্তু চার বছর এই কলকাতা থেকেও একবার এসে দেখা করতে পারে না।

সেও তোমারই জন্ম।

কি রকম!

দেখা করলে তুমি খুশী হবে না বুঝে আসে না।

এসব কথা কি সে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে?

সে সেরকম ছেলে নয়। তার মুখ থেকে কিছু কেউ শুনতে পাবে না।

তবে বুঝলে কি করে?

বুঝেছি তার ব্যবহারে।

কি ব্যবহারে বুঝলে?

বহু মেয়ে গোলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু সে কারও সঙ্গে মেশে না। তোমার একখানা ফটো তার কাছে আছে। সেখানা সে খুব গোপন করে রাখে। তোমার কোনো কাজ করে দিতে পারলে খুব খুশী হয়। এই সব দেখে বুঝেছি।

আমার কি কাজ করে দেয়?

তুমি যেসব সৌখিন জিনিস, কাপড়, জামা, আমাকে কিনতে পাঠাও তা সব গোলাই খুঁজেপেতে পছন্দ করে কিনে এনে দেয়।

কথাটা শুনে শিউলীর মনে একটা চমক লাগল। তাই তো, আগে ইব্রাহিম যেরকম জিনিস আনত, এখন করিম তার চাইতে অনেক ভালো ও দামী জিনিস আনে। করিমের সাধ্য কি এই সব জিনিসের আসল-নকল ভালো-মন্দ বুঝে কেনে। অথচ এ ব্যাপারটা সে লক্ষ্যই করে নি। এবার শিউলী একটু বেশী গম্ভীর হয়ে বলল,—

এখন আসল কথা বলি শোনো, করিম ভাই। তোমার গোলাপবাবু দার্জিলিঙ থেকে ফিরলেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেই দেখাসাক্ষাত তুমি আর বাবা ছাড়া আর কেউ যাতে না জানতে পারে তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

তাতে কি সে রাজি হবে?

যদি না হয় তবে আমাকেই তার হোটেলে যেতে হবে।

খুকুমণি, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন না করে সব কথা খুলে বল, তাতে আমার কাজের সুবিধা হবে।

তোমাকে সবই বলছি শোনো। আমাদের দু'জনের বিয়ে খোদার হুকুমে সেই ছেলেবেলায়ই হয়ে গেছে। সে বিয়ের সাক্ষী আছেন বাবা আর ভেওয়া ফকির। তোমার গোলাপবাবু পুরুষমানুষ, তিনি একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু আমার আর কোনো কারণেই অন্যত্র সাদী হতে পারে না। এতদিন বাবার অভিপ্রায় জানতে পারি নি বলে কাউকে কিছু বলি নি। আজ বাবা নিজেই কথা তুলে এ বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

কিন্তু গোলা তো মুসলমান হতে রাজি হবে বলে মনে হয় না!

সে আমার জন্য মুসলমান হতে চাইলে তাকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, ঘৃণা করব। আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রে ধর্ম সবদিক থেকেই নিরপেক্ষ। আমরা যার যার ধর্মমত বজায় রেখে বিয়ে-সাদী করতে পারি, তাতে কোনো বাধা নেই।

কিছুদিন আগেও যদি একথা আমার জানা থাকত তবে কাজ অনেক সহজ হত। এখন গোলার মনে বদ্ধমূল ধারণা, তুমি তার কথা একেবারে ভুলে গেছ। এ অবস্থায় সাদীর কথা তুললে সে বুঝে নেবে তুমি সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে এই প্রস্তাব তুলেছ।

এই সব কারণেই আমি তার সঙ্গে নির্জনে দেখা করতে চাই।

সেদিন গিয়ে রাত্রিটাও গেল। প্রভাতে জাফর সাহেবের পায়খানা হল ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত পচামাংস। সংবাদ পেয়ে বড়ো ডাক্তার নিয়ে এলেন অমিয়বাবু। ডাক্তার সব দেখে অমিয়বাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানালেন, ভিতরটা পচে গেছে। বাইরে যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে না তার কারণ, যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তাতে পাকস্থলী অসাড় হয়ে গেছে। সম্ভবত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর দেখা দেবে। সেই জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সব শেষ হবে। চিকিৎসায় আর কোনো ফল হবে না।

ডাক্তার যা বলে গেলেন তাই ঘটতে চলল। একটু বেলা হতেই জাফর সাহেবের জ্বর দেখা দিল, দিনের শেষে দেখা দিল ঘোর বিকার।

রোগীর পাশে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে শিউলী। নিকটেই দু'খানা

চেয়ারে নীরবে বসে আছেন অমিয়বাবু আর ইব্রাহিম। করিম মেঝেয় বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদছে।

ঘরের মধ্যে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মৃত্যুর গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। সেই নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে জাফর সাহেব প্রলাপ বকছেন। সে প্রলাপের বেশীর ভাগই ঢাকার সেই বীভৎস দাঙ্গার ঘটনা। একবার জাফর সাহেব চিৎকার করে বলে উঠলেন, খোদার দোহাই এঁকে বেইজ্জৎ ক'রো না, খোদার গজব নেমে আসবে, খোদার গজব নেমে আসবে।

সন্ধ্যার পূর্বে জাফর সাহেবের ঘর থেকে সব পুরুষ সরিয়ে দিয়ে জুলেখা এসে ভাইকে দেখে গেছেন। রাত্রে ভাইয়ের কাছে থাকার জন্য ওমর সাহেবের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করেও অনুমতি পেলেন না। রাত আটটায় সোফিয়া এসে মায়ের জন্য বাপের কাছে সুপারিশ করল, তাতেও কোনো ফল হল না।

রাত গভীর হয়ে আসছে। রাত ন'টার পর থেকে রোগীর গায়ের তাপ কমতে আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে রোগীও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

রাত এগারোটায় নার্স থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখে বললেন, রোগীর তাপ আবার একটু বেড়েছে। সকলে উৎসাহিত হয়ে ইব্রাহিমকে পাঠালেন ডাক্তার আনতে। ডাক্তার এসে দেখে বললেন, রাত যদি কাটে তবে আশা করা যায়; বাইরে গিয়ে অমিয়বাবুকে বললেন, এটা কিছু নয় প্রদীপ নেভার আগে সলতে জ্বলার মতো।

ডাক্তার বিদায় হওয়ার পর জাফর সাহেব আবার প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলেন। এবারে শুধু সুলতানপুরের কথা। সুলতানপুরের বাড়ী, ভৈরব নদ, ভেওয়া ফকিরের দরগা, বেগম সাহেবা, গোলাপ, শিউলী বাংলা ভাগে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সর্বনাশ, এই সব প্রলাপের বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে শিউলী ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা বাবা, এসব আপনি কি বলছেন।' জাফর সাহেব শিউলীর মুখের দিকে তাকান, সে দৃষ্টি অর্থশূন্য।

রাত দু'টো বেজে দু'এক মিনিট হয়েছে, এমন সময় জাফর সাহেব প্রলাপের ঘোরে বললেন, ভৈরবে বান ডেকেছে সব ভেসে যাবে।

শিউলী জিজ্ঞাসা করল—বাবা, আপনি ভৈরবের কথা কি বলছেন?

শিউলীর ডাকে জাফর সাহেব চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে সুস্থ মানুষের মতো তার হাত ধরে উঠে বসে স্পষ্ট ক'রে বললেন,—

তুই গিয়ে গোলাপকে ডেকে আন। চল বেড়াতে যাই, ভৈরবে বান ডেকেছে।—

বলেই জাফর সাহেব চোখবুঁজে শিউলীর কোলে নেতিয়ে পড়লেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

প্রায় আড়াই'শ বছর পূর্বে বাঙলাদেশে ভৈরবের তীরে মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে যে মুসলমান জমিদারবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই সুদীর্ঘকাল জমিদারীর হিন্দু-মুসলমান প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নিজেদের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ মনে করে তাদেরই সঙ্গে বাস করেছেন; যাঁদের জমিদারীতে মসজিদ-দরগায় সকাল-সন্ধ্যায় আজানের সঙ্গে নির্বিবাদে মন্দিরে বাজত কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ; যে জমিদারবংশ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবাদের উর্ধে থেকে সর্ব-সাধারণের মধ্যে সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সর্বদা যত্নবান ছিলেন; সেই জমিদার বংশের শেষ প্রদীপ মহম্মদ জাফরুল্লা খানচৌধুরী তাঁদের পুরুষানুক্রমিক সাধনার ব্যর্থতা বীভৎস সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রেতনৃত্য চাক্ষুষ দেখে ভগ্ন হৃদয়ে অকালে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে বহুদূরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাঙলাদেশ সুলতানপুর ভৈরব নদ ভুলতে পারেন নি। বিচ্ছিন্ন বাঙলার হতভাগ্য হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের কথাও মনে ছিল। তাই বিকারঘোরে ঢাকাই দাঙ্গার পৈশাচিক স্মৃতি তাঁর মনে জেগে বিভীষিকা দেখিয়েছে।

জাফরুল্লা চৌধুরী ছিলেন সৎ-সাধু মানুষ, সেজন্য মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর মন থেকে ঢাকাই দাঙ্গার স্মৃতি সরে গিয়ে জেগে উঠেছিল সুখ-স্মৃতি বিজড়িত সুলতানপুর আর পরম স্নেহের শিউলী ও গোলাপ। সেই শিউলী-গোলাপের সঙ্গে চিরসুন্দর ভৈরবের তীরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বাংলার একটি সুসন্তান জমিদার জাফরুল্লা খানচৌধুরী ভৈরব মহাকালের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

দ্বিখণ্ডিতা দুঃখিনী বঙ্গজননী তাঁর এই বিচিত্র স্বাধীনতা দান পেয়ে এরকমের বহু সুসন্তান অকালে হারিয়েছেন, এখনও হারাচ্ছেন।

জাফর সাহেবের মৃত্যুর সাতদিন পরে দুপুরে শিউলী করিমকে জিজ্ঞাসা করল,—করিম ভাই, বলতে পার তোমার গোলাপবাবু কবে কলকাতা আসবেন?

তার আসার সময় হয়েছে। আসার আগে পত্র দেবে। হোটেলে তার ঘরের চাবি আছে আমার কাছে।

এ বাড়ীতে আর একদিনও আমার থাকার ইচ্ছা নেই। কিন্তু তথাপি তাঁর ফেরা পর্যন্ত থাকতে হবে। এই বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

আচ্ছা খুকুমণি, তুমি কি সত্যিই গোলাকে সাদী করবে?

আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, সাদী আমাদের সেই ছেলেবেলায়ই হয়ে গেছে। সুলতানপুরের খানচৌধুরী বংশের মেয়েদের জীবনে একটা সাদীই হয়।

আহা বড়ো ভুল করে ফেলেছ। হুজুর বেঁচে থাকতে যদি কথাটা গোলাকে বুঝানো হত তবে কোনো ঝামেলাই হত না। এখন তাকে বুঝানো কঠিন হবে।

কি কথা বুঝানো কঠিন হবে?

তুমি যে বরাবরই তাকে ভালোবাস, এই কথা।

তিনি যদি না বোঝেন নাই বা বুঝলেন।

তবে সাদী রেজেস্ট্রী হবে কি করে?

নাই বা রেজেস্ট্রী হল। তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন তবে তার জন্য আমি নিশ্চয়ই তাঁকে খোসামদ করতে যাব না।

কথাটা তুমি তোমাদের বংশের মতোই বললে বটে, কিন্তু এরকম মনোভাব নিয়ে যদি চল, তবে তোমাদের ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে না।

না হয় না হল। তুমি তোমার গোলাপবাবুকে একটা ভালো মেয়ে বিয়ে করে সংসার করতে পরামর্শ দিও।

দেখ খুকুমণি, এ জীবনে আমি দু'জনকে ভালো করে চিনেছি বলে মনে করি। হুজুরের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতাম তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। আর বুঝি এই গোলাকে। আমার মনে হয় হুজুরের এই চিঠি গোলা পড়ে ভাববে তুমি হুজুরের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যই এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছ।

সেরকম ভাবলে আর কি করা যাবে বল। আমি তো আর হাতে করে তার মনটা গড়ে দিতে পারি নে।

এমন সময়ে বাইরে রাস্তায় ডাকপিওনের হাঁক শোনা গেল, টেলিগ্রাম এসেছে। করিম টেলিগ্রাম আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে রহমত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। টেলিগ্রামটা নিয়ে করিম দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে শুনল রহমত বাইরে থেকে বাড়ীতে ঢোকে নি।

টেলিগ্রাম করেছে অজিত রায়, সে দু'দিন পরে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় কলকাতা পৌছাচ্ছে।

তুমি যখন গেলে তখন তিনি কি করছিলেন ?

তখন চা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হেসে বলল, 'এই যে করিম ভাই এসে গেছে। ভাইসাহেবের মেজাজ সরিফ তো? আর এক প্লেট খাবার আনাই, কি বল ?'—

তার কথায় আমি কেঁদে বললাম, 'হুজুর এন্তেকাল করেছেন।' শুনে, তুমি যেমন প্রথমদিন 'রোগা হুজুরকে দেখে কেঁদে উঠেছিলে, সেই রকম করে কেঁদে উঠল। তাকে একটু সুস্থ করে আসতে দেরি হয়ে গেল।

তিনি কিছু খেয়েছেন ? প্রশ্ন করল শিউলী।

না, কিছু খায় নি। আমি খাওয়ার জন্য পেড়াপীড়ি করলাম তা খেল না। আজ দিনে নাকি আর খাবে না।

শুনে শিউলীর চোখে জল এল, চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করল,—

আর কোন কথা হল ?

হুজুরের মৃত্যু কি ভাবে হল, তা বললাম। যখন বললাম, শেষ সময়ে খুকুমণির হাত ধরে হুজুর বেশ স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন,—'শিউলী, গোলাপকে ডেকে আন। চল, আমরা ভৈরবের ধারে বেড়াতে যাই'—তখন গোলা একেবারে ছেলেমানুষের মতো লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার জন্য আর কিছু বলতে পারি নি।

করিমের কথা শুনে শিউলীও কেঁদে ফেলল। একটু শান্ত হলে করিম বলল,—

হুজুরের পত্রের কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আমার আসার সময় গোলা বলে দিয়েছে, বিকালে তোমার কাছে ছুটি নিয়ে ঘণ্টা তিনেকের জন্য তার কাছে যেতে।

এর জন্য তোমাকে ছুটি নিতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে জানিয়ে যেও যে, তুমি তার কাছে যাচ্ছ। সে যা বলে তাই করবে। আজ আর পত্রের কথা ব'লো না, কাল সকালে পত্র নিয়ে যেও।

শিউলীর মনের অবস্থা বুঝে করিম আর কিছু না বলে ঘর হতে বেরিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এসে বলল,—

খুকুমণি, এই বাড়ীতে আর বেশীদিন আমাদের থাকা ঠিক হবে না। এই রহমত লোকটার মতলব ভালো নয়। আমি ঘর থেকে বেরুতেই দেখলাম ঐ শালা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে ওপরে চলে গেল। ঐ সুমুদ্দির পো'কে এইরকম গোয়েন্দাগিরি করতে আরও

কয়েকবার আমি দেখেছি। বালীগঞ্জের বাড়ীতে যারা আছে, ওরা সব ভদ্রলোক। ওখানে আমরা নিরাপদে থাকব।

বাবাও আমাকে এই কথাই বলে গেছেন। কাল যদি গোলাপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি তবে আগামী রবিবারে এ বাড়ী ছেড়ে যাব। একথা কিন্তু এখন কাউকে জানিও না।

করিম চলে গেল। একটু পরেই করিমের মা এল শিউলীর খাবার দেবে কিনা, জানতে। শিউলী জানাল, দিনের বেলা সে কিছু খাবে না। কেন খাবে না জানতে চাইলে বিরক্ত হয়ে বলল,—মাসী, সব সময় সব কাজের কৈফিয়ত চেও না তো। আমার মন ভালো নেই।

অপরাহ্ন সাড়ে চারটা বাজতেই শিউলী করিমকে পাঠালো হোটেলে। রাত ন'টায় করিম ফিরে এসে বলল,—

আমি গিয়ে শুনলাম গোলা দুপুরে কিছু খায় নি, ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে স্নান করে জামাকাপড় পরে খালি পায়ে হোটেল থেকে বেরুল। রাস্তায় এসে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে দু'জন গেলাম কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। সেখানে কেনা হল দশগজ লাল শালু কাপড় আর পঞ্চাশ টাকার ফুল ও ফুলেরতোড়া। তারপর চিৎপুর এসে কেনা হল হুজুর যে তিনরকম আতর ভালোবাসতেন সেই তিনটে আতর। সেখান থেকে বড়বাজারে গিয়ে কেনা হল দুই ঝুড়িতে এক মণ লাড্ডু মিষ্টি। এইসব কেনাকাটা করতেই ছ'টা বেজে গেল। তারপর আমরা গেলাম হুজুরের মাজার সরিফে।—

সেখানে গোলা নিজ হাতে শালুকাপড় দিয়ে মাজার ঢেকে তার ওপরে ঢেলে দিল আতর। তারপর ফুল দিয়ে মাজার সাজিয়ে দু'পাশে দিল দু'টো ফুলের তোড়া আর চারদিকে জেলে দিল একশ' একটা মোমবাতি। এইসব করে মাজারের পাশে বসে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।—

এদিকে রাত হয়ে যায়, বেশী দেরী হলে আবার তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কাজেই তার হাত ধরে টেনে গোরস্থানের বাইরে আনলাম। বাইরে এসে সেই দু'ঝুড়ি মিঠাই ফকির মিস্কিনদের খয়রাত করে গেলাম হোটেলে।—

হোটেলে গিয়ে গোলা বিছানায় শুয়ে পড়ল। খাওয়ার কথা বলতে, বলল কিছু খাবে না। তখন বাধ্য হয়ে আমি বললাম, তুমি কিছু খাবে না শুনে খুকুমনি না খেয়ে আছে। তোমার খাওয়ার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত সে পানিটুকুও খাবে না।

আমার কথায় গোলা বেকুবের মতো খানিকক্ষণ আমার মুখপানে তাকিয়ে

থেকে বলল, তবে ডালভাত আনতে বল। মাছ মাংস যেন না দেয়। আমি তাই ফরমাস করে গেলাম দোকানে, একপোয়া রাবড়ি আর দু'টো কলা এনে তাকে খাইয়ে বিছানা ঝেড়ে মশারি খাটিয়ে দিয়ে এলাম।

সব শুনে শিউলী প্রশ্ন করল,—রাবড়ি-কলা কেনার পয়সা পেলে কোথায়?

করিম উত্তরদিল,—দোকানটা আমার চেনা, দামটা বাকি আছে। কলা দু'টো নগদ কিনেছি।

করিমের কথা শুনে শিউলী উঠে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা মানিব্যাগ বের করে করিমের হাতে দিয়ে বলল,—এর মধ্যে গোটাপনরো টাকা আছে। এটা সব সময় সঙ্গে রাখবে, যখন যা দরকার হয় খরচ করবে, ফুরোলে আবার টাকা নেবে। এজন্য কোনো হিসাব দিতে হবে না। মাসীকে বল, আমাকে চা দিয়ে আলুপটোল সিদ্ধ ভাত তুলে দিতে; আমি আর কিছু খাব না।

পরদিন শুক্রবার। প্রাতে ছ'টায় শিউলী করিমের হাতে জাফরসাহেবের শেষপত্র দিয়ে পাঠাল হোটেলে। মুখে বলে দিল, গোলাপবাবুর সকালের খাওয়া হলে পত্র তাঁর হাতে দেবে। আর আজ তাঁর সুবিধামতো বেলা বারোটার পর তিনটার মধ্যে এসে দেখা করলে ভালো হয়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে করিম ফিরে এল। শিউলী উৎকণ্ঠিত চিত্তে তার অপেক্ষা করছিল। করিম এসে বলল,—

আমি গিয়ে দেখি গোলা তখনও ওঠে নি, আমাকে দেখে উঠে বাথরুমে গেল। হোটেলে সকালে দেয় কেবল টোস্ট আর চা, আমি দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে এলাম। খাওয়া হলে পত্রখানা দিয়ে দেখা করার কথা বললাম।

তারপর কি হল? ব্যগ্র হয়ে শিউলী প্রশ্ন করল।

পত্র পড়ে গোলার চোখমুখের ভাব যেন কেমন হয়ে গেল। তাকে আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলাম না। কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে উঠে আবার বাথরুমে গেল। অনেকক্ষণ বেরোয় না দেখে গেলাম বাথরুমে। গিয়ে দেখি পানির কল ছেড়ে দিয়ে তার তলে মাথা পেতে বসে আছে।

তারপর? অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিউলী।

ধরে এনে ভিজে জামা কাপড় ছাড়িয়ে গা মাথা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। টেবিল ফ্যানটা বসিয়ে দিলাম মাথার কাছে তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তোমাকে খবর দিতে এসেছি।

করিমভাই, তুমি গাড়ি আনো, আমি হোটেলে যাব।

তাহলে আমি চট্‌করে গিয়ে আর একবার খবর নিয়ে আসি।

আচ্ছা যাও গাড়ি করে যাও।

করিম চলে গেলে শিউলী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যেই করিম ম্লানমুখে ফিরে এল। তার মুখের ভাব দেখে শিউলী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—

কি হয়েছে করিমভাই? তোমার মুখ অমন কেন!

গোলা হোটেলে নেই।

কোথায় গেছে?

কাউকে বলে যায় নি। খালি পা'এ মাত্র একটা ফতুয়া পরে বেরিয়ে গেছে। ঘরের দরজা খোলা ছিল দেখে ম্যানেজার তালা লাগিয়ে রেখেছেন। ঐ অবস্থায় ওকে একা রেখে আমার আসাই ভুল হয়েছে।

তুমি এখনই যাও। শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন দেখে সব পার্ক, ইডেন-গার্ডেন, গড়েরমাঠ, কালীঘাট, এইসব জায়গায় খোঁজ করবে। সঙ্গে একখানা ট্যাক্সি রাখবে, আমি টাকা দিচ্ছি।

করিম টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরেই একখানা চেয়ারে মার্বেল পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকল। খাবার সময় হলে করিমের মা এসে জানাল, কোনো সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

বেলা প্রায় এগারটায় করিম ফিরে এসে শিউলীকে জানাল, বহু জায়গায় খুঁজে শেষে কলেজস্কোয়ারে গোলার দেখা পেয়েছিল। এই আষাঢ়ী রোদে খালি মাথায় খালি পায় সে দিঘির চারপাশের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তোমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে? প্রশ্ন করল শিউলী।

আমাকে দেখে যেন একেবারে ক্ষেপে গেল। আমি কিছু না বলতেই ধমক দিয়ে বলল, কেন আবার বিরক্ত করতে এসেছ? যাও, গিয়ে তোমার মনিবকে বল, তাঁর হুকুম মতো বেলা দেড়টায় অজিত রায় হাজির হবে।

তারপর?—প্রশ্নটা শিউলীর গলায় যেন ঠেকে গেল।

কথাটা বলেই গোলা দ্রুত পায়ে কলেজস্কোয়ার থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেল। আমি হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত তার পিছনে ছুটে শেষে আর ধরতে পারি নি।

শিউলী দাঁড়িয়ে করিমের কথা শুনছিল, আর দাঁড়াতে পারল না, শোবার

ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ব্যাপার বুঝে করিম তার মা'কে শিউলীর ঘরে যেতে নিষেধ করে পরবর্তী অবস্থার অপেক্ষায় বৈঠকখানায় বসে থাকল।

বিছানায় শুয়ে প্রথমদিকে শিউলী কিছু ভাবতে পারল না, সব যেন কেমন একটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে নিশ্চল পড়ে থাকার পর হঠাৎ কানে বেজে উঠল, 'যাও, গিয়ে তোমার মনিবকে বল, তাঁর হুকুম মতো বেলা দেড়টায় অজিত রায় হাজির হবে', সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে আরম্ভ করল।

ঘড়ির শব্দ শিউলীর মনে যেন একটা যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে গেল। যে মনোবল সে এই কিছুক্ষণ আগে হারিয়ে ফেলেছিল সেটা ফিরে পেয়ে তার স্বাভাবিক ধৈর্য ও সাহস সহকারে এই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হল। শিউলী বিছানা থেকে উঠে করিমকে ডেকে তার হাতে টাকা দিয়ে পাঠাল ভালো ফল আর কিছু সন্দেশ আনতে। তারপর গেল স্নান করতে। স্নান করে এসে যে শাড়ী-জামা পরে সে কলেজে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল সেই সেট্‌টা বের করে পরল। তারপর করিম ফিরে এলে তাকে নিয়ে গেল বৈঠকখানা ঘর সাজাতে।

ঘরখানা গুছিয়ে মাঝখানে গোল মার্বেল পাথরের টেবিলখানা বসিয়ে তার ওপরে কারুকার্য করা লাল গোলাপী রঙের জামিয়ার পেতে তার ওপরে একটা বড়ো স্পেনিশ টাব্ ডিশে বরফ জলে ডুবিয়ে রাখল ছাড়ানো ফল। রুপোর প্লেটে সন্দেশ সাজিয়ে ঢাক্‌নায় ঢেকে তার পাশে রাখল টাটকা লেবুর রস মিশানো মিছরির সরবৎ আর ছোটো কাঁচের কুঁজায় ঠাণ্ডা জল। তারপর টেবিলের ছু'পাশে দু'খানা কুশান চেয়ার পেতে বাইরের দরজা সম্মুখ করে শিউলী যখন প্রস্তুত হয়ে বসল তখন ঘড়িতে একটা বেজেছে।

দেখা যায় যুদ্ধের সম্ভাবনায় বড়ো বড়ো সেনাপতিরা প্রথমদিকে খুব উদ্‌বিগ্ন থাকেন, কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে তাঁরা পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে যান। শিউলী যখন টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসল, তখন তার অবস্থাও হল সেই সেনাপতিদের মতো।

ঘড়িতে দেড়টা বাজতে শিউলী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘড়ির কাঁটা এক, দুই, তিন করে এগিয়ে চলল, গোলাপের দেখা নেই।

আরও দশ মিনিট গেল, শিউলী বসে থাকতে পারল না, উঠে বাইরের দরজার পরদা সরিয়ে দেখল, গলির মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। আষাঢ়ী দুপুরে পথ প্রায় জনশূন্য গোলা গলির পথে নেই। শিউলীর ম্লান মুখে-চোখে এবার আশঙ্কার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেলে শিউলীর চোখে পড়ল পরদার ওপরে একটা মানুষের ছায়া, ছায়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার কিন্তু শিউলী সেই যুদ্ধারম্ভে সেনাপতির মতো স্থির-ধীর থাকতে পারল না; তার গা ঘেমে বুক টিপ্‌টিপ্‌ করতে লাগল। কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙাগলায় বলল,—ভিতরে আসুন।

পরদা সরিয়ে গোলাপ ঘরে প্রবেশ করল। তার চোখ দুটো লাল জবাফুলের মতো, মাথার চুল এলোমেলো, গায়ের পাঞ্জাবিটার সবক'টা বোতাম লাগানো হয়নি, সব ছন্নছাড়া পাগলের মতো।

ঘরে প্রবেশ করেই সম্মুখে টেবিলের অপর দিকে দাঁড়ানো শিউলীকে দেখে গোলাপ থম্‌কে নিশ্চল হয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল, কথা বলতে পারল না। শিউলীও নিশ্চল পুতুলের মতো গোলাপের রক্তরাঙা চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, কথা বলল না।

এইভাবে প্রায় দু'মিনিট নীরবে কেটে গিয়ে গোলাপের চমক্ ভাঙল। দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে জলের কুঁজোটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে অনেকখানি জল খেয়ে কুঁজোটা হাতে করেই বলতে আরম্ভ করল,—

তুমি—আপনি রোশোনারা চৌধুরী! আপনাকে আমি চিনি নে। চাচাসাহেব আমাকে ভালোবাসতেন, অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাজার হালে ছিলাম। আমার জন্য কাউকে কিছু করতে হবে না। চাচাসাহেব নেই, আমিও নেই। চাচাসাহেব স্বর্গে গেছেন আমি যাব আফ্রিকায় দক্ষিণ আমেরিকায়। চাচাসাহেব মরে যাওয়ার পর এ সংসারে আমার আর কেউ নেই। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না, ভাবতে দেব না। এই বারো বছরে আমার নামটাও আর কেউ—।

গোলাপের কণ্ঠ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে রুদ্ধ হয়ে গেল। হাতের কুঁজোয় মুখ লাগিয়ে আরও খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বলল,—

ছেলেবেলার কথা, ও তো রাতের স্বপ্ন হাসির খোরাক। বারো বছরে সব মুছে গেছে, নামটাও মনে নেই। থাকবেই বা কেন, থেকে লাভই বা কি? চাচাসাহেব ভালোবাসতেন, খুবই ভালোবাসতেন। সেইজন্য ওরকম চিঠি লিখে গেছেন। চাচাসাহেব সুখে স্বর্গে থেকে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন কারও অনিচ্ছার দান, অনুগ্রহ আমাকে গ্রহণ করতে না হয়। চাচাসাহেবের চাপে পড়ে পত্রে আজগুবি কথা লেখা হয়েছে। ওসব মিথ্যে। বারো বছরে

নামটাও কেউ করে নি। দূরে, বহু দূরে, অজানা দেশ থেকে সবসময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব চাচাসাহেবের মেয়ে তার পছন্দমতো—অ্যাঁ—হ্যাঁ—সুখী হোক। সে সুখী হোক। আমার নাম সকলের মন থেকে মুছে গেছে, আর যেন না জাগে।

গোলাপ আবার জল খেতে নিল, কুঁজায় জল ছিল না, একটু ঠোঁট ভিজল মাত্র। খালি কুঁজাটা চেয়ারের ওপরে রেখে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুতে দরজায় হোঁচট খেয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

সদর দরজায় বসেছিল করিম, গোলাপকে পড়তে দেখে ছুটে এসে ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করল,—

খুব লেগেছে?

না লাগে নি। একখানা গাড়ি করে আমাকে হোটেলে রেখে আসতে পারো?

তুমি ঘরে গিয়ে বস। আমি গাড়ি আনছি।

না, তুমি আমাকে একটু ধরে নিয়ে চল। গলির মোড়ে রিক্সা পাওয়া যাবে।

ঘর থেকে গোলাপ বেরিয়ে গেলে টেবিলের ধারে শিউলী নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। দরজার পরদায় মানুষের ছায়া পড়তে দেখে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ভিতরে আসুন। তারপর আর কথা বলে নি, নড়েও নি।

গোলাপ চলে গেছে। শিউলী কথা বলে না, নড়ে না, চোখের পলকও পড়ে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই পরদার দিকে, যে পরদা ঠেলে গোলাপ ঘরে প্রবেশ করেছিল, আবার বেরিয়ে গেছে।

বৈঠকখানার ভিতরের দিকে দরজার বাইরে বসে করিমের মা আগাগোড়া ব্যাপারটা দেখেছে। গোলাপ চলে গেলেও শিউলী একভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে চিন্তিত হয়ে কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে, 'ও মা তুই এমন হলি কেন' বলে জড়িয়ে ধরতেই তার বুকের মধ্যে শিউলী এলিয়ে পড়ল।

বুদ্ধিমতী করিমের মা আর চেঁচামিচি না করে মূর্ছিতা শিউলীকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে প্রথমে বাইরের দরজা বন্ধ করে সব জানালাও বন্ধ করে দিল।

তারপর জল এনে শিউলীর চোখে-মুখে দিয়ে মাথায় পাখার বাতাস দিতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল।

শিউলীর জ্ঞান ফিরে আসছে দেখে তাকে খাওয়ানোর জন্য একটু গরম দুধ আনতে ঘর হতে বেরোতেই করিমের মা'র চোখে পড়ল রহমত বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে করিমের মা অত্যন্ত রেগে প্রশ্ন করল,—

এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?

কিছু করছিনে। ওপরে পানি নেই, পানি নিতে এসেছি।

দেখো মিঞা, আমরা যতদিন এ বাড়ীতে থাকব ততদিন যদি ঐ সিঁড়িকোঠার এদিকে তোমাকে আমি দেখি তবে ঝাঁটা মেরে এ বাড়ী থেকে তাড়াব। তোমার কোন মনিব আমার ঝাঁটা ঠেকাতে পারবে না।

বলে করিমের মা গেল বাবুর্চিখানায়। রহমত একটু মুচকি হেসে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলল চিৎপুরের দিকে।

করিমের মা দুধ এনে শিউলীকে খাইয়ে হাত ধরে নিয়ে গেল শোবার ঘরে বিছানায়। বিছানায় শুইয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—

তুই একথা এতদিন আমাকে বলিস নি কেন? বললে হুজুরকে জানিয়ে চেষ্টা করতে পারতাম। রাজকন্যে-রাজত্বি পেলে কত হিঁদুর বেটার মাথা ঘুরে যেত। তা যা হবার হয়েছে, তুই ব্যস্ত হোসনে, আমি ধর্মতলার ফকির সাহেবকে ধরে এমন তুক্ করব, দেখবি ও ছোঁড়া একমাসের মধ্যে মোছলমান হয়ে তোর কেনা গোলাম হবে। তুই মোটেই ব্যস্ত হোস নে, আমি ওকে বশ করবই।

শিউলী ক্ষীণকণ্ঠে বলল, —মাসী, তুমি ভুল বুঝছ। ওঁকে আমি কখনোই মুসলমান হতে দেব না। তিনি যদি নিজেও মুসলমান হতে চান, আমি প্রাণ-পণে বাধা দেব।

তবে কি তুই হিঁদু হবি? ওঃ সেইজন্যই তুই গোস্ত খাওয়া ছেড়েছিস, মোছলমানের হোটেলের খাবারও খাস নে!

মাসী, তুমি এখন বক্ বক্ কোর না তো। তিনিও মুসলমান হবেন না, আমিও হিঁদু হব না। ধর্মত্যাগীকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

তবে তোদের সাদী হবে কি করে?

আমাদের সাদী বহুকাল আগে সুলতানপুরে হয়ে গেছে। বাবা আর ভেওয়া ফকির তার সাক্ষী ছিলেন।

হুজুর সাক্ষী ছিলেন!

এবার শিউলী আর চোখের জল সামলাতে পারল না, চোখ মুছতে মুছতে উঠে গিয়ে একখানা বড়ো ট্রে'র ওপরে সব সাজিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে করিমের হাতে তুলে দিল।

এক ঘণ্টা পরে করিম ফিরে এসে বলল,—খাবার দেখে গোলা খুব চটে উঠেছিল। আমিও বেশ গরম হয়ে বললাম, তোমাকে খাওয়াবে বলে শিলী এগুলো নিজ হাতে তৈরী করেছিল। সন্ধ্যার পর দেখলাম, সে এগুলো নিয়ে নীরবে কাঁদছে, তাই তাকে সান্তনা দেবার জন্য এনেছি। তুমি যদি না খাও, তবে নর্দমায় ফেলে দাও। আমার কথায় মানুষ একেবারে বদলে গেল।

তাহলে তিনি সব খেয়েছেন?

সব খায় নি। সন্দেশ আর আঙ্গুরগুলো টিফিনকেরিয়ারে তুলে রেখে কাটা ফলগুলো খেয়েছে।

আর কিছু বললেন?

কাল সকালে গেলে নাকি দেখা হবে না, বেলা দশটার পর যেতে বলেছে।

পরদিন শনিবার বেলা দশটার পর গেলে দেখা হবে, আগে গেলে দেখা হবে না বলেছে গোলাপ। শিউলী কিন্তু সকাল ছ'টা বাজতেই করিমকে বলল,—করিম ভাই, তিনি দার্জিলিঙ থেকে ফিরেছেন, হাতে বোধহয় টাকা নেই। এই পাঁচশ' টাকা তাঁকে দিয়ে এস।

দিচ্ছ তো খুকুমণি, কিন্তু গোলা এখন তোমার টাকা নেবে কিনা সন্দেহ।

আমিও তা ভেবেছি। অত্যন্ত অভিমানী মানুষ। কিন্তু আর একটা কথা আছে, যা তিনি জানেন না; আমিও জানতাম না। কথাটা বাবা মৃত্যুকালে আমাকে বলে গেছেন, এবং সেই অনুযায়ী দলিল করে কাকাবাবুর কাছে রেখে গেছেন।

কথাটা কি খুকুমণি?

কথাটা হচ্ছে, সুলতানপুরের জমিদারীর অর্ধাংশের প্রকৃত মালিক ছিলেন হোসেনপুরের রায় বংশ। আমরা অন্যায় করে সে ভাগ তাঁদের দিই নি, যার জন্য খোদার গজবে সুলতানপুর ধ্বংস হয়ে গেল। এখন এই কলকাতায় যা কিছু আমার নামে আছে তার অর্ধাংশের ন্যায্য মালিক তিনি।

খুকুমণি, তুমি সব কথাই বল, কিন্তু বড্ডো দেরী করে বল। এখন এই সব কথা তাকে বুঝানো সহজ হবে না। কাল রাতে ফলগুলো খেল বটে, কিন্তু শেষে যা বলল তা বড়ো সুবিধের নয়।

কি কথা বলেছেন, করিম ভাই ? শিউলী অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

তুমি না খেয়ে আছ কাঁদছ, এই সব কথা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। তার ধারণা, আমি অনেকটা বানিয়ে বলেছি।

এ অবিশ্বাসের হেতু ?

সে কথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে সে বলল,—যে একযুগ বারো বছরের মধ্যে নামটাও মুখে আনে নি, সে এখন হঠাৎ চাচা সাহেবের মৃত্যুর পর কেঁদে ভাসাচ্ছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

এর উত্তরে তুমি কি বললে ?

বললাম, আমি যা দেখছি শুনছি তাই তোমাকে জানাচ্ছি। তোমার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস কর, চাই না কর।

তাতে কি বললেন ?

বলল, প্রয়োজন হলে মেয়েরা চমৎকার কান্নাকাটির অভিনয় করতে পারে।

করিমের কথায় শিউলীর মুখের রক্ত যেন সব উধাও হয়ে গেল। অবস্থাটা বুঝে করিম বলল,—

আমি তার এ কথার উত্তর দিয়েছি।

কি উত্তর দিলে ? ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল শিউলী।

বললাম, তুমি ভুল করছ। তুমি নিজেই দেখেছ, ছেলেবেলায় বেগম সাহেবার হাতে মার খেয়ে সে কাঁদত না, অথচ তোমার জন্য সে যথেষ্ট কেঁদেছে। তোমাদের দু'জনের সম্বন্ধটাও এই বারো বছর ছিল পরদার আড়ালে। এখন সে পরদা সরে গেছে।

শুনে কি বললেন ?

বলল, তার জন্য কেউ দুঃখ পায় এ সে চায় না।

তুমি তাঁর কাছে আমার নাম করতে শিলী বল, না শিউলী বল ?

শিলী বলি। যদি ওকে একদিন ঠাণ্ডা মাথায় এখানে আনতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সহজেই সব গোলমাল মিটে যাবে।

এরপর টাকা নিয়ে করিম গেল হোটেলে। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে জানাল, গোলাপ হোটেলে নেই। দারোয়ানকে বলে গেছে কেউ খোঁজ করতে এলে সাড়ে দশটার পর আসতে বলবে।

সাড়ে দশটায় করিম আবার গেল হোটেলে। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই তার ফিরে আসার সাড়া পেয়ে শিউলী ব্যস্ত হয়ে তার সম্মুখে যেতেই সে কেঁদে ফেলল।

কি হয়েছে করিম ভাই ? প্রশ্ন করল ব্যগ্র শিউলী।

গোলা তার সব জিনিসপত্র নিলামদারের কাছে বিক্রি করে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

সংবাদটা শুনে শিউলী স্তম্ভিত হয়ে গেল, কিন্তু সে ভাব অল্প সময়ের জন্য। পরক্ষণেই সে ধীর স্থির অবিচলিত কণ্ঠে করিমকে জিজ্ঞাসা করল,—

অজিত রায়ের জিনিষপত্র কি নিলামদার নিয়ে গেছে ?

না, এখনও নিয়ে যায় নি, নেবার জন্য ঠেলাগাড়ী আনতে গেছে।

কত টাকায় সব বিক্রি করে গেছেন ?

মাত্র আটশ' টাকায়।

আমি টাকা এনে দিচ্ছি। অজিত রায়ের সব জিনিস আমি চাই। একটাও যেন হাতছাড়া না হয়। তাতে যে টাকা লাগে লাগবে।—বলে শিউলী টাকা আনতে গেল।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সি এসে থামল। ইব্রাহিম এসেছে।

টাকা নিয়ে এসে ইব্রাহিমকে দেখে শিউলী বলল,—ভাই, আপনি এই ট্যাক্সি নিয়েই করিমভাই'এর সঙ্গে অজিত রায়ের হোটেলে যান। অজিত রায়ের সব জিনিস নিলামওয়ালা কিনেছে। ওসব আমি চাই। তাড়াতাড়ি যান।

বিস্মিত ইব্রাহিম কোনো কথা না বলে করিমের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ছেড়ে গেল।

শিউলী নীরবে বসে থাকল বৈঠকখানা ঘরে। তার মুখ দেখে বুঝার উপায় নেই, কিছু একটা ঘটেছে।

নিলামওয়ালা আটশ' টাকা মালে হাতে হাতে তিনশ' টাকা লাভ পেয়ে খুশিমনে সব মাল গুছিয়ে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। শিউলীর নির্দেশমতো কিছু মাল বারান্দায় রেখে আর সব তার শোবার ঘরে তুলে দিয়ে ইব্রাহিম গেল ওপর তলায়।

ইব্রাহিমকে দেখে জুলেখা জিজ্ঞাসা করলেন,—এত সব কি এল রে ইব্রাহিম ?

মামুর দেওয়ানজীর ছেলে অজিত রায় তার সব জিনিসপত্র বিক্রি করে বিদেশে গেছে। শিউলী সেই সব কিনে আনল।

কেন! শিউলীর কি কোনো জিনিসের অভাব আছে?

অভাব না থাকলেও ওর মধ্যে যে সব গানবাজনার জিনিস আছে বাজারে সেগুলো কিনতে গেলে চার-পাঁচ হাজার টাকা লাগত।

শিউলী কি এখন ঐ সব বাজাবে?

হাঁ বাজাবে। তবে এ বাড়ীতে বাজাবে না, বালীগঞ্জে গিয়ে বাজাবে।

ইব্রাহিমের মেজাজ দেখে জুলেখা আর কিছু বললেন না। ইব্রাহিম স্নান করে এসে খেতে বসল। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে জুলেখা এসে কাছে বসলেন। খেতে খেতে ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করল,—

মা, তোমার খানসামা কোথায়?

সে কাজ সেরে বাগমারী গেছে।

তুমি পাঠিয়েছ?

না, আমি আর কি কাজে পাঠাব। এখন এখানে তো আর কিছু করার নেই। তাই কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছে।

মা, তুমি ওকে তাড়াও। নইলে সর্বনাশ হবে।

বার বার একথা কেন বলছিস, বলতো?

তুমি বলছ রহমত বাগমারী গেছে। কিন্তু ও মোটেই বাগমারী যায়নি, এই বাড়ীর নীচতলায় কি ঘটছে তাই নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে।

কার জন্য সে গোয়েন্দাগিরি করছে।

কার জন্য এ কাজ করছে তা এখনও সঠিক আমি জানিনে। তবে যে সরবত খেয়ে মামু মারা গেলেন সেই সরবতের গ্লাসটা মামুর ঘর থেকে ঐ রহমতই চুরি করে সরিয়েছিল, এটা আমি দেখেছি।

সরবত খেয়ে জাফর ভাই মারা গেছে?

হাঁ। সরবতে বিষ মিশানো ছিল।

বলিস কি! জাফর ভাইকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে!!

হাঁ, ডাক্তারী পরীক্ষায় তাই ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গোপনে পুলিশ তদন্ত চলছে। শিউলী এখনও মামুর মৃত্যুর কারণ জানে না।

আমার ভাইকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে! খুন করা হয়েছে!!

তুমি এতটা বিচলিত হবে বুঝলে এখন তোমাকে কথাটা বলতাম না। যাই হোক—ব্যাপারটা যেন শিউলীর কানে না যায়। রহমতকেও তুমি কিছু বলতে যেও না। আমি ওকে তাড়াব। বাড়ীতে শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে।

খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুতে বাথরুমের দিকে যেতেই ইব্রাহিম ওপর

বিয়ে করলে রাজকন্যা ও রাজত্ব দুইই পাওয়া যাবে, তখন তার চোখের সম্মুখে সোনার স্বর্গের রঙিন স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

তারপর মায়ের পরামর্শে এক টেবিলে খেতে বসে শিউলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই ইব্রাহিমের সেই সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সে বেশ ভালো করেই বুঝেছিল এ মেয়ের কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা বরং যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

আই. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে এসে মায়ের পেড়াপীড়িতে শিউলীকে পড়াতে গিয়ে ইব্রাহিম বুঝেছিল, শিউলীর বিদ্যাবুদ্ধি তার চাইতে অনেক বেশী। তারপর সে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, মুখের ওপরে কটু উচিত কথা বলতে একটুও ইতস্ততঃ করে না।

যেদিন পরীক্ষায় ফেলের সংবাদ জেনে এসে ইব্রাহিম বিছানায় পড়ে কাঁদছিল, সেদিন শিউলী যেভাবে তাকে ও জুলেখাকে তুলে নিয়ে তাদের দুজনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করল, তাতে বুঝল শিউলী স্নেহ মমতা ও করুণার প্রতিমূর্তি।

সেই থেকে এই তিন বছর শিউলী যেভাবে ইব্রাহিমের দোষত্রুটি সংশোধন করে তাকে মানুষ করে তুলেছে, তাতে শিউলী ইব্রাহিমের মনো-রাজ্যে মহামহিমান্বিতা দেবীর সিংহাসন পেয়েছিল। সে সিংহাসনের তলে দূরে বসে ইব্রাহিম করত দেবীর চরণে নিঃশব্দে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন, আর নীরবে নির্দেশ পালন। মামাতো পিসতুত ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের উপদেশ-পরামর্শ দেবার কল্পনাও ইব্রাহিমের মনে স্থান পায় নি।

ইব্রাহিমের মনোরাজ্যে শিউলীকে ঘিরে চার বছরে যে ভয় ও সম্ভ্রমের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছিল সেদিন শোবার ঘরের মেঝেয় পড়ে শিউলীর সেই আকুল ক্রন্দনের করুণ দৃশ্য সে ব্যবধান দূর করে ইব্রাহিমের মনে জাগিয়ে-ছিল ভাইবোনের পবিত্র সম্বন্ধ; শিউলী ছোটো বোন ইব্রাহিম তার বড়ো ভাই, দাদা। আহাঃ, বাপ হারিয়ে শিউলীর একমাত্র দাদা ইব্রাহিম ছাড়া রক্তসম্বন্ধে হিতৈষী আপনজন এ জগতে আর তো এমন কেউ নেই, যে এসে এই দুঃখের সময় তার পাশে দাঁড়াবে।

ইব্রাহিম এবার অসঙ্কোচে শিউলীর ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিলে ভিতরে গিয়ে বিছানার ওপরে বসল। শিউলী নীরবে নতমুখে ঘরের মেঝেয় ছড়ানো জামাকাপড়গুলো গুছাতে লাগল।

ইব্রাহিম কিছুক্ষণ নীরব থেকে সেদিন প্রথম শিউলীর নাম ধরে ডেকে স্নেহ-মাখা কণ্ঠে বলল,—

শিউলী বোন, তুমি এতদিন আমাকে এ কথা বল নি কেন? তুমি তো নমিতার জন্য অজিত রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বলেছিলে।

দাদা, অজিত রায়ই যে গোলাপ, তা আমি জানতাম না। বাবা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে সব জানিয়ে গেছেন। শিউলী এই প্রথম ইব্রাহিমকে দাদা বলে সম্বোধন করল।

তোমার মনের কথা কি মামুসাহেব জানতেন?

গত বারো বছরের মধ্যে জানতে পারেন নি। মৃত্যুর আগের দিন জিজ্ঞাসা করে জেনে গেছেন।

তাঁর কি এতে সম্মতি ছিল?

তাঁর সম্মতি আগাগোড়াই ছিল। সেইজন্যই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে। যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তবে সব ঘটনাটা খুলে বল।

ইব্রাহিমের অনুরোধে শিউলী সব কথাই বলল। শুনে ইব্রাহিম চিন্তিত হয়ে মন্তব্য করল,—

আমার মনে হয় অজিতের ধারণা, তুমি তাকে ভালোবাস না। মামুকে খুশী করার জন্য তাঁর কথায় সায় দিয়েছিলে মাত্র।

প্রথমদিকে তাঁর ঐরকম ধারণাই ছিল। কিন্তু গতকাল সে ধারণা দূর হয়েছে বলেই মনে হয়।

তবে সে উধাও হল কেন?

তিনি মনে ভেবেছেন, তাঁকে বিয়ে করলে আমি মুসলমান সমাজে হেয় হব। আমার কোনোরকম অসম্মান বা মনঃকষ্ট হতে পারে এমন কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না।

তাহলে বোন এ নিয়ে আর বেশী ভাবনা চিন্তা করে কোন লাভ নেই। এসব কথা আর কেউ যেন জানতে না পারে, তাতে তোমার ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যাবে।

দাদা, তুমি ভুল করছ। তিনি ছাড়া আমার আর কোনো ভবিষ্যত নেই। এই কথাটা এতকাল গোপন করে রেখেই এই বিপদ ঘটিয়েছি। এখন থেকে প্রয়োজন হলেই সকলকে জানাব, আমি বিবাহিতা। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন চাই না করুন, তিনি ছাড়া আমার অন্য গতি নেই।

এ কথা তাকে বুঝিয়ে বলেছিলে?

বুঝিয়ে বলার সুযোগ আমাকে তিনি দেন নি। এইটাই আমার সব চাইতে বড়ো দুঃখ।

তুমি এর জন্য নিশ্চিন্ত থাক। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তাকে ধরে এনে তোমার সম্মুখে হাজির করব।

দাদা, সেটা সহজ হবে না। তিনি নাকি আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা জঙ্গলে চলে যাবেন।

ইব্রাহিম একটু হেসে বলল,—না বোন, আফ্রিকা-আমেরিকা যাওয়া অত সহজ নয়, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত'ই হয়।

এ কথা তুমি কিসে বুঝলে?

যে লোক আটশ' টাকায় অতগুলো দামী বই, জামাকাপড়, গ্রামোফোন রেডিও, সেতার, গীটার, হারমোনিয়ম, সব বেচে গেছে, তার হাতে আমেরিকা-আফ্রিকা যাওয়ার মতো টাকা তো নেইই, বাংলার বাইরে গিয়ে কোনো হোটেলে গিয়ে একমাস থাকার মতো টাকা হাতে আছে কিনা সন্দেহ। এখানে হোটেলের ম্যানেজার বললেন মালপত্র বিক্রী করে হোটেলের পাওনা মিটিয়েছে। করিমের মুখে শুনলাম অজিতের কোন ব্যাঙ্ক একাউন্ট নেই।

তাহলে কি উপায় হবে দাদা? তিনি যে বড়ো সৌখিন মানুষ!

অত ব্যস্ত হোস নে বোন। তাকে খুঁজে বের করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, বিশেষ করে সে যদি বাংলার বাইরে গিয়ে থাকে। এখন চল দু'জনে খেয়ে নি।

কেন! তুমি এখনও খাও নি?

খেয়েছি, পেট ভরে নি।

শিউলী আর আপত্তি করল না। দু'জনে খেয়ে এসে ঘরের জিনিসগুলি গুছাতে আরম্ভ করল। জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলতে তুলতে শিউলী হাসিমুখে ইব্রাহিমকে বলল,—

একজনের বোকামির ফলে এতগুলো দামী মাল এত সস্তায় পেলাম।

হ্যাঁ, এগার শ' টাকা গরচা দিয়ে পাওয়া গেছে।—হেসে উত্তর দিল ইব্রাহিম।

গরচা দিলাম কিসে?

এ সবই তো তোমাদের টাকায় কেনা।

দাদা, তোমাকে আর একটা কথা বলি নি। সুলতানপুরের খান চৌধুরীদের জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তির অর্ধাংশের ন্যায্য মালিক হোসেনপুরের রায়েরা।

এপর্যন্ত আমরা তাঁদের যথেষ্ট বঞ্চনা করে এসেছি। মরণকালে বাবা আমাকে সব বলে এখন যা আছে তার অর্ধেক তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হুকুম করে গেছেন। তাঁর ন্যায্য পাওনা তাঁকে আমি ফিরিয়ে দেব। এ অন্যায়ের বোঝা আমি বইব না। আমার নিজস্ব বলতে ঢাকার বাড়ীখানা আর আজ যা কিনে আনলেন এইগুলি মাত্র।

দেখ তো বোন এটা কি!--বলে ইব্রাহিম সুন্দর মরোক্ক লেদারের একটা ফটোকেসে বাঁধানো একটা বিদ্‌ঘুটে ছবি শিউলীর হাতে দিল। ছবিখানার নীচে কাঁচা হাতে বড়ো ক'রে লেখা আছে গোলা ফ্যাঁচাং।

ছবিখানা দেখে শিউলীর মুখ যেমন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তেমনি অন্তর একটা অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল।

শিউলীর বয়স তখন সাত বছর, মাস্টারমশাই'র কাছে পড়তে বসে মাস্টার-মশাই তামাক খেতে গেলে কি একটা কথা নিয়ে গোলার সঙ্গে ঝগড়া করে তার দোয়াতটা ফেলে দেয়। মাস্টারমশাই এলে গোলা নালিস করল। শিউলীর শাস্তি হল দাঁড়িয়ে থেকে খাতায় দ্বিতীয় ঘরের নামতা লিখতে হবে।

শিউলী দাঁড়িয়ে শ্লেটের ওপরে খাতা রেখে লিখতে লাগল আর গোলা তার দিকে তাকালেই মুখে খাতা আড়াল দিয়ে ভেংচি কাটতে লাগল। গোলা আবার মাস্টারমশাই'র কাছে নালিস করল। সেবার শাস্তি হল, গোলার বসার জায়গাটা থেকে দশ'পা দূরে গিয়ে গোলার দিকে পিছন ফিরে নামতা লিখতে হবে।

ছুটি দিয়ে মাস্টারমশাই চলে গেলে 'দেখি তুই কেমন নামতা লিখেছিস'—বলেই গোলা খপ্ করে শিউলীর খাতাখানা নিয়ে দেখে বলল,—দাঁড়া, কাল মাস্টারমশাইকে এই খাতা দেখাব।

শিউলী কাঁদাকাটি করে বিকালে খাতাখানা ফেরত পেয়েছিল কিন্তু সে খাতায় গোলা ফ্যাঁচাং-এর ছবির পাতাটা পায় নি।

সন্ধ্যার সময় শিউলীর কথামতো ইব্রাহিম বালীগঞ্জে গিয়ে অমিয়বাবুকে বলে এল, আগামীকাল বেলা আটটায় লরি বোঝাই হয়ে মাল আসবে। দুপুরে খেয়ে বেলা বারটার মধ্যে শিউলী আসবে।

রাত এগারটা, কলুটোলার বাড়ী নিঝুম। নানা চিন্তায় ইব্রাহিমের চোখে ঘুম আসছে না। হঠাৎ তার কানে গেল শিউলী সেতারে টোকা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে গান গাচ্ছে।

কৌতূহলী ইব্রাহিম বিছানা ছেড়ে উঠে নিচে নেমে শিউলীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল, শিউলী বিছানার ওপর বসে অজিত রায়ের সেতারটা কোলের ওপরে নিয়ে তারে টোকা দিয়ে একটা কীর্তন গানের দুইকলি ফিরে ফিরে গাইছে,—

মান কয়লি তো কয়লি, বেশ কয়লি,
তুহুঁ বৈঠি রহ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব, আপ হি আওব,
পুনঃ লুটাওব চরণে ॥

ইব্রাহিমের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

রবিবার বেলা আটটা। ওমর সাহেব নাস্তা খেয়ে দোকানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। রহমত এসে জানাল, অমিয় বাবু দুখানা ট্রাক নিয়ে এসেছেন। নীচেরতলার সব মালপত্র ট্রাকে তোলা হচ্ছে। শিউলী আজই এ বাড়ী ছেড়ে বালীগঞ্জে যাচ্ছে।

ওমর সাহেবের আর পান-তামাক খাওয়া হল না। তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। নীচতলায় বৈঠকখানায় বসে অমিয় বাবুর সঙ্গে শিউলী কথা বলছিল। ওমর সাহেব বৈঠকখানায় প্রবেশ করে খুব গরম মেজাজ দেখিয়ে অমিয় বাবুকে বললেন,—

ব্যারিস্টার সাহেব, জাফরুল্লা চৌধুরী এন্তেকাল করার পর তার বয়স্থা মেয়ে রোশোনারার অভিভাবক গার্জিয়ান আমি। আপনি হিন্দু, আপনার সঙ্গে বয়স্থা মেয়ে রোশোনারার এরকম ঘনিষ্ঠতা আর আমি বরদাস্ত করব না। আপনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

অমিয়বাবু ওমর সাহেবের এই দাবির উত্তর দেবার সময় পেলেন না। উত্তর দিল শিউলী।—

আপনি দারুণ ভুল করেছেন। এটা হিন্দুস্তান, হিন্দুস্তানে যে কোনো সাবালিকা মেয়ে স্বাধীন, তার কোনো গাজিয়ান দরকার করে না। আপনি এ সময় নীচে এসে দেখা করে ভালোই করেছেন। আগামী একমাসের মধ্যে গত তিন বছরের বাড়ী ভাড়া তিন হাজার ছয় শ'টাকা মিটিয়ে দিয়ে এবাড়ী ছেড়ে যাবেন। নইলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমি

আমার এটর্ণিকে নির্দেশ দেব। এখন আপনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

শিউলীর কথা শুনে ওমর সাহেব একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। কোন মুসলমানের মেয়ে যে এরকম কথা বলতে পারে সে ধারণাই তাঁর ছিল না। বেকুবের মতো কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তায় বেরিয়ে চিৎপুরের পথ ধরলেন। তাঁর সঙ্গে চলল রহমত।

বেলা দশটার মধ্যে সব মাল ট্রাক ভরতি হয়ে চলে গেল। বারোটায় শিউলীকে নিতে আসবেন অমিয়বাবু। শিউলী এগারোটার মধ্যেই খেয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় এলেন জুলেখা।

মা, তুই যাচ্ছিস! আজ সন্ধ্যাটা থেকে যা—অনুরোধ করলেন জুলেখা।

হঠাৎ এ অনুরোধ করছেন কেন?—প্রশ্ন করল বিস্মিত শিউলী।

চার বছর তুই আমার কাছে আছিস। আজ যে যাচ্ছিস, আর তুই সহজে এ বাড়ী আসবি নে, এটা আমি বুঝেছি। সেইজন্য বলছি সন্ধ্যায় আমি রসুই করি, তুই খেয়ে রাত ন'টার মধ্যেই যেতে পারবি।

আমাকে নিতে এখনই ট্যাক্সি আসবে। তারপর ওখানে গিয়ে সব জিনিস-পত্র গুছাতে হবে।

তাতে কি? ইব্রাহিম, করিম, ও করিমের মা. এরা গিয়ে সব গুছাবে। তুই যদি রাজি হোস তবে কাদের ও সোফিয়াকে দাওয়াদ পাঠাই। তোরা সব এক সঙ্গে খাবি।

শিউলী একটু ভেবে নিয়ে বলল,—আচ্ছা তাই হবে।

বারোটা বাজলে দু'খানা ট্যাক্সি এসে ইব্রাহিম, করিম, করিমের মা ও অবশিষ্ট জিনিষপত্র নিয়ে গেল। ইব্রাহিম যাওয়ার সময় জুলেখাকে বিশেষ করে বলে গেল।

তুমি যখন শিউলীকে রাখলে, তখন খুব সাবধান হবে। রহমতকে আজ ছুটি দিয়ে বাড়ী থেকে সরিয়ে দাও। নিজে রসুই করে খাওয়াবে। সব সময় শিউলীকে কাছে রাখবে। রাত ন'টায় অমিয়বাবুর সঙ্গে আমি এসে ওকে নিয়ে যাব।

ইব্রাহিম চলে গেলে জুলেখা রহমতকে সেদিনের মতো ছুটি দিয়ে বললেন,—তুমি একবার পার্কসার্কাসে গিয়ে কাদের ও সোফিয়াকে আজ সন্ধ্যায় এসে এখানে খানার দাওয়াদ দেবে।

রহমত তখনই চলে গেল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে জানাল, কাদের সাহেব

ও সোফিয়া আসতে পারবেন না। সেইসঙ্গে সে জুলেখাকে বলল, হুজুর ওমর সাহেব হুকুম দিয়েছেন নীচতলার দারোয়ান করিম মিঞা বালীগঞ্জে যাওয়ায় আজ থেকে তাকেই দারোয়ানের কাজ করতে হবে। সেই জন্যই সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। রহমতের কথা শুনে জুলেখা আর কোন আপত্তি করলেন না।

রাত আটটার মধ্যেই শিউলীর খাওয়া হয়ে গেল। বালীগঞ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে শিউলী জুলেখার ঘরে বসে বলল,—

ফুফু, আজ রাগের মাথায় আমি একটা খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

কি অন্যায় করেছিস মা ?

শিউলী সেই সকালবেলা ওমর সাহেবকে নিয়ে যা ঘটেছিল সব বলল। শুনে জুলেখা দুঃখিত হয়ে বললেন,—

তা আর এমন কি অন্যায় বলেছিস। তোর বাড়ী, তুই ইচ্ছামতো ভাড়া দিবি, এতে কার কি বলার আছে।

না ফুফু। আমি অনেকদিন থেকেই ঠিক করে রেখেছি এ বাড়ী আমি ইব্রাহিম দাদাকে দেব। এখন আপনি এই দোতলা ছেড়ে তেতলায় উঠে যান। কলকাতায় আজকাল যেরকম ভাড়ার চাহিদা তাতে নীচের দু'টো তলা ভাড়া দিলে খরচ খরচা বাদে মাসে অন্তত তিনশ' টাকা পাওয়া যাবে। এই টাকা আদায় করে আমি গোপনে আপনার হাতে পৌছে দেব। এই টাকায় একটা ভালো বাবুর্চি রেখে আপনার সংসার বেশ চলে যাবে। দাদার পড়ানোর ভার আমি নিয়েছি। ওর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। দাদা ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করলে বিলেত পাঠাব। বিলেত থেকে ফিরে এসে ভালো চাকরি পেলে বিয়ে দিয়ে এ বাড়ী আমি তাঁকে উপহার দেব।

শিউলীর কথায় জুলেখার চোখে জল দেখা দিল। তিনি চোখের জল মুছে বললেন,—

মা, তুই সুলতানপুরের জমিদার খান চৌধুরী ঘরের মেয়ে। এরকম কথা তোর পক্ষে স্বাভাবিক। আমিও ঐ ঘরেরই মেয়ে। আমার এমন নসিব যে, চিরকাল কেবল নিয়ে খেয়েই দিন কাটাচ্ছি। এমন কি দু'দু'বার পেটের মেয়ে বেচে খেয়েছি। আনোয়ারার কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়।—বলে জুলেখা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

শিউলী ব্যস্ত হয়ে বলল,—ফুফু, আপনি কাঁদবেন না। এবার আমি কাকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব আনোয়ারার জন্য কিছু করা যায় কি না।

কিছুই করা যাবে না মা। আমি কাদেরকে বলেছিলাম। তাতে সে বলেছে যতদিন হিন্দুস্থানের আইনে সব জাতির মেয়েদের একই রকম অধিকার সাব্যস্ত না হবে, ততদিন আনোয়ারার জন্য কিছুই করা যাবে না, তাকে ঐ দোজখই ভোগ করতে হবে।

এমন সময় রহমত এসে জানাল, ব্যারিস্টার সাহেব গাড়ি নিয়ে এসেছেন। শিউলী তার হাতের রিস্টওয়াচে দেখল ন'টা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। শিউলী জিজ্ঞাসা করল,—

ইব্রাহিম ভাই এসেছেন?

না, ছোটো হুজুর আসতে পারেন নি। তিনি নাকি কাজে ব্যস্ত আছেন।

শিউলী আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে জুলেখাকে মোবারক জানিয়ে নিজের ছোটো ব্যাগটা হাতে নিয়ে জুলেখার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোল। বারান্দায় এসে জুলেখা শিউলীর ব্যাগটা রহমতের হাতে দিতে বললেন, তা সে দিল না।

জুলেখা শিউলীর সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত এলেন। রহমত ট্যাক্সির পিছনের সীটের দরজা খুলে দিল। শিউলী ট্যাক্সির ভিতরে গিয়ে বসলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। জুলেখা একটা দারুণ শূন্যতা বুকে নিয়ে সেই জনশূন্য তেতলা বাড়ীর দোতলায় উঠে গেলেন।

দোতলায় নিজের শোবার ঘরে গিয়ে জুলেখা বিছানার ওপরে বসলেন। শিউলী চলে গেলে তাঁর মনে যে কতটা ব্যথা লাগতে পারে, জুলেখা তা একটু আগেও বুঝতে পারেন নি, বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকিয়ে থাকলেন সম্মুখের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। ঘড়ির কাঁটা ন'টা ছাড়িয়ে গেল।

হঠাৎ সিঁড়ির ওপরে মানুষের পা'এর শব্দ। জুলেখা ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করল,—মা, শিউলী কোথায়?

ব্যারিস্টার সাহেব এসে তাকে তো আধঘণ্টা হল নিয়ে গেছেন।

ব্যারিস্টায় সাহেব এসে নিয়ে গেছেন!!—ইব্রাহিম আর কিছু বলতে পারল না, তড়িতাহত মানুষের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইব্রাহিমের এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে জুলেখা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে বাপ্? হঠাৎ তুই এমন হলি কেন?

জুলেখা এসে হাত ধরায় ইব্রাহিম সম্বিত ফিরে পেল। এক ঝাঁকুনি দিয়ে মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে রাস্তায় ট্যাক্সির কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল,—সর্বনাশ হয়েছে কাকাবাবু। শীগ্‌গির লালবাজার চলুন। শিউলীকে অপহরণ করেছে।

হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার অমিয় ব্যানার্জি নিজে এসেছেন একটা গুরুতর অপহরণ কেসের প্রাথমিক এজাহার দিতে। সংবাদ পেয়ে লালবাজার পুলিসের একজন বড়কর্তা উপস্থিত হলেন এজাহার নিতে।

এজাহার লিখে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের কারো ওপরে সন্দেহ হয় কি ?

ইব্রাহিম উত্তর দিল,—হাঁ হয়। বাগমারীর তাহের মিঞা এ কাজ করতে পারে।

চামড়ার ব্যবসাদার তাহের মিঞা ?

হাঁ।

তাহলে তো দেখছি এটা বড়দরের ব্যাপার। আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি কণ্ট্রোল রুমে সংবাদ দিয়ে আসি।

মিনিট পনরো পরে বড় অফিসার ফিরে এসে বললেন,—আমি সব বড় রাস্তার মোড়ে তাহের মিঞার দু'খানা ট্যাক্সির নম্বর জানিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এলাম। ট্যাক্সি দেখলেই পুলিসে থামিয়ে খোঁজ করবে। তবে আমার মনে হয় এতক্ষণ বমাল সমেত ট্যাক্সি রাস্তায় নেই, ঘাঁটিতে গিয়ে বমাল খালাস করে দিয়েছে।

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি তাহের মিঞার নাম শুনে একটা বড়দরের ব্যাপার বললেন কেন ?

তাহের মিঞা আমাদের সুপরিচিত। তবে তাঁকে আমরা এপর্যন্ত নিমন্ত্রণ করে এনে পুলিপোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি নি। তার কারণ, লীগ আমলে তাহের মিঞা ছিলেন একজন লীগ নেতা। তাঁর মতো মাতব্বর ব্যক্তিকে দলে রাখার জন্য সব দলই ব্যস্ত।

এর কারণ ?

এর কারণ অতি সোজা। তাহের মিঞার হাতে আছে বহু কসাই। কলকাতার ভোট দাতাদের মধ্যেও তাহের মিঞার বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এরকম একটা মাতব্বর দলে থাকলে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ সহজ হয়।

তাতে তাহের মিঞা অপকর্ম করলে আপনারা তাকে শায়েস্তা করতে পারবেন না কেন ?

দেখুন মিস্টার ব্যানার্জী আমরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে। আমরা চাকরি করে সংসার চালাই, ছেলে-মেয়ে মানুষ করি। তাহের মিঞার মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের গায়ে হাত দিলে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি

বাধে। সে টানাটানিতে যদি চাকরিটা টিকেও যায়, তবে এখানে আর চাকরি করা চলে না, বদলী হতে হয় এমন জায়গায় যেখানে নানাদিক থেকে অসুবিধা।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই সব বদমাস রাঘব বোয়ালদের পিছনে আছে উচুদরের মুরুব্বি। এদের গায়ে হাত দিলে ঐ সব মুরুব্বিরা এমন তদ্বির করেন যে, শেষে ওদের ছেড়ে দিতে তো হয়ই, অধিকন্তু অযোগ্য কর্মচারী অপবাদে চাকরির অবনতি ইত্যাদির ভয় আছে। নইলে আমরা হাঁড়ির খবর জানি। দেখলেন না আমি ইব্রাহিম সাহেবকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না? এমন কি ওমর সাহেবের নয়া খানসামা রহমতের কথাও জিজ্ঞাসা করি নি। জাফর সাহেবের সন্দেহজনক মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর থেকে ও অঞ্চলটার ওপরে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রেখেছি। তাহের মিঞা লীগ সরকারের আমলে কি করেছেন, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পর ঢাকায় গিয়ে কি করেছেন, সেখান থেকে এখানে এসে খদ্দর পরে কি করছেন, কেমন করে আনোয়ারাকে হস্তগত করলেন, সব আমরা জানি। এ ছাড়া ওমর সাহেবের আতরের দোকানের পিছনের ঘরে কাদের বৈঠক বসে, ওমরসাহেবের টাকাগুলো কাদের পেটে ঢুকেছে, তাও জানি। কিন্তু কি করব বলুন? চাকরি বজায় রেখে তো চলতে হবে। সেজন্য আমাদের জালের চুনোপুঁটিগুলো ধরে জেল-খালুইতে ভরি। রাঘব বোয়ালদের গায় হাত দিতে সাহস পাইনে। এর জন্য সংবাদপত্র-ওয়ালারা আমাদের অকর্মণ্য বলে যথেষ্ট গালাগালি দেন, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তাঁরা বুঝতেই চান না।

যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জী, আপনাদের এই কেসটা আমি নিজের হাতে নিলাম। এ কেসে সত্যই যদি তাহের মিঞা বা ঐ রকম কোন রাঘব বোয়াল থেকে থাকে, তবে তাকে ঘায়েল করতে পারব কিনা তা বলতে পারিনে, তার মুখের শিকারটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।—

এই ব্যাপার নিয়ে আপনারা এখন কোনো হৈ চৈ করবেন না। কলুটোলায় যে এত বড় একটা ঘটনা হয়ে গেল, তা যেন এখন ঐ অঞ্চলে জানাজানি না হয়। আমরাও এখন ওখানে প্রকাশ্য তদন্তে যাব না। এ বড়দরের ব্যাপার, খুব সাবধানে এগোতে হবে। ইব্রাহিম মিঞাও একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আগামীকাল বেলা ন'টায় আপনারা দু'জন করিমকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এখানে আসার আগে করিমকে ঘটনা জানাবেন না। আচ্ছা নমস্কার।

লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টার হতে বেরিয়ে ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে বলল, কাকাবাবু, আমি আর কলুটোলা যাব না। রাতটা শিয়ালদহ স্টেশনে কাটাব।

সে কি! কলুটোলা না যাও আমার ওখানে থাকবে। শিউলীর ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে। যে ক'দিন শিউলী না ফিরছে, সে ক'দিন তোমরা তিনজন আমার ঘরেই খাবে। এই ভয়ানক বিপদে সব সময় তোমাকে আমার হাতের কাছে থাকতে হবে। পুলিস অফিসারটি ভালো ও উপযুক্ত লোক। কাল আর আমি হাইকোর্টে যাব না। লালবাজার অফিসে বসে থেকে দেখব কি করা যায়।

জাফর সাহেবের সেই মৃত্যুপীড়ার আক্রমণের দিন হতে আরম্ভ করে বালীগঞ্জে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিতে উঠা পর্যন্ত শিউলীর ওপর দিয়ে যে ঘটনার ঝড় বয়ে চলেছিল, তাতে ছোটখাটো ব্যাপার লক্ষ্য করে চলার মতো মনের অবস্থা শিউলীর ছিল না। রহমত এসে বলল, অমিয়বাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন। শিউলী তার ব্যাগটা নিয়ে এসে গাড়িতে উঠেছে। গাড়ি অমিয়বাবুর কিনা, গাড়ির চালক অমিয়বাবু কিনা, এ সব সে কিছুই লক্ষ্য করে নি।

ট্যাক্সি শিউলীকে নিয়ে চলেছে বহু রাস্তা ঘুরে। হঠাৎ এক নির্জন গলির মধ্যে ঢুকে ট্যাক্সি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের দুই দরজা খুলে বোরখার মতো কি পরা দু'জন গাড়ির ভিতরে উঠে শিউলীকে দু'পাশ হতে চেপে ধরে তার মুখের ওপরে খুব ঝাঁঝালো গন্ধ একখানা তোয়ালে চেপে ধরল। শিউলী বুঝল গুণ্ডার হাতে পড়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে জ্ঞান হারাল।

যখন শিউলীর জ্ঞান হল, তখন প্রথম কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। শরীর খুব দুর্বল লাগছে, মাথা ভার। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবতেই সব মনে পড়ল। শিউলী উঠে বসল।

একটা পুরনো নোনাধরা বড়ঘর। সেকেলে ধরণের ছাপর খাটের ওপরে বিছানা। পাশে জলের কুঁজো আর গ্লাস আছে। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ।

বিছানার ওপরে বসে ঘরের সব দেখতে দেখতে হঠাৎ শিউলীর মনে ভেসে উঠল, ভৈরব নদ, সুন্দর বড় বজরা, বজরার মধ্যে বসে আছে কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে-বউ। বজরা ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু সকলে ধীর স্থির অচঞ্চল।

দৃশ্যটি মনে জাগতেই শিউলীর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক

মুহূর্তে সব দুর্বলতা সরিয়ে ফেলে মন বলে উঠল, তাঁরা মান-ইজ্জৎ রক্ষার জন্য নির্বিকার চিত্তে ডুবে মরেছিলেন। আমার দেহেও তাঁদেরই রক্ত আছে। আমি কিন্তু লড়াই করে মরব।

শিউলী উঠে কুঁজোর জল দিয়ে চোখ মুখ ভালো করে ধুয়ে বিছানায় গিয়ে স্থির হয়ে বসল।

একটু পরেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের ভদ্রবেশধারী এক ব্যক্তি দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। হাতে তাঁর শিউলীর ব্যাগটা। শিউলীর সম্মুখে টেবিলের উপরে রেখে পাশের চেয়ারে বসে হাসিমুখে বললেন,—

বিবি সাহেবার মেজাজ সরিফ তো, আমাকে চিনতে পারছ?

শিউলী একটু চিন্তিত হয়ে বলল,—না, চিনতে তো পারছি নে।

আমি তোমার দুলেভাই তাহেরুদ্দিন আহম্মদ। এখন দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাকে সাদী করে খসম হব।

আপনিই আমাকে ফাঁকি দিয়ে অপহরণ করে এনেছেন!

তা না এনে আর করি কি বল? তোমার মতো দানাদার মুসলমান ঘরের খুবছুরত আওরত হিঁদু বিয়ে করে হিঁদু হতে চলেছে। একথা জেনে শুনে কোন খাঁটি মুসলমান ইসলামের খাদেম চুপ করে বসে থাকতে পারে? এখন এসব কথা থাক, আজ আমার অনেক কাজ আছে। কাল রাত ন'টায় এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করব। সাদীর ব্যবস্থাটাও পাকা করে ফেলব। এখন তোমার ব্যাগ থেকে চেক বইটা বের করে একখানা বিশ হাজার টাকার বেনামী চেক লিখে দাও দেখি।

এখনই আপনার বিশহাজার টাকা দরকার হল কিসে?

তোমার ফুফা ওমর সাহেব আজ দুপুরে বিশ হাজার টাকা আগাম নিয়েছেন। সেই টাকাটা তোমার কাছে চাচ্ছি।

শিউলী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,—বিশ হাজার টাকা আগাম নিয়েছেন! এ কথার মানে?

আমি ইসলামের খাদেম, ইসলামের খিদমৎ করে টাকা খাইনে। কিন্তু তোমার ফুফা ওমর সাহেব এই খিদমৎগারীর বকসিস একলাখ টাকা আর কলুটোলার বাড়ীখানা নেবেন। তার মধ্যে আগাম বিশহাজার নিয়ে, তবে তোমাকে আমার গাড়ীতে তুলে দিয়েছেন। অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য লিখিত চুক্তি হয়ে আছে।

আমার ফুফা এ কাজ কখনো করেন নি। আপনি মিথ্যাবাদী।

হো হো করে হেসে তাহের মিঞা বললেন,—তোমার ফুফা ওমর সাহেব নিজের মেয়ে চৌদ্দ বছরের আনোয়ারাকে ষাট বছরের বুড়ো গর্মী রুগীর কাছে দশ হাজার টাকায় বেচেছিলেন। ইব্রাহিমের সঙ্গে তোমার সাদী দিয়ে জাফর সাহেবের সম্পত্তি হাতাবার তালে ছিলেন আজ চার বছর। মাস দুই আগে কথাটা ইব্রাহিম ও তার মায়ের কাছে তুলতে তারা অমত করেছে। তখন ওমর সাহেব আর তাঁর দোস্ত হেকিম নছির সাহেব বাইরে তোমার খদ্দের খুঁজতে আরম্ভ করেন। কথাটা কানে যেতে আমিই এগিয়ে গেলাম। কারণ তোমার মতো শিক্ষিতা খুবছুরত একটা বিবি এখন আমার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। তোমার নসিব খুব ভালো যে, তুমি আমার হাতে পড়লে। নইলে তোমার কপালে যে কি ঘটত তা খোদায় মালুম।

আপনি ওমর সাহেবকে কাল আমার সম্মুখে উপস্থিত করতে পারেন?

সাদীর সময় সকলেই উপস্থিত থাকবেন।

না, আমি কালই তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। এতে আপনারও লাভ হবে। অত টাকা আর বাড়ীখানা দেওয়া লাগবে না।

আচ্ছা, যদি পুলিস হাঙ্গামা না বাধে, তবে কাল রাত ন'টায় নিয়ে আসব। এখন তাড়াতাড়ি চেকখানা লিখে দাও তো। তারিখটা তিনদিন পিছিয়ে দাও!

চেকটা সাদীর সময় নেবেন।

তা হয় না, বিবিসাহেবা। এ সব কাজে আমি পুঁটিমাছের তেল দিয়েই পুঁটিমাছ ভাজি, নিজের টাকা খরচ করিনে তুমি দানাদার বিবি পাঁচলাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে। ওর দু'একলাখ খরচ করেও যদি আমার মতো খসম পাও, তবে মনে করবে তোমার জোর নসিব। কিছু ভেব না, আমি এবার ইলেকসনে দাঁড়াচ্ছি, পাস করে মন্ত্রী হব। তোমাকে করব আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তখন দেখবে একমাসের মধ্যেই সব ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। লিখে ফেল, চেকখানা লিখে ফেল, চটকরে লিখে ফেল।

শিউলী আর কোনো আপত্তি না করে চেক লিখে দিল।

চেকখানা হাতে নিয়ে তাহের মিঞা বললেন,—

তোমার ব্যাগের মধ্যে এগারশ' কয়েকটাকা ছিল। টাকাটা আমি নিয়েছি, বহু বাজে খরচ করতে হচ্ছে। তোমার যা কিছু দরকার তা বাইরে যে দুজন হিন্দুস্থানী জেনানা বসে আছে, তাদের ডেকে বললেই করে দেবে। এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করোনা, বা নীচে যেও না। সে রকম চেষ্টা করলেই এখানে যারা আছে, তারা সকলে তোমাকে ধরে ইজ্জৎ নষ্ট করবে।

তাতে তুমি মরেও যেতে পার। কাল রাত ন'টায় আমি আসব। সম্ভব হলে তোমার ফুফা সাহেবকেও সঙ্গে আনব।

তাহের মিঞা চেক নিয়ে ভয় দেখিয়ে চলে গেলে প্রথম শিউলীর খুব হাসি পেল। মনেমনে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে উঠে ঘরের দরজা জানালাগুলো বেশ করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। একটা ছোট দরজা ছাড়া আর সব দরজা জানালা বার হতে বন্ধ, ভিতর হতেও বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। একটা জানালায় খড়খড়ির দুটো কাঠ ভাঙ্গা। খড়খড়ি খোলা গেল না চেয়ার পেতে উঠে ভাঙ্গা খড়খড়ি দিয়ে দেখল নিকটেই একটা আমগাছের মোটা ডাল রয়েছে। গাছটার ভাবে বুঝল, যে ঘরে সে আছে সেটা দোতলায়, নিকটে কোনো বসতি নেই। ছোট দরজা খুলে দেখল, সেখানে বেশ বড় বাথরুম। বাথরুমে সেকেলে সাজসজ্জা দেখে বুঝা গেল বাড়ীটায় এককালে বিশিষ্ট বড়লোক বাস করতেন। জলের কল খুলে দেখা গেল প্রচুর জল আছে। বাথরুমের পিছনের দরজাটাও বার হতে বন্ধ। আলনায় দু'খানা শাড়ী, দুটো মুসলমানী সেমিজ তোয়ালে আছে, সব কোরা নতুন।

শিউলী বেশ করে সব দেখে সব দরজা জানালা ভিতর হতে শক্ত করে বন্ধ করে এসে বসল বিছানায়। হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত সাড়ে এগারোটা। ব্যাগটা নিয়ে খুলে দেখল টাকাগুলো বাদে আর সব ঠিক আছে ব্যাগের একটা গোপন পকেট খুলে বের করল সিল্কের রুমালে জড়ানো গোলাপের ছোট ফটোখানা। হ্যারিকেনের আলোয় কিছুক্ষণ দেখে দু'হাতে ফটোখানা বুকের ওপরে চেপে ধরে কিছুক্ষণ চোখবুজে থাকল। তারপর সেখানা আবার রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ব্যাগের গোপন পকেটে রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে শিউলী স্বপ্ন দেখছে—সুলতানপুরে ভৈরবের তীরে দুপুর বেলা। বাড়ী অনেক দূর। গোলার পাশে শিউলী বসে আছে। নিকটে কোথাও কেউ নেই। গোলার হাতে বাঁশী। গোলা বলল,—

শিলী, তুই নমিতার মতো এসরাজ বাজাতে শেখ না কেন?

শিখব, আগে এম. এ-টা পাস করে নিই। তুই এখন কি করবি?

আমি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারী -পাস করে আসব। তুই আমার সাথে যাবি?

এমন সময় শিউলী দেখল তাহের মিঞা আর রহমত তাদের দিকে ছুটে আসছে। রহমতের হাতে চক্‌চকে ছোরা।

ভয়ে শিউলী গোলাকে জড়িয়ে ধরল। তাহের মিঞা এসে শিউলীর শাড়ী ধরে টানতে লাগল। রহমত গোলাকে ছোরা মারতে চেষ্টা করছে। গোলা বাঁ হাতে শিউলীকে জড়িয়ে ধরে ডান হাতে বাঁশী দিয়ে রহমতের ছোরা ঠেকাতে চেষ্টা করছে।

এমন সময় ইব্রাহিম ছুটে এসে তাহের মিঞার মাথায় মারল এক ঘা লাঠি। লাঠি খেয়ে তাহের মিঞা শিউলীর পরনের শাড়ীখানা নিয়ে গড়িয়ে পড়ল ভৈরবের জলে। সেই ফাঁকে রহমত গোলার পিঠে আর কাঁধে ছোরা মেরে পালিয়ে গেল।

ইব্রাহিম বলল—বোন, তুই গোলার রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা কর, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

ইব্রাহিম চলে গেল। গোলার পিঠে ও কাঁধে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শিউলী গায়ের ব্লাউজ খুলে নিয়ে পিঠের ক্ষতে বাঁধতে গেল, বাঁধা যায় না, পাতলা কাপড়ে রক্ত মানে না। কেবলমাত্র পরনে শায়া আছে, শায়া খুলতে গিয়ে মনে হল এখনি ডাক্তার নিয়ে দাদা আসবে। কি করে গোলার রক্ত পড়া বন্ধ করা যায়? শিউলী কোলের উপরে গোলাকে বসিয়ে বুক দিয়ে চেপে পিঠের কাটা জায়গা আর গাল দিয়ে চেপে ধরল গোলার কাঁধের কাটা জায়গা। উঃ গোলার রক্ত কি গরম। কিন্তু ও কি! গোলার সুন্দর মুখ যে নীল হয়ে গেছে! গোলার চোখ দুটো যে বুজে আসছে! গোলা ও গোলা, গোলা।

কাঁদতে কাঁদতে শিউলী জেগে বিছানায় উঠে বসল। অ্যাঃ, এটা স্বপ্ন? কি ভয়ানক স্বপ্ন।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। শিউলী উঠে বাথরুমে গেল। স্নান করে এসে মেঝেয় একখানা শাড়ী বিছিয়ে নামাজ পড়তে আরম্ভ করল। নামাজ শেষ হলে প্রার্থনা করল,—

'হে করুণাময় খোদা, তোমার অসীম করুণা। তুমিই দয়া করে আমার গোলাকে কলকাতা হতে দূরে সরিয়ে রেখেছ, নইলে এরা তাকে খুন করত। হে খোদা, তুমি আমার গোলাকে রক্ষা কর। এখন আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, বুদ্ধি দাও।'

প্রার্থনা করে শিউলী নিজের ভিতরে একটা অপূর্ব উন্মাদনা ও প্রেরণা অনুভব করল। এ বিপদ তার কাছে যেন একটা মজাদার খেলা বলে মনে হতে লাগল।

প্রভাত হয়ে সূর্য উঠেছে। শিউলী দরজার কাছে গিয়ে ডাকতেই একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলে হাজির হল। শিউলী একখানা ফর্দ লিখে তার হাতে বলল,—এই কটা খাবার জিনিস এখন চাই। ভাল বড় দোকান থেকে আনবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে সব এসে গেল। এক কৌটা মাখন, সাহেব হোটেলের পাঁউরুটি, চিনি, মর্তমান কলা, আপেল, ন্যাংড়া আম। তার সাথে ডিস প্লেট চামচ, এ সবও এল।

সমস্ত পৌছিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল,—এর পরে বেগম সাহেবার খানার কি ব্যবস্থা হবে?

এখানে রসুই করার বাবস্থা আছে?

আছে। দরকার হলে চুলো এই উপরে এনে এখানেই রসুই করে দিতে পারি।

বেশ, তাই কর। রসুই করবে মুশুরির ডাল, আল-পটোল ভাজা, আর রুই মাছের ঝোল।

কেন, গোস্ত খাবেন না?

না, আমি গোস্ত, পিঁয়াজ, রসুন, এ সব খাই নে। রসুই করার ডেকচি, হাতা, সব নতুন কিনে আনবে।

বিকালে ও রাত্রে কি খাবেন?

বিকালে খাব দুধ চিড়ে আম। রাত্রে লুচি আর তরকারি, তার সাথে দুটো ভাল সন্দেশ।

বেগম সাহেবা কি হিন্দুর মেয়ে?

আমি হিন্দুর বউ।

আহাঃ কি করব মা, আমার হাতে কোনো উপায় নেই।

তুমি কত বছর বাঙলা দেশে এসেছ?

আমার জন্ম এই দেশেই। নসিবের দোষে আমার মরদ এদের দলে কাজ করে। কত মেয়ের সর্বনাশ হতে দেখি, কিছুই করতে পারি নে। মা, খোদার দোয়া আপনার ওপরে হোক। আমার কোন কসুর নেবেন না।

না না, তোমার দোষ কি।

হাঁ মা, আমি যদি ওদের সঙ্গে একটু বেইমানি করি, তাহলে ওরা আমার সোয়ামীকে খুন করে ফেলবে।

আচ্ছা, তুমি যাও।

স্ত্রীলোকটি চলে গেলে শিউলী বিছানায় বসে ভাবতে লাগল,—কি সর্বনাশ, এই বাড়ীতে এই সব কাণ্ড হয়! মেয়েদের এ সর্বনাশ করে কারা? তারা হিন্দু না মুসলমান?

শিউলী উঠে গিয়ে আবার স্ত্রীলোকটাকে ডেকে আনল।

আচ্ছা বলতে পার এখানে মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করে কারা? তোমাদের দলের লোকে, না বাইরে থেকে লোক আসে?

আমাদের দলের লোক বাবুসাহেবদের মর্জিমতো মেয়ে ধরে এনে দেয়। এরা কিছু করে না কেবল টাকা নেয়। অত্যাচার করে বাবুসাহেবরা।

এই বাবুসাহেবরা হিন্দু না মুসলমান?

ও দুইই আছে, হিঁদুই বেশী। টাকার জোর হিঁদুদেরই বেশী।

আচ্ছা যাও। তোমার কথায় আমার মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

বেলা আটটায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন তাহের মিঞা।

বিবি সাহেবার মেজাজ সরিফ তো?

নিশ্চয়ই।—হাসিমুখে উত্তর দিল শিউলী।—আপনি যে ঘোর বিপদ থেকে আমাকে বাঁচালেন, তাতে মেজাজ সরিফ না হয়ে পারে? কিন্তু একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি নে। আপনার তো তিন-তিনটে বিবি আছে, তার মধ্যে আনোয়ারা পরমা সুন্দরী। তাঁরা থাকতে আবার আমাকে সাদী করতে চাচ্ছেন কেন?

ওঃ, তুমি মনে করেছ তোমার বাড়ী আর ট্যাকার লোভে বুঝি তোমাকে সাদী করতে চাচ্ছি। না, এটা তোমার ভুল ধারণা। আমার বড় দুই বিবি দুটি জ্যান্ত ইল্লত, একপাল বাচ্চা পয়দা করে এই বয়সে একেবারে বুড়ী হয়ে গেছে। আনোয়ারাটার দফা ঐ বুড়োই রফা করে ফেলেছে। এখন ওটা রোগা ঘ্যানঘ্যানে-প্যানপ্যানে। এ ছাড়া তোমাকে সাদী করার একটা বিশেষ কারণ আছে। একে তুমি খুবছুরতী, তারপর শিক্ষিতা, সকলের সঙ্গে তাল রেখে কথা বলতে পার। আমি এবার ইলেক্‌সনে পাস করে মন্ত্রী হব। মন্ত্রী হলে দ্বারোদ্ঘাটন, ভিত্তিস্থাপন, পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব, এইরকম অনেক কিছু করতে হয়। ভালরকম একটা বিবি থাকলে ওসব কাজে তাকে এগিয়ে দিতে পারলে কাজগুলোরও জৌলুষ বাড়ে, নিজেও ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যায়। তারপর অপরের পেটের কথা বের করতে খুবছুরত বিবিরা যেমন পারে, তেমন আর কেউই পারে না। এই সব কারণে তোমাকে পছন্দ করেছি

আপনি ইলেকসনে দাঁড়িয়ে পাস করে মন্ত্রী হবেন, এ ভরসা কিসে পেলেন ?

তুমি হিন্দুস্থানের হালচাল কিছু জান না। হিঁদুদের মধ্যে বহু দল। আমরা কিন্তু একদল। হিঁদুদের যে দলে আমরা যোগ দেব, সেই দলই ইলেকসনে জিতে মন্ত্রীত্ব করবে। কাজেই আমাদের খুশী করতেই হবে।

বেশ বেশ, আপনারা দেখছি খুব বুদ্ধিমান। 'লড়কে লেঙ্গে' করে পাকিস্তান আদায় করলেন। আবার হিন্দুস্তানে থেকে এখানেও দুধে সরের ভাগ বসাচ্ছেন

হাঁ, আমরা মুসলমান, বাদসার জাত। কাফেরদের কেমন করে কায়দায় ফেলে কাজ হাসিল করতে হয়, তা আমরা জানি।

কিন্তু আমার তো মনে হয় হিন্দু নেতারা এমন বেকুব নয় যে, আপনার মতো মুসলমানকে মন্ত্রীত্ব দিয়ে দলে রাখবে।

এ বেকুবী তো ওরা চিরকালই করে আসছে। এখন আর এটা এমন নতুন কি ? এ সব বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না। যখন মন্ত্রী তাহেরুদ্দীন আহম্মদের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে ইসলামের খিদমত করার সুযোগ পাবে তখন বুঝবে। যাক, এখন আমি যে কাজে এসেছি তাই শোন। আর একখানা দশ হাজার টাকার চেক দাও তো।

আবার দশ হাজার দরকার হল কিসে ?

বাবুরামকে দিতে হবে।

বাবুরামকে দিতে হবে কেন ?

গতকাল তোমার ফুফার সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তির জামিনদার হয়েছে বাবুরাম। তার এই জামিনদারীর ফিস্ দশ হাজার টাকার পাঁচ হাজার কাল রাত্রেই নিয়েছে। আর পাঁচ হাজার আজ সন্ধ্যার মধ্যে দিতে হবে।

এ জামিনদারীর মানে ?

এসব দলিল তো আর রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে রেজেস্ট্রি করা যায় না, বা কোর্টে দাখিল করে মামলা করাও যায় না। এসব দলিলে এরাই জামিন থাকে। পরে দুই পক্ষের কেউ যদি দলিল না মানে, তবে এরা তার জান্ খতম করে দেয়।

তাহলে এরপর আর কাকে কি দিতে হবে ?

এই যাদের বাড়ীতে আছ, এদের দিতে হবে দু'হাজার। আর হেকিম নছির সাহেবকে দিতে হবে আড়াই হাজার। নছির সাহেব গতকাল আগাম পাঁচ শ' নিয়েছেন।

কি যেন শলাপরামর্শ করে। আমাকে পথে দেখলেই দু'জনে থেমে যায়, আর আমার দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকায়।

হাঁ, এই সবই হচ্ছে কাজের কথা। আচ্ছা করিমভাই, তুমি বলতে পার, তোমার খুকুমণির ব্যাগের মধ্যে কি কি আছে?

হাঁ, বলতে পারি। ব্যাগে আছে একসেট শাড়ী-শায়া-ব্লাউজ, চিরুণি, পাউডার, তোয়ালে আর ব্যাঙ্কের চেক বই।

মিস্টার ব্যানার্জী কি বলতে পারেন রোশনারা চৌধুরীর চলতি হিসাবে ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে?

একলাখ টাকার কিছু কম আছে।

অফিসার কলিংবেল টিপলেন। চাপরাশী এলে তাকে বললেন, ইনস্পেক্টর দত্তসাহেবকে সেলাম দাও।

ইনস্পেক্টর দত্ত সাহেব এলে তাঁকে বললেন,—আপনি নিজে একজন সাবইনস্পেক্টর আর তিনজন আই. বি. কনষ্টেবল নিয়ে সাদা পোষাকে এখনই ব্যাঙ্কে যান। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে আমি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি রোশনারা খান চৌধুরীর নামে যদি কেউ চেক ভাঙ্গাতে আসে তবে তাকে গ্রেফতার করতে যেন আপনাদের সাহায্য করেন। আপনারা ভাল করে প্রস্তুত হয়ে যাবেন, এটা কিন্তু বড়দল সঙ্গে রিভলভার থাকতে পারে। সাড়ে দশটার আগেই যাবেন সম্ভবত কাউণ্টার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই চেক আসবে।

ইনস্পেক্টরকে বিদায় করে অফিসার অমিয় বাবুকে বললেন—

আপনার কি আজ হাইকোর্টে বিশেষ কিছু কাজ কাছে?

থাকলেও আমি আজ এই ঘটনার জন্য যাবনা স্থির করেছি।

দেখুন মিষ্টার ব্যানার্জী, জনসাধারণ আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা করে। কিন্তু আমাদের অসুবিধা এই যে, আমরা কি করি তা আপনাদের দুটো কারণে দেখাতে বা জানাতে পারিনে। এর একটা কারণ হচ্ছে, এমন সব ব্যাপার আছে যা অতিশয় গোপনীয়। বাইরের লোক এমন কি সাধারণ অফিসারদেরও সে সব ব্যাপার জানানো হয় না। দ্বিতীয় কারণ যতটুকু আমরা জানাতে পারি বা দেখাতে পারি তা জানতে দেখতে আপনাদের মতো গণ্যমান্য কেউ আমাদের মধ্যে আসেন না। আপনি যখন এই কেসটা নিয়ে এসেছেন, তখন অনুগ্রহ করে একটু দেখুন কেসটার জন্য আমরা কতদূর কি করি। আপনি যদি আমার অনুরোধ স্বীকার করেন, তবে যতটা আপনাকে জানানো ও দেখানো সম্ভব তা আমি জানাতে দেখাতে চেষ্টা করব।

এজন্ত আমি আপনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আচ্ছা তাহলে আপনি একটু ঘুরে আস্থন। আমি এখন অন্ত কাজে যাচ্ছি। বারোটার পর এলে আবার দেখা হবে। এর মধ্যে খুব সম্ভব ব্যাঙ্কের সংবাদও আসবে। আচ্ছা নমস্কার।

পুলিস অফিসের বাইরে এসে ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করল,—

কাকাবাবু, এখন আপনি আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারেন?

আমার কাছে তো অতটাকা এখন নেই।

করিম বলল,—আমার সঙ্গে বালীগঞ্জে চল, খুকুমণির বাজারের টাকা আমার কাছে আছে, তার থেকে দেব।

তাহলে তোমরা ট্রাম ধরে বালীগঞ্জে যাও। আমি একটু হাইকোর্ট ঘুরে আসি।

বেলা বারোটায় অমিয়বাবু উপস্থিত হলেন লালবাজার পুলিস অফিসে। তাঁকে দেখে বড় অফিসার বললেন,—আস্থন মিষ্টার ব্যানার্জী। ব্যাঙ্কের জালে একটা পুঁটিমাছ ধরা পড়েছে। এখনও পুঁটিটা দেখি নি, আপনার অপেক্ষায় আছি। চলুন, দেখা যাক, বঁড়শিতে এই পুঁটিটা গেঁথে রাঘব বোয়াল ধরা যায় কিনা।

অফিসার অমিয়বাবুকে সঙ্গে করে নীচতলায় গিয়ে একটা ঘরে বসে আসামি হাজির করতে হুকুম দিলেন। ত্ব'জন কনস্টেবল আসামি নিয়ে এল। তাকে দেখেই অফিসার মহা উৎসাহ দেখিয়ে বললেন,—

আরে: এ যে আমাদের দোস্ত মুনির মিঞা! কি ব্যাপার? মিঞা-সাহেবের তবিয়ত আচ্ছা হ্যায়।

জি হুজুর।

তাহলে আজকাল কি পকেটমারা ছেড়ে দিয়ে মেয়ে চোরের দলে ঢুকেছ?

না হুজুর, চেক হু'খানা কুড়িয়ে পেয়েছি।

তা তো হল, কিন্তু একথা বললে যে বহুকাল হাজতে পচতে হবে। তার চাইতে মেয়েটা কোথায় আছে আমাকে গোপনে বল। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে মেয়ে চুরির আসামি না করে পকেটমার হিসাবে চালান দেব। তাতে বড়জোর ছ'মাস জেল হবে, মেয়ে চুরিতে কিন্তু সাত বছর।

মুনির কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে ভাবতে লাগল। অফিসার

কলিংবেল টিপলেন। চাপরাসী এলে দুপ্লেট খাবার আর তিন কাপ চা আনতে বললেন।

মিঞা সাহেবকে তো আজকাল শুক্রবারে মসজিদে যেতে দেখি। ওখানে কিছু সওদা হয় নাকি? আমি তো জানি মসজিদে যারা যায়, পকেটে খয়রাতের দু'পাঁচটা ফুটো পয়সা থাকে মাত্র। তার চাইতে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বিশেষ করে সিনেমায় যে সব মহিলার যান, তাঁরা তোমাদেরই জন্য অন্তত গলায় কিছু নিয়ে যান।

জি হুজুর, আমি এখন পাঁচ ওকৃত নামাজ পড়ি, রোজা রাখি।

বেশ বেশ, এই তো মানুষের কাজ। নামাজের সময় নামাজ পড়বে, সওদার সময় সওদা করবে, বেশ বেশ। তাহলে দেখছি তোমাকে দিয়ে এ কেসটা ফয়সালা করা যাবে কারণ এখন তুমি ইমানদার হয়েছ। এ মেয়েটা কিন্তু মুসলমান ভদ্রঘরের শিক্ষিতা অবিবাহিতা মেয়ে। তুমি তো সবই জানো, বেশী দেরী হলে মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মেয়েটা কোথায় আছে সেইটুকু জানতে পারলেই আমি ওকে উদ্ধার করতে পারব। তুমি ইমানদার মুসলমান, পাঁচ ওকত নামাজ পড়, রোজা রাখো। তোমার কি কর্তব্য নয় এই মুসলমান মেয়েটাকে উদ্ধার করা?

হুজুর, আমি যে কিছু জানি নে।

এই তো তোমার দোষ। আজ আঠারো বছর ধরে তোমার সঙ্গে আমাদের মহরম-মহরম চলছে, তবুও আমাদের দোস্তী হচ্ছে না। আমরা কিন্তু তোমার সঙ্গে দোস্তী করতেই চাই। যাক এখন চা এসে গেছে, গল্প করতে করতে খেয়ে নেওয়া যাক।—দীনেশ, প্লেট দু'টো ব্যারিস্টার সাহেব আর মুনির মিঞাকে দাও আমি চা খাব।

দীনেশ হুকুম মতো প্লেট রাখতেই ঢাকনা খুলে অমিয়বাবু বললেন,—এত খাবার খাব না। অফিসার হেসে বললেন,—আরে মশাই, খেয়ে নিন। এর পরে তো আর আমরা আপনাকে খাওয়াব না, খাওয়াবে মুনির মিঞার মুরুব্বীরা। এ কেস কোর্টে উঠলে ব্যারিস্টার উকিলদের হবে ফলারের নেমন্তন্ন।

আপনি দেখছি আইনজীবিদের ওপর বেশ চটা।

দেখুন মিস্টার ব্যানার্জী, আমি প্রথম জীবনে সাব-ইনস্পেক্টর হয়ে পুলিশে ঢুকে এখন এই পোস্টে পৌছিয়েছি, শীঘ্রই পেনসন নিতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, সমাজ বিরোধী দুষ্কার্যকারীদের প্রধান সহায় এক শ্রেণীর আইনজীবী, যাঁরা জেনে শুনেও কথার মারপ্যাচে আসামী খালাস করে

দেন। নীচের কোর্টে মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে বেশ করে তাকে তালিম দিয়ে কোর্টে দাঁড় করানো তো একটা দৈনন্দিন ঘটনা। তারপর যে আইনজীবী প্রকৃত অপরাধীকে বেকসুর খালাস করতে ওস্তাদ, তারই কদর বাড়ে। আপনারা থাকেন একেবারে উপরতলায়, সেজন্যই আপনাদের অনেকেই বোধহয় নীচতলার খবর রাখেন না।

নীচতলার একটু নমুনা বলুন তো?—হেসে অনুরোধ করলেন অমিয়বাবু।

এই ধরুন মুনির মিঞাকে এই আঠারো বছরের মধ্যে বোধহয় এবার নিয়ে এগারোবার আমরা নেমন্তন্ন করে এখানে এনেছি। তার মধ্যে চারবার নেমন্তন্নের ভোজ খাইয়েছি দু'বার ছুটে গেছে। প্রথম দিকে বার চারেক আমাদের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে সেটা অস্বীকার করে বলত —পুলিসের মারের চোটে মিথ্যা স্বীকারোক্তি করেছে। এখন আর মেরে হাড় ভাঙ্গার কথা কোর্টে বলে না। বোধহয় মুনির মিঞার একটু চক্ষুলজ্জার বালাই আছে, যার জন্য এখন আর ওকে দিয়ে মেরে হাড় ভাঙ্গার গল্পটা বলানো সম্ভব হয় না।

অফিসার মুনিরের দিকে ফিরে বললেন,—কি বল মুনির মিঞা, কোনোবার আমরা তোমাকে মেরেছি?

না হুজুর। প্রথম প্রথম দু'চারটে থাপ্পর, রুলের গুঁতো খেয়েছি। ইদানিং আর ওসব কিছু হয় না।

আরে দোস্ত, ট্রামে, বাসে, ধরা পড়লে ভদ্রমহোদয়েরা চাঁদা করে তোমাদের শ্রীঅঙ্গে যেরকম 'ভাদুরে তাল ঠোকেন', তার তুলনায় আমাদের গুলো তো স্রেফ বাগবাজারের রসগোল্লা। এখন এসব বাজে কথা থাক, এই কেসটার কি করা যায় সে সম্পর্কে দোস্ত, একটা পরামর্শ দাও তো।

হুজুর আমি কিছুই জানি নে। চেক দু'খানা ট্রামের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছি।

এই তো তুমি কিছুতেই আমাদের সঙ্গে দোস্তি করবে না। তবে এটা জেনে রাখো মুনির মিঞা, এবার তোমার মুরুব্বীকে আমি ঝুলাবোই। খদ্দরের পোষাক চরকামার্কা নিশান এবার আর বাঁচাতে পারবে না। মাঝখানে তোমার সাত বছরের জেল হবে, তার ফলে তোমার অমন ভাল বিবিটা পথে বসবে। তোমার জন্য আমার তত মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তুমি সাত বছরের জন্য জেলে গেলে অমন খুবছুরৎ বিবিটার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কি দশা হবে তাই ভেবে সত্যই আমি দুঃখিত হচ্ছি।

অফিসার কলিংবেল টিপলেন, দু'জন কনস্টেবল এসে আসামীকে হাজতে নিয়ে গেল।

তাহলে মুনির মিঞার কাছে কোনো সংবাদ পাওয়ার আশা আপনি ছেড়ে দিলেন? প্রশ্ন করলেন অমিয়বাবু।

মোটেই না। এদের সঙ্গে আমরা কথা বলি মনোবিজ্ঞান অবলম্বনে। আগেকার দিনে মারপিট করে যে স্বীকারোক্তি আদায় করা হত তার বেশীর ভাগই মিথ্যা, মারের চোটে যা তা বলত। এখন আমাদের মনোবিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার ফলে যে স্বীকারোক্তি এরা করে, কোর্টে টিকুক চাই না টিকুক সেটা কিন্তু সত্য। এজন্য আমরা এ শ্রেণীর দাগী আসামীদের অনেক কিছু ইতিহাস অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করি।

এই মুনিরের ইতিহাসটা বলতে কি আপনার অসুবিধা আছে?

না। বলছি শুনুন,—প্রায় আঠারো বছর আগে পুলিস হিসাবে প্রথম আমার সঙ্গেই এ লোকটার পরিচয় হয়। তখন এর নাম ছিল মণীন্দ্র দাস, বয়স চোদ্দ-পনরো, বাপ-মার কোনো খোঁজ নেই। ও নিজেও এ পর্যন্ত কিছু বলে না। কাজ করত খিদিরপুরে এক চায়ের দোকানে।

মণীন্দ্র ধরা পড়ল একটা ছোটখাটো চুরির ব্যাপারে। সন্ধ্যাবেলা হাজতে এসে সারারাত কাঁদল। সকালে দিলাম চালান। বিচারে দুই সপ্তাহ জেল হল।—

জেল হতে বেরিয়ে এসে চায়ের দোকানে চাকরি পেল না। কালীঘাটে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকরি পেল। তিন-চার মাস পরে ভদ্রলোক জানতে পারলেন মণীন্দ্র চুরি করে জেল খেটেছে। অতএব বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে পথে এসে দাঁড়াল। বছর দুই পরে মণীন্দ্র আবার ধরা পড়ল। এবার পকেট মেরেছে। তিন মাস জেল হল। জেল থেকে বেরোলে এবার পুলিশ নজর রাখল।—

মণীন্দ্র খিদিরপুর অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গামছা বিক্রী করে, আর সুযোগমতো এক চাটগেঁয়ে মুসলমান হোটেলওয়ালার তেরবছরের মেয়ে মরিয়মের সঙ্গে আলাপ করে। তাকে নানারকম সখের জিনিস কিনে দেয়।

ক্রমে ব্যাপারটা হোটেলওয়ালা জানতে পারল। জেনে মণীন্দ্রকে ডেকে ভালরকম টাকা রোজগার করতে পরামর্শ দিল। মণীন্দ্র মহাউৎসাহে টাকা রোজগার করে হোটেলওয়ালার কাছে জমা রাখতে লাগল। সাদীটা কিন্তু আজ কাল করে আর হয় না। তবে হোটেলওয়ালা দুজনের মেলা-মেশায় বাধা দিত না।

একবছর এইভাবে চলার পর মণীন্দ্র আবার পকেট মেরে ধরা পড়ল। সেবার সে নাম বলল মনিরুদ্দিন সেখ। জেল হল এক বছর।

মরিয়মের বয়স ষোল, দেখতে সুন্দরী। হোটেলে আসে স্টীমারের সারেঙরা। কৌশলে মরিয়মকে দেখানো হয়। শেষে এক বুড়ো সারেঙ দুহাজার টাকা নগদ গুনে দিয়ে মরিয়ম বিবিকে কাবিলনামা পড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

নোয়াখালী জেলায় সারেঙ সাহেবের বাড়ী। এর আগে সারেঙ সাহেবের পুরনো দুই বিবি খিদিরপুরের বাসা আর নোয়াখালীর বাড়ীতে পালা করে থাকতেন। নয়াবিবি পেয়ে সারেঙ সাহেব পুরনো বিবিদের খিদিরপুর আর নোয়াখালীর মধ্যে টানাহেঁচড়া বন্ধ করে দিলেন।

মনিরুদ্দিন জেল হতে বেরিয়ে এসে হোটেলওয়ালার কাছে তার জমানো টাকা চাইল। হোটেলওয়ালা তাকে বুঝিয়ে বলল মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে সারেঙের বাসায় গেছে, সেখানে গিয়েও কাঁদছে, এই ফিরে এল বলে।

মনিরুদ্দিন খোঁজ নিয়ে জানল, সারেঙ সাহেব আসাম ডেচপাচের সারেঙ। স্টীমার নিয়ে আসাম হতে ঘুরে আসতে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ লাগে। কলকাতা এসে দু'সপ্তাহের বেশী থাকেন না। মরিয়মকে পাহারা দেয় এক বুড়ী। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। মরিয়মের সঙ্গে মনিরুদ্দিনের দেখা-সাক্ষাত চলতে লাগল। মরিয়মের কান্নাও থেমে গেল।

দু'বছর পরে সারেঙ সাহেবের চাকরি শেষ হল। সারেঙ সাহেব নয়া বিবি নিয়ে দেশে যাবেন, নয়া বিবি যাবে না। কেন যাবে না তার হেতু, বিবি আর তার বাপজান বলল এক রকম, গোপন সূত্রে শুনা গেল অন্যরকম।

গোপন সূত্রটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সারেঙ সাহেব আট দশজন খালাসী নিয়ে এক রাত্রে হানা দিলেন তাঁর নিজের বাসায়। ঘর হতে বেরুল মরিয়ম আর মনিরুদ্দিন। মরিয়মের হাতে বরিশালের দা, মনিরুদ্দিনের হাতে ছোরা। দু'জন খালাসী ঘায়েল ও একজন খুন হল।

কেসটা তদন্ত করলাম আমি। ওরা দুজনে সব কথা আমাকে বলেছিল। মরিয়মকে বাইরে রাখা দরকার, সেজন্য কোর্টে মনিরুদ্দিন নিজেই সব করেছে মরিরম কিছু করেনি বলে স্বীকারোক্তি দিল। মরিয়ম প্রথমে রাজি হয় নি। তারপরে যখন ধমক দিয়ে বুঝালাম যুবতী মেয়ে জেলে গেলে তার অসুবিধা আছে। তখন সে রাজি হয়ে সাক্ষী দিল। মনিরুদ্দিনের চার বছর জেল হল।

সারেঙ সাহেব নয়া বিবির আশা ত্যাগ করে দেশে গেলেন। মরিয়ম গেল তার বাপজানের কাছে। মাস দুই পরে এক কনস্টেবলের মারফত হিজিবিজি

লেখা একটুকরো কাগজ পেলাম। লেখার পাঠোদ্ধার করে বুঝলাম মরিয়ম লিখেছে, তার বাপজান আবার তাকে দিয়ে দাঁও মারতে চেষ্টা করছে। সে বাঁচতে চায়।

গেলাম বাপজানের হোটেলে। খুব করে ধমকিয়ে বললাম মরিয়মকে দিয়ে আবার যদি দাঁও মারার চেষ্টা কর, তবে জেল খাটিয়ে ছাড়ব।

এর পর দুই বছর আমি ওখানে থেকে যখন বদলী হই, তখন যে ইনস্পেক্টর ওখানে গেলেন তাঁকেও ঘটনাটা বলে এসেছিলাম।

মনিরুদ্দিন জেল থেকে বেরিয়ে এসে মরিয়মকে নিকে করে রাজাবাজারে বাসা করল। ইচ্ছা করলে ও ভালই থাকতে পারত। কিন্তু ওর স্বভাবটাই খারাপ হয়ে গেছে। আর একবার ওর ঘরে চোরাই মাল পাওয়া গেলে এক বছর জেল খাটল। তারপর তাহের মিঞার ব্ল্যাক মার্কেট ব্যবসায় যোগ দিয়ে সিমেণ্ট সমেত ধরা পড়ে জেল খেটেছে।

মুনির মিঞার কাহিনী শুনে অমিয়বাবু বললেন, আপনি কি তাহলে মুনির আর মরিয়মের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সংবাদ আদায় করতে চান?

দেখুন ব্যারিস্টার সাহেব, আমার মতলব অনেকটা ঐ রকম হলেও এর আর একটা দিক আছে। মেয়ে চুরি, তাও আবার যুবতী মেয়ে চুরি। এটা গুরুতর অপরাধ। মুনির যদি সাক্ষাত সম্বন্ধে এর সাথে জড়িত না থাকে, তবে ওকে এই ধারা হতে বাঁচিয়ে অন্য ধারায় ফেলতে চেষ্টা করব। সেজন্য সবঘটনা আমার জানা প্রয়োজন। মুনিরের মনে দুর্বলতা আছে ওর বউ-এর জন্য। বউটারও এই দুর্বলতা আছে। মুনির যদি কিছু না বলে তবে ওর বউ মরিয়মকে ধরে বুঝাব। মরিয়ম যদি কিছু জানে তবে সে নিশ্চয়ই আমাকে বলবে। আর না জানলে তাকে এখানে এনে তাকে দিয়েই মনিরুদ্দিনকে বুঝাব। আশা করি তাতে ফল হবে।

মুনির যদি সব বলে তবে ওকে সরকারী সাক্ষী করলেই হবে।

না, তা করা যাবে না। তাতে ও খুন হয়ে যাবে। হয় ওকে ছেড়ে দিতে হবে নয় তো ঐ চেক ভাঙ্গানোর চেষ্টা ধারায় ফেলে কিছুদিন জেল খাটিয়ে ছাড়তে হবে।

যা হোক আজ আপনি অনুগ্রহ করে আপনাদের কার্যকলাপ যা দেখালেন ও শুনালেন তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা যে সমাজদ্রোহী গুণ্ডা বদমাসদের 'এত হাঁড়ির খবর' রাখেন, তা আমি জানতাম না।

না, মিস্টার ব্যানার্জী, এখন আর আমরা এদের দিকে পুরোপুরি নজর দিতে পারি নে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভি. আই. পি.-দের দেখাশুনা রক্ষণা-বেক্ষনের চাপে আমাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এদিকে আছেন কয়েক শ' দেশী ভি. আই. পি. যাঁরা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন, ওদিকে আবার বিদেশী ভি. আই. পি. ঝাঁকে ঝাঁকে নামছেন বিমান ঘাঁটিতে। এই দুই শ্রেণীর ভি. আই. পি. নিয়েই আমরা গলদঘর্ম। গুণ্ডা-বদমাসদের খোঁজখবর করবার সে রকম সময় কোথায়? আচ্ছা নমস্কার। কাল বেলা আটটায় একবার খবর নেবেন।

শিউলী বুঝেছে এ বিপদে দুর্বল হলে চলবে না, শারীরিক ও মানসিক বল অটুট রাখতে হবে। সেজন্য সে তার পছন্দমতো খাবার ব্যবস্থা করল।

যে স্ত্রীলোকটি সকাল হতে সব কাজ করছে তার বয়স বছর সাতাশ হবে দেখতে সুশ্রী, ব্যবহারও ভাল। শিউলী তার পরিচয় জানার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে উত্তর দেয়,—আমি কিছু বললে ওরা আমার সোয়ামীকে খুন করবে।

বেলা চারটা বাজতে মেয়েটি শিউলীকে বলল, আমি এখন বাসায় যাব। আমি লুচি ভাজতে জানি নে, এখন যে আসবে সেও জানে না। বেগমসাহেবা যদি অন্য কোনো খানার হুকুম করেন তবে করে দিয়ে যাই।

তুমি খিঁচুড়ি পাকাতে জান?

জানি।

তবে তাই কর। আচ্ছা তোমার নামটা বলাও কি দোষ?

স্ত্রীলোকটা ঘর হতে বেরিয়ে গিয়ে চারিদিক লক্ষ্য করে দেখে এসে মৃদুস্বরে শিউলীকে বলল, আমাকে সকলে মরুনি বলে ডাকে, ভাল নাম মরিয়ম।

তুমি এত ভয় কর কেন? খুন করা কি এত সোজা? তোমরা দল ছেড়ে গেলেই পার?

না বেগম সাহেবা, সে উপায় আর নেই। দল ছেড়ে যাব কোথায়? যেখানে যাব সেখানেই ওরা খুন করবে। দল ছাড়াও দোষ। একবার এদের মধ্যে ঢুকলে আর ছাড়ার উপায় নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শিউলী বসে ভাবতে লাগল মরিয়মের কথা। মানুষ মানুষের কি সাংঘাতিক শত্রু হতে পারে। যদি কেউ ভুল ক'রে একবার এই

গুণ্ডাদের দলে এসে পড়ে, তবে ধরা পড়ে জেল হয় হোক, কিন্তু জেলের বাইরে সে দলত্যাগ করে আর সৎভাবে জীবন কাটানোর চেষ্টা করতে পারবে না।

সন্ধ্যা হতেই শিউলী প্রস্তুত হল তাহের মিঞা আর ওমর সাহেবের সম্মুখীন হবার জন্য। ন'টায় তাঁদের আসার কথা, আটটা বাজতেই খেয়ে নিয়ে, যে স্ত্রীলোকটা নতুন এসেছে তাকে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে টেবিলটা আনল খাটের সম্মুখে। হ্যারিকেনের আলোয় অতবড় ঘর ভাল আলোকিত হচ্ছে না দেখে তিনটে মোমবাতি আনিয়ে রাখল। রাত সাড়ে আটটা বাজলে শিউলী টেবিল সম্মুখ করে স্থির হয়ে বসল খাটে।

শিউলী স্থির হয়ে বসে আছে। এতবড় বিপদের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েও তার মুখে চোখে কোনো দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে নি। প্রভাতে নামাজ পড়ে সে প্রার্থনা করেছে হে খোদা, আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, বুদ্ধি দাও। সারাদিন তার মনোবীণার সুরে বেজেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত—

'বিপদে মোরে রক্ষা কর,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

এই প্রার্থনা আর গান তার অন্তরে জাগিয়েছে অসীম সাহস আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

দূরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। শিউলী হাতের রিস্টওয়াচটা দেখল,

হাঁ ন'টা বাজল, সময় হয়েছে। শিউলীর মুখে শরতের মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মতো খেলে গেল এক ঝলক কৌতুকের হাসি।

ন'টা বাজার মিনিট দশেক পরে ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন তাহের মিঞা আর তাঁর পিছনে ওমর সাহেব। তাঁদের দেখে শিউলী উঠে দাঁড়াল, তার চোখে প্রকাশ পেল এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সম্মুখে তাহের মিঞার চোখ আড়ষ্ট হয়ে গেল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। ওমর সাহেব চেয়ারে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

ওমর সাহেবের পড়ার শব্দে চমকে উঠে তাহের মিঞা তাঁর হাত ধরে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলেন, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না।

ঘর নিস্তব্ধ। শিউলী তাকিয়ে আছে দুজনের মুখের দিকে। চেয়ারে বসার পর তাহের মিঞা ও ওমর সাহেব আর শিউলীর চোখের দিকে তাকালেন না।

একটু দেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রথম কথা বলল শিউলী। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল বজ্রকঠোর গুরুগম্ভীর বাক্‌শক্তি।

চিৎপুরের জুয়াড়ু নিমকহারাম আতরওয়ালা, কি পাবার আশায় সুলতানপুরের জমিদার জাফরুল্লা খানচৌধুরীর মেয়ে রোশোনারা খানচৌধুরীকে ঢাকা-চকবাজারের ছ্যাকড়া গাড়ির কোচম্যানের বাচ্চা চামাড় তাহের মিঞার কাছে বিক্রী করার সাহস করেছ?

শিউলীর কণ্ঠস্বর, ভাষা ও কথাবলার ভঙ্গী ওমর সাহেব ও তাহের মিঞা দুজনকেই অভিভূত করে ফেলল। কেউ কথা বলতে পারলেন না দেখে শিউলী আর একটা ধমক দিয়ে বলল,—

কিঃ কথা বলছ না যে? উত্তর দাও। কত টাকা বায়না নিয়েছ? পরে আর কি নেবে, বল? তোমার বিবেচনায় জমিদার জাফরুল্লা চৌধুরীর মেয়ের দাম কত? তোমার মেয়ের দাম তো দশহাজার টাকা নিয়েছিলে, রোশোনারার দাম কত?

অ্যাঁ অ্যাঁ আ-আ-আমি বিক্রী করি নি। জড়িত কণ্ঠে বললেন ওমরসাহেব।

শিউলী তাহের মিঞাকে জিজ্ঞাসা করল,—কাল রাত্রে তুমি যে বললে ওমর সাহেব নগদ বিশ হাজার টাকা আগাম নিয়ে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। সাদীর সময় আরও আশিহাজার টাকা ও কলুটোলার বাড়ীখানা দিতে হবে। তোমাদের দুজনের মধ্যে কার কথা সত্য?

তাহের মিঞা উত্তর দিল,—আমি যা বলেছি, তাই সত্য। গতকাল বিকেল চারটার সময় ওমর সাহেবের আতরের দোকানের পিছনের ঘরে বসে

বাবুরামকে মধ্যস্থ ও নছির সাহেবকে সাক্ষী করে কাগজে চুক্তি লিখে বাবুরামের হাতে দিয়েছি। সেই ঘরে বসেই ওমর সাহেবকে নগদ বিশ হাজার, বাবুরামকে দশহাজার আর নছির সাহেবকে পাঁচশ' টাকা দিয়েছি।

শুনে শিউলী আবার ওমর সাহেবকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—

কি, চুপ করে আছ কেন? তাহের মিঞা যা বলছে তার উত্তরে তোমার কি বলার আছে?

অ্যাঁ না, আ-আ-আমি তোমাকে বিক্রী করি নি। এ-এই আমার অবস্থা খারাপ, দোকানে মাল নেই। এ-এই তাই তোমার সাদীর দেনমোহর আর বাড়ীখানা চেয়েছি।

একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রূপের হাসি হেসে শিউলী বলল,—বাঃ বাঃ চমৎকার যুক্তি! আমার সাদীর দেনমোহর দেব আমি! আর সে মোহরাণা পাবে জুয়াড়ু বিশ্বাসঘাতক আতরওয়ালা। চমৎকার যুক্তি!! শোনো নিমকহারাম আতরওয়ালা, নির্বোধ তাহের মিঞার কাছ থেকে নগদ বিশহাজার টাকা তুমি হাতে পেয়েছ। ঐ টাকা দিয়ে জুয়া খেল গিয়ে। তুমি জীবনে আর সুলতানপুরের খান চৌধুরী বংশের মেয়ে রোশোনারার কাছে কোনোপ্রকারে একটি তামার পয়সাও পাবে না।

তারপর শিউলী ফিরল তাহের মিঞার দিকে।

এইবার তুমি শোনো তাহের মিঞা। তুমি যা ফন্দি এঁটেছ, তার সবটাই ভুল। সেই ভুলের মাশুল সাড়ে পঁচিশ হাজার টাকা তোমার নিজের ট্যাঁক থেকেই গরচা গেছে। আম্মার চেক নিশ্চয়ই তুমি ভাঙ্গাতে পার নি।

এখনও যদি তোমার ভুল না ভাঙ্গে, তবে ঘোর বিপদে পড়বে। আমাকে বালীগঞ্জের বাড়ীতে রেখে এস। আমি কথা দিচ্ছি আমার দ্বারা তোমার আর কোনো অনিষ্ট হবে না।

শিউলীর কথার তেজে তাহের মিঞা একেবারে বেকুব বনে গেলেন। জীবনে তিনি বহু মেয়ের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু এ রকম মেয়ের পাল্লায় কোনোদিন পড়েন নি। এ রকম মেয়ে তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। আমতা আমতা করে বললেন,—

আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি।

এমন সময় ভাঙ্গা জানালাটার বাইরে আমগাছের দিকে একটা শব্দ হল। তাহের মিঞা সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে ওমর সাহেবকে নিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে শিউলীকে বললেন,—

তাহলে চল, তোমাকে বালীগঞ্জে রেখে আসি।

শিউলী তার ব্যাগ নিয়ে তাহের মিঞার সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। দু'খানা ট্যাক্সি ছুটল কলকাতার দিকে।

শিউলী পিছনের সিটে একাই বসে ছিল। ট্যাক্সি কলকাতার অনেকগুলো রাস্তা ঘুরে এক নির্জন গলির মধ্যে একটা বড় গেটওয়ালা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গাড়ীবারান্দার নীচে থামল।

তাহের মিঞা ট্যাক্সি থেকে নেমে শিউলীকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর। এখানে আমার একটু কাজ আছে। দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

তাহের মিঞা ফিরে এলেন চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে। ব্যাপারটা শিউলীর বুঝতে আর বাকি থাকল না। সে নির্বিবাদে গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে চলল। বাড়ীটা পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় অনেকগুলো করিডোর ঘুরে ঘুরে পাঁচতলায় উঠে সাথের লোক একটা ঘর খুলে আলো জেলে দিল।

শিউলী ঘরে প্রবেশ করে টেবিলের উপরে ব্যাগটা রেখে তাহের মিঞার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল,—

তাহলে মিঞা সাহেবের খোয়াব এখনও ভাঙ্গে নি।

আচ্ছা দেখা যাবে। এই আসছে রবিবারে সাদীর রেজিস্ট্রার, মোল্লা, উকিল, সাক্ষী, সব নিয়ে রাত আটটায় আমরা আসব। তখন বুঝবে এ খোয়াব কার।

এই বলে তাহের মিঞা চলে গেলেন।

কলুটোলার বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সময় শিউলী তার অভাগিনী ফুফু জুলেখার সম্মুখে জেলে দিয়েছিল ভবিষ্যত নিশ্চিন্ততার উজ্জ্বল আলো। আধ ঘণ্টা পরেই ইব্রাহিমের অদ্ভুত ভাব দেখে তার পিছনে পিছনে সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে যখন শুনলেন, ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে বলছে,—লালবাজার পুলিশ অফিসে চলুন, সর্বনাশ হয়েছে, আপনার নাম করে শিউলীকে অপহরণ করেছে, তখন জুলেখার চোখের ওপরে নেমে এল গভীর রাত্রে শ্মশান চিতার আলোক-ভীতি। জুলেখা নিভিয়ে দিলেন সদর দরজার আলো, সিঁড়ির আলো, রান্নাঘরের আলো, শোবার ঘরের আলো। অভাগিনী জুলেখার আর আলো নেই।

বড় উজ্জ্বল আলো জেলে দিয়েছিল শিউলী। ইনজিনীয়ারিং পাশ করে

বিলাত যাবে ইব্রাহিম। বিলাত হতে ফিরে এলে বড়ো ইন্‌জিনীয়ারের মা হবে জুলেখা। ইব্রাহিম বড়ো চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত মাসে আড়াইশ' টাকা বাড়ীভাড়া নিজ হাতে আদায় করবে জুলেখা। আড়াইশ' টাকা মাসে পেলে একটা ভাল বাঁদী আর একজন বাচ্চা খানসামা রেখে দুজনের সংসার ভালো-ভাবেই চলবে। আর জুলেখা কাউকে ভয় করে না হিদায়েৎ চৌধুরীর নাতনী শিউলী তার সহায়।

আধঘণ্টা পরেই অতবড় উজ্জ্বল আলো নিভে গেল। গভীর অন্ধকারে মেঘ-গর্জনের মতো মনের কানে বেজে উঠল ইব্রাহিমের সতর্কবাণী—সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমার হুঁস হবে না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন জুলেখা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, আশা —যদি ইব্রাহিম ফিরে আসে।

রাত এগারটার ঘণ্টা বাজল। ইব্রাহিম ফিরল না। ওমর সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে। গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জুলেখা শিউলীর কথা বলতেও ওমর সাহেবের ঘরে গেলেন না। অন্ধকারে দাঁড়িয়েই জুলেখার সে রাত ভোর হয়ে গেল।

রহমত বেলা ন'টার মধ্যেই রান্না শেষ করে ওমর সাহেবকে খাইয়ে, জুলেখা ও ইব্রাহিমের খাবার জুলেখার ঘরে টেবিলে সাজিয়ে রেখে গেল। ইব্রাহিম এলে জুলেখা খাবেন।

বেলা এগারোটায় ইব্রাহিম এসে তার ঘরে ঢুকল। জুলেখা গিয়ে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ইব্রাহিম, খুলে বল ?

ইব্রাহিম রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল—যা হবার তাই হয়েছে, শিউলী গুণ্ডার হাতে পড়েছে। এখনও খোঁজ পাওয়া যায় নি।

জুলেখা ইব্রাহিমকে স্নান করে খেতে বললেন। ইব্রাহিম উত্তর দিল না, বাক্‌স হতে একসেট কালো পোষাক বের করে বাথরুমে গিয়ে স্নান করে পোষাক পরে বাড়ী হতে বেরিয়ে গেল। জুলেখার সঙ্গে আর কথাও বলল না, খেয়েও গেল না।

ছেলে খেয়ে গেল না, মাও খেলেন না। ছেলে ভাল পোষাক পরে গেছে, বোধহয় বিশেষ কাজ আছে, কাজ সেরে ফিরে এসে খাবে। ছেলে খাইয়ে মা খাবেন। বেলা একটা বাজল ছেলে ফিরল না।

ওমর সাহেব খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বেলা একটায় জেগে গড়গড়া টানছেন। জুলেখা ঘরে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন,—

মেয়েটা উধাও হয়ে গেল, তুমি তার জন্য একটুও চেষ্টা করলে না! দিব্বি আরামে খেয়ে, ঘুমিয়ে, ফর্সি টানছ!!

আমি তার কি করব? বে-আবরু খুবসুরৎ আওরত মরদে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপার হিঁদুর মেয়ে নিয়ে হামেশাই হচ্ছে। হিঁদুর দেখাদেখি যে সমস্ত মুসলমানের বে-আদব বে-তরিবত মেয়ে বে-আবরু হয়ে চলাফেরা করবে, নসিবেও এই হবে—এ তো জানা কথা। তবে তোমার ভাইঝিকে মুসলমানেই নিয়েছে। এরকম মেয়ে ধরার মতো মরদ হিঁদুদের মধ্যে নেই। হিঁদুরা দু'চারটে ভেড়ী বক্‌রি ধরে, বাঘিনী ধরার সাহস তাদের নেই। কাজেই তোমার জাত যাবে না।

জুলেখা আর কিছু না বলে ঘর হতে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। টেবিলের ওপরে মা ও ছেলের খাবার পড়ে থাকল।

সন্ধ্যা হল, ইব্রাহিম ফিরল না। জুলেখা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রাত সাতটা, আটটা, বাজতে বাজতে, দশটা বেজে গেল। অভুক্ত মা পথের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের জন্য।

সন্ধ্যার পর ওমর সাহেব বেরিয়ে গেছেন। অন্য দিন রাত সাড়ে আটটায় ফেরেন, সেদিন ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়। বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন জুলেখা, ওমর সাহেবকে দেখেও দেখলেন না। ওমর সাহেবও কিছু বললেন না।

আধঘণ্টা পরেই ফিরল ইব্রাহিম। মাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইব্রাহিমও কিছু বলল না, সোজা ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

জুলেখা ইব্রাহিমের সাথে সাথেই ঘরে গিয়ে বসলেন তার বিছানার ওপরে। ইব্রাহিম মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। জুলেখা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—

বাপজান, কি হয়েছে বল। কাল সারাটা রাত, আজ সারাটা দিন, আর এই এতটা রাত আমার যে কি অবস্থায় কাটছে, তা তোরা একবার ভেবে দেখলি নে। আমাকে সব কথা খুলে বল।

ইব্রাহিম মুখ ফিরিয়ে দেখল মা কাঁদছেন। মায়ের চোখে জল দেখে ইব্রাহিম উঠে বসে একটু ভেবে নিয়ে বলল,—মা, তুমি বারে বারেই সব কথা খুলে বলতে বলছ। সব কথা শুনে তুমি সহ্য করতে পারবে?

আমার আর অসহ্য কি আছে বাপজান? আমি যে সারাজীবন সহ্য করতে করতে পাথর হয়ে গেছি।

তবে শোনো,—একলাখ টাকা নগদ, আর এই বাড়ীর বিনিময়ে শিউলীকে তাহের মিঞার কাছে বিক্রী করা হয়েছে। গতকাল বেলা চারটের সময় তোমাদের দোকানে বসে দলিল লেখাপড়া করে তাহের মিঞা নগদ বিশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছে। অবশিষ্ট টাকা ও বাড়ীর দলিল সাদীর পরদিন পাওয়া যাবে। এবার আমরা বড়লোক হব।

তুই এসব জানলি কি করে?

আমি নিজ কানে বাপজান, তাহের মিঞা ও শিউলীর কথাবার্তা শুনে এলাম।

তুই এদের কোথায় পেলি?

দমদমে এক বাগান বাড়ীতে শিউলীকে তাহের মিঞা আটক করে রেখেছে। আমি আর করিম রাতের অন্ধকারে জানালার কাছে থেকে সব দেখে ও শুনে এলাম।

জুলেখার চোখের জল শুকিয়ে ধীরে ধীরে চোখে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ ক্রমে কালো হয়ে উঠল। কপালের শিরাগুলি দড়ির মতো ফুলে উঠেছে। নীরবে কিছুক্ষণ ইব্রাহিমের বিছানায় বসে থেকে উঠে গেলেন। মায়ের মুখ চোখের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে ইব্রাহিম ভয় পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল, কথা বলতে সাহস পেল না।

ইব্রাহিমের ঘর থেকে বেরিয়ে জুলেখা গেলেন ওমর সাহেবের ঘরে। ওমর সাহেব বিছানায় শুয়েছিলেন, জুলেখাকে দেখে উঠে বসলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জুলেখা অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—

তুমি শিউলীকে তাহের মিঞার কাছে বিক্রী করেছ?

এ কথা বুঝি তোমাকে ইব্রাহিম এখন বলল? জানো, আজ তোমার ওস্তাদ ছেলের বুকে রহমতের ছোরা বসে নি কেবল আমার সাথে সম্বন্ধ আছে বলে। শয়তানটা ঐ ছুঁড়ীর খোঁজে গিয়ে সব দেখে এসে তোমাকে ক্ষেপিয়েছে।

জুলেখা অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি জানতে চাই আমার বাবা জমিদার হিদায়েৎ খাঁর নাতনী শিউলীকে চিৎপুরের আতর-ওয়ালা বিক্রী করেছে কি না?

মুখ সামলিয়ে কথা বলবে। তোমার দজ্জালী আর আমি সইব না। আমি খোদার খাদেম, ইসলামের খিদ্‌মৎগার। তোমার বাপ ভাইদের মতো নাদেন নই। ঐ বেতরিব ছুকড়ীটা একটা কাফের হিঁদু বিয়ে করার জন্ত পাগল হয়ে

উঠেছিল। তার ইমান রক্ষার জন্য উপযুক্ত মরদের বাচ্চা মরদের হাতে তুলে দিয়েছি। এর জন্য আমি কাউকে কোনো কৈফিয়ত দেব না।

ওমর সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে জুলেখা পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠল। হাসির বেগ একটু কমলে বলতে আরম্ভ করল,—

বাঃ রে খোদার খিদমৎগার, হাঃ হাঃ হাঃ। এই খিদমৎগারীর জন্য বায়না আগাম বিশহাজার টাকা হাঃ হাঃ হাঃ। তারপর আরও আশী হাজার টাকা আর এই বাড়িখানা। বাঃ রে খোদার খাদেম! হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ—

উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ছেন জুলেখা। ওমরসাহেব জুলেখার হাসির সম্মুখে একেবারে জড় পুতুল হয়ে গেলেন।

হাসির বেগ কমলে আবার জুলেখা বলতে আরম্ভ করলেন,—

বাঃ, বাঃ খাসা খোদার খাদেম। খাসা ইসলামের খিদমৎগার! হাঃ হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হিঃ—। খাসা ইমানদার। হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ—।

এবার ওমর সাহেব একটু সামলে নিয়ে বললেন,—তোমার হাসি থামাও এতদিন তোমার দজ্জালী সহ্য করেছি, কিছু বলি নি, আরনা। এখন এ বাড়ী আমার। আমি খোদার কসম করে বলছি, কালই তোমাকে তালাক দিয়ে এ বাড়ীর হতে বের করে দেব।

আবার জুলেখা হেসে ফেটে পড়লেন,—হাঃ হাঃ হাঃ চিৎপুরের জুয়াড়ু সরাবী আতরওয়ালা বলছে জমিদার হিদায়েৎ খাঁর মেয়েকে বের করে দেবে তার বাপ ভাইয়ের বাড়ী থেকে। সুলতানপুরের জমিদার খান চৌধুরী বংশের মেয়েকে তালাক দেবে চিৎপুরের আতরসুর্মাওয়ালা। হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ শোনো আতরওয়ালা, সুলতানপুরের খান চৌধুরী ঘরের মেয়েদের চেনার ক্ষমতা তোমার নেই। ঐ ঢাকা চক্‌বাজারের ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানের বাচ্চা তাহের মিঞারও নেই। ঐ কোচম্যানের বাচ্চার বিশ হাজার টাকা হাতিয়েছ বটে কিন্তু রোশোনারা চৌধুরী তোমাকে একটি পয়সাও দেবেনা। বাঁদীর বাচ্চা তাহের মিঞার সাধ্যও হবেনা রোশোনারা চৌধুরীর গায়ে হাত দেওয়ার। আমার এ কথা আর কদিনের মধেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে। সেলাম আতরওয়ালা সাহেব সেলাম, কাল তুমি জুলেখা খান চৌধুরীকে তালাক দিও। সেলাম আতরওয়ালা সাহেব। জুলেখার এই শেষ সেলাম। হাঃ হাঃ হাঃ—।

হাসতে হাসতে ওমর সাহেবের ঘর হতে বেরিয়ে জুলেখা নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বারান্দায় যে ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে ছিল তা জুলেখা দেখলেন না। ইব্রাহিমও সাহস করে মাকে কিছু বলতে পারলনা।

নানা দুশ্চিন্তায় সারারাত কাটিয়ে ভোরে উঠে ইব্রাহিম গেল বালীগঞ্জে। শিউলীর জন্য বালীগঞ্জের বাড়ীতে সকলেই বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। প্রভাতেই ইব্রাহিমকে আসতে দেখে সকলেই ব্যস্ত হয়ে তাকে ঘিরে ধরলেন। ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে বলে দুজনে ঘরের দরজা বন্ধ করে দমদম বাগান বাড়ীতে যা দেখেছে ও শুনেছে তার মধ্যে ওমর সাহেবের কীর্তিকলাপ বাদ দিয়ে আর সব বলল।

শুনে অমিয়বাবু বললেন,—তুমি কাল রাত্রেই লালবাজারে জানালে না কেন ?

অতরাতে পুলিশে জানানো যাবে কিনা বুঝতে পারিনি।

তুমি ভুল করেছ। যখনই তুমি জানতে পেয়েছিলে শিউলী ঐ বাগান বাড়ীতে আছে তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। নিজেদের গোয়েন্দাগিরি করা ঠিক হয়নি। কাল বিকালে করিম তোমার সঙ্গে গিয়েছে, এখনও সে ফিরল না কেন ?

অমিয়বাবুর প্রশ্নে ইব্রাহিম চমকে উঠল। তাই তো! করিমকে বাগান বাড়ির সম্মুখে লক্ষ্য রাখার জন্য বলে ইব্রাহিম গাছে উঠেছিল। তারপর যা দেখেছে ও শুনেছে তাতে করিমের কথা আর মনেই নেই।

অমিয়বাবু করিমের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে ইব্রাহিমকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে কিছু খেয়ে নাও। পুলিশ অফিসে এখনই যেতে হবে।

নমিতা করিমের মার নিকট হতে একসেট পোষাক এনে ইব্রাহিমকে দিল। ইব্রাহিম স্নান করে খেতে বসে অপর্ণাদেবীকে বলল,—কাকীমা, শিউলী উধাও হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত আমার মা এককোঁটা পানিও খান নি।

অপর্ণাদেবী খুব দুঃখিত হয়ে বললেন,—বাবা, তুমি তোমার মাকে বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে যদি আনতে পার, তবে বড় ভাল হয়। অতবড় বাড়ীর মধ্যে তোমার মা মাত্র একটি প্রাণী, কি করে থাকবেন বুঝি নে।

মা-কে এখন বললেই আসবেন, এখন আর তাঁর আসায় কোনো বাধা নেই কথাটা বলল ইব্রাহিম গত রাত্রের সেই তালাক দেওয়ার কথা মনে করে।

অপর্ণাদেবী খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন,—তবে বাবা,—আজই তাঁকে নিয়ে এস। জিনিস-পত্র কিছু না আনলেও চলবে। ওমর সাহেবের কাজ যা কিছু তা তো খানসামাই করে দেয়। তুমি তোমার মাকে আজই নিয়ে এস।

ইব্রাহিম ও অমিয়বাবু চা খেয়ে চললেন লালবাজারে। অপর্ণা দেবী আবার অমিয়বাবুকে বলে দিলেন, তুমি ফেরার পথে জুলেখা দিদিকে নিয়ে এস।

অমিয়বাবু ও ইব্রাহিম লালবাজার পুলিশ অফিসে উপস্থিত হতেই বড় অফিসার বললেন, কিরকম ইব্রাহিম সাহেব, আপনি তো দেখছি আমাদের চাইতেও বড় গোয়েন্দা কিন্তু আপনার সহকর্মী করিমভাই যে এখন হাসপাতালে।

অমিয়বাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, করিম হাসপাতালে ! এর মানে ?

তবে সবটাই শুনুন। আমাদের ইব্রাহিম সাহেব কাল বেশ সেজেগুজে বেলা বারটায় যান বাগমারী তাহের মিঞার বাড়ী। সেখানে তাহের মিঞার এক ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে নিয়ে যান রাজাবাজারের এক হোটেলে। বাস ড্রাইভারটিকে পেট ভরে খাইয়ে তার পেট হতে বের করে নিলেন দমদম বাগান বাড়ীর ঠিকানা। বেলা দুটোর সময় দেখে এলেন বাগান বাড়ীটা। তারপর রাত আটটায় করিমকে সঙ্গে নিয়ে বাগান বাড়ীর উত্তরের ভাঙ্গা প্রাচীরের ভিতর দিয়ে ঢুকে একটা বড় গাছের আড়ালে করিমকে রেখে নিজে পশ্চিমের দিকে দোতলায় যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল, সেই ঘরটার কাছে একটা আমগাছে উঠে বসেছিলেন। রাত ন'টায় দুখানা ট্যাক্সি এল। ট্যাক্সিতে যাঁরা এলেন তাঁরা গেলেন দোতলায় যে ঘরে আলো জ্বলছিল। এর আধঘণ্টা পরেই ইব্রাহিম মিঞা গাছ হতে নামতে গিয়ে পড়ে যান। শব্দ পেয়ে তাহের মিঞার পাহারাদার চারজন সতর্ক হয়। ইব্রাহিম পালিয়ে গেলেন কিন্তু করিম পারল না। করিমকে পেছন হতে ছোরা মারতেই আমাদের লোক টর্চ ফোকাস করে। টর্চের আলো দেখে আততায়ী পালিয়ে গেল। আমাদের লোক করিমকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কারণ নেই।

অমিয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—তারপর শিউলীর কি হল ?

ইব্রাহিম সাহেব এই গণ্ডগোল বাধানোর ফলে ওখান হতে মেয়েটাকে আবার সরিয়েছে। এখন কোথায় রেখেছে তা এপর্যন্তও জানতে পারি নি।

দমদম বাগান বাড়ীতেই ওদের ধরলেন না কেন ?

দেখুন মিস্টার ব্যানার্জী, এ একটা বড় দল। এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে ভালভাবে আটঘাট বেঁধে করতে হবে। কাল রাত্রে আমাদের দল প্রথম দিকে প্রস্তুত ছিল না। তারপর যখন প্রস্তুত হয়ে যাওয়া গেল, তখন পাখি পালিয়েছে। যাই হোক ইব্রাহিম সাহেব, আর গোয়েন্দাগিরি করবেন না। আপনার বোনকে অল্পদিনের মধ্যেই উদ্ধার করে দেব। আমরা আপনার ভগ্নীপতির দলটাকে এইবার একটু শায়েস্তা করতে চাই। আচ্ছা নমস্কার।

পুলিস অফিস হতে বেরিয়ে অমিয়বাবু ও ইব্রাহিম করিমকে দেখতে গেলেন

হাসপাতালে। ডাক্তার জানালেন ক্ষতটা গুরুতর নয়, চামড়া ও মাংস কেটেছে মাত্র।

অমিয়বাবু করিমকে জিজ্ঞাসা করে শুনলেন সে আততায়ীকে চিনতে পারেনি। ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে ইংরেজীতে বলল আততায়ী আর কেউ নয় স্বয়ং রহমত। কথাটা শুনে বিস্মিত অমিয়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ইব্রাহিম আর কিছু বলল না।

হাসপাতাল হতে বেরিয়ে অমিয়বাবু ইব্রাহিমকে বললেন,—বেলা তো ন'টা বাজে, এখন কলুটোলা গেলে তোমার মা কি বালীগঞ্জ যেতে রাজি হবেন?

ইব্রাহিম উত্তর দিল,—আজ তো হাইকোর্টের ছুটি। চলুন দেখে যাই মা এখন যাবেন কিনা। তবে আমার মনে হয় আমি বললেই মা রাজি হবেন। ও বাড়ীতে ঐ পরিবেশে মা আর থাকবেন না। কাকীমা যদি নিজ হতে প্রস্তাব না করতেন, তবে আমিই কাকীমাকে বলতাম। মা'কে আমি আর ঐ পরিবেশে রাখবনা। শিউলী এলে মা তার কাছেই থাকবেন। এখন কাকীমার কাছে রাখব। আমার মা বড় দুঃখিনী।

কথাগুলি বলতে বলতে ইব্রাহিমের চোখ ছলছল করে উঠল।

অমিয় বাবু আর কিছু না বলে গাড়ি চালালেন। গাড়ি কলুটোলা বাড়ীর সম্মুখে থামলে অমিয় বাবু গাড়িতেই বসে থাকলেন, ইব্রাহিম গেল দোতলায়।

দোতলার তিনখানা ঘরেরই দরজা বন্ধ। ইব্রাহিম ও ওমর সাহেবের ঘরের দরজায় তালা লাগানো, জুলেখার দরজা ভিতর হতে বন্ধ।

ইব্রাহিম জুলেখার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল, কোনো সাড়া নেই।

মা, মা বলে ডাকল, সাড়া নেই। চিন্তিত হয়ে পাকঘরে গিয়ে রহমতের কাছে জিজ্ঞাসা করে শুনল—বেগম সাহেবা আজ প্রভাত হতে এপর্যন্ত ঘরের দরজা খোলেন নি।

আতঙ্কিত ইব্রাহিম একটা লোহার শিকের সাহায্যে খুলে ফেলল জানালা। জানালা দিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠল—কাকাবাবু, মা আমার নেই, কাকাবাবু, মা আমাকে ছেড়ে গেছেন।

অমিয়বাবু ইব্রাহিমের আর্তনাদ শুনে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। ইব্রাহিম দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে বিছানার ওপরে জুলেখার মৃত দেহ জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে,—মা, তুমি এ কি করলে? আমি যে বড় আশা করে তোমাকে বালীগঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

অমিয়বাবু এসে ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য

করলেন টেবিলের ওপরে দুখানা খোলাপত্র পড়ে আছে। পত্র দুখানা হাতে নিয়ে পড়লেন। একখানায় লেখা আছে—

আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। যে আফিং আমি খাইলাম উহা আফিংখোর আতরওয়ালার ঘর হইতেই আনিয়াছি। আমার মৃত্যুর জন্ত কেহ দায়ী নহে। ইতি।

জুলেখা খান চৌধুরী।

দ্বিতীয় পত্রখানা লিখেছেন ইব্রাহিমকে।

'বাপজান, আমি বরাবরই ভুল করিয়াছি। এ ভুল আমি বাঁচিয়া থাকিলে সংশোধন হইবে না। আতরওয়ালার কথামতো সেদিন আমিই শিউলীকে খাওয়ানোর জন্ত রাখিয়াছিলাম। আমার এই আত্মহত্যার পর তুমি শিউলীকে বুঝাইয়া বলিও আমি আতরওয়ালার মতলব না বুঝিয়া সরল মনেই তাকে রাখিয়াছিলাম। আশাকরি শিউলী আমাকে বুঝিবে। বাপজান, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আমার জন্ত দুঃখ করিও না। তুমি যদি মানুষ হইয়া সুখী হও তবে আমি কবরে থাকিয়াই সুখী হইব। বাপজান, আমার আনোয়ারাকে একটু দেখিও। সে বড়ই হতভাগিনী। বাপজান, খোদা তোমাদের রক্ষা করুন।'

তোমার মা।

অমিয়বাবু পত্র দুখানা পড়ে চিন্তা করছেন। ইব্রাহিম জুলেখার বুকের উপরে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে। এমন সময় ওমর সাহেব, নছির সাহেব ও রহমতকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরের মধ্যে অমিয়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওমর সাহেব রূঢ় কণ্ঠে বললেন,—

আপনি আমার জেনানামহলে কেন ঢুকেছেন? বেরিয়ে যান।

খবরদার।—গর্জে উঠে দাঁড়াল ইব্রাহিম। তার সমস্ত মাংশপেশী লৌহকঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে।—এই বাড়ীতে দাঁড়িয়ে হিদায়েৎ চৌধুরীর নাতনী শিউলী চৌধুরীর এটর্নিকে কোনো কথা বলার অধিকার আপনার নেই। গতরাত্রে আপনি খোদার কসম করে জুলেখা বেগমকে তালাক দিয়েছেন। আজ জুলেখা খানচৌধুরীর বাপের বাড়ীতে তাঁর ঘরে আপনি ঐ দুই শয়তানকে নিয়ে কোন অধিকারে প্রবেশ করেছেন? বেরিয়ে যান। এখুনি বেরিয়ে যান। নইলে একটা একটা করে ধরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।

ইব্রাহিমের রুদ্র মূর্তি দেখে তিনজনই সরে পড়লেন।

অমিয়বাবু ইব্রাহিমকে বললেন,—থানায় একটা সংবাদ দিয়ে পুলিশের অনুমতি নেওয়া দরকার। আমি থানায় যাই।

কাকাবাবু, এই নিকটেই আমার দু'জন সহপাঠী বন্ধু আছে। আমি ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, তাদের সংবাদ দিয়ে সৈয়দ সাহেব আর দিদিকে নিয়ে আসুন।

অমিয়বাবু চলে গেলেন।

দু'ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আলো আঁধারে জুলেখা তাঁর ভাই জাফরুল্লার কবরের পাশে আর একটা কবরে মুখ লুকোলেন।

একটি সরল পবিত্র স্নেহ-মমতা ভরা নারী হৃদয় প্রথম জীবনের সরস কামনা পূরণ করতে খোদার বিধানে যাকে অবলম্বন করেছিল, তার কাছে দিনের পর দিন অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা পেয়ে খুঁজেছিল তার মাতৃত্বের মধ্যে সার্থকতা। সে সার্থকতা সম্পাদন চেষ্টায় কুটিল সংসারপথে তার সরল বুদ্ধি ভুল করেছে বহু। সে ভুলের দণ্ড এসে গেল এমন সময়ে যখন একমাত্র আশা-ভরসার স্থল পুত্রের ভবিষ্যত তার সম্মুখে খুলে দিয়েছিল মাতৃ গৌরবে আলোকিত সৌভাগ্যের দুয়ার।

নিভে গেল তার উজ্জ্বল আলো। ভেঙ্গে গেল তার সোনার স্বপন। অন্ধকারে কোথাও কাউকে না পেয়ে অকালে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এল তার মরণ দেবতাকে। হে দেবতা, তুমি আমাকে গ্রাস করে আমার সন্তানের ভবিষ্যত আলোকিত করে দাও।

চলে গেল একটি রক্তঝরা মাতৃহৃদয় মরণের কালো পরদার আড়ালে। সে পরদার আড়াল হতে মা কি তাঁর নাড়ীছেঁড়া ধনদের শুভাশুভ দেখেন না? নিশ্চয়ই দেখেন, মা তো।

তাহের মিঞা তাঁর দলবল নিয়ে চলে গেলে একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক এসে শিউলীকে জিজ্ঞাসা করল রাত্রে কিছু লাগবে কিনা। শিউলী জানাল, কিছু লাগবে না। স্ত্রীলোকটি ঘর হতে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

শিউলী হাতের ঘড়িতে দেখল রাত এগারোটা বাজতে চলেছে। উঠে ঘরখানা পরীক্ষা করে দেখল। ছোট হলেও ঘরখানা বেশ আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। দুখানা টেবিল, তিনখানা গদি আঁটা চেয়ার, একখানা সোফা,

খাটে পুরু গদির ওপরে ভাল বিছানা, মেঝেয় গালিচা পাতা, ইলেকট্রিক ফ্যান। জানালা দুটো নেড়েচেড়ে দেখল খোলা যায়। বাথরুমটাও বেশ ভাল।

সব দেখে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে শিউলী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। শিউলীর বন্দী জীবনের দ্বিতীয় দিন শেষ হল।

প্রভাতে ঘুম ভেঙে শিউলীর কানে এল নিকটেই কোনো গাছে বহু চড়াই পাখি কলরব করছে। তাদের কিচির মিচির শুনতে বেশ ভাল লাগে। সুলতানপুরেও ঘুম ভেঙে সে এমনি কিচির মিচির শুনত। দু'চারটে দুষ্টু চড়াই তার ঘরে এসে উড়ে বেড়াত। সময় সময় দু'এক জোড়া চড়াই তার ঘরের কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বাঁধত। তাতে ঘর নোংরা হলেও শিউলী করিমকে ওদের বাসা ভাঙতে দিত না। একদিন একটা চড়াইয়ের বাচ্চা ওড়া শিখতে গিয়ে তার কোলের উপরে এসে পড়ে। তা দেখে তার মা-বাবার সে কি ছটফটানি। সে সময় শিউলী ভেবেছিল—আজ গোলা যদি কাছে থাকত তবে সে বাচ্চাটাকে বাসায় তুলে দিত। সেই সঙ্গে সেদিন সে অনেক কিছু ভেবেছিল।

ওঃ সে সব কথা মনে এলে যে এখন সব কর্তব্য ভুলে যাব!—শিউলী উঠে বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এসে নামাজ পড়ল। নামাজের শেষে সে আগের দিনের মতোই প্রার্থনা করল—হে খোদা, আমার গোলার মঙ্গল কর। আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, বুদ্ধি দাও, যাতে সমস্ত বিপদ আমি কাটাতে পারি।

নামাজ শেষ করে শিউলী বিছানার উপরে বসে আবার গান ধরল,—

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন না করি আমি ভয়।—

গানটা শিউলী বহুকাল পূর্বে মুখস্থ করেছিল। কিন্তু এতদিন এ গানের তাৎপর্য সে তেমন করে উপলব্ধি করে নি, যেমন করে উপলব্ধি করছে আজ দুদিন। ঋষি রবীন্দ্রনাথের এই মহামন্ত্র ছন্দে ছন্দে জাগিয়ে তুলছে তার হৃদয়ে দুর্জয় সাহস ও শক্তি।

শিউলী এর পূর্বে কোনোদিন গান গায় নি। সে চেষ্টাও সে কোনোদিন করেনি। কলেজে জলসায় অজিত রায়ের বাঁশীর সঙ্গে নমিতার এসরাজ বাজানো শুনে তার মনে কল্পনা জেগেছিল গোলার বাঁশীর সঙ্গে সে যদি অমনি করে এসরাজ বাজাতে পারত। তারপর যখন জানতে পারল অজিত রায়ই গোলা, তখন সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল, বালীগঞ্জ গিয়ে অপর্ণাদেবীর কাছে

এসরাজ শিখবে। কিন্তু গান গাইবার কল্পনা তার মনে কোনোদিনই স্থান পায় নি। আজ দু'দিন এই ঘোর বিপদে শিউলীর কণ্ঠে যে সুর জেগেছে, সে সুরে সে নিজে মুগ্ধ হয়ে কতখানি গলা ছেড়ে গান গাইল, তা সে বুঝতে পারে নি।

গান শেষ হওয়ার একটু পরে ঘরের দরজা খুলে এসে দাঁড়াল একটি বাঙালী স্ত্রীলোক, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর।

আপনি গান গাচ্ছিলেন, সেজন্য দরজা খুলে আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করি নি। এখন আপনার কি লাগবে বা কি করতে হবে বলুন?

আমার গান বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল না কি?

হাঁ, আপনার গলা চমৎকার। যে শুনেছে সেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, নড়তে পারে নি।

আপনার নামটা জানতে পারি কি?

আমার নাম নীরোদা।

বেশ আমি আপনাকে নীরুদি বলে ডাকব।

বেশ তা ডাকবেন। এখন আপনার জন্য কি করব বলুন?

এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা কি হতে পারে?

আপনি যে রকম বলবেন, সেই রকম করতে চেষ্টা করব।

এখানে আপনি পাক করে আমাকে খাওয়াতে পারবেন?

যদি একটা হিটার বা স্টোভ পাই তবে হবে।

তাহলে আপনি সেটা জেনে আসুন। আমার শাড়ী-জামা মাত্র দুইপ্রস্থ আছে, আর একপ্রস্থ পাওয়া যাবে কি?

কেন পাওয়া যাবে না? আপনার অবশ্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই পাবেন।

তাহলে এক প্রস্থ শাড়ী-শায়া-ব্লাউজ, আর একপ্রস্থ সালোয়ার-ওড়না আমার দরকার। সালোয়ারটা বেশ মজবুত কাপড়ের হওয়া চাই।

আচ্ছা বিকালে আপনার একটা শায়া আর ব্লাউজ নিয়ে অর্ডার দিয়ে আসব। সকালে আপনি কি খাবেন?

দেখুন আমি দোকান বা হোটেলের খাবার পছন্দ করি না। যদি হিটার বা স্টোভ পাওয়া যায় তাহলে এখানে যা করে দেবেন তাই খাব। তবে আপনার কথার টানে বুঝতে পারছি আপনি পূর্ববঙ্গের মেয়ে। লঙ্কাটা কিন্তু আমি কম খাই। পিঁয়াজ রসুনও বড় একটা খাইনে।

আচ্ছা তাহলে আগে আমি স্টোভের খোঁজ করে আসি।

নীরোদা চলে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে স্টোভ ও এক প্রস্থ প্রয়োজনীয় বাসনপত্র নিয়ে এল।

বাসনপত্র দেখে শিউলী জিজ্ঞাসা করল—দিদি, আপনি কি এখানে খাবেন না?

আমার বাসা এই নিকটেই।

তাতে কি? আপনি আমার জন্য রাঁধবেন বাড়বেন আর খাবেন না! হাঁ, যদি আপনি মনে করেন আমি মুসলমানের মেয়ে তবে সে অন্য কথা!

দিদিমণি, আমাদের কি আর জাতজন্ম আছে? পাকিস্তান হয়ে সব গিয়েছে। আমি চাষীঘরের মেয়ে, আজ আমার কপালে এই ঝি-গিরি জুটেছে।

নীরোদার চোখ ছল ছল করে উঠল। শিউলী ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে নীরোদার হাত ধরে বলল—দিদি, আমাকে ক্ষমা করুন। অজান্তে আমি আপনার অন্তরে আঘাত দিয়েছি।

না দিদিমণি, আপনি আমাকে কোনো আঘাতই করেন নি। কারণ আঘাত করার মতো কোনো জায়গাই যে আর আমাদের নেই। ধর্ম নেই, মানসম্মান নেই; আছে শুধুমাত্র একটি পরিচয়—আমরা পাকিস্তানের নিম্নশ্রেণীর রিফিউজি, শিয়াল কুত্তার সামিল।

দিদি, আপনি শান্ত হন, আমি খুব দুঃখ পাচ্ছি।

আপনি দুঃখ পাচ্ছেন কেন?

আমি মুসলমানের মেয়ে। আমি যখনই ভাবি বা চোখের ওপরে দেখি, এই মুসলমান সমাজের নেতারাই লড়কে লেঙ্গে করে কোটি কোটি নিরীহ নরনারীর সর্বনাশ ঘটিয়েছেন তখন ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি।

দিদিমণি, আমাদের বড় হুজুরও এই কথাই বলেন।

তিনি কি মুসলমান?

হাঁ। এখন এসব কথা থাক। আমি আপনার এখানেই খাব। আজ কি কি খাবার করতে হবে, তার একটা ফর্দ করে দিন। এখন সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটার মধ্যে আপনার চা-এর যোগাড় করব।

শিউলী ফর্দ লিখে দিল। নীরোদা ফর্দ নিয়ে একঘণ্টার মধ্যেই সব জিনিস নিয়ে এল।

দিদিমণি, আজ আপনার সকালের চা খাবার করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কি করব বলুন, আপনি তো দোকানের চা খাবার কিছু খাবেন না।

ভালো দোকানের দৈ, মিষ্টি, পাঁউরুটি কেক—এসমস্ত খাই।

আচ্ছা, তাহলে এরপর থেকে ও সবও এনে দেব।

নীরোদা লুচি তরকারি ও চা করে দিয়ে ঘরের বাইরে করিডোরে রান্নার যোগাড় করতে লাগল। শিউলী ঘরের মধ্যে বিছানায় বসে জানালা দিয়ে দূরে আকাশের পানে চেয়ে আছে। এমন সময় দুটো চড়াই পাখি এসে জানালায় বসে আরম্ভ করল কিচির মিচির। তাদের দেখে সেই প্রভাতে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া স্মৃতি আবার এসে শিউলীর মন জুড়ে বসল।

তখন শিউলীর বয়স তের চোদ্দ। সবে মাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছে ভেওয়া ফকিরের দরগার সম্মুখে সেই খোদার হুকুমে মালা বদল করে সাদী করার তাৎপর্য কি।

দুপুর বেলা শিউলী তার পড়ার ঘরে বসে আছে। চড়াইপাখির বাচ্চাটা উড়ে এসে পড়ল তার কোলের ওপরে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে শিউলী ঢেকে ফেলল বাচ্চাটা। ও: তারপর চড়াই দুটোর কি ছটফটানি আর ডাকাডাকি!

আঁচল খুলতেই বাচ্চাটা উড়ে গিয়ে বসল মেঝেয়। সেখান হতে কিছুতেই ছাদের কড়িকাঠের ফাঁকে বাসায় যেতে পারলনা। দেখে শিউলীর মনে হলো, গোলা যদি থাকত তবে বাচ্চাটা বাসায় তুলে দিত। গোলা নেই, শিউলী গিয়ে বাচ্চাটা ধরে চেয়ার পেতে উঠে আলমারির মাথায় বসিয়ে দিল। সেখান থেকে সেটা উড়ে বাসায় গেল। চড়াই দু'টোর ছটফটানি থামল।

শিউলী এসে বিছানায় বসে ভাবতে লাগল,—

গোলা চলে গেছে। তার আর কোনো খোঁজ নেই। এ বাড়ীতে কেউ আর তার নাম করে না। করবে কেন? সে হিন্দু, আমি মুসলমান। খোদার এবকম মরজি কেন হল? চড়াই পাখি দু'টো কেমন একসাথে বাসা বেঁধেছে। গোলার সঙ্গে আমি তো অমন করে বাসা বাঁধতে পারবনা। হিঁদুর ছেলের সঙ্গে মুসলমানের মেয়ের তো বিয়ে হয় না।

আচ্ছা, ঐ মালাবদল না হলে কি আমি অপর কারও সঙ্গে সাদী কবুল করতে পারতাম? ককখনো না, ছিঃ।

তাহলে আমি বড় হয়ে কি করব? গোলা হয় তো এতদিনে আমার কথা ভুলে গেছে। সে খুব বড় বিদ্বান হয়ে বড় চাকরি করবে। কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে তাকে দেখে পাগল হবে। তাদের মধ্যে বেছে পরীর মতো একটা মেয়ে বিয়ে করবে।

সেই চোদ্দ বছর বয়সে সেই গোলার পরীর মতো মেয়ে বিয়ে করার কথা

মনে উঠে মনের কি অবস্থা হয়েছিল তা স্মরণ হতেই শিউলীর খুব হাসি পেল। কি ছেলেমানুষীটাই না করেছিলাম, পাঁচ-সাতদিন সময়মতো স্নান করি নি, খাই নি। সব সময় ঐ এক চিন্তা—গোলা আমাকে ভুলে পরীর মতো মেয়ে বিয়ে করবে।

তারপর কত কথাই না ভাবতাম। কোনো সময় তার উপরে রাগ করে মনে মনে বলতাম—যাক্ গিয়ে, আমার কথা ভুলে পরীর মতো মেয়ে বিয়ে করে করুক গিয়ে। আমি তার কাছে যাবও না, কথাও বলব না।

আবার ভাবতাম—গোলা পুরুষ মানুষ। সে একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পারে, তাতে আর তার দোষ কি? তারপর সে হিন্দু আমি মুসলমান। আমাকে বউ করে তো ঘরে তুলতে পারবে না, কাজেই তাকে একটা হিঁদুর মেয়ে বিয়ে করে সংসার করতেই হবে।

আচ্ছা গোলা যদি এখনও সেই আগের মতোই আমাকে ভালবাসে, সে যদি আর বিয়ে না করে, তাহলে কি হবে? বেশ হবে, আমি বাবাকে বলব—বাবা, আপনি এখন বুড়ো হয়েছেন, সব কাজকর্ম করা আর আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। দেওয়ান চাচার ছেলেকে খুঁজে এনে তাকে সব দেখাশুনা করার ভার দিন।

বাবা হয় তো বলবেন—গোলা এখন বড় বিদ্বান হয়েছে, সে যত টাকা মাইনের চাকরি পাবে তা কি আমরা দিতে পারি?

আমি বলব—তাকে একবার ডেকে দেখুন না।

তারপর বাবা ডাকলেই সে আসবে। দেওয়ান চাচার বাসা যেখানে ছিল ওখানেই সুন্দর করে একটা বাংলো করে দেব। তখন তো আর পড়ার ঝামেলা থাকবে না, খুব ভোরে উঠে দুজনে ভৈরবের ধারে বেড়াব। দুপুর বেলা বাড়ীর পিছনের বাগানে ঐ লিচুগাছটার তলায় বসে দুজনে ভালো ভালো বই পড়ে তর্ক করব। একখানা ছোট্ট সুন্দর নৌকা করব। বিকালে রোদ পড়লে দুজনে নৌকায় বেড়াব।

আচ্ছা গোলার সাথে বেড়াতে লজ্জা করবে না?

এখন তো আর বেড়াচ্ছি নে। যখন বেড়াব তখন আমি অনেক বড় হয়ে যাব। এম. এ. পাস ক'রে আসব। নইলে গোলাই বা আমার সঙ্গে বেড়াবে কেন? বাবা বলেন—আজকাল উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরা আর কুনো ব্যাঙের ঘরের কোণে কেবল মাত্র খাওয়া, পরা আর ঘুমানো নিয়ে জীবন কাটায় না। তারাও বাইরে খোদার দান আলো বাতাসে স্বাধীন ভাবে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। আমিও বেড়াব, তাতে লজ্জা করবে কেন?

কিন্তু গোলা যদি সত্যিই আমাকে ভুলে পরীর মতো মেয়ে বিয়ে করে, তাহলে আমি কি করব? গোলার ওপরে রাগ করে তো বেশী দিন থাকতে পারব না এখন না হয় আমি ছেলেমানুষ, বাবার সঙ্গে ছাড়া কোথাও যাই নে, গোলার খোঁজও নিতে পারি নে যখন এম. এ. পাস করব, তখন তো আর আমার এ দুর্বলতা ভয় থাকবে না। তখন আমি নিজেই গোলার খোঁজ করে তাকে বের করব তখন যদি দেখি গোলা বিয়ে করেছে, তাহলে কি করব?

তাহলে আর গোলাকে আমার পরিচয় দেব না। সেও নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবে না। গোলা যেখানে বাড়ী বা বাসা করবে সেখানে তার পাশে আমি বাড়ী বা বাসা করব। তাতে যত টাকা লাগে লাগুক, গোলার পাশের বাড়ীটা আমাকে নিতেই হবে তারপর গোলার বউ-এর সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুত্ব করব। কিন্তু আমার সত্যিকারের পরিচয় দেব না ওদের যে সব ছেলে মেয়ে হবে আমি তাদের আদর করে মানুষ করব—লেখাপড়া শেখাবো। গোলা হয় তো মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করবে—আপনি, আমাদের জন্য এত করেন কেন? আমি বলব—এটা আমার খেয়াল।

তারপর যখন বুড়ী হব তখন একদিন নির্জনে গোলাকে ডেকে এনে বলব—গোলা, তুই আমাকে চিনতে পারিস? আমার কথায় গোলা চমকে উঠবে। আমি তখন বলব—আমি তোর সেই শিলী। তুই ভুলে গেছিস কিন্তু আমি ভুলি নি।

আমার কথায় হয় তো কেঁদে ফেলবে। আমি হাসিমুখে আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে বলব—গোলা, কাঁদিস নে। তোদের ধর্মে তো জন্মান্তর মানে। এজন্মে আমি তোকে পেলাম না, আসছে জন্মে পাবোই।

দিদিমনি, ভাত কি টেবিলের ওপরে দেব?

নীরোদার রান্না হয়েছে।

জুলেখার জানাজায় ওমর সাহেব যোগ দিলেন না, তাঁকে কেউ ডাকেও নি। ইব্রাহিমের তাড়া খেয়ে ওমর সাহেব ও রহমত বাড়ী থেকে বেরিয়ে দোকানে এসে বসলেন। দোকানে এসে রহমত গেল তাহের মিঞাকে সংবাদ দিতে।

দুপুরের পর এলেন তাহের মিঞা। দোকানের ঘরে বসল পরামর্শ বৈঠক।

নছির সাহেব তাহের মিঞাকে জিজ্ঞাসা করলেন—উকিল কি বলল?

উকিল বলছে কোনো রকমে কাবিল-নামাটায় স্বাক্ষর নিতে পারলে আর ভয় নেই, পুলিশে কিছু করতে পারবে না।

তাহলে কালই কাবিল নামায় সই করিয়ে নাও।

আমি সিরাজ সাহেবকে তাই বলেছিলাম, তাতে তিনি বললেন রবিবারের আগে তাঁদের মোল্লা, উকিল, রেজিস্ট্রার—এসব পাওয়া যাবে না।

তাহলে তো অনেক দেরী হয়ে গেল। আজ মঙ্গলবার এখনও পাঁচদিন বাকি!

পাঁচদিন পরেই হোক আর দশদিন পরেই হোক, কিন্তু ওকে দিয়ে কাবিল নামায় সই করাবে কি করে? কাল রাত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তাহেরকে কবুল করবে না।—বললেন ওমর সাহেব।

কবুল আবার করবে না! ঝুঁটি ধরে শক্ত রকম ঘা কতক লাগালে বাপ্ বাপ্ ডাক ছেড়ে কবুল করবে।

এ সেরকম মেয়ে নয়, নছির। একে কাবু করা অত সহজ হবে না।

আরে কত মেয়ে দেখলাম। প্রথম খানিকটে গুড়ামোড়া ক'রে, তারপর শক্ত মরদের গুঁতোয় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কাল আমি তোমাদের সঙ্গে যাই নি বলে অত গোস্তাকি দেখিয়েছে। আমি গেলে কালই তাহের মিঞাকে দিয়ে ওকে এমন শায়েস্তা করে আসতাম যে, আজ বিছানায় পড়ে কোঁকাত।

তাহের মিঞা বললেন,—তা না হয় করা যাবে, কিন্তু সাদীর পর যদি অরাজি হয়ে মামলা বাধায় তখন কি হবে? এটা যে হিন্দুস্তান।

আরে মিঞা, কাবিলনামায় সইটা প্রথম আদায় কর তো। তারপর তোমার বাগমারীর বাড়ীতে নিয়ে কড়া নজরবন্দী করে রাখবে। সেখানে একটু বেতর দেখলেই বেঁধে আচ্ছা করে চাবুক কষবে। তারপর একটা বাচ্চা পয়দা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখনি হিঁদুর মেয়েগুলো কি করে?

কিন্তু আমি তো মাঝে মাঝে ঢাকায় গিয়ে দু'এক মাস থাকি সে সময় যদি এখানে গোলমাল বাধায় তবে কে সামলাবে?

ঢাকায় যখন যাবে, তখন সঙ্গে নিয়ে যেও।

পথে বেরিয়ে যদি গোলমাল করে?

বাঃ রে, এও তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে! পিছমোড়া করে হাত বেঁধে আর মুখ বেঁধে মোটা কালো কাপড়ের বোরখা পরিয়ে নিয়ে যাবে। মেয়ে লোপাট করে এই ভাবেই তো চালান করা হয়।

আমার টাকা আর বাড়ীখানার দলিল কিন্তু সাদীর পরদিন সোমবারেই দিতে হবে।—বললেন ওমর সাহেব।

তা কি করে দেব? সাদী হয়ে গেলে রোশোনারার কাছ থেকে আমার

ওমর সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন, দরদর করে ঘাম ছুটল। উঠে কাঠের আলমারি খুলে একটা বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে খেতে আরম্ভ করলেন।

গ্লাসের অর্ধেকটা ফুরোলে ওমর সাহেব আবার উঠে গেলেন লোহার আলমারির কাছে। আলমারি খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। কোনোরকমে আলমারি খুলে নোটগুলো বের করে একখানা ছোট টেবিলক্লথে জড়িয়ে পরনের লুঙ্গির নীচে কোমরে বাঁধলেন। লুঙ্গির উপরে জড়িয়ে বাঁধলেন একখানা তোয়ালে। তারপর আবার গিয়ে বসলেন বিছানায়।

ফরসির নলটা একটু নাড়াচাড়া করে গ্লাসে যেটুক ছিল তা শেষ করলেন। একটু বসে থেকে উঠে টেবিলের দেরাজ খুলে বের করলেন চরস দেওয়া বর্মী-চুরুট। চুরুট ধরিয়ে বিছানায় বসে দু'চার টান দিতেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

অ্যাঁ, কাল রাতে ঠিক এই সময় জুলেখা এ ঘরে এসেছিল। ঐ তো ঐ টেবিলের ধারে ঐখানে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে কোথায়? কবরের নীচে শুয়ে আছে?

মানুষ মরে ভূত-পেত্নী হয়। আত্মহত্যা করলে পেত্নী হয়ে সেই বাড়ীতেই থাকে।

ওমর সাহেবের গা'য় আবার ঘাম দেখা দিল। বাইরে একটা শব্দ হল।

ও কিসের শব্দ? এই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল না? হাঁ তাই তো এই দরজায় ধাক্কার শব্দ।—

ও কি! দরজা যে খুলে ফাঁক হচ্ছে!! ও কার শাড়ী দেখা যাচ্ছে? ও যে জুলেখার শাড়ী!! ঐ যে দরজার ফাঁক দিয়ে একখানা আলতাপরা পা ঘরে ঢুকল!! হিঁদু মেয়েদের মতো আলতা পরতে জুলেখা ভালবাসত। ও যে জুলেখার পা!! জুলেখা পেত্নী হয়ে ধীরে ধীরে ঘরে আসছে যে!!

ওমর সাহেব ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

ঐ যে জুলেখার চোখ দেখা যায়! চোখে আগুন! দরজা আরও ফাঁক হল! জুলেখার মুখ দেখা যায়!! জুলেখা হাসছে! ভয়ঙ্কর হাসি। রহমত, রহমত—।

ওমর সাহেবের গলায় আওয়াজ হল না।

জুলেখা-পেত্নী এসে দাঁড়াল ওমর সাহেবের সম্মুখে টেবিলের কাছে।

জুলেখা-পেত্নীর মুখে হাসি আর নেই, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করছে—

তুমি সুলতানপুরের জমিদার হিদায়েতুল্লা খানচৌধুরীর নাতনী শিউলীকে তাহের গুণ্ডার কাছে বিক্রী করেছ?

উঃ কী ভয়ানক গলার আওয়াজ! কি ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি!

ওমর সাহেব চোখ ফিরালেন। সেদিকেও জুলেখা। চোখ বুজলেন।

ধমক দিয়ে পেত্নী বলছে—

চোখ বুজলে কেন? খোল চোখ, তাকাও আমার দিকে। সুলতানপুরের জমিদারের মেয়ে জুলেখা আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করে তোমার নতুন বিবি ঘরে আনার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, নাঃ? হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ,—।

হাসতে হাসতে জুলেখা যেন ফেটে পড়ছে। উঃ কি ভয়ঙ্কর হাসি!

হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ—। এখন একটা কুড়ি-বাইশ বছুরে বিবি। হিঃ হিঃ—। এক বছর পরে সতরো বছুরে ছুকরী বিবি। হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ—। কি মজা। হিঃ হিঃ—। কি মজা। দু'চার বছর একটা রেখে তালাক। কি মজা। হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ—। সুলতানপুরের জমিদারের মেয়ে সাদী করে তালাক দেওয়া যায় না। এখন কি মজা, হাঃ হাঃ,—। জুলেখা বুড়ী হয়ে গেছে মরে বাঁচিয়েছে। এখন ছুকরী বিবি ঘরে আসবে। কি মজা। হিঃ হিঃ—। চোখ বুজে থাকলে কেন? তাকাও। নইলে আমি চোখের পাতা টেনে খুলে দেব। খোলো চোখ।

ভয়ে ওমর সাহেবের কাঁপুনি থেমে গেছে। চোখ খুললেন। জুলেখার হাসি থামল।

তোমার কেনা আফিং চুরি করে নিয়ে খেয়ে মরেছি, তাতে তোমার খুব ফুর্তি, কেমন না? তালাক দিলে দেনমোহর দিয়ে দিতে হয়। আমি মরে সেটা বাঁচিয়ে দিয়েছি। খুব ফুর্তি, না? সুলতানপুরের খান চৌধুরী ঘরের মেয়েদের তালাক হয় না, দেনমোহরও নেই। সেটা তোমাকে দিতে হবে না। কিন্তু আমার বাবা আমাকে যা দিয়েছিলেন, আমার ভাই যা দিয়েছে তাই আমাকে ফিরিয়ে দাও।

'ও কি, জুলেখার হাত যে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার কোমরের টাকা খুলে নেবে না কি?'

'দাও আমার টাকা। অনেক টাকা খেয়েছ। জাফর ভাইয়ের কাছে আদায় করেছ বিশ হাজার টাকা। সেই বিশ হাজার এখন চাই। তোমার লুঙ্গির তলে বিশ হাজার আছে। খোলো ও টাকা।'

ওমর সাহেব দুই হাত দিয়ে কোমরে বাঁধা নোট চেপে ধরলেন।

'ঐ বাঁদীর বাচ্চার কাছে আমার শিউলীকে বিক্রয় করে বিশহাজার আগাম নিয়েছ। ও বাঁদীর বাচ্চা চামাড় শিউলীর পায়ের জুতোও ছুঁতে

পারবে না। তোমরাও আর কিছু পাবে না। ও বিশ হাজার আমি এখুনি নেব। পরে আরও চাই। না দিতে পারলে তোমার পিঠের চামড়া খুলে নিয়ে জুতো তৈরী করে পায়ে দেব। এখন দাও ঐ বিশহাজার। খোলো কোমরের টাকা।'

'ইয়ে আল্লা, জুলেখা পেত্নী ঘাড় চেপে ধরেছে। ঘাড় ধরে চাপ দিচ্ছে। পিঠের হাড় টন টন করছে। টেনে মেঝেয় নামিয়ে ফেলল। দু'পা দিয়ে কোমরের দু' পাশ চেপে ধরেছে। ঘাড়ে চাপ দিচ্ছে।'

'খোলো টাকা। এতদিন জুলেখার একটা দিকই দেখেছ। আর একটা দিক এইবার দেখ।'

ওমর সাহেব কোমর হতে টাকার বাণ্ডিল খুলে ফেলে দিয়ে জ্ঞান হারালেন।

প্রভাত হয়ে সূর্য উঠেছে। জানালার সার্সি দিয়ে রোদ এসে পড়ল ওমর সাহেবের মুখে। ওমর সাহেব জাগলেন।

জেগে উঠতে গিয়ে উঠতে পারলেন না, সারা গায়ে ব্যথা। তাকিয়ে দেখেন ঘরের মেঝেয় পড়ে আছেন। গায়ের ফতুয়া পরনের লুঙ্গি ভেজা। এমন কি করে হল ?

ওমর সাহেব শুয়ে শুয়েই চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন ভাবতেই সব মনে পড়ল। ভয়ে শিউরে উঠলেন।

চোখ মেলে বুঝলেন ঘরে রোদ এসে পড়েছে, দিন হয়েছে। যাক্ বাঁচা গেছে, দিনে ভূত-পেত্নীর উপদ্রব থাকে না।

কিন্তু আমার টাকা ?—কোমরে হাত দিয়ে দেখেন টাকা নেই। জোর করে উঠে বসলেন। দেখেন কিছু দূরেই টাকার বাণ্ডিল পড়ে আছে। বাণ্ডিলটার কাছে যেতে গিয়ে দেখেন কোমরে দারুণ ব্যথা কোনোরকমে এগিয়ে গিয়ে বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে বাঁধলেন।

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে পারলেন না, গড়িয়ে পড়ে গেলেন। হাতে নরম কি বাধল, শুঁকে দেখেন বিষ্ঠা।

অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গেলেন। দরজার মাঝখানে ছিটকিনি। ওমর সাহেব বসে ছিটকিনি হাতে পেলেন না। রহমত, ও রহমত, রহমত—। নাঃ, গলার আওয়াজ বসে গেছে। যে মিহি শব্দ বের হয়, তাতে বন্ধ দরজার বাইরের কেউ শুনতে পাবে না।

অনেক চেষ্টায় একটু উঁচু হয়ে ওমর সাহেব ছিটকিনি সরিয়ে দরজা খুলে সেখানে বসেই হাঁফাতে লাগলেন।

রহমত ছিল বাবুর্চিখানায়, দরজা খোলার শব্দ পেয়ে এসে ওমর সাহেবকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখ বড়ো বড়ো আর মুখ হাঁ হয়ে পড়ল।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? এক বালতি পানি আন। রাত্রে আমার ভয়ানক জ্বর আর পেটের অসুখ হয়েছে। গা-হাত-পা'য় ভয়ানক ব্যথা, উঠে চলতে পারছিনে। এখানেই এক বালতি পানি আন।

ওমর সাহেবের কথায় রহমতের চমক ভাঙ্গল। সে পানি না এনে নিয়ে এল একখানা বড়ো আয়না। আয়নাখানা বসিয়ে দিল ওমর সাহেবের সম্মুখে।

ওমর সাহেব আয়নার মধ্যে দেখলেন সে আশী-নব্বই বছরের খুনখুনে বুড়ো, মাথার সব চুল সাদা, চোখের ভুরু পেকে ঝুলে পড়েছে, চোখের মণি ঘোলা ধরে গর্তে বসে গেছে।

প্রথমে ওমর সাহেব চমকে উঠলেন, এ কে, ভূত না কি? অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।

নীচতলায় সদর দরজার বাইরে একখানা ট্যাক্সি থেমে হর্ণ দিচ্ছে। রহমত গিয়ে দরজা খুলে দিল। ইব্রাহিম আর অমিয়বাবু এসেছেন।

রহমতকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করে দু'জনে সোজা উঠে এলেন দোতলায়। সম্মুখেই পড়ে গেলেন ওমর সাহেব। দুজনেই বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। কে এই অপরিচিত বুড়ো! এ এখানে এল কোথা থেকে? এর সারাগায়ে যে বিষ্ঠামাখা!

ওমর সাহেব ইব্রাহিম ও অমিয়বাবুকে দেখে প্রথম একটু বেকুব হয়ে পড়েছিলেন। একটু সামলিয়ে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।—

ব্যারিস্টার সাহেব, জুলেখা মরে পেত্নী হয়েছে। সারা রাত আমার সঙ্গে লড়াই করে এই দেখুন আমার কি দশা করেছে। আমাকে বাঁচান ব্যারিস্টার সাহেব, আমাকে বাঁচান। এখানে আমি একা থাকলেই জুলেখা আবার এসে আমাকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। ব্যারিস্টার সাহেব, দয়া করে আমাকে ধরে তুলে আমার দোকানে পৌছে দিন। আমার সারা গায় ব্যথা, বোধহয় হাড় ভেঙ্গে গেছে। নড়তে পারছিনে ব্যারিস্টার সাহেব, আমি নড়তে পারছি নে।

অবাক হয়ে শুনলেন অমিয়বাবু আর ইব্রাহিম ওমর সাহেবের অদ্ভুত কথা। আর চাক্ষুষ দেখলেন তাঁর অভূতপূর্ব দুর্দশা। দুজনের একজনের মুখেও সহজে কথা বেরুল না।

হঠাৎ পিছনে হুড়মুড় শব্দ। জুলেখা মরে পেত্নী হয়ে ওমর সাহেবের সঙ্গে

লড়াই করেছে শুনে ভয়ে রহমত এক পা এক পা করে পিছু হঠছিল। বারান্দায় ছিল একটা বালতি। বালতিতে লুঙ্গি জড়িয়ে গিয়ে পড়ল বারন্দার রেলিং-এর উপরে। রেলিংটা ছিল ভাঙ্গা। ভাঙ্গা রেলিং রহমতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সব শুদ্ধ গিয়ে পড়ল নীচতলার উঠানে!

একটা লোহা রহমতের উরুতে বিঁধে গেছে। সেটা খুলে উঠতে গিয়ে দেখে আর একটা পা ভেঙ্গেছে। রহমত ভাঙ্গা পা নিয়েই নেংচাতে নেংচাতে পালিয়ে গেল।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এক সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারে না, লক্ষ্যও করে না। যখন যেটি তার মনে জাগে তখন সেইটি নিয়েই সে মেতে থাকে। অনেক সময় এরা যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে তার একটি মাত্র দিকই দেখে, তার যে আরও দিক থাকতে পারে তা তারা ভেবেও দেখে না। বাজারে যদি আলু, পটোল, বেগুন, কিনতে যায়, তবে যখন আলু কেনার কথা মনে জাগে, তখন কোথায় আলু আছে, সে আলু কেমন, দাম কত, এই সবই খোঁজ করে। আলুর পাশে পটোল বেগুন থাকলেও সেগুলো সে তার আলু কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করতে পারে না। বিজ্ঞেরা এদেরই বলে থাকেন অদূরদর্শী, অসতর্ক, খেয়ালী, একগুঁয়ে। বিজ্ঞদের এই মন্তব্য যদি ঠিক হয় আর ওটা যদি দোষের হয়, তবে 'মনোযোগ' কথাটার অর্থ কি হবে?

নমিতা কিন্তু এই অদূরদর্শী একগুঁয়ে শ্রেণীর মেয়ে। জাফর সাহেবের মৃত্যুর পর সে একদিন অপর্ণা দেবীর সঙ্গে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়ে শিউলীর সাথে দেখা করে এসেছিল। সে দেখা সাক্ষাত মামুলী ধরণের। তারপর আর যায় নি। শিউলীও বালীগঞ্জে আসে নি। তারপর যখন শুনল শিউলী কলুটোলার বাড়ী ছেড়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে স্থায়ী বাসের জন্য আসছে, তখন সে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েছিল। রবিবারে শিউলীর সব জিনিসপত্রের সঙ্গে সেতার, গীটার, রেডিও, গ্রামোফোন, হারমনিয়ম, আসতে দেখে নমিতা বিস্মিত হল। শিউলীর ঘরে এগুলো তো ছিল না! এগুলো সবই তো পুরনো! শিউলী এসব পেল কোথায়?

নমিতা করিমকে জিজ্ঞাসা করে শুনল—ওসব দেওয়ানজীর ছেলে গোলাপের। গোলাপ শিউলীর সাথে ঝগড়া করে তার সমস্ত জিনিস পত্রবিক্রী করে নিরুদ্দেশ হয়েছে। শিউলী সংবাদ পেয়ে নিলামদারের হাত থেকে সব

কিনে নিয়েছে। গোলাপই যে অজিত রায় একথা কিন্তু করিম নমিতাকে ভেঙ্গে বলল না।

করিমের মুখে নমিতা যা শুনল, তাতে তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। জাফর সাহেবের মৃত্যুর সপ্তাহ দুই আগে থেকে এই প্রায় দেড়মাস হতে চলল শিউলীর সঙ্গে নমিতার কোনো ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ হয় নি। তার আগে নিশ্চয়ই গোলাপের সঙ্গে শিউলীর দেখা সাক্ষাত হয় নি। এমনকি গত বারো বছরের মধ্যে শিউলী জানতে পারে নি, তার গোলাপ কোথায় আছে, কি করছে। অথচ এই দেড় মাসের মধ্যে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ ঝগড়াঝাটি, মান-অভিমান, সব বিক্রী করে নিরুদ্দেশ, নিলামের মাল খরিদ,—এত কাণ্ড ঘটে গেছে! অথচ শিউলী নমিতাকে কিছুই জানাল না! জানালে তো নমিতা অতি সহজে ওদের দুজনের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি ঘটেছে, তা মিটিয়ে দিতে পারত। আসুক আগে শিউলী, এসে এবার নমিতার বচনমাধুরী কেমন তা বুঝবে।

রবিবার সারাদিন আর সোমবারে বেলা চারটা পর্যন্ত নমিতা মনে মনে চিন্তা করেছে শিউলী এলে তার সঙ্গে কেমন করে ঝগড়া করবে। সোমবারে বেলা চারটায় চা-এর টেবিলে বসে যখন অমিয়বাবু জানালেন রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় কলুটোলা বাড়ি হতে শিউলী অপহৃতা হয়েছে, তখন নমিতা কেঁদে ফেলল।

তারপর হতে অমিয়বাবু বাইরে থেকে ঘুরে এলেই নমিতা শিউলীর কথা জিজ্ঞাসা করে। অমিয়বাবু পুলিস অফিসারের মুখে যা শুনতে পান তাই বলেন।

বুধবার রাত্রে খেতে বসে অপর্ণাদেবী অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

শিউলীকে এভাবে অপহরণ করার উদ্দেশ্য কি?

প্রধান উদ্দেশ্য শিউলীর সম্পত্তি হস্তগত করা, তবে এর সাথে বোধহয় কিছু ধর্মীয় উদ্দেশ্যও আছে।

সে কি রকম?

অমিয়বাবু শিউলী ও গোলাপের কাহিনী যা জাফর সাহেবের মুখে শুনেছেন তাই বললেন। কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে গোলাপই যে অজিত রায় এমন কি অজিত রায়ের নামটাও উল্লেখ করলেন না। কাহিনীর শেষে বললেন,—আমার মনে হয় শিউলী ও গোলাপের ভালবাসা এবং তাদের দুজনের মিলনে জাফর সাহেবের সম্মতির কথা, বাইরের কারও কানে উঠেছে। তারই ফলে মেয়েটাকে অপহরণ করে কোন মুসলমানকে বিয়ে করার জন্য মেয়েটার ওপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

অমিয়বাবু যা বললেন, নমিতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে ভাবতে লাগল চারবছর শিউলী কলকাতা এসেছে, এই চারবছরই গোলাপ কলকাতায় ছিল। অথচ দু'জনে দেখা সাক্ষাত হল না কেন! এ রহস্য ভেদ করতে হবে।

নমিতা তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে গেল।

খাওয়া শেষ হলে টেবিল পরিষ্কার করতে করতে অপর্ণাদেবী অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—জাফর সাহেব এযাবৎ গোলাপের সব খরচ চালাচ্ছেন। গোলাপ ছ'বছর কলকাতায় আছে। অথচ আমরা একদিনও তাকে দেখলাম না! এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

দেখেছি আমরা, কিন্তু চিনতে পারি নি। জাফর সাহেব মৃত্যুর দু'দিন পূর্বপর্যন্ত ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন করে রেখেছিলেন। অজিতকে যে, তিনি খরচ দিয়ে পড়াচ্ছেন এ আমিও জানতাম না।

অজিত কে?—অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অপর্ণাদেবী।

নমিতার সঙ্গে থিয়েটারে নামে যে অজিত রায়, সেই গোলাপ।

অপর্ণাদেবীর হাতে ছিল ক'খানা প্লেট। প্লেট ক'খানা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। মুখ থেকে একটা হাহাকারের মতো বেরিয়ে এল—অজিত রায় গোলাপ?!!

হাঁ ঘাবড়িও না। খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে। জাফর সাহেব তাঁর একমাত্র মেয়ে রোশোনারার সমস্ত দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। আমাদের যেন কোনো স্বার্থের মোহে সে দায়িত্ব সম্পাদনে কুণ্ঠিত না হই।

অপর্ণাদেবী চোখের জল মুছে বললেন,—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি নমিতাকে কতটা বুঝেছ তা জানি নে, আমি ওকে চিনি। আমার একটি মাত্র মেয়ে নমিতার আর বিয়ে হবে না। একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করা আমিও যেমন ঘৃণা করি, আমার মেয়ে নমিতাও তেমনি করে।

যাই হোক ব্যাপারটা হয়েছে গোলমেলে। শিউলীও জানত না যে, অজিত রায়ই গোলাপ। জাফর সাহেব গত বারো বছরের মধ্যে শিউলীর প্রকৃত মনোভাব জানতে পারেন নি। সেজন্য তিনি দু'জনের কথা দুজনকে বলে একত্রিত করতে সাহস পান নি। সব কথাই জানাজানি হয়েছে জাফর সাহেবের মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে। এখন তুমি আজই নমিতাকে সব বুঝিয়ে বল। আমি পুলিস অফিসারের মুখে যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় শিউলী দু'চারদিনের মধ্যেই উদ্ধার পেয়ে এখানে আসবে। এরই মধ্যে নমিতা তার মন প্রস্তুত করে নিয়ে

-যাতে আগের মতো সরলভাবে হাসিমুখে তার বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত কর।

মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় জুলেখার জানাজা শেষ হলে রাত্রে ইব্রাহিম বালীগঞ্জের বাড়ীতে আসে। বুধবার প্রাতে অমিয় বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়েছিল ঘরগুলি তালাবন্ধ করতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন ওমর সাহেবের দুরবস্থা, শুনল মা মরে পেত্নী হয়েছেন।

ওমর সাহেবের কথামতো তাঁকে দোকানে রেখে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে ইব্রাহিম অমিয়বাবুকে বললে,—কাকাবাবু, গত রাত থেকে আমার জ্বর হয়েছে। জ্বরে বোধহয় ভোগাবে।

তা আর অসম্ভব কি! এ ক'দিন যে ঝড় তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তাতে পাথুরে শরীরও ভেঙ্গে যায়।

তা ভাঙ্গে ভাঙ্গুক। আমি অসুখকে ভয় করছি তার কারণ, বিছানায় পড়ে থাকলে শিউলীর জন্য কিছু করতে পারব না।

যে ব্যাপারে পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে তাতে তুমি কি করবে?

আমি ঐ শয়তান তাহেরমিঞার সাথে মুখোমুখী হব। আমিও তাহের-মিঞার চাইতে কম নই। তিনবছর আগে আমারও দলবল ছিল। এখনও তাদের ডাকলে পাব।

খবরদার এমন কাজ কোরো না, করলে খুনোখুনী হয়ে যাবে। তাতে শিউলীকে উদ্ধার করা আরও দুঃসাধ্য হবে।

আচ্ছা, আপনার কথামতো আমি আরও সাতদিন অপেক্ষা করব, সাতদিনের মধ্যে যদি শিউলী ফিরে না আসে তবে আমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করব তাতে যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে দুজনে প্রবেশ করলেন জুলেখার ঘরে। ঘরে তখনও যেখানকার যে জিনিস সব সাজানো আছে। দেখে অমিয়বাবু বুঝলেন কত অল্প খরচে জুলেখা সংসার চালাতে চেষ্টা করতেন। একখানা বাড়তি কাপড় জামাও জুলেখার ছিল না।

ঘরের মধ্যে এসে ইব্রাহিম কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে অমিয় বাবুকে বলল,—কাকাবাবু, আপনি কি বিশ্বাস করেন আমার মা মরে পেত্নী হয়েছে?

না,—আমি বিশ্বাস করিনা। তার কারণ অতি হীন চরিত্রের মানুষই মরে প্রেতত্ব লাভ করে। তোমার মা অতি সৎ ও সরল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন, এটা আমি বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করেছি।

তবে বাপজানের ও অবস্থা কি করে হল ?

আমার মনে হয় ওটা হয়েছে অতিশয় ভয় ও তীব্র নেশার ফলে।

এটা আপনি কি করে বুঝলেন ?

কাল প্রভাতে আমরা যখন তাঁর ঘরে যাই তখন দেখেছিলাম, বিছানার কাছে টেবিলে ব্রাণ্ডির বোতল আর গ্লাস, মেঝেয় পড়েছিল চরস মিশানো বর্মীচুরুটের পোড়া অংশ। নোটের বাণ্ডিলটা বোধহয় ভয়ের চোটে কোমরে বাঁধতে নিয়েছিলেন।

তাতে মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে কেন ?

তা হয়। দুশ্চিন্তা ভয় ও নেশায় এরকম হতে পারে। পৃথিবীতে এর দৃষ্টান্ত বহু আছে। আমাদের রামায়ণে আছে গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা দেবী ভয় ও দুশ্চিন্তার ফলে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা সেই চিন্তায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এক রাত্রে অশীতি-পর বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর একটি চুলও কাঁচা ছিল না।

আচ্ছা কাকাবাবু, আপনাদের গয়ায় নাকি পিণ্ড দিলে প্রেত উদ্ধার হয় ?

হাঁ হয়। যার ঐরকম সংস্কার আছে সে মরে যদি প্রেত হয় তবে তার জন্য পিণ্ড দিলে সে উদ্ধার হয়। যার সে সংস্কার নেই, সে উদ্ধার পায় না।

কাকাবাবু, মা'র জন্য কিছু করা যায় না ?

এই ঝামেলা মিটে গেলে এ নিয়ে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব কি করা যায়। তবে তোমার মা আত্মহত্যা করলেও প্রেতযোনি লাভ করেন নি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার।

বাপজান তবে কি দেখে অত ভয় পেলেন ?

যদি সত্যই কিছু দেখে থাকেন তবে বুঝতে হবে ওটা তাঁর নিজস্ব তীব্র কল্পনা, যাকে ইংরেজীতে Hallucination বলে।

শুনেছি বাবা প্রথম জীবনে বেশ ভালই ছিলেন, ঐ হেকিম নছির সাহেব তাঁর দোস্ত সেজে সর্বনাশ করেছে। এই শিউলীর ব্যাপারেও ঐ নছির সাহেবই বোধহয় পরামর্শদাতা।

তুমি ঠিকই বুঝেছ। তোমার বাবা খানদানি ঘরের ছেলে। এত বড় নীচতা তাঁর স্বভাবগত নয়। এটা হয়েছে সঙ্গদোষে।

শিউলী ফিরে এলে আমি একবার নছির সাহেবকে দেখে নেব। আমি ওর অনেক খবর জানি ওটা পাকিস্তানী গুপ্তচর, এখানে বসে দল পাকিয়ে আমাদের দেশের সর্বনাশের চেষ্টায় আছে।

অথচ এই নছির সাহেব তাহের মিঞা এই রাষ্ট্রেরই নাগরিক।

হাঁ, এরাই এককালে লড়কে লেঙ্গে করে পাকিস্তান করেছে। এখন পাকিস্তানে না গিয়ে এখানে বসে আর কি সর্বনাশ করা যায় তার চেষ্টায় আছে।

এর ফল বড় ভয়ানক। এদের কার্যকলাপের ফলে যদি এই রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের ধারণা জন্মায় মুসলমান মাত্রেই ভারতের শত্রু তবে সর্বনাশ হবে। এখন থেকেই এদের সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

করিম হাসপাতালে, ইব্রাহিমকে নিয়ে গিয়েছে সোফিয়া, শিউলীর ফ্ল্যাটে আছে একমাত্র করিমের মা।

নমিতা খেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি এল করিমের মার কাছে।

মাসী, শিউলী আর গোলাপবাবুর বই, খাতা, এগুলো সব কোথায় আছে?

সেগুলো তো মা, গাঁটবন্দী হয়ে পড়ে আছে, এখনও খোলা হয় নি।

আর কোথাও কিছু আছে?

ঐ বেতের বাক্‌সটায় কি যেন কতকগুলো আছে, দেখতে পার।

বেতের বাক্‌সটার উপরে ছিল গীটারের বাক্‌স। সেটা নামাতে যেয়ে নমিতা চমকে উঠল, এ যেন তার চেনা বাক্‌স! বাক্‌স খুলে গীটারটা বের করে দেখেই চিনল—অজিত রায়ের গীটার। নমিতা ঘেমে উঠল।

গীটারটা রেখে খুলল বেতের বাক্‌স। উপরেই একখানা ফটো এলবাম। এলবামে নানারকমের অজিত রায়ের ফটো। ঘরের আলো চোখের উপরে আঁধার হয়ে উঠল।

এলবাম হাতে করে কাঁপতে কাঁপতে নমিতা গেল করিমের মার কাছে।

দেখ তো মাসী, এ ফটো কার?

ভাল চিনতে পারছি নে। গোলাপকে তো বহুদিন দেখি নি, এই সেদিন এক ঝলক মাত্র দেখেছিলাম। ফটো দেখে তো মনে হয় গোলাপের।

আচ্ছা মাসী, গোলাপবাবুর কি আর কোনো নাম আছে?

আছে। গোলাপ ডাক নাম, ভাল নাম অজিত।

যে একটু আলো ছিল, এবার সেটুকুও নিভল। নমিতা আশা করেছিল

মাসী হয়তো বলবে—ওটা বোধহয় গোলাপের কোন বন্ধুর ফটো। জলে ডোবা মানুষ খড়-কুটো ধরেও বাঁচতে চায়।

এলবাম হাতে করে নমিতা কোনোরকমে গেল তার ঘরে। বিছানায় শুয়ে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ল।

অপর্ণাদেবী নমিতার ঘরে এসে অবস্থা দেখেই বুঝলেন অজিত রায়ই যে গোলাপ তা নমিতা জানতে পেরেছে।

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে নমিতা কাঁদছিল। অপর্ণাদেবী পিঠের কাছে বসতেই ফিরে মায়ের চোখে জল দেখে গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকোল।

মা-এর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করে। মেয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে মা-এর বুকে মাথা রেখে। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই, বলারও কিছু নেই। মেয়ের জন্য মায়ের চোখের জলই ভগবানের আশীর্বাদ।

সে আশীর্বাদ কার্যকর হল। অনেকক্ষণ কেঁদে মনের ভার কিছু কমলে নমিতা স্থির হয়ে বসল অপর্ণাদেবীর সম্মুখে।

মা, তুমি আমার জন্য কেঁদ না। এ বিধাতার বিধান।

তুই কি আগে অজিতের মনোভাব কিছুই বুঝতে পারিস নি?

খুব বুঝেছি। আমিই কলেজের মেয়েদের মধ্যে তাঁকে নারীবিদ্বেষী বলে প্রচার করেছি।

তোর সঙ্গে কি খুব খারাপ ব্যবহার করত?

মোটেই না। খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন। কিন্তু সেই ভদ্র ব্যবহারেই আমি বুঝেছিলাম তাঁর মনে আমার কোনো স্থান নেই।

তবে তুই সাবধান হলি নে কেন?

মা, তুমি আমাকে এ কথা বলছ?

অপর্ণা দেবী থতমত খেয়ে বললেন—না মা, আমি না বুঝে হঠাৎ বলে ফেলেছি। ক'মাস আগে শিউলী আমাকে তোর অবস্থা বুঝিয়ে বলেছিল। কিন্তু আমি ভাবছি অজিত কেন তোকে বুঝিয়ে বলল না!

তিনি আমাকে কি বুঝিয়ে বলবেন? সেই প্রথম বর্ষার সন্ধ্যা ছাড়া কোনোদিন আমি তাঁর সঙ্গে একা কথা বলিনি। তিনি আমাকে কোনোদিন প্রশ্রয়ও দেন নি। এটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, মন তাঁকে ত্যাগ করতে পারে না। এদিক থেকে শিউলী ও আমার মনের মিল

আছে। আমি এখন ভাবছি শিউলী কেন এমন করল! আমাকে কেন জানাল না? জানালে তো আমি দু'জনের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তা সহজেই মীমাংসা করে দিতে পারতাম।

কি ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে?

তিনি বোধহয় মনে ভেবেছেন শিউলী তাঁর কথা ভুলে গেছে। শিউলীও ধরে নিয়েছিল তাদের মিলন অসম্ভব। শিউলীর মনের খবর চার বছর আগে যেদিন তার সঙ্গে এই বাড়ীতে প্রথম দেখা হয়েছিল, সেইদিনই পেয়েছি। তাঁর মন এক শিউলী ছাড়া আর কাউকে জানে না। মা, আমি এখন যতই তাঁর কথা চিন্তা করছি ততই আমার মনের দুঃখ দূর হয়ে আনন্দে মন ভরে উঠছে। সত্যই তিনি ভালবাসতে জানেন। তাঁর ভালবাসায় একটুও খাদ নেই। আজ আমি ঘটনাটার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম; আর হব না। এখন আমি যতই তাঁর ব্যবহার, কথা, চালচলন ভেবে দেখছি ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। এটা আমার আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, আমি এমন একজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যিনি সত্যিকারের প্রেমিক মানুষ।

রবিবারে শিউলী সন্ধ্যার মধ্যেই খাওয়ার পাট শেষ করে লেগে গেল ঘর গুছাতে। খাট আর বড় টেবিলটা বাদে ঘরের আর সব আসবাব বের করে দিয়ে টেবিলটা সরিয়ে এনে খাটের সম্মুখে এমনভাবে রাখল, যাতে তার মাঝ-খানে দাঁড়ালে পিছন ও পাশ দিয়ে কেউ তার কাছে আসতে না পারে।

ঘর গুছানো শেষ হলে শিউলী তার শাড়ী ছেড়ে পরল সালোয়ার। ওড়নাটা মাথার ওপরে না দিয়ে পেঁচিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধল।

শিউলীর প্রস্তুতি দেখে নীরোদা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,—

দিদিমণি কি সাদীর সময় লড়াই বাধাবেন?

দরকার হলে বাধাব বই কি।

তাতে কি জিততে পারবেন?

না পারলেও মরতে পারব তো। তবে মরার আগে দু'একটা ঘায়েল করেই মরব, যাতে বদমাশগুলো বুঝতে পারে মেয়েদের ওপরে জুলুম করা নিরাপদ নয়।

তা দিদিমণি আপনি পারবেন; আপনার মতো মেয়ে খুব কমই দেখা যায়।

সব মেয়েই পারে। তারা যদি একটু সাহস করে সুযোগমতো তাদের

অপহরণকারী গুণ্ডাবদমাশদের গলায় ছুরি বসাতে আরম্ভ করে, তাহলেই এসব শয়তান ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তা আর বসায় কই।•• প্রায়ই তো শুনি নারীহরণের কথা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় মেয়েদের ওপরে হামলা আর যুবতী মেয়ে অপহরণ সর্বপ্রধান ঘটনা। গত তিরিশ বছরে আমাদের পূর্ববঙ্গে দাঙ্গায় যে কত মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে তার সংখ্যা নেই। সেসব মেয়ে গেল কোথায়?

কোথায় আর যাবে? দেশেই আছে। যারা তাদের ধরে নিয়ে গেছে, তাদেরই চার বিবির এক বিবি হয়ে পিঁয়াজলঙ্কা বাঁটছে। আপনাদের হিন্দু-ঘরের মেয়েরা রাজহংসী। রাজহংসী যেমন নিরীহ জীব দেখলে ঠোকর মারতে যায়, কিন্তু শিয়ালে যখন ধরে, তখন একবার প্যাঁকও করে না। হিন্দুমেয়েরাও তেমনি হিন্দুর ঘরে থেকে নারী স্বাধীনতা নারী প্রগতি সমানাধিকার নিয়ে খুব চেল্লাচিল্লি করে, কিন্তু মুসলমানের হাতে পড়লে আর টুঁ শব্দও করে না। যদি করত তবে হিঁদুর মেয়ে ধরে নিয়ে বিবি করার সখ এতটা জমাট বাঁধতে পারত না।

আপনাদের মুসলমান ঘরের মেয়েদের বিধর্মীর হাতে অপহৃতা হতে হয় না বটে তবুও তাদের ঘরে যে স্বাধীনতা আছে এ কথা মনে করার কোনো কারণ দেখি নি।

না, তাদের কোনো স্বাধীনতাই নেই। আমার বক্তব্যও তা নয়। আমি বলতে চাই হিন্দু মেয়েরা অনেকাংশে শিক্ষিতা। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ স্বাধীন মনোবৃত্তি গড়ে ওঠার অনুকূল। ধর্মীয় আচার নিয়ম, শাস্ত্র, সাহিত্য—এসবও আত্মমর্যাদা ও নারীর ধর্ম রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ করার শিক্ষাই দেয়। তা সত্ত্বেও তারা অপহৃতা হলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করে অপহরণকারীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে কেন, তা আমি বুঝি নে।

দিদিমণি, আপনি উচ্চশিক্ষিতা আপনার কথার উত্তর দেবার যোগ্যতা আমার নেই। তথাপি আমার মনে হয় আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও মেয়েদের সতীত্ব সম্পর্কে সংস্কার এর জন্য দায়ী। অপহৃতা মেয়েরা ভাবে ফিরে গেলে স্বামীর ঘরে বা বাপের বাড়ীতে আর স্থান হবে না। সেজন্য ভাগ্যে যা ঘটেছে তাই মেনে নিতে হয়।

তাহলে আর নিজস্ব রুচি ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের পরিচয় কোথায়? আপনারা এত শিক্ষিতা ও প্রগতিবাদী হয়েও যদি বিপদে পড়ে ভাগ্যের দোহাই

দিয়ে অত্যাচারীর হাতেই নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করেন তবে, আর কিছুই আশা করার নেই। আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষা, মহাপুরুষদের বাণী, সাহিত্য, স্বাধীনতা, প্রীতি, রুচিবোধ—সব ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে হবে।

আপনি এখন কি করবেন ?

দেখতেই পাবেন কি করি।

রাত আটটা বাজল। টেবিল সম্মুখ করে খাটের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ধীর-স্থির শিউলী। তার মুখ দেখে বুঝার উপায় নেই যে, কোনো চিন্তা-ভাবনা তার মনে আছে।

মানুষ বিপদে পড়তে চায় না। কিন্তু যদি জানতে পারে অমুক সময় বিপদ আসবে, আর সেই নির্দিষ্ট সময়ে যদি বিপদ না আসে, তবে বিলম্বিত সুখের মতোই সে বিপদের জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে।

আটটার সময় সদলবলে তাহের মিঞার আসার কথা। ন'টা বাজতে চলল কারও দেখা নেই। শিউলী বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তবে কি এ আয়োজন বৃথাই যাবে ?

আয়োজন বৃথা হল না। রাত সাড়ে ন'টা বাজতে বাইরে সিঁড়ির ওপরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ এগিয়ে আসছে। শিউলী উঠে খাট ও টেবিলের ফাঁকে দাঁড়াল।

ঘরে প্রবেশ করলেন ছয়ব্যক্তি ; তাহের মিঞা, নছির সাহেব, সাদীর উকিল রেজিষ্ট্রার, সাদীর মোল্লা, আর ওমর সাহেব। কুঁজো ওমর সাহেব ছিলেন সকলের পিছনে লাঠি ভর করে।

তাহের মিঞা শিউলীকে দেখে একগাল হেসে বললেন,—এই তো দেখছি বিবিসাহেবা সাদীর জন্য সেজেগুজে একেবারে ঠিক হয়ে আছে। ওড়নাটা ওরকম কোমরে জড়িয়ে পরেছ কেন ? ওটা হিঁদুয়ানী ঢং, মাথার ওপর দিয়ে গায়ে জড়িয়ে পর।

তাহের মিঞার খোশমেজাজী কথায় শিউলী কান দিল না। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ঘরের কোণে ওমর সাহেবের দিকে। তার বিস্মিত ভাব দেখে তাহের মিঞা বললেন—

ও বুড়োকে কি চিনতে পারছ না ?

না। ও কে ?

শিউলীর প্রশ্নের উত্তর ওমর সাহেব নিজেই দিলেন,—আমি তোমার ফুফা।

আতরওয়ালা ওমর সাহেব !!

হাঁ।

এই ক'দিনের মধ্যে এ অবস্থা আপনার কি করে হল ?

তোমার ফুফু মরে পেত্নী হয়েছে। মরার পরদিন রাতে আমার ঘরে ঢুকে সারারাত লড়াই করে এ দশা করে দিয়েছে। এখনও রাতে আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

ফুফু কি করে মারা গেলেন ?

আমার আফিমের কৌটা হতে আফিম চুরি করে খেয়ে মরেছে।

এতেও আপনার আক্কেল হল না! আবার আজ এসেছেন এদের সঙ্গে ?

আমি আসতে চাই নি। হেকিম নছির সাহেব আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।

ঝুটবাত—রুখে উঠলেন নছির সাহেব,—বেইমান মিথ্যাবাদী। আমি তোমাকে ধরে এনেছি ? এসেছ তোমার নিজের গরজে, আবার বলছ—আমি তোমাকে জোর করে ধরে এনেছি। এসেছ তোমার পাওনাগণ্ডার দলিল আজ রাতেই পাকা করে নেওয়ার জন্য, আর দোষ দিচ্ছ আমার ?

সে তো তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ। তাহের আমার দামাদ, তাকে আমি অবিশ্বাস করিনে। তুমিই তো আমাকে বুঝিয়েছ এ অনেক টাকার ব্যাপারে মুখের কথা বা একখানা চোতা কাগজের ওপরে ভরসা করতে নেই।

সে পরামর্শ কি আমার লাভের জন্য দিয়েছিলাম ?

কার লাভের জন্য দিয়েছ তা সকলেই জানে।

কি সকলে জানে ?

আমার তিন-তিনখানা বাড়ী বিক্রীর টাকা, দোকানের পুঁজি, আরও কত দিকের কত টাকা জুয়া আর কসবীর মারফত হেকিম নছিরের পেটে ঢুকে হজম হয়ে গেছে—এ কথা সকলেই জানে।

হারামজাদ্ বেইমান,—হুঙ্কার ছাড়লেন নছির সাহেব।

আমি হারামজাদ্, না তুই হারামজাদ্ ? আমি বেইমান, না তুই বেইমান ? ছেলেবেলা থেকে তুই আমার সর্বনাশ করে আসছিস। তুই জুলেখাকে মেরে ফেলে আবার সাদী করতে পরামর্শ দিয়েছিস। তুই রহমতকে দিয়ে সরবতে বিষ মিশিয়ে জাফরসাহেবকে খুন করেছিস। তুই আনোয়ারা ও শিউলীকে বিক্রী করতে পরামর্শ দিয়েছিস। তুই আমাকে নেশা করা

শিখিয়েছিস। তুই টাকা খেয়ে ঘরের বউ বলে কসবী এনে দিয়েছিস। তুই—গেয়ে চললেন ওমর সাহেব।

ওদিকে নছির সাহেবকে সামলাতে তাহের মিঞা ও উকিল সাহেব গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন।

শিউলী খাট ও টেবিলের ফাঁকে মার্বেল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পলক, নাকের নিশ্বাস পড়ে কিনা সন্দেহ।

প্রাণখুলে দোস্ত নছির সাহেবের কেরামতির গুণগান করে ওমর সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মেঝেয় লাঠিভর করে বসে পড়লেন। উকিল মোল্লা ও তাহেরমিঞার চেষ্টায় নছির সাহেবও কিছু শান্ত হলেন। সাদীর আসরের প্রথম দৃশ্য শেষ হয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হল।

মোল্লা সাহেব তাহের মিঞাকে বললেন,—এখন আমরা যে কাজে এসেছি সেই কাজ ফয়সালা করা হোক।

মোল্লাসাহেবের কথামতো তাহের মিঞা উকিল মারফত কাবিলনামা শিউলীর সম্মুখে টেবিলের ওপরে রেখে বললেন,—এইখানে তোমার নাম সই কর।

শিউলী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল,—সুলতানপুরের জমিদার জাফরুল্লা খান-চৌধুরীর মেয়ে ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের বাচ্চা চামাড়ের হাতের কাবিল-নামায় সই দেয় না।

কিঃ এতবড় গোস্তাকি ?—গর্জে উঠলেন হেকিম নছির সাহেব। তাহের, হারামজাদীর ঝুঁটিধরে টেনে এনে মাজায় গোটাকতক শক্ত লাথি লাগাও। দেখি, মা—।

নছির সাহেব আর কথা শেষ করতে পারলেন না, বিদ্যুৎগতিতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল।

শিউলী বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নছির সাহেবের ঘাড়ে। নছির সাহেব চিত হয়ে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝেয়। তাঁর বুকের ওপরে ডান হাঁটু চাপ দিয়ে বাঁ হাতে টুঁটি চেপে ধরে দমাদম কয়েকটা কিল বসিয়ে শিউলী উঠে দাঁড়াল। কিল খেয়ে মুখের কয়েকটা দাঁত ভাঙলেও তখনও নছির সাহেবের জ্ঞান ছিল, উঠে বসতে চেষ্টা করতেই শিউলী তাঁর পিঠে মারল লাথি, মট্ করে একটা শব্দ হল। এবার হেকিম নছির সাহেব জমিন নিলেন, আর নড়লেন না, মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটল।

শিউলী আবার টেবিল ও খাটের ফাঁকে এসে তার জায়গায় দাঁড়াল।
সাদীর আসরের দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হল।

দ্বিতীয় দৃশ্যটির ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, তাহের মিঞা তালটা ঘটনার সময় বুঝেই উঠতে পারেন নি, সেজন্য বেতাল হয়ে পড়েছিলেন। শিউলী নছির সাহেবের মুখে ও পিঠে তাল ঠুকে আবার তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে তাহের মিঞার হুঁশ হল। মিঞা সাহেব তাঁর জেনানার তিন বিবি ও ডজন খানেক বাঁদী তালিম করা চামড়ার হাণ্টার চাবুক বের করলেন আচকানের ভিতর থেকে।

হাণ্টারের কাফ্ ডান হাতের কব্জিতে পরিয়ে নিয়ে শিউলীকে তাক করে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। চাবুক তাক করার সঙ্গে সঙ্গে শিউলী একলাফে উঠে পড়ল টেবিলের ওপরে চাবুক এসে পড়ল তার বাঁ-হাত আর কাঁধপেঁচে। সঙ্গে সঙ্গে চাবুক ধরে বাঁ-হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাহের মিঞার ওপরে। মিঞাসাহেব তাল সামলাতে পারলেন না, দু'জনে গিয়ে পড়লেন উকিলসাহেবের ঘাড়ে। ঘরের মেঝেয় চিৎপাত উকিলসাহেবের ওপরে মিঞাসাহেব, মিঞাসাহেবের বুকের ওপরে হাঁটুগেড়ে শিউলী। ঝড়ের মতো চলতে লাগল শিউলীর ডান হাতের কিল আর ঘুসি।

তাহের মিঞার ডান হাত আটক পড়েছে হাণ্টারের কাফে। বাঁ হাতে শিউলীর ডান হাতের মার ঠেকানো সম্ভব হল না। টেবিল উলটিয়ে উরুর ওপরে পড়ে থাকায় পা দু'খানার সাহায্যও পেলেন না। নিতান্ত বে-কায়দায় পড়ে মার খেতে লাগলেন।

তাহের মিঞা চাবুক বের করতেই নীরোদা বিপদসঙ্কেত ইলেকট্রিক বেলের সুইচ টিপেছিল। চারজন লোক এসে গেল। তাদের দেখে শিউলী তাহের মিঞাকে ছেড়ে দিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল তার জায়গায় খাটের পাশে।
সাদীর আসরের তৃতীয় দৃশ্য শেষ হল।

শিউলী বুকের ওপর থেকে সরে যেতেই তাহের মিঞা উঠে দাঁড়ালেন, মুখে সামনের দাঁত আর একটাও নেই। ওয়াক থুঃ করে মুখভরা রক্ত ফেলতেই তার সাথে বেরিয়ে এল গোটা দশেক ভাঙ্গা দাঁত। নাকটা কিলের চোটে হয়েছে আধপোড়া মুক্তকেশীবেগুন। নাক-মুখ দিয়ে সমানে রক্ত পড়ছে।

রেজিস্ট্রার ও মোল্লাসাহেব যে কখন কোথায় সরে পড়েছেন তা কেউ লক্ষ্য

করেন নি। ওমর সাহেবকেও দেখা গেল না। উকিলসাহেব উঠে আচকান ঝাড়তে ঝাড়তে সরে পড়তে যাচ্ছিলেন, আগন্তুকেরা তাঁকে যেতে দিলেন না।

আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তরে নীরোদা যা ঘটেছে সব বলল। উকিল সাহেব নীরোদার উক্তি সমর্থন করলেন।

সব শুনে একজন আগন্তুক শিউলীকে লক্ষ্য করে বললেন,—

আপনার হাত ও কাঁধ জখম হয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি। আমরা গিয়ে ডাক্তার ও নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেবে।

আগন্তুক চারজন তাহের মিঞা ও উকিল সাহেবকে নিয়ে চলে গেলেন। একটু পরে দুজন লোক এল স্ট্রেচার নিয়ে নছির সাহেবকে নিতে। নীরোদা তাদের সাহায্যে টেবিলখানা তুলে যথাস্থানে বসাতেই খাটের তল থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ এল,—

এই খাটখানা একটু উঁচু করে ধর, আমরা বেরোই।

তোমরা কে?—বিস্মিত শিউলী জিজ্ঞাসা করল।

আমি তোমার ফুফা ওমর সাহেব। আমার সামনে আছেন মোল্লা সাহেব। মোল্লা সাহেবের ভুঁড়ি বেঁধে গিয়েছে খাটের তলায়। সেজন্য আমিও বেরুতে পারছিনে।

সেকেলে ধরণের ছাপড় খাট, দুজনে ধরে উঁচু করতে পারল না। শিউলী তাদের সরিয়ে দিয়ে একাই খাট উঁচু করে ধরল। মোল্লা সাহেব ও ওমর সাহেব খাটের তল থেকে বেরিয়ে এলেন।

মোল্লাসাহেবের কালো আচকানের পিঠের দিকটা ঘাড়ের কাছ থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ঝুলে পড়ায় ভিতরের ময়লা সাদা জামাটা বেরিয়ে পড়েছে। তিনি সেদিকে লক্ষ্য করে পিঠের জামায় হাত বুলোতে বুলোতে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ওমর সাহেবও লাঠিভর করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন।

নছির সাহেবকে স্ট্রেচারে তুলতে নিতেই 'মলাম মলাম'—বলে চিৎকার করে উঠলেন। জ্ঞান বোধহয় তাঁর অনেক আগেই ফিরেছিল, অথবা তিনি মোটেই অজ্ঞান হন নি, আর একটা লাথি খাওয়ার ভয়ে মূর্ছার ভান করে পড়েছিলেন।

ঘরে দাঁড়িয়ে আছে একা শিউলী আর মেঝেয় পড়ে আছে রক্তমাখা গোটা পনেরো দাঁত।

সাদীর আসরের চতুর্থ দৃশ্য শেষ হয়েছে।

বড় একটা হল ঘর। ঘরখানা বহুমূল্য গালিচা, কার্পেট, আসবাবপত্র দিয়ে সেকেলে মুসলমান আমীরী কায়দায় সাজানো। ঘরের একপ্রান্তে মূল্যবান ফরাসের ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ফর্সি টানছেন পাকা সিঁদুরে আমের মতো এক বৃদ্ধ। পাশে আর একটা বড় ফরাসে বসে আছেন আরও দু'জন সর্দার। তাহেরমিঞা ও অপর সকলে হলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শিউলী নীরোদার সঙ্গে দরবারে উপস্থিত হয়েছে। সর্দার তাকে কাছে ডেকে এনে বেশ লক্ষ্য করে দেখে বিস্মিত হয়ে তাহের মিঞাকে বললেন,—

তাহের মিঞা, তুমি এতদিন বহু কুস্তি ধরে চাবুকের জোরে বশ করেছ, কিন্তু এ বাঘিনী ধরার মতো দুর্বুদ্ধি হল কেন?

হুজুর, আমি নিজ হতে ধরতে যাইনি। ওমর সাহেব আর হেকিম নাসিরুদ্দিন সাহেব আমাকে পরামর্শ দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন।

সর্দার হুকুম দিলেন,—ওমর সাহেব ও নছির সাহেবকে হাজির কর।

ওমর সাহেব কাঁপতে কাঁপতে এসে লাঠিভর করে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন। নছির সাহেবকে আনা গেল না, তাঁর এগারটা দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে, ওপরের ঠোটের চামড়া, মাংস কিছুই নেই, মাজার হাড় দু'জায়গায় ভেঙ্গে ফুলে উঠেছে, এখন জ্ঞান হয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন।

শুনে সর্দার শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন,— ক'টা লাথি মেরেছিলে?

দু'টো।

ওকে এমন সাংঘাতিক মার মারলে কেন?

ঐ নছিরটাই যত নষ্টের মূল। আজ এখানে ঐ আতরওয়ালার মুখে শুনলাম হেকিম নছির আমার বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। আমার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি।

সেজন্য হেকিম জনাব নাছিরুদ্দিন আহম্মদের এগারটা দাঁত ভেঙ্গে ঠোট-নাক উড়িয়ে দিয়ে দুই লাথিতে মাজার হাড় দু'জায়গায় ভেঙ্গে দিয়েছ! বেশ করেছ। আচ্ছা, এখন ওমর সাহেব বলুন তো, আপনি একাজ কেন করলেন? রোশোনারা তো আপনার সংসার চালিয়ে ছেলে মানুষ করে দিচ্ছিল!

হুজুর, রোশোনারা একটা কাফের ছেলে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তাই ওর ইমান রক্ষার জন্য তাহেরের হাতে দিয়েছি।

সর্দার শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই সে কাফের বিয়ে করবার মতলব করেছে কিনা।

শিউলী সেই ভৈরবের তীরে মালাবদল ও ভেওয়া ফকিরের মন্তব্য হতে আরম্ভ করে জাফরুল্লা সাহেবের মৃত্যুকালীন পত্র পর্যন্ত সব খুলে বলল।

শিউলীর কাহিনী শুনে সর্দার কোনো মন্তব্য না করে তাহের মিঞাকে বললেন,—তাহের মিঞা, তোমাকে আমরা বহুকাল হতে জানি, তুমিও আমাদের জান। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান হওয়ার পর তুমি হিন্দুস্তানে থেকে খদ্দর পরে কংগ্রেসী সেজে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মধ্যে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল তৈরী করতে চেষ্টা করছ বলে তোমার ওপরে আজ খোদার গজব নেমে এসেছে। আমরা যাদের গুম করে হেপাজতে রাখি, তাদের ওপরে কেউ অত্যাচার করলে, সেই অত্যাচারীকে কি শাস্তি পেতে হয়, তা তুমি জান। তুমি রোশোনারা চৌধুরীর ওপরে জুলুম করেছ, হাণ্টার চাবুক মেরে তাকে জখম করেছ। তোমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। কালু মিঞা, আসামী নিয়ে যাও। আগামীকাল রাত্রে ওকে কোতুলপুর পাঠিয়ে দেবে। খোদার দোয়া ভিক্ষা করার জন্য একদিন সময় দেওয়া হল।

কালু মিঞা ও আরও তিনজনে তাহের মিঞাকে ধরে নিয়ে গেল। তাহের মিঞা কেমন যেন অভিভূতের মতো নির্বাক হয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

এবার সর্দার শিউলীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?

শিউলী একটু বিস্মিত হয়ে বলল,—আপনি কি আমাকে মুক্তি দেবেন?

হাঁ, তুমি এখন যেখানে যেতে চাও সেখানেই আমার গাড়ী তোমাকে রেখে আসবে। সঙ্গে নীরোদা যাবে।

আমি বালীগঞ্জে আমার বাড়ীতে যাব। কিন্তু আজ রাতটা এখানে থেকে ভোরে যেতে চাই।

বেশ, তাই হবে। নীরোদা তোমার কাছে থাকবে।

তারপর সর্দার একটু হেসে বললেন,—তোমার আবার ভয় কি! তুমি তো একাই যে কোনো মরদকে ঘায়েল করতে পার। আমার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে তোমার দুলা কেমন মরদ তা একটু পরীক্ষা করে দেখতে। সাদীর সময় এ বুড়ো নানাকে কিন্তু দাওয়াদ দিও, তা না দিলে রাগ করব।

শিউলী লজ্জিত হয়ে হেসে সেলাম জানিয়ে নীরোদার সঙ্গে হল হতে বেরিয়ে গেল।

তাহের মিঞার সাদীর পঞ্চম বা শেষ অঙ্ক শেষ হল।

শনিবার সকাল সাতটায় অমিয়বাবু লালবাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অপর্ণাদেবী টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে চা আনতে গেছেন। নমিতা খাবার টেবিলে বসে সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বুলোচ্ছে। খোকন জানালার কাছে বসে পড়ছিল, হঠাৎ সে—ও দিদি, বড়দি এসেছে।—বলেই লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেল।

একখানা বড় ফিটন ঘোড়ার গাড়ি শিউলীকে নামিয়ে দিয়েই ফিরে গেল। শিউলী খোকনের হাত ধরে নীচতলার সিঁড়ির সম্মুখে আসতেই নমিতা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

তোর জন্য আমরা যে কি দুশ্চিন্তায় আছি, অথচ কেউ কিছু করতে পারছি নে। বাবা দু'বেলা লালবাজার পুলিশে খোঁজ করছেন।

খোঁজ করে কি হবে? যে অবস্থায় পড়েছিলাম, তাতে এক খোদা ভিন্ন আর কেউ রক্ষা করতে পারতেন বলে মনে হয় না। চল ওপরে গিয়ে বসে সব বলব। ঐ যে কাকাবাবু কাকীমা আসছেন। চলুন কাকীমা ওপরে ঘরে বসে সব বলব।

উপরে এসে চা ও খাবার খেতে খেতে শিউলী সব ঘটনা বলল। কেবল নছির সাহেব ও তাহের মিঞার দাঁত ভাঙ্গার কথা বলল না।

সব শুনে অমিয়বাবু লালবাজারে ফোন করে শিউলীর ফেরার কথা জানালেন। বড় অফিসার উত্তর দিলেন এগারোটার মধ্যে তিনি এসে শিউলীর মুখে সব শুনবেন।

শনিবার, হাইকোর্ট বন্ধ। অমিয়বাবু ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ইব্রাহিম ও সোফিয়াকে আনতে। দশটার মধ্যেই সকলে এসে গেলেন। এগারোটার কিছু পূর্বে এলেন পুলিশ অফিসার।

শিউলীর মুখে সব শুনে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,—

নছির সাহেবের আটটা দাঁত ভাঙ্গল কি করে?

শিউলী উত্তর না দিয়ে মাথা নত করল দেখে অফিসার হেসে বললেন,—

মা শিউলী তাহলে গতরাত্রে মা-রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করেছিলে। তাহের মিঞাও বোধহয় অক্ষত দেহে কোতুলপুর যেতে পারেন নি।

কোতুলপুর যাওয়া মানে কি? প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

কোতুলপুর যাত্রা মানে, ফাঁসির দড়ি গলায় পরে ঝুলে পড়া।

বলেন কি! তাহের মিঞাকে তাহলে আজ রাত্রে ওরা ফাঁসি দেবে?

হাঁ।

বাঁচানোর কি কোনো উপায় নেই? জিজ্ঞাসা করলেন অমিয়বাবু।

কোনো উপায় নেই। আমাদের জেল-হাজত হতে মাঝে মাঝে আসামি পালায়। কিন্তু ওদের হেপাজত হতে কেউ পালাতে পারে না।

আপনি চেষ্টা করে বাঁচাতে পারেন না? প্রশ্ন করল শিউলী।

না, মা। চেষ্টা করার সময় নেই। এটা সিরাজ মিঞার দল। এদের গায়ে হাত দিতে হলে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা এই অল্প সময়ে সম্ভব নয়।

তাহলে আমার বোন আনোয়ারা বিধবা হবে?—দুঃখিত কণ্ঠে বলল সোফিয়া।

এর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। তাহের মিঞা এ পর্যন্ত বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে, বহু নরহত্যা করেছে। এই গতকাল মনিরুদ্দিনের বউ মরিয়মকে খুন করেছে,—।

এ্যাঁ, মরিয়মকে খুন করেছে? আর্ত চিৎকারের মতো কথাটা বেরিয়ে এল শিউলীর মুখ হতে। উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল।

হাঁ, খুনই করেছে। গতকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার অপরাধ?

দমদম বাগান-বাড়ীতে তুমি আছ, এ সংবাদ মরিয়মই আমাকে জানায়। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খুন করা হয়েছে।

আপনি কি সঠিক সংবাদ পেয়েছেন? প্রশ্ন করলেন অমিয়বাবু।

গতকাল থেকে মরিয়মের খোঁজ নেই। এই নিখোঁজ হওয়া মানেই শেষ হওয়া।

আপনি চেষ্টা করলে কি মরিয়মকে বাঁচাতে পারতেন না? বললেন সৈয়দ সাহেব।

একমাত্র জেলহাজতে এনে রাখতে পারলে বাঁচানো যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি, মরিয়মের তিনটি বাচ্চা আছে।

মরিয়মের বাচ্চা তিনটির কি হচ্ছে? প্রশ্ন করল উৎকণ্ঠিতা শিউলী।

মরিয়মের উধাও হওয়ার সংবাদ আজ সকাল আটটায় পেয়েছি। তারপরে তোমার সংবাদ পেলাম। সেইজন্য এ পর্যন্ত ওদের কোন খোঁজ নিতে পারি নি।

ওরা থাকে কোথায়? প্রশ্ন করলেন অপর্ণাদেবী।

উল্টাডাঙ্গা রেল লাইনের পূবে একটা পুরনো দোতলা বাড়ীর ওপরতলায়।

মনিরুদ্দিন এখন কোথায় আছে? প্রশ্ন করলেন সৈয়দসাহেব।

সে জেল হাজতে আছে।

তাকে নিয়ে এখন কি করবেন? জিজ্ঞাসা করলেন অমিয়বাবু।

এও এক সমস্যা। মনিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করা হয় নি। তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন তাকে ছেড়ে দিলে তাহের মিঞার দলের দু'একটা খুন হয়ে যেতে পারে। মরিয়মের প্রতিশোধ নিতে ও পাগল হয়ে উঠবে।

তবে কি করতে চান?

ওকে মরিয়মের নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়ে কিছুদিন জেল হাজতে রেখে ঠাণ্ডা করে ছাড়তে চাই।

তাহলে ওর ছেলেমেয়ে ক'টার এতদিন কে দেখবে?

কাকাবাবু, পুলিশসাহেব যদি মত করেন তবে আমি মরিয়মের সন্তান তিনটির ভার নিতে চাই। বলল শিউলী।

তাহলে তো ভালই হয়, আমার একটা বড় সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে।

আচ্ছা, আপনি এদের জন্য এত আগ্রহশীল কেন? প্রশ্ন করলেন অপর্ণাদেবী।

দেখুন, এই মনিরুদ্দিনকে ওর ছেলেবেলা থেকে চিনি। মরিয়মকেও চিনি। ওদের দু'জনের মধ্যে যে ভালবাসা তাতে কোনো খাদ নেই। বহু বাধা-বিপত্তি দুঃখ-কষ্টের অগ্নিপরীক্ষায় ওদের ভালবাসা অটুট থেকে গেছে। যারা সত্যই ভালবাসতে পারে তারা কখনো স্বভাব-অপরাধী হয় না, নিতান্ত পাকেচক্রে অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হয়। আমাদের দেশের আইন ও সমাজ যদি এদের সুযোগ দিত, তবে এরা সৎ নাগরিক হয়ে জীবনযাপন করতে পারত।

স্বভাব-অপরাধী বলতে আপনি কাদের কথা বলতে চান? প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

স্বভাব-অপরাধীর নমুনা ঐ হেকিম নছির সাহেব, তাহের মিঞা। এরা পেটের দায়ে দুষ্কর্ম করে না, করে স্বভাব বশত।

এরা কোনোদিন আপনাদের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটেছে—এমন কি কাঠগড়ায় উঠেছে বলেও তো শুনি নি!—বলল সোফিয়া।

এইটাই তো বর্তমান যুগে আমাদের সামাজিক ও পুলিশী সমস্যা। স্বভাব-দুর্বৃত্ত বেশীর ভাগই সমাজের উপরতলায় বসে আছেন, অথবা দুর্বৃত্ততা করেই উপরতলায় উঠে যান, যেখানে আমরা হাত বাড়াতেই সাহস পাই নে।

নছির সাহেবের দাঁত ভেঙেছে এটা আপনি কখন জানতে পারলেন?—প্রশ্ন করলেন সৈয়দ সাহেব।

গত রাত্রি প্রায় দু'টোর সময় কে বা কারা নছির সাহেবকে তাঁর দাওয়াখানার সম্মুখে ফুটপাথে রেখে যায়। হেকিম সাহেবের গোঙানি শুনে পুলিশ এসে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের কাছে বলেছেন, ছাদ হতে পড়ে এ দশা হয়েছে। ডাক্তার বলেন, বেদম মারের চোটে দাঁত ও পিঠের হাড় ভেঙেছে।

বাঁচবে তো? জিজ্ঞাসা করলেন অমিয়বাবু।

ডাক্তারের অভিমত—বেঁচে যাবেন। তবে অবশিষ্ট জীবন আর ইচ্ছামতো চলতে ফিরতে পারবেন না, শুয়ে শুয়েই শয়তানী চালাতে হবে। আচ্ছা, এখন এসব কথা থাক। মা শিউলী যে প্রস্তাব করেছে সেই কথায় আসা যাক্। মা, তুমি বাচ্চা তিনটি নিয়ে কি ভাবে মানুষ করতে ইচ্ছা করছ?

এ বিষয়ে তো আমি কিছু ভেবে দেখি নি। তাদের দায়িত্ব নেব—এই স্থির করেছি।

আমার মনে হয় আট বছরের মেয়েটি তোমার কাছে রেখে পাঁচ বছরের আর দু' বছরের ছেলে দুটি কোনো অনাথ আশ্রমে রাখাই ভাল হবে।

আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। টাকা পয়সা যা লাগবে আমি দেব।

তাহলে আমি এখনই বাচ্চা ক'টার সন্ধানে যাই।

না, তা হবে না। এখন বেলা বারোটা বাজে। নিশ্চয়ই আপনার দুপুরে খাওয়া হয় নি। এখানে খেয়ে যেতে হবে।—বললেন অপর্ণাদেবী।

আপনার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার আন্তরিক স্নেহ মমতা আমার সে ক্ষমতা হরণ করেছে। কিন্তু তিনটে বাজতেই আমাকে আফিসে বসতে হবে। এর মধ্যে উল্টাডাঙ্গা হতে বাচ্চা তিনটে এনে পৌঁছে দিতে চাই।

বেশ, আপনারা খেয়ে নিন। আমাদের দু'খানা গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাব। ছেলেমেয়ে তিনটে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে আপনি সোজা অফিসে যেতে পারবেন।

আচ্ছা তাই হোক।

তাহলে আপনি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমি আর সোফিয়া এদিকে সব ঠিক করি।

খাওয়া শেষ হলে বেলা একটায় চললেন অমিয়বাবু তাঁর ট্যাক্সি নিয়ে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। অমিয়বাবুর গাড়িতে অপর্ণাদেবী ও শিউলীও গেল।

উল্টাডাঙ্গা রেল লাইনের পূবে তখন ছিল জনবিরল বাগান বাড়ী, ডোবা,

পুকুর, আর অসংখ্য নারকেল গাছ। তারই মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ির সম্মুখে দু'খানা ট্যাক্সি থামিয়ে সকলে নামলেন।

বাড়ীতে জনমানবের সাড়া নেই। নীচতলায় খোঁজ করে এক বুড়ীর দেখা পাওয়া গেল। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, দুদিনের মধ্যে মরিয়ম বাড়ী আসে নি। গতকাল উপরতলায় সারাদিন-রাত ছোট ছেলে দু'টোর কান্না শোনা গেছে। আজ সকাল হতে এ পর্যন্ত আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। দোতলার তিনটি ঘরের দুটি অব্যবহার্য। যেটি ভালো সেটির দরজা ভিতর হতে বন্ধ। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

পাশেই একটা বন্ধ জানালা। অপর্ণাদেবী সেই জানালার কাছে গিয়ে বললেন, খুকুমনি আমরা তোমার মা'র কাছ থেকে এসেছি। কোনো ভয় নেই দরজা খোলো।

এবার জানালা একটু ফাঁক হল। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দুটি ভয় কাতর সজল চোখ।

এবার শিউলী এগিয়ে গিয়ে বলল,—খুকু, তোমার ভয় নেই, আমরা তোমাদের দেখতে এসেছি, দরজা খোল।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে দরজা খুলল। অপর্ণাদেবী অমিয়বাবু ও পুলিশ সাহেবকে বাইরে রেখে শিউলীর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরখানা বেশ সাজানোগোছান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখলেই মনে হয় মুনির ও মরিয়ম বেশ সুখেই ঘরকন্না পেতেছিল।

অপর্ণাদেবী ও শিউলী ঘরে প্রবেশ করতেই মেয়েটি খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। খাটের ওপরে ছেলে দুটি চিত হয়ে শুয়ে আছে।

অপর্ণাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—খুকু, তোমার ভাই দুটি ঘুমাচ্ছে?

কথা বলছে না।

কথা বলছে না! কতক্ষণ কথা বলছে না?

ছোট ভাই রাত থেকেই আর কাঁদছে না। আদুল সকালে খেতে চেয়েছিল দিতে পারি নি, আর কথা বলে না।—বলেই মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

অপর্ণাদেবী ছুটে গিয়ে ছেলে দুটি দেখলেন, মরে নি। ঘর হতে বেরিয়ে পুলিশ অফিসারকে বললেন, যতশীঘ্র সম্ভব দু'সের গরম দুধ চাই, অবস্থা গুরুতর।

অফিসার গেলেন দুধ আনতে। অপর্ণাদেবী ঘরে ফিরে এসে ছোট ছেলেটি কোলে তুলে নিয়ে মুখে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগলেন। দেখাদেখি শিউলীও বড়ছেলেটির মুখে জল দিতে আরম্ভ করল। দেখা গেল শিশু দুটি জল খাচ্ছে।

অপর্ণাদেবী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

খুকু তোমার নাম কি ?

মমতাজ।

কি খেয়েছ ?

কাল খেয়েছিলাম।

কি খেয়েছিলে ?

সকালে পান্তাভাত।

তারপর কি খেয়েছ ?

মা আসে নি।—বলেই মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

অপর্ণাদেবী ও শিউলী চোখের জল সামলাতে পারলেন না। একটু স্থির হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—

তোমার ভাইদের কি খাইয়েছ ?

কাল পান্তাভাতের পানি খেয়েছিল।

তারপর আর কিছু খেয়েছে ?

না।

অবস্থা বুঝতে আর বাকি থাকল না, তিরিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অবোধ শিশু তিনটির পেটে কিছু পড়ে নি। এই নির্জন বাড়ীতে এরা ধীরে ধীরে অনাহার মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ছিল।

মেয়েটির ভয় কেটে গেছে। অপর্ণাদেবীর মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল,—মা কখন আসবে ?

এ প্রশ্নের সম্মুখে অপর্ণাদেবী উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর গণ্ডবেয়ে অশ্রুধারা দেখা দিল। শিউলী উত্তর দিল,—

তোমার মা এখানে আসতে পারবেন না। আমরা তোমাদের আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। সেখানে তোমার মা বাবা আসবেন।

দুধ আর পাঁউরুটি এসে গেল। মেয়েটিকে দুধ আর রুটি খেতে দিয়ে ছেলে দুটিকে অপর্ণা ও শিউলী একটু একটু করে প্রায় দেড়সের দুধ খাওয়াতেই চোখ মেলল, কিন্তু খুব দুর্বল।

ছেলে দুটি কোলে করে মেয়েটি সঙ্গে নিয়ে শিউলী ও অপর্ণাদেবী নীচে নেমে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি ছুটল কলকাতার দিকে।

আমাদের বেদান্ত বলেন, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান আনন্দময়। তিনি নিজে আনন্দ ভোগ করেন, অপর সকলকেও আনন্দভোগে প্রবৃত্ত করান। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সেজন্য মানুষও নিজে আনন্দ ভোগ করে অপরকেও আনন্দিত করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা ও ত্যাগ।

মনীন্দ্র মরিয়মকে ভালবেসেছিল, মরিয়মও মনীন্দ্রকে ভালবেসেছে। ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় তাদের ভালবাসা উত্তীর্ণও হয়েছে। কিন্তু ঘটনাচক্র ও সামাজিক পরিবেশ তাদের সংগৃহস্থ হওয়ার সুযোগ দেয়নি। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব পূরণ সৎভাবে করতে না পেরেই তারা অসৎপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। তার ফলে মরিয়মের অপমৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেল মনীন্দ্রের কাছ থেকে অকালে ছিনিয়ে। পড়ে থাকল তাদের এত সাধের গোছান সংসার।

এর জন্য দায়ী কে?

শিউলী উদ্ধার পেয়ে বালীগঞ্জের বাড়ীতে এলে প্রথম দিনটা নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকল। উল্টাডাঙ্গা যাওয়ার সময় নমিতা শিউলীর সঙ্গে যায় নি। তাছাড়া আর সব সময় কাছে কাছে থেকেছে; কিন্তু বেশী কথা বলে নি। নমিতার এই ভাবান্তর শিউলী লক্ষ্য করলেও এর হেতু ভেবে দেখার মতো অবকাশ প্রথম দিন পায় নি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে নমিতার কথা মনে পড়ল, কিন্তু সারাদিনের ঘটনাপ্রবাহ তার মনকে এমন ব্যস্ত করে রেখেছে যে সেকথা একবার উঠেই মিলিয়ে গেল।

প্রভাতে ঘুম ভেঙেই শিউলীর কানে এল সেতারের ঝঙ্কার। অপর্ণাদেবী সেতার বাজাচ্ছেন। শিউলী উঠে হাতমুখ ধুয়ে গেল অপর্ণা দেবীর ঘরে। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

কাকীমা, নমিতা কোথায়? বলতে বলতে শিউলী গিয়ে অপর্ণাদেবীর পাশে বসল।

অপর্ণাদেবী সেতার নামিয়ে রেখে বললেন,—সে বোধহয় ছাদে বসে আছে। বাচ্চা তিনটে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত করে নি তো?

না, ওরা বেশ শান্ত' ছেলেমেয়ে। মাসীর কাছে বেশ আছে। ওদের অনাথ আশ্রমে দেব না, আমার কাছে রেখেই মানুষ করব।

কিন্তু ওদের বাবা রাজি হবে তো?

তিনি এলে তখন দেখা যাবে। নমিতা কখন ছাদে গিয়েছে?

একটু ফরসা হতেই গিয়েছে।

তবে আমিও নমিতার কাছে যাই। বলে শিউলী উঠতেই অপর্ণাদেবী বললেন,—

মা, একটু বস। তোমাকে এখনই কিছু বলা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি।

শিউলী বসলে অপর্ণাদেবী ধীর সংযত কণ্ঠে বললেন,—তোমার বাবা ছিলেন আমাদের বন্ধু। তাঁর নিকটে আমরা বহু বিষয়ে ঋণী। মৃত্যুকালে তিনি তোমার ও তোমার বিষয়সম্পত্তির সমস্ত দায়িত্ব তোমার কাকাবাবুর হাতে দিয়ে গেছেন। সে দায়িত্বের প্রধান দিক অজিত রায়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া। এই দায়িত্ব পালনে যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয় তবে তাকে আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। আমাদের অসুবিধা হয়েছে এই যে, চৌধুরী সাহেব এই চার বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি, অজিতের প্রকৃত পরিচয়ও আমরা পাই নি। যখন সব জানতে পেলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত যেন একটা দারুণ ঝড় চলছে; কোনো কিছু দেখেশুনে বুঝে করার অবকাশ নেই। এখন তোমাকে নিরাপদে আমাদের কাছে পেয়েছি। এইবার অজিতকে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি কোনো চিন্তা কর না, অজিতের সন্ধান পেতে বেশী সময় লাগবে না।

কাকীমা, এখন আমি নমিতার কাছে যাই।

আচ্ছা যাও। মেয়েটার কথাবার্তা আজ কিছুদিন ধরে কেমন যেন খাপ-ছাড়া হয়ে পড়েছে, কথায় কথায় রেগে যায়। তুমি কিন্তু ওর কথায় গুরুত্ব দিয়ে রাগ কর না।

শিউলী এ কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

পূব আকাশে তখনও প্রভাতসূর্য দেখা দেয় নি, আকাশে কয়েকখানা মেঘ গায়ে রাঙা ফাগুয়া মেখে পূবদিকে এগিয়ে চলেছে নব প্রভাতের রাঙা রবিকে অভ্যর্থনা করতে।

নমিতা তার সেই গোলাপ গাছটার কাছে বসে ছিল। শিউলী আসতেই হাসিমুখে বলল,—

একটা মজা দেখ। আজ চারদিন হল এই গোলাপটা প্রথম চোখ খুলেছে। ঐ যে বেল ফুলের টবে ঝরে পড়ে আছে ফুলটা ও ছিল তখন সাদা কুঁড়ি। গোলাপ চোখ মেলেই দেখল ঐ কুঁড়িটাকে। তারপর এই চারদিন ও তাকিয়ে আছে ঐ দিকেই। বেলকুঁড়ি বড়ো হল, ফুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, একবারও গোলাপের দিকে তাকাল না, শেষে আজ প্রভাতে দেখছি ঝরে পড়েছে। লক্ষ্য করে দেখ, গোলাপ এখনও ঐ ঝরা বেল ফুলটার দিকেই ম্লান মুখে তাকিয়ে আছে, মনের দুঃখে আরও ঝুঁকে পড়েছে। ঐ দেখ গোলাপের পিছনে কত সুন্দর সুন্দর দোপাটি কত আগ্রহভরা হৃদয় নিয়ে গোলাপের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু নাঃ গোলাপ একবারও ওদের পানে চেয়ে দেখল না। আমি চেষ্টা করেছিলাম গোলাপটাকে ওদের দিকে ফিরাতে। না তাতে ও সুখী হল না। বেলফুল ওকে উপেক্ষা করলেও ও সারাজীবন ঐ বেল-ফুলের দিকে তাকিয়েই কাটাবে। অন্য কোনো ফুল ওর মনে স্থান পাবে না।

নীরবে দাঁড়িয়ে শুনছিল শিউলী নমিতার গোলাপ-বেলফুলের কাহিনী। নমিতার বলা শেষ হলে শিউলী একটু হাসিমুখে বলল,—

তুই কেন বোকার মতো ওর মুখ ফিরোতে গেলি? ওকাজ পারত ঐ বেল-ফুল নিজে। হতভাগী তা করে নি বলেই তো অকালে ঝরে গেল।

না, তা হয় না। ও জগতে ফেরাফিরি নেই। হিমালয়ের যে জলধারা দক্ষিণে নেমে এসেছে সে ধারা দক্ষিণ সমুদ্রেই যাবে; তাকে কেউ উত্তর সাগরে পাঠাতে পারে না। এখন বল তো গোলাপবাবু কেন নিখোঁজ হলেন?

এত তাড়াতাড়ি নমিতা কথাটা জিজ্ঞাসা করবে তা শিউলী আগে থেকে ভাবে নি। প্রশ্নটা যখন আচমকা এসে পড়ল তখন শিউলী উত্তর দিতে পারল না। তারপর এ প্রশ্নের যেটা সঠিক উত্তর তাও নমিতাকে দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে নীরব থাকতে হল। তাকে নীরব দেখে নমিতা আবার প্রশ্ন করল,—

প্রথম দেখায়ই দুজনে ঝগড়া করেছিলি?

ঝগড়া তো দূরের কথা, আমি একটা কথা বলার সুযোগ পাই নি।

চিঠিপত্র লেখালেখির মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েছিলি?

কোনো চিঠি লেখালিখিই হয় নি।

লোকমুখে এমন কোনো কথা তাঁকে জানিয়েছিলি যাতে তিনি মনে আঘাত পেয়েছেন?

করিম ভাইকে পাঠিয়ে তাঁকে দেখা করতে বলেছিলাম মাত্র। এ ছাড়া আর কোনো কথাই বলে পাঠাই নি।

তবে এমন হল কেন? তিনি তো তোকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না!

তাঁর ধারণা, আমি তাঁর কথা ভুলে গেছি। এখন বাবার চাপে পড়ে এ বিয়েতে রাজি হচ্ছি। তিনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই আমার ঘাড়ে চাপাতে চান না।—বলে শিউলী হেসে ফেলল।

শিউলীর হাসি দেখে নমিতা বেশ একটু রেগে বলল,—তাঁর এই মনোভাব নিয়ে তুমি হাসতে পার, কেন না তুমি বড়লোকের মেয়ে, উচ্চ শিক্ষিতা, তারপর অপুর্ব সুন্দরী। ইচ্ছামাত্রেই অজিতবাবুর চাইতে সুন্দর ধনী সম্ভ্রান্ত পাত্র তোমার জুটবে। কিন্তু যে ভালবাসা পদার্থটিকে অনুভব করেছে, সে হাসবে না। সে বলবে এটা ভালবাসার স্বাভাবিক লক্ষণ।

শিউলী নমিতার রাগ দেখে আরও একটু হেসে বলল,—যাক্ এতকাল পরে তুই আমার মনোভাব ঠিক ধরে ফেলেছিস। তোর অজিতবাবু গরিব বলে তাকে আমি বিয়ে করব না। এবার তুই তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারিস।

নিশ্চিন্ত আমি হতে পারব না; এ বিয়ে আমি দেবই।

অর্থাৎ যেহেতু তোর অজিতবাবু আমাকে ভালবাসে, সেহেতু তার সুখের জন্য এ বিয়ে তুই দিবিই। কিন্তু আমি যে গরিব স্বামী পছন্দ করিনে, তার কি হবে?

সে অসুবিধা আমি দূর করব। তুমি গরিব পছন্দ কর আর না কর, অজিত বাবু তোমাকে বিয়ে করে তোমার পোষ্য হয়ে থাকবেন, এ আমি সহ্য করব না। আমি তাঁকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টারী পড়িয়ে আনব। আমি জানি তিনি বড় ব্যারিস্টার হতে পারবেন, তাঁর যোগ্যতা আছে।

টাকা পাবি কোথায়? অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল শিউলী।

টাকার অভাব হবে না কিছুদিন ধরে ক'য়েকটা ফিলিম্ কোম্পানি আমার পেছন লেগেছে। দু'টি কোম্পানির সঙ্গে কথা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। তারা দু'খানা ছবির জন্য আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। এই টাকা দিয়ে তাঁকে বিলেত পাঠাব। তারপর তিনি পাস করে আসতে যে ক'বছর লাগবে তার মধ্যে একখানা ভাল বাড়ী তাঁর জন্য করতে পারব। আমি তাঁকে কারও পোষ্য হতে দেব না।

শিউলীর মুখের সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত হয়েছে। সে আর একটি কথাও না বলে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা নমিতার চোখে পড়ল না।

গোলাপ ও অজিত একই ব্যক্তি জানার পর এ পর্যন্ত শিউলীর জীবন নাটকের ঘটনা প্রবাহের ভয়ঙ্কর আবর্ত একটার পর একটা এত দ্রুত তালে এসে পড়েছে যে, আনুসঙ্গিক কোনো বিষয় বুঝে দেখার মতো অবকাশ সে পায়নি। গোলাপ যে তাকে ভালবাসে. আর সে ভালবাসার মধ্যে যে একটুও ফাঁক নেই, সেদিক থেকে কোনো সন্দেহের অবকাশ আর নেই। ওদিকে নমিতার সাধ্য নেই গোলার মনে কোনো ফাটল ধরায়। ধর্মের দিক থেকেও এ মিলনে কোনো বাধা নেই। এইসব কারণে শিউলী তার গোলা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকে উপস্থিত বিপদের সঙ্গে নির্ভয়ে লড়াই করে চলেছিল।

আজ নমিতার কথায় শিউলী বুঝেছে, তার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সঙ্কট এইবার দেখা দিয়েছে। যে মিলনে দুটি নর-নারীর পূর্ণতা ও সার্থকতা; সেই মিলনে যদি কোনো পক্ষে হীনতা বোধ থাকে, তবে সেখানে বলিষ্ঠ প্রেম দেখা দিতে পারে না। শিউলী নমিতার মধ্যে প্রেমের যে সর্বত্যাগী বলিষ্ঠরূপ আজ দেখতে পেয়েছে, তার সম্মুখে সে নিজেকে দুর্বল মনে করে ভেঙে পড়ল। অথচ কোনো উপায় তো নেই। শিউলী নিজে চেষ্টা করে গোলার সঙ্গে নমিতার বিয়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু গোলা যে শিউলী ছাড়া আর কাউকে জানে না, জানতে চায়ও না।

বিছানায় শুয়ে শিউলী ব্যাপারটা যতই ভাবে ততই দেখে সবদিক থেকেই অবস্থাটা নমিতার অনুকূল, আর তার প্রতিকূল। এ অবস্থায় নমিতার কাছে পরাজয় বরণ করতেও তার মন সায় দেয় না; অপর দিকে তার গোলা তাকে না পেয়ে অসুখী হবে, এ চিন্তাও অসহনীয়।

বিছানায় শুয়ে বেলা আটটা বাজল। করিমের মা দু'বার এসে স্নানের কথা বলে গেছে শিউলী সাড়া দেয় নি। আটটা বাজতে নমিতা এল।

এ কি। তুই যে শুয়ে আছিস, কি হয়েছে বল?—বলতে বলতে নমিতা বিছানায় শিউলীর মাথার কাছে বসে তার মুখ দেখে চমকে উঠে বলল—এ কি, তুই কাঁদছিলি! কেন কাঁদছিলি? বল ভাই, বল।—বলে শিউলীর হাত জড়িয়ে ধরল।

যাক, 'তুমি' ছেড়ে আবার যে 'তুই' ধরেছিস এটা আমার ভাগ্য।

এইজন্য আমার ওপরে রাগ করে কাঁদছিলি! দেখ ভাই, কিছুদিন ধরে আমার মন-মেজাজ যেন কেমন হয়ে গেছে। কখন কাকে কি বলি তার ঠিক নেই। তুই যদি আমার কথায় রাগ করিস তবে আর আমার উপায় নেই।

তোকে একটা কথা বলার সুযোগ আমি এ পর্যন্ত পাই নি। কথাটা অবশ্য

আমিও জেনেছি বাবার মুখে তার মৃত্যুর দুদিন আগে। সুলতানপুরের জমিদারী হিন্দু আমলে অর্ধেক ছিল হোসেনপুরের রায়দের। নবাব সরকারের হুকুমে যদিও দুই জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ এনায়েতুল্লা খাঁ, তথাপি তিনি রায়দের জমিদারী তাঁর হক্ পাওনা বলে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল রায়দের জমিদারী ফিরিয়ে দেওয়া, কিন্তু তা নানাকারণে এ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। বাবা মৃত্যুকালে আমাকে আদেশ করে গেছেন, যা কিছু তার অর্ধেক অজিত বাবুকে দিয়ে তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নিতে। বাবা কাকাবাবুকেও এ পরামর্শ দিয়ে গেছেন। কাজেই তোর অজিতবাবু কোনো কালে কারও পোষ্য হন নি, হবেনও না।

ওঃ আমি এই কথা বলেছিলাম বলে অমন করে এসে বিছানায় পড়ে কাঁদছিলি? যাক্ তুই একটা বিষয়ে খুব সময়মতো আমাকে বাঁচিয়ে দিলি। আগামীকালই আমার সিনেমা কোম্পানির কণ্ট্রাক্ট সই করার কথা আছে। এখন আর আমি ও ব্যাপারের মধ্যে যাব না।

কেন যাবি নে?

আর তো কোনো প্রয়োজন নেই। এখন মনোযোগ দিয়ে এম. এ. প'ড়ে পাশ করে স্কুল-কলেজে কাজ করব। তাতেই আমার চলে যাবে।

শিউলী বুঝল এদিক হতেও তাকে পরাজয় বরণ করতে হবে। তাকে নীরব দেখে নমিতা বলল—তোর সঙ্গে গোলাপবাবুর দেখা হলে কি ঘটেছিল, তিনি কি বলেছিলেন, তার কিছুই এপর্যন্ত তুই আমাকে বললি নে, অথচ এগুলি জানা আমার বিশেষ দরকার।

কেন দরকার বল'তো?

তোদের দুজনের মধ্যে যে টুকু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, সেটা একমাত্র আমিই দূর করতে পারব। সেই জন্যই দু'জনেরই মনের কথা, আর কি ঘটেছে তা জানা প্রয়োজন।

আমার সব কথাই তোকে বলেছি, সেদিন কি ঘটেছিল তাও বলেছি কিন্তু তোর অজিতবাবুর মনের কথা জানবি কি করে?

বাবা তাঁর এক বন্ধুর মুখে সংবাদ পেয়েছেন গোলাপবাবু লক্ষ্ণৌ গিয়েছেন। লক্ষ্ণৌ আমার দাদুর বাড়ী। সেখানে তাঁকে খুঁজে বের করতে বেশী অসুবিধা হবে না।

তাঁকে খুঁজে পেলেই তাঁর মনের কথা তুই সব জানতে পারবি, এ ভরসা তোর কি করে হল? এতদিন তো কিছুই জানতে পারিস নি!

এতদিন আমি ছিলাম স্বার্থপর ভিখারিণী। সেজন্য তাঁর মনের বন্ধদুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে মাথাকুটে মরেছি। এখন আর আমি ভিখারিণী নই। এখন আমার সম্মুখে ঐ দুয়ার বন্ধ করে রাখতে তিনি আর পারবেন না, এ জোর আমার আছে।

শিউলী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নমিতার মুখের দিকে। তার মনে হল যে নমিতাকে সে এতদিন দেখেছে এ সে নমিতা নয়। এ নমিতার মনের তেজ, মানসিক-ঐশ্বর্য, চরিত্র-মাধুর্য ও ত্যাগ-মহিমার সম্মুখে যে কেউ নত হতে বাধ্য। এর কাছে পরাজয় স্বীকার করায় কোনো অগৌরব নেই।

তুই অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন বল তো?

আমি তোর মধ্যে খুঁজে দেখছি আমার সেই আগেকার চঞ্চল বন্ধু নমিতাকে, কিন্তু তাকে পাচ্ছি নে। যাকে পাচ্ছি তাকে স্বর্গের দেবী বললেও অপমান করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শহরে গঙ্গানারায়ণ মুখার্জী বৃহৎ যৌথ পরিবারের কর্তা। পরিবারটি সবদিক থেকেই বৃহৎ। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে আনা নেওয়ার জন্য নিজস্ব মোটর বাস আছে।

বৃদ্ধ গঙ্গানারায়ণবাবু বাড়ীর নীচতলায় তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানায় বসে কয়েকখানা সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বুলোচ্ছেন। পাশে নাতনী শীলা বাজারের ফর্দ বুঝাচ্ছে। বাড়ীর যে মেয়েগুলি প্রজাপতির নিবন্ধ বন্ধনে পড়ার জন্য বয়স অনুপাতে কিউ দিয়ে বসে আছে, তার মধ্যে শীলা অগ্রবর্তিনী। সেজন্য নিয়মানুযায়ী দৈনন্দিন কাঁচা বাজারে ফর্দ করার দায়িত্ব শীলার।

শীলা এবার এম. এ. পাশ করেছে, দেখতে সুশ্রী গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। প্রতিদিন বাজারের ফর্দ নিয়ে দর কষাকষিতে দাদুর কাছে সেই জেতে। দাদু রুইমাছ দশসেরের এক ছটাকও কমাতে না পেরে কাঁচালঙ্কা পাঁচছটাকের এক ছটাক কমিয়েই শীলার ফর্দ মঞ্জুর করে দেন।

সেদিনও দুদিনে কাঁচা আদা আধসের কি করে ফুরোল, তাই শীলা দাদুকে বেশ ভাল করে বুঝাচ্ছিল। এমন সময় দারোয়ান এসে গঙ্গানারায়ণবাবুর হাতে একখানা কার্ড দিল।

শীলা জিজ্ঞাসা করল—কে এসেছেন, দাদু?

বাড়ীর ছোটদের আর একজন মাষ্টারের জন্য কাল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছিলাম, দেখছি বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়ে বেরোনার সঙ্গে সঙ্গে উমেদার হাজির।

তা'হলে তাড়াতাড়ি ফর্দটা সই করে দিন।

কেন? বোস না। দেখই লোকটা কেমন।

ও আর কি দেখব। বিজ্ঞাপন দেখেই যখন ছুটে এসেছে, তখন বুঝাই যাচ্ছে একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত বুড়ো।

তোর কথায় তাহলে বুঝতে পারছি কোনো বুড়ো মাস্টার এ বাড়ীতে থাকুক এটা তোরা পছন্দ করিস নে।

তা কেন হবে? ঐ যে এখন এসে নিজের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে চাকরির জন্য ঘ্যানোর ঘ্যানোর করবে ওটা আমার ভাল লাগে না।

ঠিক কথাই বলেছিস। যারা একটু অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মে ছেলেবেলা হতেই অন্নবস্ত্রের অভাবের সঙ্গে অপরিচিত থেকে যায়, তারা নাটক নভেলে গরিবের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা শুনে বা পড়ে সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে ঘরে বসে আহা-উহুঃ করে। কিন্তু বাস্তবে গরিবের সম্মুখীন হলে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়।

আচ্ছা, বেশ হয়েছে। এখন আপনার গরিব উমেদারটিকে ডাকুন, দেখে যাই।

গঙ্গানারায়ণবাবুর নির্দেশ পেয়ে দারোয়ান বেরিয়ে গেল। একটু পরেই উমেদার ঘরে প্রবেশ করে দুজনকেই নমস্কার করে দাঁড়াল।

উমেদারকে দেখে গঙ্গানারায়ণবাবু প্রায় দু'মিনিট কথা বলতে পারলেন না। শীলাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে গঙ্গানারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—

তোমার নাম কি?

অজিতশঙ্কর রায়।

কি জাতি?

ব্রাহ্মণ।

বাড়ী কোথায়?

বাড়ীঘর এখন কিছু নেই।

জন্মস্থান কোথায়?

যশোর জিলায় সুলতানপুর।

এখানে কোথায় থাক?

হোটেল রয়েল-এ।

ক'দিন এসেছ?

আজ নিয়ে তিন দিন।

এর আগে কোথায় থাকতে ?

কলকাতার এক হোটেলে।

সে হোটেলে মাসে কতটাকা লাগত ?

তিন চারশ'।

এ টাকা কে দিত ?

আমার বাবা এক জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর সেই জমিদার আমার সব ব্যয় বহন করতেন। প্রায় একমাস হল সেই জমিদারও মারা গিয়েছেন।

জমিদারের সন্তানাদি কি আছে ?

একটি মাত্র মেয়ে আছে।

এবার শীলা দাদুর কানের কাছে এগিয়ে এসে আস্তে করে বলল,—

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, বসতে বলুন।

হাঁ হাঁ তুমি দাঁড়িয়ে আছ, বস বস। এই দেখ আমার আর এখন তাল ঠিক নেই। বাপু, তুমি কিছু মনে কর না, বুড়োমানুষ সবকাজেই ভুল হয়। আমার এই সামনের চেয়ারে বস।

অজিত বসলে দাদু আবার জেরা করতে আরম্ভ করলেন,—

জমিদারের কে আছে বললে ?

একটি মাত্র মেয়ে আছে।

মেয়েটির বয়স কত ?

আমার চাইতে দু'বছরের ছোট।

বিয়ে হয়েছে ?

না।

এখন মেয়েটি কোথায় আছে ?

কলকাতায় আছে।

সে তোমার খরচ খরচা দিতে চায় না ?

দিতে চায়, আমি নেব না।

মেয়েটি দেখতে কেমন ?

পরমাসুন্দরী।

হুঃ, তা এ চাকরির মাইনে কত তা জানো তো ?

বিজ্ঞাপনে দেখেছি পঞ্চাশ টাকা। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আপনি করবেন।

হাঁ, তা কখন আসতে চাও ?

আপনি যখন আসতে বলেন তখনই আসব।

তাহলে এখনই আসলে ক্ষতি কি?

আচ্ছা, তাই আসব।

গঙ্গারামবাবু কলিংবেল টিপলেন। দারোয়ান এলে তাকে বললেন,—গ্যারেজ থেকে একখানা ট্যাক্সি বের করে এই বাবুর সঙ্গে দু'জন চাকর পাঠাও। হোটেল রয়েল থেকে বাবুর সব জিনিসপত্র নিয়ে আসবে।

অজিত নমস্কার করে দারোয়ানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। দুজন ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে শীলা বলল,—

দাদু এ ছেলেটিকে আমি চিনতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।

কি করে চিনলি?

নমিতার এ্যালবামে এর ফটো দেখেছি, নামও শুনেছি।

আমাদের অপর্ণার মেয়ে নমিতা?

হাঁ, কিন্তু একটা ব্যাপারে মিল হচ্ছে না।

কিসে মিল হচ্ছে না?

অজিত বাবুর খরচ জমিদার দিতেন, তার নিজস্ব কিছু নেই এরকম কিছু নমিতা বলে নি।

সে হয় তো নাও জানতে পারে।

নমিতা ওর পিছনে ঘুরছে আজ চার বছর। তার অজানা থাকার মতো কথা তো এ নয়।

নমিতা ওর পিছনে ঘুরছে কেন?

সে ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না—

কোনো সুবিধা করতে পেরেছে?

নমিতার কথায় তো বুঝা যায় কিছুই করতে পারে নি।

এ সব কথা এখানে আর কেউ জানে?

না, আর কেউ জানে না। আমাকেই এবার নমিতা সব বলেছে।

তার মা জানে?

বোধহয় জানেন।

তবে এখন এই ছেলেটি সম্পর্ক কোনো কথা এবাড়ীর কাউকে বলিস নে। ভিতরে অনেক রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে।

লাইব্রেরীর পাশের ঘরটায় অজিতের থাকার ব্যবস্থা করে দে। তুই নিজে ওর দেখাশুনা করবি।

দুদিন মাস্টারী করেই অজিত বুঝল, তার ছাত্রী পুঁটি বইয়ের 'এ'-টা শ্লেটে না লিখে পিণ্টুর পিছনে চিত হয়ে শুয়ে দুই পা দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে ভালো 'এ' হয়। 'অ-য় অজাগর আসছে তেড়ে' বইতে পড়ার চাইতে ভুতো যদি ছোট ভলিকে ভয় দেখিয়ে তেড়ে যায়, তবে ভলি 'ই'-তে ইঁদুরছানা ভয়েই মরে' হয়ে যায়। এ অবস্থায় সকালে দুঘণ্টা বিকালে দুঘণ্টা, এই চার ঘণ্টা ভজন দুই ভুতো পিণ্টুর মাস্টারী করা যে, তার পোষাবে না তা বুঝে অজিত উপস্থিত হল গঙ্গানারায়ণ মুখার্জির সম্মুখে।

আমি আজ চলে যাব।

কেন! কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?

আজ্ঞে, আমি যে মাস্টারী করতে জানি নে, তা আগে বুঝতে পারিনি। তাই এই চাকরি নিয়েছিলাম।

বেশ তোমাকে আর একটা কাজ দিচ্ছি। আমার বাড়ীতে যে লাইব্রেরী আছে সেই লাইব্রেরিয়ানের কাজ কর।

এ কাজ করলে আমার ইচ্ছামতো বই নিয়ে পড়তে পারব?

হাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। তোমাকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে, তা আমি দেখব।

এ কাজে কিন্তু আমি মাইনে নেব না।

কেন?

আপনি আমার থাকা খাওয়া সব ব্যবস্থা করে পড়ার সুযোগ দিচ্ছেন। সে তুলনায় এ কাজ এমন কিছু নয় যে, আমি মাইনে নিতে পারি।

তোমার হাতখরচ চলবে কি করে?

আমার কাছে প্রায় তিন-শ'টাকা আছে, এতেই তিন-চার মাস চলে যাবে। এর মধ্যে একটা চাকরি খুঁজে নেব।

লেখাপড়া কতদূর করেছ?

এবার এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছি।

হুঁ, আচ্ছা, বেশ। তোমাকে মাইনে দেব না, তবে তোমার যখন যা লাগবে শীলাকে বললেই এনে দেবে।

প্রতি সন্ধ্যায় মুখার্জীবাড়ীর ছেলে-মেয়েদের একটা আসর বসে। শনি ও রবিবারের আসর চলে দু'ঘণ্টা অন্যবারে এক ঘণ্টা। আসরে গান-বাজনা, গল্প, রাজনীতি, সাহিত্য, সমালোচনা, অনেক কিছু চলে। সেদিন শনিবারের আসর বসেছে।

আসরে প্রথমেই মেয়ে মহলে কথা উঠল নতুন মাষ্টার অজিতকে নিয়ে।

ভদ্রলোক অদ্ভুত মুখচোরা। আজ চারদিনের মধ্যে কারও সঙ্গে আলাপ করল না।

মুখচোরা নয়, অহঙ্কারী। কাউকে যেন মানুষ বলেই গণ্য করেন না।

ঠিক বলেছিস। আমি একখানা বই আনতে গেলাম, বইখানা বের করে দিয়ে নিজের বই পড়তে লাগলেন। আমি যে একটা মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে আছি তা তাঁর খেয়ালই হল না।

লোকটা বোধহয় কোনোকালে কারও সঙ্গে মেলামেশা করে নি।

বোধহয় নীচু সমাজের মানুষ। ভদ্র সমাজে মিশতে ভয় পায়।

জামা-প্যাণ্টগুলো কিন্তু খুব দামী।

সেদিন চায়ের সঙ্গে জেলি মাখানো টোস্ট আর সন্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সন্দেশ তো ছুঁলেনই না। টোস্টের গায়ের জেলিও খানিকটা চামচ দিয়ে তুলে ফেলে দিলেন।

তা দিলি কেন? চায়ের সঙ্গে কেউ মিষ্টি খায়?

লোকটা লেখাপড়া জানে কেমন, তা কিন্তু বুঝা যায় না।

চেহারা দেখে তো মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে।

কিন্তু এই পাঁচদিনেও আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করল না কেন!

প্রয়োজন বোধ করে না, তাই মেশে না।

সারাদিন বই নিয়ে পড়ে থাকে, তা আলাপ পরিচয় মেলামেশা করবে কখন? ওটা একটা গ্রন্থকীট।

অজিতকে কেন্দ্র করে যখন মেয়েদের এই রকম আলোচনা চলছিল তখন দাদু গঙ্গানারায়ণবাবু এসে নাতনীদের মধ্যে বসে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোদের কি নিয়ে আলোচনা চলছে?

আচ্ছা দাদু, আপনার এই নতুন মাস্টার কোন শ্রেণীর মানুষ?

তা জেনে কি হবে? ও বে-ওয়ারিশ মাল নয়।

দাদুর যে কথা! আমরা যেন শিকার ধরার জন্ম ওৎপেতে বসে আছি।

তোরা ক'জন চেষ্টা তো করেছিস, কিন্তু ভিড়তে তো পারলি নে।

আমরা কি চেষ্টা করেছি? বাড়ীতে একটা নতুন মানুষ এসে থাকলে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা কি দোষের?

মোটেই না, বিশেষ করে এরকম ছেলের সঙ্গে।

কি রকম ছেলে?

এই যার জুতা সাফ করা মুচির মাসিক মাইনে পচিশ টাকা। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস টিকিট কোন দিকে পাওয়া যায়, তা যে ছেলে জানে না।

ও বে-ওয়ারিশ নয় জানলেন কি করে?

অজিতের কথায় বুঝতে পেরেছি, এক বড় জমিদারের একমাত্র সুন্দরী কন্যা ওর পিছনে লেগে আছে। আরও একটা মেয়ে ওর পিছনে চার বছর ঘুরছে, কিন্তু কোনো সুবিধা করতে পারছে না। সেই দুটির তুলনায় তোরা পাত্তাই পাবি নে।

লেখাপড়ায় কেমন?

এম. এ. পাস করেছে।

অজিতবাবু খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারেন।—বলল শীলা।

তুই জানলি কি করে?—প্রশ্ন করল সবিতা।

যা করেই জানি না কেন, দাদু আজ আমাদের অজিতবাবুর বাঁশি শোনাবেন।

আমি কি করে শোনাব? তোরা ডেকে এনে বল। যদি তোদের কথায় বাজায়, তবে আমিও শুনব। আমি তাকে বাঁশি বাজাতে বলে শেষে সেই বাঁশির গুঁতো সামলানোর দায়িত্ব নেব না।

বাঁশির আবার গুঁতো কেমন?

ব্রজের নন্দনের বাঁশির গুঁতোয় ব্রজকন্যারা এমন পাগল হয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রজ ছেড়ে মথুরায় পালিয়ে গেলেন। জীবনে আর ও মুখো হলেন না, বাঁশিও আর হাতে নিলেন না।

তাহলে দেখছি দাদু আর এখন আমাদের পক্ষে নেই।

তোদের পক্ষেই আছি, তবে সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি। 'বাঁশরী শুনিয়া মোহিত' হোস নে। আজকাল একটার বেশী বউ কেউ রাখতে পারবে না, আইন হয়েছে।

মুসলমান'রা তো যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে?

এটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কি না, তাই সব আইন সব ধর্মাবলম্বীর ওপরে প্রযোজ্য নয়।

তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার মানে কি?

ওর মানে যে কি, তা আমাকে এপর্যন্ত কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেন নি। কার্যত দেখছি ধর্মনিরপেক্ষ বুলির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় পৃথক স্বার্থবাদীরা এই দেশের বুকে বসে, আর্থিক ব্যাপারে অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সমান

সুযোগ নিয়ে, আবার এদেশ ভেঙে আর একটা স্থান পয়দা করার জন্য জোট বাঁধছে।

এই রে দাদুর রাজনীতিক বক্তৃতা আরম্ভ হয়ে গেল। আর আমাদের অজিতবাবুর বাঁশি শোনা হবে না।

আচ্ছা শীলা, যা তো অজিতকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমি কিন্তু তাঁকে ডেকে আনব, বাঁশি বাজাতে বলতে পারব না।

আচ্ছা, সে দায়িত্ব এখন আমিই নেব। তুই ডেকে আন।

অজিত এলে দাদু বললেন,—বাপু, তুমি নাকি ভালো বাঁশি বাজাতে পার।—এদের একটু বাঁশি বাজিয়ে শোনাও।

আমার সঙ্গে তো বাঁশি নেই।

আর কিছু বাজাতে জানো?

সেতার দিতে পারেন, যদি তবলচী থাকে।

আচ্ছা, আমিই ঠেকা চালিয়ে দেব।

সেতার হাতে নিয়ে সুর বাঁধতে গিয়ে একটু দেখেই অজিত বলল,—

সেতারটা ভালো, কিন্তু বহুকাল 'জোয়ারী' করা হয় নি, এ বাজানো যাবে না। ঐ গীটারটা দিন। আমি বাজানো 'রিং-নেল' আনছি।

অজিতের কথায় সকলেই অবাক হয়ে গেল। সে 'রিং-নেল' আনতে গেলে দাদু বললেন,—এবার তোমরা বুঝতে পারছ বোধহয়, ছেলেটা কি?

দাদুর এ কথায় কেউ আর উত্তর দিল না।

অজিত ফিরে এলে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন,—দেখছি তোমার সঙ্গে 'মেসরাজ', 'রিং-নেল' সব আছে। তুমি কি গান-বাজনার মাস্টারী করবে?

আজ্ঞে না। কোন মাস্টারীই আমার পোষাবে না। বলে গীটার তুলে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল।

প্রথম বাজাল দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত। শেষে বাজাল একখানা ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালী শেষ হতেই অজিত গীটার নামিয়ে রেখে উঠে গেল। কারও কোনো মন্তব্য করার অবকাশ দিল না।

মানুষ যদি সব সময় নিজের প্রকৃত মনোভাব বুঝে চলতে পারত, তবে পরবর্তীকালে অনেক অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে তার চলার পথ অনেকটা

সুগম হত। একে তো কেউ কারও মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝে উঠতে পারে না, তারপর এমন কতকগুলি মানুষ আছে, যারা নিজের প্রকৃত মনোভাব বা মতলব গোপন রেখে, বাইরে তার বিপরীত ভাব প্রকাশ করতে এমনই সুদক্ষ যে, যাঁরা লোকের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারেন বলে গর্ব করেন, তাঁরাও শেষে বেকুব বনে যান।

প্রকৃত প্রেম কিন্তু এমন একটা ব্যাপার, যা তার নিজ বৈশিষ্ট্যেই মুখের কথায় প্রকাশ পায় না। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক কবি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'প্রেমসম্পুট' গ্রন্থে সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন।—প্রেম একটা ছোটো তেলের প্রদীপের মতো। প্রদীপ ঘরের ভিতরে থেকে ঘরখানা আলোকিত করে রাখে। কিন্তু তাকে দরজার বাইরে আনলে 'নির্বাতি শীঘ্রম্ অথবা লঘুতামুপৈতি'। প্রেমও যদি ভাষায় প্রকাশ পায়, অর্থাৎ মুখের কথায় 'তোমা বিনা প্রাণ বাঁচে না' চলতে থাকে, তবে বুঝতে হবে, যদিই বা কোনোকালে অন্তরে প্রেমের ছোঁয়াচ লেগে থাকে, এখন সেটা নিভে গিয়ে স্বার্থপর আদান-প্রদানের দুর্গন্ধী ধোঁয়া ছাড়ছে।

সেদিন মুখার্জী বাড়ীর সান্ধ্য আসরে অজিত শেষে যে ভাটিয়ালী সুর বাজাল সে সুরের মূর্চ্ছনা তার মন টেনে নিয়ে গেল সুদূর অতীতের একটি ঘটনায়।

সুলতানপুর, জমিদার বাড়ীর পিছনে বাগান। বাগানে লিচু গাছতলায় বসে নয় বছর বয়সের গোলাপ বাঁশি বাজাতে চেষ্টা করছে। পাশেই মাদুরের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা উঁচু করে দুই হাতে চিবুক ধরে ফ্রক-পরা শিউলী একমনে বাঁশির সেই ভাঙ্গা সুর শুনছে। কিছু দূরে ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে পুবন বাতাসে ভৈরবের বুকে ঢেউয়ের নাচন দেখা যাচ্ছে। এক জোড়া গাঙ্‌চিল আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে আর ডাকছে, কোঁয়া, কোঁয়া। শ্রাবণ মাস হলেও সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। করিমের মাও সেদিন দুপুরে বাগানে আসতে পারে নি, তার হয়েছিল জ্বর।

হঠাৎ ভাঙ্গাপ্রাচীরের পথে দেখা দিল দু'জন মানুষ। তাদের হাতে ধারালো হাসুয়া,আর বড় বাঁশের আগা। দেখে শিউলী ও গোলাপ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দুজনে দৌড়ে পালাতে পারল না। ভয়ে শিউলী গোলাপকে জড়িয়ে ধরেছে। গোলাপেরও খুব ভয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বয়সেও সে শিউলীকে বাঁচানোর জন্য তাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে ভয়ে ভাঙ্গা গলায় তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল,—তোমরা কে?

তারা দু'জন এসেছিল কলাপাতা কাটতে। ছেলে-মেয়ে দুটির ভয় দেখে হেসে বলেছিল,—খোকাবাবু, আমরা ডাকাত বা ছেলেধরা নই। তোমরা ভয় কর না। দুখানা কলাপাতা কেটে নেব।

আর আজ? আজ শিউলীর একমাত্র আপনজন চাচাসাহেব নেই। সে হয় তো বড় আশা করেছিল তাদের বংশপরম্পরা সহায় বন্ধু হোসেনপুরের দেওয়ান বংশের ছেলে অজিত তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সে এ কি করে এল! সে যে শিউলীকে একটি কথা বলারও সুযোগ দেয় নি। ছেলেবেলা হতে চাচাসাহেব তাকে মানুষ করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন, এই কি তার প্রতিদান!

অজিতের মনে হতে লাগল তার বুদ্ধি-বিবেচনা যদি নাক-কানের মতো একটা কিছু হত, তবে সেটা জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দূর করে ফেলে দিত? নিজের ওপরে রাগ ও ক্ষোভে যখন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল শীলা।

অজিত শীলাকে অভ্যর্থনা করে বসতে বলল না, কেবল উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

শীলা একখানা চেয়ার অজিতের কাছে টেনে নিয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,—অজিতবাবু, আপনি কি আমাকে আপনার একজন সত্যিকারের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেন?

অজিত শীলার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে আগের মতোই চেয়ে থাকল দেখে, শীলা স্নেহমাখা কোমল কণ্ঠে বলল,—আপনি সংসার ও মানব-চরিত্র সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ি। এই বয়সে আমি যেটুকু বুঝি, আপনি তাও বোঝেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে আপনার ভিতরের কথা কিছু বলতে পারেন কি? বললে কিন্তু মন হাল্কা হয়ে যাবে।

খেয়ালের বশে কোনো অপকর্ম করে মানুষ যখন অনুশোচনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে, তখন সহানুভূতিশীল সান্ত্বনাই তাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারে। সে সহানুভূতি-সান্ত্বনা যদি স্নেহমমতাময়ী নারীর কাছ থেকে আসে, তবে পুরুষ তার কাছে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারে না।

অজিতের বেলায়ও তাই হল। শীলা তার মনের দুয়ার খুলে প্রথম শুনল, চাচা জাফরুল্লা সাহেব ও তাঁর মেয়ে রোশোনারার কথা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল শিলী-গোলার কাহিনী।

সবশুনে শীলা জিজ্ঞাসা করল,—

আপনি কি তাহলে এখনও মনে করেন, শিউলী কেবল তার বাবার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা পুরণের জন্যই এ বিবাহে রাজি হয়েছে ?

এ কথা মনে করা ছাড়া অন্য কিছু মনে করার মতো কোনো হেতু তো খুজে পাচ্ছি নে। যে আজ দশ বছরের মধ্যে কারো কাছে একটিবারও আমার নাম করে নি, সে হঠাৎ একেবারে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল! এ একমাত্র চাচা সাহেবের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

সুলতানপুরে শিউলীর মনের কথা বলার মতো কেউ ছিল ?

না-আ। অজিত একটু চিন্তিত হয়ে উত্তর দিল।

কলকাতা এসে মনের কথা বলার মতো কোনো সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে ?

বোধহয় হয়েছে।

সে মেয়েটিকে আপনি চেনেন ?

চিনি।

সে কে ?

চাচা সাহেবের এটর্নি অমিয় ব্যানার্জীর মেয়ে নমিতা।

নমিতাকে চিনলেন কি করে ?

সে আমাদের কলেজের ছাত্রী, ভালো অভিনয় আর গান করতে পারে।

আপনি তো নমিতার সঙ্গে থিয়েটার করতেন, গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন। এত ঘনিষ্ঠতা যখন ছিল, তখন আপনি কি কোনোদিন নমিতাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তার বন্ধু শিউলীর কথা ?

না।

নমিতার সম্মুখে কোনোদিন শিউলীর নাম উচ্চারণ করেছেন ?

না।

অথচ আপনি শিউলীকে এত ভালবাসেন যে, অপর কোনো মেয়ে আপনার মনে একটু ছায়াও ফেলতে পারে না। যার জন্য কলেজে মেয়ে মহলে আপনি নারীবিদ্বেষী বলে দুর্নামগ্রস্ত। আপনার নিজের অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখে বলুন, শিউলী যার তার কাছে 'আমি গোলাপকে ভালবাসি'—বলে বেড়াতে পারে কি না।

কিন্তু আমার সন্দেহও তো সত্য হতে পারে ?

আপনার এই মিথ্যা সন্দেহ দূর করার জন্য আমি সাতদিনের মধ্যে এমন

প্রমাণ উপস্থিত করব, যা আপনি কোনো রকমেই অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—এই বলে শীলা উঠে গেল।

এই ঘটনার ছয়দিন পরে বেলা আটটায় অজিত তার ঘরে বসে চা খাচ্ছে। এমন সময় দরজায় হাসিমুখে এসে দাঁড়াল নমিতা, তার পিছনে করিম।

অজিত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে নমিতা হাসতে হাসতে বলল,—

চমকাবেন না। এটা আমার আপন দাদুর বাড়ী। ছেলেবেলায় আমি এখানেই মানুষ হয়েছি।

নমিতার চেষ্টা সত্ত্বেও অজিত কলকাতা এসে উঠল হোটেলে। দু'দিনের মধ্যে শিউলীর সঙ্গে তার দেখা হল না। তিনদিনের দিন ছিল রবিবার। অপর্ণাদেবীর পরামর্শে অমিয়বাবু অজিতকে নিমন্ত্রণ করে সকাল আটটার মধ্যেই তাকে নিয়ে এলেন বালীগঞ্জের বাড়ীতে।

অজিত যেদিন কলকাতা ফিরে আসে, সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে বিয়ের কথা তুলেছিসেন অপর্ণাদেবী। তাতে শিউলী জানিয়েছে, এখন বিয়ে হবে না। এখন অজিতবাবু বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ুন। এদিকে শিউলী ও নমিতা এম. এ. পড়বে। অমিয়বাবু এ পরামর্শ ভালো বলে গ্রহণ করলেও অপর্ণাদেবী একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু গোলমাল বেধে আছে। এ গোলমাল দুজনে নির্জনে মুখোমুখী না হলে মিটবে না। সেইজন্যই এই নিমন্ত্রণ।

বেলা আটটায় সকালের খাবার টেবিলে বসল নমিতা শিউলী আর অজিত। অমিয়বাবু নীচতলায় তাঁর চেম্বারে কাগজের জন্য আসতে পারলেন না। অপর্ণাদেবী রান্নাঘরে ব্যস্ত। করিম বাজারে গেল। খাবারঘরে থাকল মরিয়মের মেয়ে।

খাবার টেবিলে মুখোমুখী বসল অজিত আর শিউলী। একপাশে থাকল নমিতা। বালীগঞ্জের বাড়ীতে এসে এ পর্যন্ত অজিত ও শিউলীর দেখা হয় নি। খাবার টেবিলে মুখোমুখী বসে অজিত ঘেমে উঠল, শিউলী নির্বিকার।

দু'জনের ভাব দেখে নমিতা আরম্ভ করল নানারকমের কথা, যাতে দু'জনের মনের সঙ্কোচ দূর হয়। কিন্তু কোনো ফল হল না, প্রাণখোলা আলাপে তাদের নামানো গেল না।

খাওয়া শেষ হলে নমিতা বলল,—অজিতবাবু, এখন চলুন শিউলীর ঘরে আপনার সেতারে বাজনা শুনব।

আমার সেতার কোথায়?—বিস্মিত অজিত প্রশ্ন করল।

আপনার সেতার শিউলীর ঘরে যত্নেই আছে।

সে কি রকম?

আপনার যে সব জিনিস নিলামদারের কাছে বেচেছিলেন, তা সব—মায় ছেঁড়া জুতো পর্যন্ত শিউলী কিনে রেখেছে।

শুনে অজিত শিউলীর দিকে তাকাতেই শিউলী একটু হাসল। সে হাসির সম্মুখে অজিতের কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেল।

আপনাকে আর দুটো খবর জানাচ্ছি, শিউলী মা'র কাছে সেতার শিখছে। আপনার সেতারটি আর ফিরে পাবেন না। আপনার সেতার ছাড়া অন্য কোনো সেতার ও বাজাবে না।

যেমন তুই ঐ একজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে থিয়েটার করতে বা গান গাইতে পারিস নে।—হেসে বলল শিউলী।

বাঃ রে, তা কেন হবে! আমি তো সিনেমায় নামা একরকম স্থিরই করে ফেলেছিলাম।

যেজন্য তুই আর কারও সঙ্গে থিয়েটারে নামতে পারিস নে, সেইজন্যই সিনেমায় নামতে গিয়েছিলি। ও একই ব্যাপার।

শিউলী ও নমিতার এই কথা কাটাকাটির তাৎপর্য অজিত বুঝে উঠতে না পেরে তাদের মুখের দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে আছে দেখে শিউলী বলল,—

তুমি বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারনি। তুমি সহায়-সম্বলহীন গরিব। বিয়ে করে বউ-এর অধীন হবে, এ নমি···।

থাম,—বলে নমিতা শিউলীর মুখ চেপে ধরল।—আর একটা কথা বলবি তো তোর মুখ সেলাই করে দেব।

তা তুই করিস। এখন আমাকে কথাটা খুলে বলতে দে।

না তোকে কিছুই বলতে হবে না। আমি নিজেই সব বলছি। শুনুন অজিতবাবু, আমার ধারণা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী যদি গরিবের ছেলে হয়, আর স্ত্রী যদি বড়লোকের মেয়ে হয়ে তার বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, তবে অনেক সময় উভয়ের মধ্যে একটা হীনমন্যতা এসে ভালবাসায় ফাটল ধরায়। এই জন্য আমি মনে করেছিলাম, সিনেমায় নেমে টাকা যোগাড়

করে আপনাকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টারী পাস করিয়ে আনব। এতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? আপনি আমার বন্ধুর বর। আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনোসময়ে কোনোকারণে যাতে অমিল না হয়, তা দেখা নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য।

নমিতার কথার তাৎপর্য যা সে বুঝাতে চেয়েছে, তাই অজিত বুঝল। এর অপর দিকটা যে অজিতের ধারণার বাইরে, তা বুঝতে শিউলীর কোনো অসুবিধা হল না। কারণ নমিতার কথা শেষ হতেই অজিত হেসে সরলভাবে বলল,—

আপনি যে আমাকে এত স্নেহ করেন, আমার মঙ্গলের জন্য এত চিন্তা করেন, এ আমি এতদিন বুঝতে পারিনি। এই চারবছর কলেজে মেলামেশায় অনেক সময় আপনার সাথে সঙ্গত ব্যবহার করি নি। এর জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

অজিতের কথা শেষ হতেই নমিতার হাসিখুশি মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। এটাও শিউলীর দৃষ্টি এড়াল না। শিউলী বেশ বুঝল তার গোলার মনে একটু দাগ কাটার ক্ষমতাও অপর কারও নেই।

নমিতা গম্ভীর হয়ে অজিতের কথার উত্তর দিল,—

ক্ষমা আর চাইতে হবে না। কারণ এখন এই সব সামান্য কারনেই যদি ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করেন, তবে আপনাদের বিয়ের পর ক্ষমা চাওয়ার ঠেলায়ই আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। এখন চলুন শিউলীর ঘরে বসে আপনার সেতার শুনব।—বলে নমিতা অজিতের হাত ধরে নিয়ে চলল। পিছনে পিছনে শিউলীও গেল।

ঘরে এসে শিউলীর বিছানার ওপরে অজিতকে বসিয়ে নমিতা বলল, আপনারা দুজন একটু বসুন আমি হারমোনিয়মটা নিয়ে আসি।—বলে ঘর হতে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে শিকল লাগিয়ে দিয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে হেসে শিউলী অজিতকে বলল,—

নমিতার মতলবটা বুঝেছ?

হাঁ, তোর—তোমার সঙ্গে আমি নির্জনে কথা বলি, এই তিনি চান।

হাঁ। কিন্তু তুমি 'তোর' বলে আবার 'তোমার' ধরলে কেন?

না, তা হয় না। এখন আমরা বড় হয়েছি।

হাঁ, মাথায় বেশ খানিকটা উঁচু-লম্বা হয়েছ, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় তো দেখছি সেই ছেলেবেলায় যা ছিলে, তার থেকেও নেমে গেছ।

কিসে বুঝলে ?

এই নমিতার এত বড় ভালবাসাটা তোমার চোখে পড়ছে না কেন ?

পড়েছে তো। তার জন্যই তো ক্ষমা চাইলাম।

তুমি একটা বুদ্ধির ঢেঁকি। নমিতার ভালবাসাটা কোন শ্রেণীর ভালবাসা, তা এতকাল ধরেও বুঝতে পারলে না ? আমি কিন্তু সেই কলেজে থিয়েটারে তোমাদের দুজনকে দেখেই বুঝেছিলাম।

কি বুঝেছিলে ?

আমি যেমন আমার গোলাকে ভালবাসি, নমিতা তেমনি তার অজিত রায়কে ভালবাসে।

বলিস কি শিলী ! তোর মতো আমাকে আর কেউ ভালবাসতে পারে ?—উত্তেজনায় গোলাপ উঠে দাঁড়াল।

হাঁ, পারে। বরং অনেক বেশী পেরেছে। নমিতা এদিক থেকে মহারাণী। তার কাছে আমি ভিখারিণী। এইটাই আমার দুঃখ।

কেন দুঃখ ? কেন ভিখারিণী ? আমাকে খুলে বল।—ব্যাকুল হয়ে গোলাপ শিউলীর হাত চেপে ধরল।

তুমি তা বুঝবে না আমাকে ভালবেসে তোমার মনের চোখ কান অন্ধ-বধীর হয়ে গেছে। কেন তুমি আমাকে এত ভালবাস ?—শিউলীর গলা ভার হয়ে উঠল।

কেন যে আমার শিলীকে আমি ভালবাসি, তা তো জানি নে। সেই শিশুকালে জ্ঞান হয়ে তোকে কাছে পেয়েছিলাম। তারপর এগারো বছর বয়সে তোকে হারিয়ে এই বারো বছর কেবল মনের মধ্যে তোর ছবি বসিয়ে ভালবেসে এসেছি। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে, আলাপ-পরিচয় হবে, এটা ছিল আমার কল্পনার অতীত। তবুও জানি শিলী আমার, আমি শিলীর। আজ যদি তুই জিজ্ঞাসা করিস কেন আমি তোকে ভালবাসি, তবে আমার উত্তর দেবার মতো কিছু তো নেই।—গোলাপের চোখে জল দেখা দিল।

গোলাপের শেষ কথাক'টা ও চোখের জল শিউলীকে সব ভুলিয়ে আত্মহারা করে ফেলল। সে ব্যাকুল হয়ে গোলাপের গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকালো।

শিউলী ও অজিতকে ঘরে বন্ধ করে রেখে নমিতা তার ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে খুলে নিল ভিক্টর হুগোর 'লা-মিজারেবল'। বইখানার পাতা উলটিয়ে

বের করল 'এপোনাইন'-এর মৃত্যুর জায়গাটা। পড়া শেষ হলে বইখানা বন্ধ করে উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,—কিছু পায় নি, তবুও মরণকালে আশা—'মেরিয়াসের' একটা চুমো। মেরিয়াস মৃত এপোনাইনের ললাটে সে চুমো দিয়েছিল। হতভাগী এপোনাইন। ভালবাসা শূন্য চুম্বনের কি মূল্য আছে?

নমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করে গেল রান্নাঘরে মায়ের কাছে।

মা, আজ আমি একটা কিছু রান্না করব।

তুই আবার এর মধ্যে কি রান্না করবি?—বলেই অপর্ণাদেবী মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,—আচ্ছা, এই মাছের আলুগুলো ভাজ। আমি ততক্ষণ আর সব গুছিয়ে নি।

আলুভাজা শেষ না হতেই শিউলীর ঘর থেকে সেতারের ঝঙ্কার শোনা গেল।

ঐ যাঃ, আমি যে হারমোনিয়ম নিয়ে যাব বলে এসেছি। মা, তোমার আলুভাজা থাকল, আমি চললাম।—বলে নমিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল শিউলীর ঘরের দরজায়।

গিয়েই দরজা না খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সেতার বাজনা। সেতারে বাজছে আলাপ। সে আলাপ শুনে নমিতার মনে হল, যেন অজিত তার আজন্ম প্রণয় কাহিনী শুনাচ্ছে শিউলীর কানে কানে। সে কাহিনীতে কত ব্যথা, কত আকুলতা, কত মিনতি।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শুনে নমিতা অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে একটু ফাঁক করে দেখল, খাটের ওপরে বসে অজিত সেতার বাজাচ্ছে। তার পিঠের ওপরে ঘাড়ের কাছে দু'খানা হাত আর ডান কাঁধের ওপরে চিবুক রেখে চোখ বুঁজে শিউলী বাজনা শুনছে। শিউলীকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন নয়-দশ বছরের একটি সরল বালিকা; এ কুটিল সংসারের কিছুই সে জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে নমিতা এ দৃশ্য দেখল। সে সময় বোধহয় তার শ্বাস-প্রশ্বাসও চলে নি, চোখের পলকও পড়ে নি। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে ছুটে চলে গেল তার শোবার ঘরে। ঠিক সেই সময় অজিত সেতারের সুরের তারে মীর টানতে গিয়ে তারটা ছিঁড়ে ফেলল।

ছেঁড়া তার ছুটে শিউলীর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে বিঁধে রক্ত পড়তে লাগল। দেখে অজিত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ক্ষতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল,—ঘরে টিঞ্চার আইডিন আছে?

এখানে নেই, কাকীমার ঘরে আছে। কিন্তু ওর কোনো দরকার হবে না, এ এমনিই সেরে যাবে।

না, খুব লেগেছে যে।

না, লাগে নি। ছেলেবেলায় তোমার হাতের কিলগুলোর চাইতে বেশী লাগে নি।

সত্যিই শিলী, ছেলেবেলায় তোর পিঠে কিল মারতে আমার খুব ভাল লাগত।

ভাল লাগে যদি তবে এখন দু'একটা মারোনা।—বলে শিউলী হেসে ফেলল।

তা মারব। এখন কাকীমার ঘরে গিয়ে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে আয়। সেতারের তারে জখম, সেপ্টিক হতে পারে।

কাকীমার ঘরে যাওয়ার কথা উঠতেই শিউলী দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল দরজা খোলা।

আর কোনো কথা না বলে শিউলী ঘর থেকে বেরিয়ে কাকীমার ঘরের দরজায় গিয়ে দেখে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল, নমিতা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে নীরবে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

শিউলীর আর আইডিন লাগানো হল না, সে ফিরে গেল।

অজিত ব্যারিস্টারী পড়তে গেছে। শিউলী ও নমিতা পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়ে এম. এ. পড়ছে। ইনজিনীয়ারিং পড়তে রুড়কি গেছে ইব্রাহিম।

তাহের মিঞা নিরুদ্দেশ হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর চাচাতো ভাই তায়েবুদ্দিন আহম্মদ ঢাকা হতে এসে তাহের মিঞার বড় দুই বিবিকে নিকে করে সম্পত্তির মালিক ও ম্যানেজার হয়ে বসেছেন। ছোট বিবি আনোয়ারাকেও মিঞাসাহেব যথাস্থানে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম ও সৈয়দ সাহেবের চেষ্টায় তাঁর সে মতলব হাসিল হয় নি। তবে তাহেরমিঞার সম্পত্তির ওপরে আনোয়ারার দাবি সম্পর্কে না দাবিপত্র লিখে দিতে হয়েছে। আনোয়ারা একেবারে খালি হাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে বোন সোফিয়ার কাছে।

তায়েব মিঞা তাহের মিঞার চাইতেও ওস্তাদ লোক। ভাইয়ের সম্পত্তি দখল করে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক আসরের প্রতিপত্তিও আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এদিক থেকে তাঁর লম্বাদাড়ি বিশেষ সাহায্য করেছে। কারণ, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ করবার জন্ত এটা একটা প্রয়োজনীয় বস্তু।

বাইরে সভা-সমিতিতে তায়েব মিঞা বলেন,—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই প্রকৃত জনগণের রাষ্ট্র। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। হিন্দুভাইরা দেশরক্ষার দায়িত্ব মুসলমান ভাইদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রামধুন গাইতে গাইতে চরকা কাটুন। আর ইসলামের খাঁটি খাদেমদের জমায়েতে যা বলেন, তা একদিন সৈয়দ সাহেবকে বুঝিয়ে দলে টানতে গিয়ে বেকুব বনে গিয়েছিলেন। সৈয়দ সাহেব তাঁকে দেশদ্রোহী বেইমান, বিদেশীর গুপ্তচর, প্রভৃতি বিশেষণ আপ্যায়িত করে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বিদায় করেছেন।

অজিত বিলাতে যাওয়ার মাস পাঁচ-ছয় পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা চা-এর টেবিলে অমিয় বাবুকে নীরব দেখে অপর্ণাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাকে আজ চিন্তিত দেখছি কেন?

একটা দুঃসংবাদ পেয়ে মন বড় ভালো নেই।

কি দুঃসংবাদ কাকাবাবু?—প্রশ্ন করল শিউলী। টেবিলের সকলেরই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

আজ হাইকোর্টে সেই পুলিশ-অফিসারটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল,—।

তিনি কি বললেন?

পাঁচদিন হল মনিরুদ্দিনকে রাঁচি পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে।

কেন! সে পাগল হল কবে?

মনিরুদ্দিন তাহের মিঞার দোসর রহমতকে খুন করতে গিয়েছিল। সময়মতো পুলিশে বাধা দেওয়ায় খুন করতে পারে নি, কিন্তু তার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।

মুনির একাজ করল কেন?

তার ধারণা, তাহের মিঞার হুকুমে রহমত মরিয়মকে খুন করে দমদমের বাগান বাড়ীতে পুঁতে রেখেছে।

রহমতকে পেল কোথায়?

রহমতের একখানা পা জখম হয়ে সেপ্টিক হয়। শেষপর্যন্ত হাসপাতালে পা-খানা কেটে ফেলে। কয়েকমাস হাসপাতালে থেকে ঘা-শুকোলে বেরিয়ে এসে নাখোদা মসজিদের কাছে রাস্তায় বসে ভিক্ষে করত। সেখানেই এই কাণ্ড ঘটেছে।

তাতে মুনিরের জেল না হয়ে পাগলাগারদে পাঠানো হল কেন? প্রশ্ন করলেন অপর্ণাদেবী।

তোমাদের মনে থাকতে পারে, শিউলী ফিরে এলে দেখা করতে এসে পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, তিনি তখনই মনিরুদ্দিনকে ছেড়ে দেবেন না। তাকে মরিয়মের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জানিয়ে কিছুদিন হাজতে রেখে শান্ত করে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টায় ফল হয়েছে বিপরীত। মরিয়মের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শুনে, এক রাত্রেই মুনিরের মাথাখারাপ হয়ে যায়। জেল হাসপাতালের ডাক্তার মাস দুই চিকিৎসা করে একটু সুস্থ হলে তাকে ছেড়ে দেন।—

মুনির জেল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায় দমদম সেই বাগান বাড়ীতে। বাগানের চৌকিদার তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। প্রায় তিনমাস রাতে সে ঐ বাগান বাড়ীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে মরিয়মকে ডেকেছে, আর কেঁদেছে। তারপর এই কাণ্ড।

আহাঃ, পুলিশ সাহেব যদি ওকে আমাদের কাছে এনে দিতেন! বললেন অপর্ণা দেবী।

তা হলে আপনি কি করতেন?—প্রশ্ন করল শিউলী।

যে অমন প্রাণঢেলে ভালবাসতে পারে, সে স্বভাবে অসৎ নয়। যারা স্বভাবে অসৎ তারা কখনো ওরকম ভালবাসতে পারে না। তাদের ভালবাসা স্বার্থ বা দেহের ভালবাসা। স্বার্থ বা দেহের রূপ-যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাও ফুরিয়ে যায়। তোমার কাকাবাবুর মুখে ওদের দু'জনের কাহিনীটা শুনেছি, তাতে ওটা সত্যিকারের ভালবাসা। ওরা সুযোগ পেলে সৎ-গৃহস্থ হতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আইন ও সমাজ সে সুযোগ ওদের দেয় নি। মুনিরকে যদি আমাদের কাছে আনতে পারতাম, তবে ও আর অসৎপথে যেত না। পুলিশ সাহেব আমাদের না জানিয়ে ভুল করেছেন।

পুলিশ সাহেবকে দোষ দিয়ে কি হবে! বললেন অমিয় বাবু!—এই মাসখানেক আগে একদিন হাইকোর্টের সম্মুখে গাড়ি হতে নামতেই মুনির আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—ব্যারিস্টার সাহেব, আপনি দয়া করে আমার মরিয়মকে খুঁজে দিন। তাকে যদি ওরা খুন করে পুঁতে রেখে থাকে, তবে কোথায় রেখেছে সেই জায়গাটা খুঁজে আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি ফকির হয়ে তার কবরের পাশে থাকব। আমার যে মরিয়ম ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই ব্যারিস্টার সাহেব।

সেদিন যদি তাকে অবহেলা না করে ব্যাপারটা বুঝে দেখতাম তবে সত্যই ওকে ভাল করা যেত। আমার এ ভুলের দুঃখ জীবনে ঘুচবে না।

চা-এর টেবিলে সকলেরই চোখে জল এসে গেল

ক্রমে তিন বছর হয়ে গেল। শিউলী ও নমিতা এম. এ. পাশ করেছে। শিউলী পরীক্ষা দিয়েই অমিয় বাবুর হাত থেকে নিজের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিয়েছে। এরপর থেকে অমিয়বাবু শিউলীর পরামর্শমতো কাজ করেন, নিজে আর কিছু করেন না।

শিউলী বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব হাতে নিয়ে প্রথমেই কলুটোলার বাড়ী বিক্রী করে আলিপুরে অজিতের নামে জমি কিনে সুন্দর একখানা ছোট বাড়ী করল। পার্কসার্কাসের বাড়ী ইব্রাহিমের নামে লিখে দিয়ে সে বাড়ীর ওপর তলায় সৈয়দ সাহেবকে এনে বসিয়েছে। বালীগঞ্জের বাড়ীর অর্ধাংশ অজিতের নামে করে দিল।

এক বছরের মধ্যে এই সব ব্যবস্থা শেষ করে পাকিস্তানের পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে দু'মাস ঢাকা বেড়িয়ে এল।

অজিত যখন বিলাত যায় তখন শিউলী তাকে বলে দিয়েছিল, চিঠিপত্র সে যেন এমনভাবে লেখে, যা সকলকেই দেখানো যায়। অজিত সেই রকমই লেখে। নমিতাকেও পত্র দেয়। নমিতার পত্র ও শিউলীর পত্র বিষয়বস্তুতে প্রায় এক রকম, পার্থক্য—শিউলীকে লেখে 'তুমি' আর নমিতাকে লেখে 'আপনি'।

নমিতা খুব গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কোথাও বেড়াতে যেতে চায় না। নিজের মনে সংসারের কাজ করে। শিউলীর সঙ্গে পারতপক্ষে অজিতের কথা তোলে না। গভীর রাতে তার ঘরে বসে একা গীটার বাজায়। অজিতের গীটারটা সে চেয়ে রেখেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দিনে সেদিন খুব গরম গেছে। কলকাতার বৈশিষ্ট্য, রাত আটটার পর দক্ষিণে হাওয়া ছেড়েছে, কিন্তু আবহাওয়া ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

রাত এগারোটা বেজে গেল, গরমে শিউলীর ঘুম আসছে না। বিরক্ত হয়ে ফ্যান বন্ধ করতেই কানে এল, ছাদে নমিতা গীটার বাজিয়ে গান গাইছে।

শিউলী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে, গেল ছাদে। ছাদের দু'তিনটে সিঁড়ি থাকতে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, দড়ির খাটলির ওপরে বসে নমিতা গান গাচ্ছে, তার চোখে জল।

তবে ঐ গাছের গোলাপ ফুলটা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, তাঁর এই গোঁয়ার্তুমি দূর করতে তুই প্রাণপণে চেষ্টা করবি।

নমিতা হাসতে হাসতে প্রতিজ্ঞা করল।

অজিতের টেলিগ্রাম এসেছে। সে এরোপ্লেনের টিকিট পেয়ে বুধবার বেলা আটটা থেকে নয়টার মধ্যে দমদম পৌঁছাবে। টেলিগ্রাম পেলেন অমিয়-বাবু সোমবার সন্ধ্যায়।

অজিত এসে কোথায় থাকবে—কথা উঠতেই শিউলী জানাল তিনি এসে তার ঘরেই থাকবেন।

শুনে অমিয়বাবু ও অপর্ণাদেবী বিস্মিত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

মঙ্গলবারে সকালে উঠেই শিউলী লেগে গেল ঘর সাজাতে গুছাতে। গোলাপবাবু কেমন সাজানো ঘর পছন্দ করেন তা করিমের কাছে জেনে নিয়ে সেইরকম করে সারাদিন ধরে ঘর সাজাল। যেসব আসবাব ছিল না,তা করিমকে পাঠিয়ে বাজার থেকে আনাল।

শিউলীর কাণ্ড দেখে নমিতার একবার মনে হল,—শিউলীর মতো মেয়ে এত নির্লজ্জও হতে পারে।

সারাদিন ও রাত্রি এগারটা পর্যন্ত শিউলী ব্যস্ত থাকল। করিম ও তার মা মনিবের নির্দেশ ম্লান মুখে নীরবে পালন করেছে। রাত এগারটায় তাদের শুতে যেতে বলে শিউলী দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে বসল।

শিউলী পা ঝুলিয়ে খাটের ওপরে বসে আছে, দৃষ্টি তার উদাস। কিছুক্ষণ পরে চোখের জল গড়াতে লাগল। সে জল সে মুছল না। দূরে কোথায় বারোটার ঘণ্টা পড়ল।

ঘণ্টার শব্দে শিউলী চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে ঘরের আলো নিভিয়ে বসল গিয়ে টেবিলের কাছে চেয়ারে।

চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ নীরব থেকে টেনে নিল রাইটিং প্যাড। লিখতে আরম্ভ করল পত্র। অনেকখানি লিখে কি ভেবে লেখাটা পড়ে দেখে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে কাঁচের কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিয়ে একটু খেয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল বড় একখানা ফটো। ফটোখানা সেই

সুলতানপুরে তোলা গ্রুপ ফটো। জাফর সাহেব আর গৌরীশঙ্কর রায় দুই চেয়ারে বসে আছেন, মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শিউলী আর গোলাপ।

শিউলী ঘরের বড় আলোটা আবার জেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল সেই ফটোর সম্মুখে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে হাঁটুগেড়ে বসে হাতজোর করে বলল,— বাপজান, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার জন্ম হলে দাদাসাহেব নাকি বলেছিলেন, সুলতানপুরের জমিদারীই যখন চলে যাচ্ছে, তখন জমিদার বংশ দিয়ে আর কি হবে। আমি তাঁর কথাই রক্ষা করব। আপনার ইচ্ছা ছিল হিন্দু মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সদ্ভাব গড়ে তোলা। আমি সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করব। আপনি আমাকে দোয়া করুন।

কথাগুলি বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ থেকে শিউলী যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার মুখে-চোখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব ফুটে উঠেছে। বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আবার গিয়ে বসল চিঠি লিখতে। প্রথম চিঠিখানা লিখল,—

'গোলা, আমি পাকিস্তানে যাচ্ছি। তুমি যখন এ পত্র হাতে পাবে তখন আমি বহুদূর চলে যাব। আমাকে ধরতে চেষ্টা না করে আমার পত্রখানা পড়ে কি লিখলাম তা বুঝতে চেষ্টা কর।—

আমার পাকিস্তান যাওয়ার সংবাদে তুমি যে পাগল হয়ে উঠবে তা আমি জানি। তোমাকে আমি চিরতরে ছেড়ে যাচ্ছি নে। একদিন আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব, এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমার কাছেই থাকব। এখন তুমি নমিতাকে বিয়ে করে ঘরসংসার কর।

তিন বছর আগে বালীগঞ্জের বাড়ীতে যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, সেদিন আমার শোবার ঘরে তোমাকে বলেছিলাম, ভালবাসায় নমিতা মহারাণী আর আমি ভিখারিণী। কথাটা তখন তুমি বুঝতে চাওনি। আমিও বুঝিয়ে বলতে পারি নি। কারণ, সেইদিন থেকে যে দু'মাস তুমি কলকাতা ছিলে, সে দু'মাস এক তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নি। তুমি সম্মুখে এলে তো একেবারেই আত্মহারা হয়ে পড়তাম। এখনও তোমার কাছে বসে এসব কথা বলার ক্ষমতা আমার হবেনা বলেই লিখে রেখে যাচ্ছি।—

সাত বছর আগে কলকাতা এসে নমিতার সাথে যখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়, তখন সে আমার মুখে তোমার-আমার সম্বন্ধের কথা শুনে বলেছিল, আমার হারাণো গোলা খুজে এনে দেবে। সেই থেকে চার বছরের মধ্যে সে জানতে

পারে নি যে, তার অজিত রায়ই আমার গোলাপ। তারপর যখন জানল তখন তুমি লক্ষ্ণৌ, আমি দুর্বৃত্তের হাতে।

দুর্বৃত্তের হাত হতে উদ্ধার পেয়ে আমি ফিরে এলে নমিতা আমাকে নিজে থেকেই সব বলল। তার কথা ও ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিকারের প্রেম যে মানুষকে কতবড় মহান ও ত্যাগী করে সেটা সেদিন আমি প্রত্যক্ষ দেখে বুঝলাম।—

নমিতা তোমাকে প্রথম দেখার দিন থেকেই প্রাণঢালা ভালবেসেছে। সে ভালবাসার প্রতিদানে তোমার কাছ থেকে সে কিছুই পায় নি, পাবার আশাও করে নি। তার ধারণা ছিল তুমি নারী-বিদ্বেষী। তবুও তুমি ছাড়া তার অন্য গতি নেই। তারপর যেদিন সে জানতে পারল তুমি নারীবিদ্বেষী নও, তুমি আমাকে ভালবাস বলে আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাও না, সেদিন থেকে তার আনন্দ ও গর্ব ধরে না। নমিতার উক্তি,—সে এমন একজনকে ভালবেসেছে, যে সত্যই ভালবাসতে জানে। তার এই অপূর্ব ভালবাসার সম্মুখে আমি নিতান্ত ছোট হয়ে গেছি।

মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু মনের দুর্বলতা আছে। সৎমানুষের এই দুর্বলতা অনেকসময় তার মানসিক সৌন্দর্য-মাধুর্যই ফুটিয়ে তোলে। নমিতারও মনে দুর্বলতা আছে। এই তিনবছরে তাকে আমি কয়েকবার নির্জনে নীরবে কাঁদতে দেখেছি। তাতে তার প্রেমের মাধুর্যই আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে।

তোমাকে নিয়ে সবদিক থেকেই আমি নমিতার কাছে পরাজিত হয়েছি। এখন অন্তত ত্যাগের দিক থেকে আমি তার সমকক্ষ হতে চাই। ছেলেবেলায় তুমি আমার দুঃখ সইতে পারতে না, যখন যা বলতাম তাই করতে। এতদিন পরে আবার তোমার কাছে আবদার করছি, তুমি নমিতাকে বিয়ে করে আমার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ কর।

কারো কথায় কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না,—এ জ্ঞান আমার আছে। তুমি নমিতাকে স্নেহ কর। তার ভিতরে আমাকে পেতে চেষ্টা কর। চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে আমার সব কিছুই নমিতার মধ্যে আছে, বরং কিছু বেশী আছে।—

আমি উপস্থিত থেকে যদি তোমাদের দু'জনের বিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম, তবে আমার খুবই গর্বের বিষয় হত। কিন্তু সে গর্ব করার সাহস আর আমার নেই। তিন বছর আগে যখন তুমি প্রথম বালীগঞ্জের বাড়ীতে এলে, তখন তোমার আসার পূর্বমুহূর্তেও সঙ্কল্প ছিল তোমার কাছে ধরা দেব না। কিন্তু

তোমাকে দেখেই আমি সব ভুলে গেলাম। তোমার একটু কাতরতায় জ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তোমার কলকাতা থাকার সেই ছু'মাসের মধ্যে একদিনও সে জ্ঞান আমার ফিরে এলনা। এতেই বুঝেছি তোমার সম্মুখে আমি কত দুর্বল। তথাপি ঐ দু'মাসের সুখস্মৃতিই আমার সারাজীবনের সম্বল। এই সম্বল নিয়েই আজ তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

যখন আমি বুড়ী হব, তখন আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। শিশুকালে জ্ঞান হয়ে তোমাকে পেয়েছি একমাত্র খেলার সাথী। বড় হয়ে বুঝেছি তুমিই আমার ধ্রুবতারা। মরণকালে তোমার সম্মুখেই শেষ শয্যা যেন পাততে পারি, খোদার কাছে এই প্রার্থনা সারাজীবন করব। গোলা, আমি ফিরে আসব।'

তোমারই শিলী।

পত্রখানা লিখে ভাঁজ করে খামে ভরে খামের উপরে লিখল গোলাপ রায়। তারপর আর তিনখানা পত্র লিখল নমিতা, অপর্ণাদেবী ও অমিয়বাবুর নামে। চিঠি লিখতেই রাত ভোর হয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই নমিতা এল শিউলীর খোঁজে। শিউলীর ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি না করে নমিতা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘরে আলো জ্বলছে, শিউলী রাইটিং টেবিলের ওপরে দুইহাতের মধ্যে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে, গণ্ডে চোখের জলের দাগ।

ব্যাপার দেখে নমিতা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তিন বছর আগে অজিত লক্ষ্ণৌ থেকে এসে যে দু'মাস কলকাতা ছিল, তার মধ্যে কেবল প্রথম দিন অপর্ণাদেবীর পরামর্শে অমিয়বাবু অজিতের হোটেলে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে বালীগঞ্জের বাড়ীতে এনেছিলেন। তারপর থেকে নমিতা সপ্তাহে অন্তত তিনদিন গাড়ি পাঠিয়ে অজিতকে নিয়ে এসে নানা ছুতায় দুজনের নির্জনে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করত। নমিতার এই চেষ্টার জন্য শিউলী ও অজিত দুজনেই যে সুখী ও খুশী, তা তাদের ভাব-ভঙ্গীতেই বেশ বুঝা যেত। বিলাতে যাওয়ার পূর্বে দুমাসের মধ্যে একদিনও দুজনের একটু মনান্তর ঘটে নি। বরং অজিত যেদিন ইয়োরোপ যাত্রা করে, তার আগের দিন থেকেই শিউলী বেশ একটু ভেঙ্গে পড়েছিল। এ অবস্থায় আজ অজিত তিন বছর পরে ফিরে আসছে, আজ কেন শিউলী কাঁদে!?

নমিতা কিছুই ভেবে স্থির করতে পারল না, সাহস করে শিউলীকে ডাকতেও পারল না। তখনকার মতো ফিরে গিয়ে স্নান করে আবার এসে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল, শিউলী একই ভাবে বসে আছে।

এবার নমিতা দরজায় কড়ানাড়া দিল। দরজা খুললে ঘরে প্রবেশ করে নমিতা শিউলীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—

তুই এমন করে কাঁদছিলি কেন বল তো?

আজ ক'দিন ধরে কেবলই বাবার কথা মনে পড়ছে। আমি তাঁর কোনো ইচ্ছাই পূরণ করতে পারলাম না।—শিউলীর চোখে আবার জল দেখা দিল।

তা ভাই, কি করবি বল। আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের সামর্থ্যই বা কত? এখন নে, চল। স্নান করে প্রস্তুত হয়ে সাতটার মধ্যে রওনা হতে হবে। বাবা বলছেন—আবহাওয়া ভাল আছে, প্লেন কিছু আগেই আসতে পারে।

ভাই, তুই যা। আমার শরীরটা আজ খুব খারাপ, রাত্রে ঘুম হয় নি।

কিন্তু প্লেন থেকে নেমে যখন তৃষিত চক্ষু দুটি তোকে খুঁজবে তখন আমি কি উপস্থিত করব?—হাসতে হাসতে বলল নমিতা।

তুই তখন সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবি।

দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে?

ও প্রবাদটা এই দেশের ঘোল সম্পর্কে খাটলেও আমাদের সুলতানপুরের ঘোলের বেলায় খাটে না। সে ঘোল পেলে যারা রসিক ভোক্তা তারা দুধ ফেলে ঘোলই খাবে।

কিন্তু যারা দুধেরই ভোক্তা?

হাঁ, সে কথা ঠিক। একগুঁয়েদের গোঁ ছাড়ানো সহজ নয়। তবে অসাধ্যও নয়। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা। খোদা ও দুটোই তোকে যথেষ্ট দিয়েছেন।

গোলাপ বাবুর একগুঁয়েমী আমি ছাড়াতে যাব কেন? তোর অপছন্দ হয় তুই ছাড়াবি।

আমি পারব না বলেই তোর সাহায্য চাচ্ছি। সেদিন তুই ফুল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিস তাঁকে আমার মতানুবর্তী করার জন্য চেষ্টা করবি। এখন তোর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। তিনি এলে ছায়ার মতো তাঁর সাথে থাকবি। আমার কোনো ব্যবহারে তিনি মনে যদি দুঃখ পান, তুই সে দুঃখ দূর করবি।—বলতে বলতে শিউলীর গলা ভার হয়ে গেল। নমিতার সম্মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে টেবিলের দিকে দু'এক পা গিয়ে ঘড়ি দেখে বলল,—

এখন তুই যা। সাতটা বাজতে পনরো মিনিট বাকি আছে। আমার হয়ে তুই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস।

নমিতা শিউলী কথার প্রকৃত তাৎপর্য কিছুই বুঝল না। সে সরল মনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক পরে অমিয়বাবুর ট্যাক্সি চলল দমদম।

অপর্ণাদেবী সেদিন সকাল থেকেই কাজে ব্যস্ত। অজিত এসে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বালীগঞ্জের বাড়ীতেই থাকবে। বিয়ে হলে আলিপুরের বাড়ীতে যাবে। বালীগঞ্জের বাড়ীতে অজিত থাকবে শিউলীর ফ্ল্যাটে, শিউলী থাকবে নমিতার সাথে নমিতার ঘরে। এই রকম ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে।

অজিত এলে প্রথম দিন অপর্ণাদেবী খাওয়াবেন। নমিতা ও অমিয়বাবু অজিতকে আনতে গেলে অপর্ণাদেবী রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে সাহায্য করছে মরিয়মের মেয়ে।

শিউলীর ফ্ল্যাটে কি ঘটছে, সে সংবাদ তিনি রাখেন নি, রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি।

বেলা প্রায় পৌনে ন'টার সময় খোকন একখানা পত্র এনে অপর্ণাদেবীর হাতে দিয়ে বলল,—মা বড়দি'রা সব চলে গেল। নীচে গাড়িতে উঠে তোমাকে দেওয়ার জন্য এই পত্রখানা দিয়ে গেল।

খোকনের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অপর্ণাদেবী পত্র নিয়ে খুলে পড়লেন,—

'কাকীমা, আপনি আমার ও নমিতার সব কথাই জানেন। এই তিন বছর ধরে অনেক ভেবেচিন্তে বৃহত্তর কর্তব্যের অনুরোধে আপনাদের ছেড়ে আজ ঢাকা যাচ্ছি। নমিতা ও আপনি তাঁকে শান্ত করুন। শান্ত করে নমিতার সঙ্গে বিয়ে দিন। আমার স্থির বিশ্বাস, নমিতা তাঁকে সুখী করতে পারবে। আপনার অসুবিধা হবে বলে মরিয়মের ছেলে দুটি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তিনখানা পত্র আমার টেবিলের ওপরে রইল, কাকাবাবুদের দেবেন। আশীর্বাদ করুন আমি যেন শান্তি পাই। প্রণাম গ্রহণ করুন।'

আপনার স্নেহের শিউলী।

পত্র পড়ে অপর্ণাদেবী একেবারে পাথর হয়ে গেলেন।

খোকন বলল,—মা, বড়দি গাড়ির মধ্যে বসে আমার হাতে পত্র দিলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বড়দি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তাতে দিদি কেঁদে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কিছু বললেন না।

অমিয়বাবুর ট্যাক্সি এসে বালীগঞ্জ বাড়ীর সম্মুখে থামল, কিন্তু করিম বা দারোয়ান মাল নামাতে এল না দেখে অজিত নিজেই ট্যাক্সির পিছন থেকে সব নামাতে আরম্ভ করল। অমিয়বাবু আর নমিতা গাড়ি হতে নেমে দাঁড়ালেন। একটু পরেই অপর্ণাদেবী এলেন, তাঁর পিছনে এল খোকন।

মা, করিমভাই কোথায়? দারোয়ানকেও তো দেখছি নে! প্রশ্ন করল নমিতা।

অর্পণাদেবী এ প্রশ্নের কি উত্তর এখনই দিতে পারেন তা একটু ভেবে নিতেই খোকন বলে ফেলল,—দিদি, বড়দি আজ ঢাকায় চলে গেলেন, আর আসবেন না।

অজিত নামাচ্ছিল একটা বাক্স। বাক্সটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। সকলে স্তম্ভিত।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সি এসে গেটের সামনে রাস্তায় থামল। ট্যাক্সি থেকে দারোয়ান নেমে বলল,—মাইজী, ট্যাক্সি আ গিয়া।

দারোয়ানের কথায় অজিত চমকে উঠে অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করল,—কাকাবাবু, ঢাকামেল ক'টায় ছাড়ে?

ন'টা পঁয়ত্রিশে।

অজিত একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বলল,—জলদি হাঁকাও, শিয়ালদা, ন'টা পঁয়ত্রিশ, ঢাকামেল, পঞ্চাশটাকা বকশিস্।

অমিয়বাবু নমিতাকে বললেন,—গাড়িতে ওঠ, আমরাও যাই।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো নমিতা গাড়িতে উঠে বসল। অমিয়বাবু গাড়ি ব্যাক করে রাস্তায় পৌছতে দু'মিনিট দেরী করে ফেললেন।

সারারাস্তা ছুটে এসে অজিতের ট্যাক্সি বাধা পেল শিয়ালদহ-বহুবাজারের মোড়ে। অফিসের সময়, সম্মুখের মোড়ে ট্রাফিক জাম। নয়টা পঁয়ত্রিশ বাজতে আর মিনিটখানেক দেরী।

অজিত পাঁচখানা দশটাকার নোট ড্রাইভারের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়াল মেইন স্টেশনের দিকে।

অজিতের ট্যাক্সির পিছনে কিছু দূরে ছিল অমিয়বাবুর ট্যাক্সি। নমিতা দেখল, অজিত গাড়ি থেকে নেমেই ছুটল মেইন স্টেশনের দিকে। অমিয়বাবুর গাড়ি বহুবাজারের মোড়ে আসতেই সার্কুলার রোডে গাড়ি চলাচল আরম্ভ

হল। বাধা না পেয়ে গাড়ি ঘুরে মেইন স্টেশনের সম্মুখে আসতেই দেখা গেল, অজিত স্টেশনে ঢুকল। নমিতা গাড়ী থেকে নেমে ছুটল অজিতের পেছনে।

অজিত যখন পাঁচনম্বর প্লাটফর্মের গেটের কাছে এল, তখন ঢাকা মেল চলতে আরম্ভ করেছে। চেষ্টা করলে সে গার্ডগাড়ির পাশের কামরাটায় উঠতে পারত, কিন্তু সেবুদ্ধি তার হল না, ছুটল প্রথম শ্রেণীর বগীর দিকে।

শিউলীর রিজার্ভ কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল করিম; তার চোখে পড়ল, অজিত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। দেখে শিউলীকে করিম বলল,—খুকুমণি, গোলাপ আসছে।

শিউলী জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখতেই অজিত চিৎকার করে উঠল,—'ও শিলী, তুই যাসনে শিলী। আমাকে ফেলে যাসনে শিলী। ও শিলী, তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়—'।

পাঁচনম্বর প্লাটফর্ম ভেণ্ডার আর মালপত্রে ভরতি। একটা ছোটো বাক্সে বেধে গোলাপ পড়ে গেল। শিউলী দেখল, গোলাপ পড়ে যেতেই নমিতা ছুটে এসে তার হাত ধরে তুলল। রেলের থার্ড লাইনে যাওয়ার জন্য শিউলীর বগীখানা ঘুরে গেল। পাঁচনম্বর প্লাটফর্ম আর দেখা গেল না।

সতেরো বছর আগের এক দুপুরে সুলতানপুরে বাড়ীর পিছনের বাগানে গোলার পিছনে ছুটেছিল সাত বছরের বালিকা শিউলী কাঁদতে কাঁদতে,—'ও গোলা, তুই যাসনে গোলা। তুই গেলে আমি কার সঙ্গে খেলব গোলা? ও গোলা, তুই ফিরে আয়। গোলা, ফিরে আয়, ফিরে আয়…'।

সতেরো বছর পরে শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মে ব্যাকুল গোলার আকুল কণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনিত হল,—'ও শিলী, তুই যাসনে শিলী। আমাকে ফেলে যাসনে শিলী। ও শিলী, তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়—'।

মহাকালের গতিপথে বিচিত্র এই ভারতবর্ষ আর তার অধিবাসীর প্রেম সেই জন্যই—

'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

কারণ, এ প্রেমের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।